॥ নিবেদন ॥

এই খণ্ডের তৃতীয় গ্রন্থ "হিটলার" বইয়ের হিটলারের প্রেম, মস্কোযুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়, গাড়োলস্য গাড়োল, লক্ষ মার্কের বরমান, কনরাট আডেনাওয়ার, রাজহংসের মরণ-গীতি, আবার আবার সেই কামানগর্জন, হিটলার—এই প্রবন্ধগুলি পূর্বেই অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদনুযায়ী রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে ও ৪র্থ খণ্ডের পূর্বাংশে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কারণে উক্ত প্রবন্ধগুলি 'হিটলার' অংশে আর অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

রচনাবলী-সম্পাদক

সূচিপত্র

কত না অশ্রুজল

হিটলার

ভূমিকা

পুরীর সমুদ্রে যাঁরা স্নান করতে নেমেছেন, অথবা যাঁরা সেখানে নুলিয়াদের নৌকো নিয়ে দূর সমুদ্রে এগিয়ে গিয়ে মাছ ধরা দেখেছেন তাঁরা জানেন তীরের কাছাকাছি এসে সমুদ্রের ঢেউগুলি পাহাড়-প্রমাণ উঁচু হয়ে দুইয়েরই বাধা সৃষ্টি করে। স্নানার্থীরা সেই ব্রেকার বা উত্তাল তরঙ্গভঙ্গের আগেই ডুবে গিয়ে তা থেকে আত্মরক্ষা করে, আর নুলিয়ারা বহু দুঃখ সহ্য করে অনেক সময় নৌকো সমেত ডিগবাজি খেয়ে প্রথম বাধাগুলি পার হয়ে গেলে অনেকটা শান্ত সমুদ্রে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়।

ঠিক এর সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাভঙ্গির তুলনা করতে পারলে পাঠককে তা বোঝাবার পক্ষে সুবিধাজনক হত। কিন্তু মুজতবার ভাষাভঙ্গি, বানান, উচ্চারণ, লিপ্যন্তর, ইডিয়ম প্রভৃতি তাঁর অধিকাংশ রচনার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই মাঝে মাঝে ধাক্কা মারে, এবং তা শুধু তীরভূমিতে নয়। এ ধাক্কা অবশ্য অভ্যস্ত পাঠকের সহ্য হয়ে যায় এবং পাঠক তখন তাঁর রচনা-সমুদ্রের শান্ত গাম্ভীর্যের স্তরে ডুবে গিয়ে অনায়াসে লেখককে ক্ষমাও করতে পারেন। এবং শুধু তাই নয়, লেখককে ভালবাসতেও পারেন।

লেখার কোন্ গুণে এটি সম্ভব সে আলোচনা পরে করছি। কিন্তু তার আগে এই চরম খেয়ালি অথচ নিরহঙ্কার লেখকটির ভাষা খেয়ালের কিছু নমুনা দিই। কারণ নতুন পাঠক এই সব অপরিচিত ইডিয়ম ইত্যাদিতে ধাক্কা খেয়ে লেখককে ভুল না বোঝেন।

মুজতবা সব স্থানে লিখেছেন চেষ্টা দেওয়া অথবা প্রচেষ্টা দেওয়া। অনভ্যস্ত কানে বিষম লাগে। অথবা man proposes-এর বাংলা করা হয়েছে মানুষ প্রস্তাব পাড়ে। অজ্ঞতা নয়, এ তাঁর নিজস্ব ভাষা। বেপমানের স্থলে বেপথুমান, অপর্যাপ্ত অর্থে অপ্রচুর, অপরিচ্ছিন্ন শব্দের সঙ্গে কেন লিখলেন 'মলিন অর্থে নয়'? উপমিত ও উপমেয়-এর স্থলে তুল্য ও তুলনীয় কেন? তারপর লিপ্যন্তর। এ, অ্যা, এ্য ও এ্যা এই চার রকম বানান আছে। ভাষাবিজ্ঞান মতে অ্যা হওয়া উচিত। পার্লিমেণ্ট সর্বত্র। পেলেস (প্যালেস), এশেমড্ (অ্যাশেমড)। সাইকোঅ্যানালেসিস, ক্যারেবিয়ান লিপ্যন্তরে অ্যানালিসিস এবং ক্যারিবিয়ান হওয়া উচিত। Function ফন্‌কৃশন কেন? Zinc জিনক কেন? গ্যোয়েবলস, গ্যোয়েরিং গ্যোয়েটে হয়েছে গ্যোবলস, গ্যোরিং, গ্যোটে, Roosevelt

রোজোভেল্ট কেন ? রুজভেলট বা রোজভেলট হওয়া উচিত ছিল। Concentration কনসানট্রেশন কেন ? ফ্রয়লাইন ফ্রলাইন কেন ? মহারাজাকে 'মহরাটশা' কেন বলবে জার্মানরা ? মাহারাজা বলবে। Maharazah হলে 'মাহারাৎসা' হতে পারত। তবু মহা নয়, মাহা। Valet ভ্যালে কেন সর্বত্র ? এটি না ইংরেজি না ফরাসী না জার্মান উচ্চারণ। উদ্ধৃতিতেও গণ্ডগোল আছে। Dog and the manger নয়—in the manger হবে। এ রকম কত যে আছে !

এ রকম ধাক্কা নতুন পাঠকের পক্ষে অসুবিধেজনক হতে পারে। কিন্তু এ সবও তুচ্ছ হয়ে যায় যখন লেখক মানুষটির সমস্ত মধুর ব্যক্তিত্বের গভীর স্পর্শ পাওয়া যায় তাঁর রচনাগুলির ভিতর দিয়ে। এ থেকে পাঠকের মুক্তি নেই। মুজতবা এত জনপ্রিয় তার অনেকগুলি কারণ। প্রথম কারণ কৃত্রিমতাহীন সরল বলার ভঙ্গি। দ্বিতীয় কারণ তাঁর আপন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অহঙ্কারহীনতা। তৃতীয় কারণ যাঁর বিষয়ে বলতে গেছেন তাঁর প্রতি আছে তাঁর গভীর মমত্বপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ে কৌতুক ও নিজের প্রতি মৃদু ব্যঙ্গ বর্ষণ। চতুর্থ কারণ লঘু বিষয়ে লঘু চাল ও গুরু বিষয়ে যথার্থ চিন্তাশীলতার প্রকাশ। সবার প্রতি গোঁড়ামি বর্জিত অভিগম বা অ্যাপ্রোচ। যেখানে বেদনা, সেখানে তিনি অন্যের বেদনার অংশীদার হয়েছেন। অনেক সময় হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরেছে বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে। তাঁর মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুবাৎসল্য তুলনাহীন।

মুজতবা প্রকৃত কথা-শিল্পী, কথা বলার আর্ট তাঁর জন্মগত। এ বিষয়ে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাঁর বিষয়ে। আমার বয়স যখন বাইশ-তেইশ, আর মুজতবার ষোল, সেই সময় (১৯২১) আমরা কিছুদিন পাশাপাশি বিছানায় কালযাপন করেছি। তখনই দেখেছি তাঁর অবিরাম কথা বলে ও নানা ম্যাজিক দেখিয়ে (প্রায় টম সইয়ারের মতো) আত্মপ্রকাশের চেষ্টা। তারপর দীর্ঘ ৩২ বছর পরে দেখা। গার্স্টিন প্লেসে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে। ঘণ্টা দুই একত্র কাটিয়েছি। এর মধ্যে আমি কথা বলার সময় পেয়েছি বোধ হয় পনেরো মিনিট মোট। প্রথম পরিচয় ১৯২১, শেষ দেখা ১৯২১। এর মধ্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। স্থান আমার বাড়ি। আড়াই ঘণ্টা ছিলেন, সেদিনও আমি শ্রোতা, তিনি বক্তা।

তাঁর মুখের মতো তাঁর কলমও অবিরাম কথা বলতে চায়। এদিক থেকে দেখলে মনে হয় তাঁর যে তিনখানা বই বিষয়ে আমি আলোচনা করছি, তার

অনেকগুলি রচনাই এই অবিরাম কথা বলার দৃষ্টান্ত। আর ঠিক এই কারণেই সে-সব রচনায় ব্যাকরণ গৌণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পাঠকের পক্ষে সেটি যে বড় বাধা হয়ে ওঠেনি, মুজতবার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। তাঁর সমস্ত চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে প্রকট।

অন্যের বেদনা তাঁর মনে যে বেদনার সঞ্চার করেছে, তাই থেকে কত না অশ্রুজলের প্রথম দিকের অনূদিত রচনাগুলি। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যারা বলি—তরুণ-তরুণীই অধিকাংশ, তারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের নিকটতম প্রিয়-জনকে যে সব অপূর্ব সুন্দর চিঠি লিখে গেছে তারই একটি সংকলন গ্রন্থ থেকে অনেকগুলি চিঠি এ বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া হয়েছে। চিঠিগুলি স্বভাবতই মর্মস্পর্শী। মুজতবার প্রধানত হাল্কা মেজাজের নিচের স্তরে যে একটি গভীর সং-বেদনশীল মন আছে, তার প্রতিটি তন্ত্রীতে যেন এই চিঠিগুলির বেদনা ঘা দিয়েছে, তাই তিনি এগুলি বেছে নিয়েছেন বাঙালী পাঠকদের দেখাবার জন্য। এই সঙ্গে পটভূমিরূপে প্রথম মহাযুদ্ধের বলি তরুণ কবি ওয়েনের ডায়ারি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর মায়ের চিঠির উল্লেখ থাকলে ভাল হত।

কিন্তু সব রচনাই অশ্রু নয়। সৈয়দী ভঙ্গি ও মেজাজের রচনাও আছে, প্রায় টেবিলে বসে বলা, শুনতে বেশ লাগে। 'নট গিলটি' এই জাতীয় রচনা। পরবর্তী কয়েকটিও তাই। একেবারে শূন্যগর্ভ নয়, চিন্তার পরিচয় আছে, ভাববার কথাও আছে। স্পাইদের গল্পগুলিও চমকপ্রদ, ভাল লাগে পড়তে।

'আধুনিকের আত্মহত্যা' যেমন কাজের কথায় তেমনি মজার কথায় ভরা। আধুনিকতা নিয়ে মুজতবা যেসব দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর স্মৃতি আছে এবং শেষ পর্যন্ত পিকাসো বিষয়ে যেসব চমকপ্রদ কথা মুজতবা সংগ্রহ করে এতে উদ্ধৃত করেছেন, তা পড়লে শিল্পী-জগৎ স্তম্ভিত হবে। এবং প্যারিসের ডি-লিট পাওয়াও অতি মনোরম। আমি কিছু উদ্ধৃত করছি—

> "...শেষটায় ভিটেমাটি বেচে, কালোবাজারে ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনে যদি প্যারিসে চলে যান, ভুলবেন না ফেরার সময় মঁ পলিয়ে থেকে একটা ডি-লিট নিয়ে আসবেন, এ দেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধ হয় সনদ বিক্রি হয়, নয়তো দু'একদিন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বাস করে রেডিমেড থীসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে। ডট করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপসই দিতে যেন ত্রুটি না হয়।"

পিকাসো সম্পর্কে যেসব তথ্য এ রচনায় সংগ্রহ করা হয়েছে তা পড়লে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্পের সঙ্গে তাঁর নিজের ভূতে অবিশ্বাস বিষয়ে মন্তব্যের কথা মনে পড়ে যাবে। পিকাসো বলেছেন, লোকে চায় তাই আমি আর্টের নামে বাঁদরামি করি। আর ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ইউরোপ দর্শন বইতে বলেছেন, আমি কোনো ভূতেই বিশ্বাস করি না, জীবিত বা মৃত কোনো ভূতেই না।

তবে দুইয়ের তুলনা চলে না, কারণ পিকাসো জ্ঞানপাপী, টাকার জন্য আর্টের নামে লোক ঠকিয়েছেন এতকাল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের ভূত লোকঠকানোর জন্য নয়।

মুজতবার এ রচনাটি বিশেষ মূল্যবান নানা দিক থেকে। এতে তাঁর 'আধুনিকতা' বিষয়ে চিন্তায় কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই।

কত না অশ্রুজলের অন্যান্য রচনাও বিষয়বৈচিত্র্যে এবং পাঠকের চিত্ত-আকর্ষণকারী ক্ষমতায় কিছুমাত্র কম নয়। 'হিটলারের শেষ প্রেম' তথ্যপূর্ণ রচনা। সব চেয়ে মজার 'দ্বন্দ্ব পুরাণ'। কীর্তিমানদের জীবনে যা ঘটে তা থেকে ক্রমে কিভাবে লেজেণ্ড তৈরি হয় তার আলোচনা হৃদয়গ্রাহী। শান্তিনিকেতনের গাঙ্গুলীমশাই-এর আসন্ন গান্ধী আগমনের প্রস্তুতির জন্য প্রাণান্তকর কর্মতৎপরতা, অসম্ভব সব আয়োজন, এবং তার অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, যে কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো চিত্তগ্রাহী। এবং গান্ধীজীর ইটালিয়ান জাহাজে ভ্রমণও এর সঙ্গে তুলনীয়। বর্ণনাগুলি এমন কৌতুককর, এবং রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী এবং গাঙ্গুলিমশাই প্রভৃতির চরিত্র উদ্ঘাটক যে, শুধু এই জাতীয় রচনাতেই মুজতবার একটা দিকের পরিচয় অতি সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু গুরুদেবের ঠাকুর্দার উক্তি ভুল করে গুরুদেবের পিতার মুখে দেওয়া হয়েছে। Babu often changes his mind—এটি প্রিন্স দ্বারকানাথের কথা, মহর্ষি-দেবের কথা নয়।

দু-একটি শব্দের যথাযথ ব্যবহার অনেকেই করতে পারেন না, মুজতবাও সেই দলে পড়েছেন। 'উদ্দেশ্য' ব্যবহৃত হয় ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলে। দর্শনের উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে, আহারের উদ্দেশ্যে। আর 'উদ্দেশে' ব্যবহৃত হয় ব্যক্তি স্থান বা বস্তু সম্পর্কে। কলকাতার উদ্দেশে, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। মুজতবার লেখায় ঐ শব্দটি ভুল এবং নির্ভুল দু রকমই আছে। ঐ যে চারিত্রিক অসতর্কতা, তা নইলে মুজতবার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে কেন?

মুজতবা নাৎসি জার্মানির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই হিটলার বিষয়ে

তাঁর পড়াশোনার আগ্রহ স্বভাবতই হয়েছে। এবং তাঁর নানা রচনায় হিটলার বিষয়ক বহু তথ্য এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের অনেক তথ্য তিনি তাঁর বইতে দিতে পেরেছেন। এবং হিটলার নামক পৃথক একখানি পুস্তকই লিখেছেন। হিটলারের ট্র্যাজিক জীবনের খুঁটিনাটি শুধু নয়, তাঁর বন্ধু হিমলারের হাতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মারার বিবরণে শিউরে উঠতে হয়। ঠিক যেমন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের সঙ্গে যুদ্ধে ইয়াহিয়া খাঁর হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী বাঙালী নিধনের বর্বরতার কথায় আমরা শিউরে উঠেছি। এবং তার সঙ্গে অ্যামেরিকান সাপ্তাহিকে ছাপা সেই বর্বরতার ছবিও দেখেছি।

এ খণ্ডে অবশ্য হিটলারের শেষ দশ দিবসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। হিটলার বহুদিন নেই, তাঁর বিষয়ে লোকের আগ্রহও বিশেষ আর নেই, কিন্তু এ বইয়ের বর্ণনা যে-কোনো ট্র্যাজিক নাটককে হার মানাবে। এবং এখানে হিটলার শুধু ঐতিহাসিক একটি চরিত্র নন, এখানে তিনি ঐ মর্মান্তিক নাটকের প্রধান চরিত্র।

বড়বাবু নামক পুস্তকখানি, এবং যেমন কত না অশ্রুজল নামক পুস্তক—নামের দিক থেকে খুব সঙ্গত হয়েছে মনে হয় না। বিশেষ করে বড়বাবু। নামের সঙ্গে 'ও অন্যান্য রচনা' জুড়ে দিলে ভাল হত। কারণ বড়বাবু এ বইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক প্রথম রচনা। স্যালাড তৈরির ব্যবস্থাপত্রও আছে একটি রচনায়। কাজেই বড়বাবু কিছু ভ্রান্তি ঘটায়।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়লে পুস্তকের নাম কি তা আর মনেই পড়বে না। এই একটি মানুষ এ দেশে আর হয় নি, হওয়া সম্ভব কিনা তাও জানি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দূর তুলনা হয়তো একটুখানি চলতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার একটি মস্ত বড় বিস্ময়। তাঁর বিষয়ে মুজতবা তাঁর বড়বাবু রচনাটি যত দূর সম্ভব তথ্যে ভরে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার যত দিক প্রায় সবই তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। এক দিকে তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য, অন্য দিকে তাঁর বক্সোমেট্রির খেলা। এর তুলনা হয় না। বাংলা শর্টহ্যাণ্ড নিয়ে তাঁর কত গবেষণা। এবং অনেক নির্দেশ ও বলবার কথাই ছন্দে লেখা। গভীর চিন্তাশীলতার সঙ্গে শৈশবের মিলন ঘটতে দেখা যায় না সহজে। "আপন স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা"—বিশেষণটি মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশি খাটে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃস্মৃতিতে এই শিশু ভোলানাথ বিষয়ে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ দিয়েছেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর লেখা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বইতেও অনেক মজার ঘটনার উল্লেখ আছে। ঠাকুর পরিবারের অনেকেই

ছিটগ্রস্ত ছিলেন। উন্মাদ সীমানার একচুল এদিক ওদিক। একখানা পা সম্পূর্ণ ঐ সীমানার দিকে বাড়ানোই ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ এই উন্মাদ ব্যাধির উদারা মুদারা তারা—এই তিন সপ্তকের প্রত্যেকটি স্বর ছুঁয়ে গেলেও কোন্ দৈবশক্তিতে সুস্থ মানুষ রূপেই পরিচিত ছিলেন, এও এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। কোন্ মন্ত্রবলে তিনি ঘোষিত উন্মাদ হন নি, এ আমার বোধের অতীত। তাঁর সমস্ত আচরণ, সমস্ত পাণ্ডিত্য, সমস্ত সাধনার স্থিতি ছিল সকল লোভ লালসা স্বার্থের উর্ধ্বে। তাঁর সমস্ত আচরণের ভিতরে ভিতরে একটি শিশু খেলা করে বেড়াত। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সভায় পঠিতব্য কোনো রচনা (দর্শন বিষয়ে) লেখা শেষ হলে সভায় পাঠের আগে কাউকে পড়ে শোনাতেন। একদিন কাউকে না পেয়ে বাড়ির বুড়ো ঝিকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। সে এক পরম দুর্লভ দৃশ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'সার সত্য' নামক কঠিন প্রবন্ধ পড়ছেন আর ঝি মাথায় ঘোমটা টেনে ধৈর্যের সঙ্গে তা শুনছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পল্লীগ্রামে যেখানে-সেখানে নানারকম দেহচর্চা আরম্ভ হতে দেখেছি। তার মধ্যে একটি, সোজা দাঁড়িয়ে দেহটাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে মাথা সমেত হাত দুটি পা স্পর্শ করার খেলা। দেহের সম্মুখভাগটা আকাশের দিকে। এ ব্যায়াম খুব কঠিন, (আমি চেষ্টা করে পারি নি)। যাই হোক, মাথাটা পায়ের সঙ্গে স্পর্শ করানোর সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের মগজ ও পা এক সমতলে এনে ব্যবহারের ক্ষমতায়। এক প্রান্তে পণ্ডিত ও অন্য প্রান্তে শিশু।

মুজতবা এ মানুষটির অনেক দিকের পরিচয়ই দিয়েছেন দৃষ্টান্ত সমেত—অবশ্য সংক্ষেপে যতটা দেওয়া সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি আমার নিজের কিছু দুর্বলতা আছে, তাই আরও ভাল লাগল রচনাটি। আজও মনে পড়ে সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তির চেহারাটি—রিকশয় তাঁকে ছুটে আসতে দেখেছি বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে দার্শনিক-তত্ত্ব আলোচনার জন্য।

লেখক একটি প্রশ্ন তুলেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ কেন বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড প্রচলনের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। আমার মনে হয় যিনি বক্সোমেট্রি তৈরিতে এত যত্নবান ছিলেন, তাঁর পক্ষে শর্টহ্যাণ্ড পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। অঙ্কের খেলাও তাঁর প্রিয় ছিল। শর্টহ্যাণ্ড উপলক্ষে তাঁর বাংলা বানান সংস্কারের নির্দেশ পরবর্তীকালে অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

"কর্ম্মের ম-এ মফলা অকর্ম বিশেষ
কার্য্যের য-এ যফলা অকার্যের শেষ।..."

এখন আর এই রেফের ক্ষেত্রে দ্বিত্ব বর্জন অস্বাভাবিক মনে হয় না।

এই রচনার একস্থানে আছে: "লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিখিরি এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই, তুমি এই শালখানা নিয়ে যাও।...ভিখিরি প্রথমটায় নাকি নিতে চায়নি।"

তারপর দিনেন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে শালখানা উদ্ধার করেন। আমি অনুরূপ আর একটি কাহিনী পড়েছি, পার্ক স্ট্রীটে থাকতে দ্বিজেন্দ্রনাথ একখানা ট্রাইসাইকেলে ময়দানে ঘুরতেন। একদিন এক ভিখিরিকে অন্য কিছু দেবার মতো না পেয়ে সেখানা দান করেন। দুটি ঘটনাই সত্য কিনা বোঝা যায় না। হয়তো একটা সত্য। প্রণাম, দ্বিজেন্দ্রনাথকে। Others abide our question, Thou art free.

পরবর্তী রচনা 'রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ'। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যে দুঃখ পেয়েছেন, যে দুঃখ দেখেছেন এবং তার শরিক হয়েছেন, তার কিছু কিছু পরিচয় আছে এতে। এ সব দুঃখ-বেদনা রবীন্দ্রনাথের মতো অতি স্পর্শচেতন মনে কি মর্মভেদী আঘাত হেনেছে তার অংশবিশেষ মাত্র আমরা জানতে পারি, তাঁর গানের ভিতর দিয়ে, কাব্যের ভিতর দিয়ে। সে কি মর্মান্তিক ভাষা ও প্রকাশ। অথচ কত সংযত। কবি সমস্ত জীবন একের পর এক আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু কখনও ভেঙে পড়েন নি। নীরবে সব মেনে নিয়ে তার উর্ধ্বে মাথা তুলেছেন। দুঃখ-বেদনাকে দার্শনিকতা অথবা কাব্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে তবে মনকে শান্ত করেছেন।

সকল জখম যে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, সে কথা বোঝাপড়া নামক কবিতাতে স্পষ্ট বলেছেন যৌবন বয়সেই। বলেছেন—

অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি
এলে সুখের বন্দরেতে,
জলের তলে পাহাড় ছিল
লাগল বুকের অন্দরেতে,
মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো
উঠল কেঁপে আর্তরবে
তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে
ঝগড়া করে মরতে হবে?

এমনি অতর্কিতে আঘাত এসেছে। এবং অনেক সময় এমনও গেয়েছেন—

আরো আঘাত সইতে হবে সইবে আমারো—। এমন কত আত্মসান্ত্বনা, এবং যিনি বলতে পারেন—

> ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে,
> নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নিচে।
> কী হল না কী পেলে না, কে তব শোধেনি দেনা,
> সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে।

তাঁর জীবনে বেদনা-আঘাতের আর নতুন সংবাদ কি শোনানো যাবে? অথচ যখনই এই অপরূপ জীবনদর্শনের কথা আলোচনা করা যায়, তখনই তা নতুন বোধ হয়। নতুন বিস্ময়। নতুন একটি ব্যক্তির মহৎ পরিচয়। যে ব্যক্তি অনন্যসাধারণ, যিনি আর সবার ঊর্ধ্বে।

এই রচনাটির নাম রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ হওয়া ঠিক মনে হয় না। ত্যাগের প্রশ্ন কোথায়? সর্বত্র বেদনাকে গ্রহণের প্রশ্নই আলোচিত হয়েছে। সর্বত্রই ভাগ্যের হাতে বঞ্চনা।

মুজতবার আর একটি মন্তব্য আলোচনার যোগ্য। তিনি এই রচনাটির এক স্থানে বলেছেন—

> আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী নিশ্চল এবং ধ্রুবতারা ধ্রুবস্থির। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—মায় ধ্রুবতারা প্রচণ্ড গতিবেগে কোন অজানার দিকে যে ধেয়ে চলেছে সে খবর কেউ জানে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন
>
> দেখিতেছি আমি আজি
> এই গিরিরাজি,
> এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
> দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
>
> তখন তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে, তারপর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেটি কবিতার রসে প্রকাশ করছেন না। এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি পুত্রশোকে মাতার কাতরতা যেমন সোজা অনুভূতি, প্রিয়জন-বিরহ আমাদের বুকে যেমন সরাসরি বেদনার অনুভূতি এনে দেয়, সেই রকম।

এর মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা immediate perception অথবা experience বোঝাতে শুধু বিচ্ছেদ-বেদনার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা এলো কেন? কিন্তু আসল কথা, বলাকা কবিতার "দেখিতেছি আমি আজি"—

ইত্যাদির মূলে কোনো পূর্বলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য অথবা উপনিষৎ থেকে পাওয়া সত্যের সম্পর্ক নেই, মুজতবার এ কথা বিভ্রান্তিকর। গিরিরাজি বন ইত্যাদির ছুটে চলা কল্পনার 'প্রত্যক্ষ দর্শন' ছাড়া কখনও ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ দর্শন বা immediate perception হতেই পারে না। পূর্বলব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই এই কবিসুলভ 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা'। মনটা tabula rasa হলে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে পারত কি ?

রবীন্দ্রমানসে পূর্বলব্ধ জ্ঞান কি ভাবে ছিল তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি, কিন্তু বৃহৎ কালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত। (রূপ ও অরূপ)

২। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনি থাকত অথচ গাছের ঐ পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম, তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতে যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চারদিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছিনে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। (আমার জগৎ)

এ ছাড়াও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে (ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা' হতেও) যে, তাতে নিশ্চিত বোঝা যেত রবীন্দ্রনাথ ছোট কালকে বড় কালের মধ্যে ফেলে এবং বড় কালকে ছোট কালের মধ্যে ফেলে দেখার চিন্তা কত ভাবে করেছেন। একটাতে কাল যেন চলছে না, অন্যটাতে কাল নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছে। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে—সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।" বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একই জিনিস বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়—এ কথা আইনস্টাইনের তত্ত্বও স্বীকার করছে। অতএব মুজতবার প্রত্যক্ষ দর্শনের সিদ্ধান্তটা খুব স্পষ্ট হয় নি তাঁর লেখায়। তাছাড়া slow motion ও rapid motion-এ সিনেমা ছবি তুলে একই কালকে অতি সচল ও অতি অচল রূপে দেখানোর ঘটনা অনেক দিনের।

এ বইতে এই দুটি ছাড়া আরও নানা শ্রেণীর এবং নানা আকারের ১৭টি

রচনা আছে। বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী কোনোটি নিতান্তই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন, কোনোটা বিশেষ ভেবেচিন্তে লেখা, কোনোটা ভাষা বিষয়ে কোনোটা বা অন্য লেখক বা শিল্পী বিষয়ে। কিন্তু যে বিষয়ে হোক, মুজতবা মুখ খুললে তা শ্রোতার না শুনে উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে অবশ্য পাঠকের কথা বলছি। যদিও মুজতবা বার বার বলেছেন তিনি চাকরি পেলে লেখেন না, চাকরি না থাকলে লেখেন, তবু তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি প্রায় সব স্থানেই উপস্থিত। এবং চাপে পড়ে লেখা অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই সত্য, এবং তা আছে বলেই অনেক ভাল লেখার জন্ম হয়েছে।

হাসনুহানা নিয়ে গবেষণামূলক রচনাটি অনেক তথ্যে সমৃদ্ধ এবং উপাদেয়। যে-কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে গেলেই মুজতবার মনে একই সঙ্গে আরও দশ রকম চিন্তা ভিড় করে আসে, কিন্তু তাতে রচনার স্বাদ আরও বাড়িয়েই দেয়।

ঢাকার কুট্টিদের বিষয়ে রচনাটি বেশ। কিন্তু কুট্টির উৎপত্তি বিষয়ে কিছু সন্দেহ রয়ে গেল। ওদের বিষয়ে একটি কাহিনী এই রচনায় আছে। ঘোড়া-গাড়ির ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি। দেড় টাকা সাধারণ ভাড়া, কিন্তু বাবুর জন্য এক টাকাতেই রাজি। বাবু বললেন, বল কি, ছ আনায় হবে না? কুট্টি গাড়োয়ান বলল, আস্তে কন কত্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবো।—আমি গল্পটা আর একরকম শুনেছি। ছ আনা শুনে কুট্টি বলল, ওরে, বাবুরে চাকার লগে বাঁইধা ল।

দরখাস্ত নামক রচনার এই ঘটনাটি পড়ে আমার একটি গল্প মনে পড়ল। মুজতবা লিখছেন—

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—তোমার জীবিকানির্বাহের উপায় কি?

উত্তরে লিখেছিলুম কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া।

তাহলে চলে কি করে?

তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছ আমি চাকরিগুলো দেখছি।

আমার যে গল্পটি মনে পড়ল:

এক চাকরিপ্রার্থিনীর সঙ্গে নিয়োগকর্তার কথা হচ্ছিল।

"তুমি কি অবিবাহিত?"

"তিন বার।"

মাঝে মাঝে চাকরি ছাড়া এবং স্বামী ছাড়া প্রায় একই। অবশ্য নতুন দেশে প্রবেশের মুখে যে সব মজার কাণ্ড ঘটে তা চেস্টারটনের একটি রচনায় পড়েছিলাম

এককালে। প্রত্যেকেরই মজার অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে।

মুজতবার ভাষা ব্যবহারের খামখেয়ালির কথা আর একবার বলি। তাঁর যে সব শব্দ বা ইডিয়ম বাংলা নয়, তার অনুকরণ অন্যের দ্বারা অসম্ভব, অতএব তাতে ভয়ের কারণ কিছু নেই। ' কিন্তু যে সব ভুল শব্দ ব্যবহারে তিনি অন্য লোকের অনুকরণ করেছেন সেখানে সাবধান হওয়া দরকার। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি একস্থানে লিখেছেন "ঢেলে সাজানো"। এই ইডিয়মটি ভুল। কারও সাজ ঠিক না হলে তা 'ঢেলে' অন্য সাজ পরানো বলে না। 'খুলে ফেলে' বা 'বদলে ফেলে' বলে। ঢালা এবং সাজা এ দুটি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কলকে থেকে পোড়া তামাক ঢেলে নতুন করে সাজা থেকে এসেছে কথাটা। তামাক সাজানো নয়, সাজা (যেমন পান সাজানো নয়, পান সাজা)। এখানে ঢালা মানেই কলকে থেকে পোড়া তামাক ঢালা। অতএব নতুন সাজ পরানোর কথায় 'ঢেলে' ব্যবহার করলে তার সঙ্গে 'সাজা' ব্যবহার্য। সাজানো নয়, 'ঢেলে সাজা দরকার' বলতে হবে তামাক সাজিয়ে আন কেউ বলে না, সেজে আন প্রকৃত বাংলা ইডিয়ম। মুজতবা হুঁকো টানলে বুঝতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব উচ্চারণে কনফিড্যাণ্টকে কনফিডেণ্ট বলা কিছু বিপজ্জনক হয়েছে। 'কনফিড্যাণ্ট' ব্যক্তিকে বোঝায়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যে রক্ষা করবে। কিন্তু বাংলায় সেই অর্থে তাকে কনফিডেণ্ট উচ্চারণ করলে তার মানে তো ঠিক রইল না? একটি confidant, অন্যটি confident। অতএব উচ্চারণ পৃথক। তেমনি অপ্‌রা কম্পনিস্ট কি, বোঝা গেল না। ইংরেজি অপেরার সঙ্গে জারমান কম্পোনিস্ট জুড়ে কি লাভ হল? দুটো শব্দই জার্মান অথবা ইংরেজি হলে ক্ষতি ছিল কি? আরও অনেক আছে এ রকম।

এই বইয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়' রচনাটি সব দিক থেকে সার্থক। বিধুশেখর শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী এই দুই প্রধান সহকর্মীকে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। বিশেষ করে বিধুশেখরের পবিত্র হাসিমুখখানা পড়তে পড়তে যেন চোখের সামনে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠল। এই প্রবন্ধটি রচনার সময় মুজতবা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সেই সময়কার সমস্ত পটভূমিটিও সামগ্রিক ভাবে ছবির মতো ফুটে উঠেছে তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে এই দুজনের উপর কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন সে কথা ছাড়াও আনুষাঙ্গক অনেক তথ্য এতে পরিবেশিত হয়েছে।

রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে দীর্ঘ রচনাটিতে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা—নানা দিক থেকে করা হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও রচনাটি সম্পূর্ণতা পায় নি, অনেক

সমস্যা পরে এসেছে এবং আরও আসবে, কাজেই বহু সৎ কথা এবং কাজের কথা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী সিদ্ধান্তে পাঠককেই পৌঁছাতে হবে। রাষ্ট্রভাষা শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে কোণঠাসা করে প্রধান হয়ে উঠবেই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। সেই জন্যই ইংরেজি বিদায়ের জন্য এত উৎসাহ। ইংরেজি যখন রাজভাষা ছিল তখন প্রাদেশিক ভাষার স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু তা সত্যই ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। সে অনেক কথা। শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমার যে ভয়ে বর্তমানে ক্রমে ভীত হয়ে উঠছেন, তা অকারণ নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের মতো সৎকর্মের পিছনে যে ষড়যন্ত্র কাজ করছে তা যেদিন সবাই বুঝবেন সেদিন আর ভ্রম সংশোধনের উপায় থাকবে না। মুজতবা আলী এই শেষ পরিণামের আভাসটুকু দিয়ে যেতে পারলেন না। এটি দুর্ভাগ্যজনক।

অন্যান্য ছোটখাটো অনেকগুলি রচনার পৃথক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, আগেই বলেছি প্রত্যেকটি রচনাই সুখপাঠ্য। শুধু এ বইতে একটি বিদেশী রোমাঞ্চকর গল্পের অনুবাদ স্থান না পেলেই আমার ভাল লাগত।

পরিমল গোস্বামী

বড়বাবু

নগরপাল বন্ধুবর

শ্রীযুত সুধীন্দ্র ও

শ্রীযুক্তা নীলিমা দত্তের

চতুর্ভদ্রচরণে

—সৈয়দ মুজতবা আলী

বোলপুর

ফাল্গুন, ১৩৭২

নিবেদন

এই সঞ্চয়নের কোনো কোনো প্রবন্ধে পুনরাবৃত্তি দোষ একাধিকবার ঘটেছে। তার প্রধান কারণ, তাবৎ প্রবন্ধ একই সময় পর পর লেখা হয়নি। ফলে কোনো প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বহু বৎসর পরে লিখিত অন্য প্রবন্ধের পটভূমি নির্মাণে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, আমার যাবতীয় প্রবন্ধের তাবৎ বিষয়বস্তু পাঠকমাত্রই স্মরণ রেখে পরবর্তী প্রবন্ধ পড়বেন, এ হেন দুরাশা আমার মত নগণ্য লেখক করতে পারে না। এমতাবস্থায় স্মৃতিধর পাঠকের কাছে অধম কিঞ্চিৎ ক্ষমাভিক্ষা করতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে অন্য কথাটি না বললে সত্য গোপন করা হবে যে, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাবশতঃ অহেতুক পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে যার জন্য আমি কোনো প্রকারের ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি না। তবে ভরসা রাখি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে, যতখানি সম্ভব, ভ্রমের পুনরাবৃত্তি সংশোধন করে নিতে পারবো।

বিনীত—

মুজ্‌তবা আলী

বড়বাবু

॥ অবতরণিকা ॥

প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ; পিতার চেয়ে তেইশ বছরের ছোট এবং তাঁর জন্মের সময় তাঁর মাতার বয়স চৌদ্দ। কনিষ্ঠতম ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে একুশ, বাইশ বছরের ছোট।

আমি এ জীবনে দুটি মুক্ত পুরুষ দেখেছি ; তার একজন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

এঁর জীবন সম্বন্ধে কোনো-কিছু জানবার উপায় নেই। তার সরল কারণ, তাঁর জীবনে কিছুই ঘটেনি। যৌবনারম্ভে বিয়ে করেন, তাঁর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। যৌবনেই তিনি বিগতদার হন। পুনর্বার দারগ্রহণ করেননি।[১] চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ এ দেশে সুপরিচিত। দুঃখের বিষয় সুধীন্দ্রনাথের স্থায়ী কীর্তিও বাঙালী পাঠক ভুলে গিয়েছে।

দ্বারকানাথ যে যুগে বিলেত যান সে-সময় অল্প লোকই আপন প্রদেশ থেকে বেরত। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তো প্রায়শ বাড়ির বাইরে বাইরে কাটাতেন। (ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই।) তাই স্বতঃই প্রশ্ন জাগবে, ইনি কতখানি ভ্রমণ করেছিলেন।

একদা কে যেন বলেছিলেন, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই লিখে দিলেন :

ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে[২] কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি!

---

১ এ তথ্যগুলো প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী থেকে নেওয়া।

২ আমি 'ভ্রমণগমনে' পাঠও শুনেছি। কিন্তু স্পষ্টত 'জ' অক্ষর 'ভ্র'-র চেয়ে ভালো।

এই কবিতাটির আর একটি পাঠ আমি পেয়েছি। কোনটা আগের কোনটা পরের বলা কঠিন। মনে হয় নিম্নলিখিতটাই আগের। এটি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত :

দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ।

'টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা
না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না
খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥

টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা না রহে কোনো জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না শুধু ভস্মে ঘি ঢালা ॥৩

চারটি ছত্রের চারটি তথ্যই ঠাট্টা করে লেখা। কারণ আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি, বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) বেড়াবার শখ ছিল। বরঞ্চ শুনেছি, তাঁর প্রথম যৌবনে তাঁর পিতা মহর্ষিদেব তাঁর বিদেশ যাবার ইচ্ছা আছে কি না, শুধিয়ে পাঠান এবং তিনি অনিচ্ছা জানান। 'পাথেয় নাস্তি' কথাটারও কোনো অর্থ হয় না ; দেবেন্দ্রনাথের বড় ছেলের টাকা ছিল না, কিংবা কর্তা গত হওয়ার পরও হাতে টাকা আসেনি, এটা অবিশ্বাস্য।

আমার সামনে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি তা হলে নিবেদন করি। ১৩৩১-এর ১লা বৈশাখের সকালে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা সমাপন করে যথারীতি সর্বজ্যেষ্ঠের পদধুলি নিতে যান। সেবারে ঐ ১লা বৈশাখেই বোঝা গিয়েছিল, বাকি বৈশাখ এবং বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত কি রকম উৎকট গরম পড়বে। প্রেসের পাশের তখনকার দিনের সব চেয়ে বড় কুয়োর জল শুকিয়ে গিয়ে প্রায় শেষ হতে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বাগ্রজকে বললেন যে, এবারে গরম বেশী পড়বে বলে তিনি হিমালয়ের 'ঘুমে' বাড়ি ভাড়া করেছেন, 'বড়দাদা' গেলে ভালো হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, বড়বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'আমি ? আমি আমার এই ঘর-সংসার নিয়ে যাবো কোথায় ?' যে-সব গুরুজন আর ছেলেরা গুরুদেবের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলেন। হয়তো বা মুখ টিপে হেসেও ছিলেন। তাঁর ঘর-সংসার! ছিল

ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু
এ কি দৈবের শাস্তি ॥'

৩ এর থেকে কিছুটা উৎসাহ পেয়েই বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ রচেন 'পিঙ্গল বিহ্বল, ব্যথিত নভতল,—'। চতুষ্পদীটি আমি স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে উদ্ধৃত করছি বলে ছন্দপতন বিচিত্র নয়। সংস্কৃত কাব্যের আদি ও মধ্যযুগে মিল থাকতো না (মিল জিনিসটাই আর্য ভাষা গোষ্ঠীর কাছে অর্ধপরিচিত। পক্ষান্তরে সেমিতী আরবী ভাষাতে মিলের ছড়াছড়ি। মিলের সংস্কৃত 'অন্ত্যানু-প্রাস' শব্দটিই কেমন যেন গায়ের জোরে তৈরী বলে মনে হয়। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।)

তো সবে মাত্র দু-একটি কলম, বাক্স বানাবার জন্য কিছু পুরু কাগজ, দু'একখানা খাতা, কিছু পুরনো আসবাব! একে বলে ঘর-সংসার! এবং তার প্রতি তাঁর মায়া! 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক স্মরণে আনতে পারবেন, নিজের রচনা, কবিতার প্রতি তাঁর কী চরম ঔদাসীন্য ছিল![৪] লোকমুখে শুনেছি সকলের অজান্তে এক ভিখিরি এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন, 'আমার কাছে তো এখন কিছু নেই। তুমি এই শালখানা নিয়ে যাও।' প্রাচীন যুগের দামী কাশ্মিরী শাল। হয়তো বা দ্বারকানাথের আমলের। কারণ তাঁর শালে শখ ছিল। ভিখিরি প্রথমটায় নাকি নিতে চায়নি। শেষটায় যখন বড়বাবুর চাকর দেখে, বাবুর উরুর উপর শালখানা নেই, সে নাতি দিনেন্দ্রনাথকে (রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভাণ্ডারী') খবর দেয়। তিনি বোলপুরে লোক পাঠিয়ে শালখানা 'কিনিয়ে' ফেরত আনান। ভিখিরি নাকি খুশী হয়েই 'বিক্রী' করে; কারণ এ রকম দামী শাল সবাই চোরাই বলেই সন্দেহ করতো। কথিত আছে, পরের দিন যখন সেই শালই তাঁর উরুর উপর রাখা হয় তখন তিনি সেটি লক্ষ্যই করলেন না, যে এটা আবার এল কি করে!

আবার কবিতাটিতে ফিরে যাই। 'পায়ে শিকলি, মন উড়ু উড়ু' আর যার সম্বন্ধে খাটে খাটুক, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাটে না। এ রকম সদানন্দ, শান্ত-প্রশান্ত, কণামাত্র অজুহাত পেলে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত মানুষ আমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি। আমার কথা বাদ দিন। তাঁর সম্বন্ধে বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ যা লিখে গেছেন সে-ই যথেষ্ট। কিংবা শ্রীযুত নন্দলালকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

'টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা'—ও বিষয়ে তিনি জীবন্মুক্ত ছিলেন।

আর সবচেয়ে মারাত্মক শেষ ছত্রটি। তাঁর 'বিদ্যাবুদ্ধি' 'কিছু না কিছু না' বললে কার যে ছিল, কার যে আছে সেটা জানবার আমার বাসনা আছে। অবশ্য সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর একটি কানাকড়িমাত্রও ছিল না। কিন্তু সে অর্থে

---

৪ 'বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।'—জীবনস্মৃতি।

আমি নেব কেন? 'বুদ্ধি' বলতে সাংখ্যদর্শনে যে অর্থে আছে সে অর্থেই নিচ্ছি—যে গুণ প্রকৃতির রজঃ তম গুণের জড়পাশ ছিন্ন করে জীবকে 'পুরুষে'র উপলব্ধি লাভ করতে নিয়ে যায়।[৫] তাঁর বিদ্যা সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দি, রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বলেন, তিনি জীবনে দুটি পণ্ডিত দেখেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁর বড়দাদা; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত ইয়োরোপীয় অর্থে। তাঁর বড়দাদা কোন্ অর্থে, কবি সেটি বলেননি। এবং খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা যেন না ভাবি তাঁর বড়দাদা বলে তিনি একথা বললেন।

বর্তমান লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি উভয়ই অতিশয় সীমাবদ্ধ। তবে আমারই মত অজ্ঞ একাধিকজনের জানবার বাসনা জাগতে পারে আমি কাদের পণ্ডিত বলে মনে করি। আমি দেখেছি দুজন পণ্ডিতকে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ইয়োরোপবাসের পরও।

অনেকের সম্বন্ধেই বেখেয়ালে বলা হয়, অমুকের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আমি বলি সত্যকার বহুমুখী প্রতিভা ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই চর্চা করেছেন তিনি সমস্ত জীবন ধরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গণিতচর্চা বিদেশে প্রকাশিত করার জন্যে উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু 'বড়দাদা' বিশেষ গা করেননি।[৬] এদেশের অত্যল্প লোকই এ যাবৎ গ্রীকলাতিনের প্রতি মনোযোগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথে গ্রীকলাতিনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে শব্দতত্ত্বে সংস্কৃত উপসর্গ, তথা মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর সুদীর্ঘ রচনা অতুলনীয়। কঠিন, অতিশয় কঠিন—পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটারও উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, এরকম কঠিন জিনিস এর চেয়ে সরল করে স্বয়ং সরস্বতীও লিখতে পারতেন না।

৫ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কৈবল্য লাভের পর এটিও থাকে না। গীতাতে আছে, 'ভূমিরাপোৎজলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেবচ/অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টকা॥' ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহঙ্কার (আমিত্ববোধ) এ প্রকৃতি অপরাপ্রকৃতি। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে কৈবল্য লাভে 'বুদ্ধি'র কতখানি প্রয়োজন সেটি এস্থলে না বলে পাঠককে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত, পঞ্চম খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায় বরাত দিচ্ছি।

৬ দ্বিজেন্দ্রনাথের এক আত্মীয়ের (ইনি রবীন্দ্র সদনে কাজ করেন) মুখে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করেন তখন

আমার যতদূর জানা, খাঁটি ভারতীয় পণ্ডিতের ন্যায় ইতিহাসকে তিনি অত্যধিক মূল্য দিতেন না—ইতিহাস 'পের সে', বাই ইট্‌সেলফ্। অথচ পরিপূর্ণ অনুরাগ ছিল 'ইতিহাসের দর্শন'-এর (ফিলসফি অব হিস্ট্রির) প্রতি।

সাহিত্য ও কাব্যে তাঁর অধিকার কতখানি ছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বিশেষ বয়সে তিনি খাঁটি কাব্য রচনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু দর্শন ছাড়া যে কোন বিষয় রচনা করতে হলে (যেমন শব্দতত্ত্ব বা রেখাক্ষর বর্ণমালা অর্থাৎ 'বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড') মিল, ছন্দ ব্যবহার করে কবিতা-রূপেই প্রকাশ করতেন। বস্তুত কঠিন দর্শনের বাদানুবাদ ভিন্ন অন্য যে কোনো ভাবানুভূতি তাঁর হৃদয়মনে সঞ্চারিত হলেই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হত সেটি কবিতাতে প্রকাশ করার। এবং তাতে যদি হাস্যরসের কণামাত্র উপস্থিতি থাকতো, তাহলে তো আর কথাই নেই।

নিচের একটি সামান্য উদাহরণ নিন :

তাঁরই নামে নাম, অধুনা অর্ধবিস্মৃত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (বরঞ্চ ডি. এল. রায় বললে আজকের দিনের লোক হয়তো তাঁকে চিনলে চিনতেও পারে) 'একদা তদীয় গণ্যমান্য বিখ্যাত ও অখ্যাত বহু বন্ধু-বান্ধবকে একটা বিরাট ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার যে আহ্বান-লিপি 'জারি' হইয়াছিল তাহা এ স্থলে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিতেছি।—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ—এ হেন যে আপনি, আপনার ভবনের নন্দন-কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশ-বসনা ভামিনী-সমভিব্যাহারে (sic), আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন অকিঞ্চিৎকর, অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধুলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি,

শ্রীসুরবালা দেবী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"[৭]'

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে একদিন বলেন, 'এ সব কাজ তুই করছিস কেন? যার দরকার সে অনুবাদ করিয়ে নেবে। তুই তোর আপন কাজ করে যা না।'

৭ দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩২০।

এর উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন,

'ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমঃ প্রতাপ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন
পদ্মবিনিন্দিত পদযুগ মে।
আছে সত্যি পদরজরত্তি—
তাও পবিত্র কে জানিত মে
চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি,
অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু—মেঘাচ্ছন্নে শনি অপরাহ্নে
যদি গুরু বাধা না ঘটে মে।
কিম্বা (sic) যদ্যপি সহসা চুপিচুপি
প্রেরিত না হই পরধামে॥'[৮]

গুরুজনদের মুখে এখানে শুনেছি যে সময় তিনি এই মিশ্র সংস্কৃতে নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তর দেন তখন তিনি গীতগোবিন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন বলে ঐ ভাষাই ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলেন, জয়দেবই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষার কাঠামো তৈরী করে দিয়ে যান। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তরও শেষের দিকটি বাঙলায়। আবার কোনো কোনো গুরুজন দ্বিতীয় ছত্রটি পড়েন, 'ন চ নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন পদ্মপলাশলোচনভামিনী মে।'

কবিতাতে সব-কিছু প্রকাশ করার আরো দুটি মধুর দৃষ্টান্ত দি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষেধ ছিল। একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাতর্ভ্রমণের সময় দূর হতে দেখতে পান, হেডমাস্টার জগদানন্দ রায়

৮ যদিও দেবকুমার মহাশয় লিখেছেন তিনি এগুলো 'অবিকল মুদ্রিত' করে দিয়েছেন, তবু আমার মনে ধোঁকা আছে যে তাঁর নকলনবীস কোনো কোনো স্থলে ভুল করেছেন। এমন কি শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে যে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রয়েছে সেটিতে 'চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি' স্থলে 'চৌদ্দপুরুষাবধি ত্রাণ পায় যদি' কে যেন মার্জিনে পাঠান্তর প্রস্তাব করছেন, হস্তাক্ষরে। তাই বোধ করি হবে। কারণ প্রতি ছত্রে ভিতরের মিল, যথা 'সম্পত্তি'র সঙ্গে 'বৃহস্পতি', 'কানন'-এর সঙ্গে 'বাহন', 'সত্যি'-র সঙ্গে 'রত্তি' রয়েছে। বস্তুত দ্বিজেন্দ্রনাথের

একটি ছেলের কান আচ্ছা করে কষে দিচ্ছেন। কুটিরে ফিরে এসেই তাঁকে লিখে পাঠালেন :

'শোনো হে, জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্বে পিটিলে হয় যে গাধা—'

'গাধা পিটলে ঘোড়া হয় না'—এটা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু 'ঘোড়াকে পিটলে সেটা গাধা হয়ে যায়' এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অবদান'। এর সঙ্গে আবার কেউ কেউ যোগ দিতেন,

'শোন হে জগদানন্দ,
তুমি কি অন্ধ!'

এটির লিখিত পাঠ নেই। তাই নির্ভয়ে উদ্ধৃত করলুম। এর পরেরটি কিন্তু ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে বেরিয়েছে। এর মধ্যে ভুল থাকলে গবেষক সেটি অনায়াসে মেরামত করে নিতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের ৬৫ বৎসর বয়স হলে তিনি ভোরবেলা চিরকুটে লিখে পাঠালেন :

চমৎকার না চমৎকার!
সেই সেদিনের বালক দেখো,
পঞ্চষট্টি হল পার।
কাণ্ডখানা চমৎকার,
চমৎকার না চমৎকাব!

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ততদিন কলকাতাতেই ছিলেন। মোটামুটি বলা যেতে পারে, ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত তিনি কলকাতার বিদ্বজ্জনসমাজের চক্রবর্তী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম (তিনি ধর্মের স্মৃতিশাস্ত্রটুকু ব্যবহার করেছেন মাত্র; মোক্ষপথ-নির্দেশক ধর্ম ও দর্শনে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল না) ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন না বলে সে যুগের অন্যতম চক্রবর্তী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের নিত্যালাপী—প্রায়ই ঠাকুরবাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে যেতেন।[৯]

এ সব রসরচনা কখনো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি বলে শুদ্ধপাঠ যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব।

৯ ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমে তখন যে বাদ-বিবাদ হয় সে সময় প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিম লেখেন, '১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক

ঐ সময় বঙ্কিমের বিরুদ্ধ-আলোচনা হলে পর তাঁর কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ফলে, এঁর মধ্যে একজন ঠাকুরবাড়িতে কাজ করতেন বলে বঙ্কিম লেখেন, 'শুনিয়াছি ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নাএব কি কি আমি ঠিক জানি না।' অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন—আমার মনে হয় অনিচ্ছায়—বঙ্কিম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন বঙ্কিম গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, 'তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া (বঙ্কিমের রচনাটি ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হচ্ছিল—লেখক) তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোনো দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বর-বাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন,[১০] তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর (অর্থাৎ যাঁরা বঙ্কিমের প্রতিবাদ করেন, 'নগণ্য' অর্থে নয়—লেখক) ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

আমি জানি আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করবেন না, তাই আমি এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার উল্লেখ করলুম। বস্তুত বাঙলা দেশের এই উনবিংশ শতকের শেষের দিক (ফঁ্যা দ্য সিএক্‌ল্) যে কী অদ্ভুত রত্নগর্ভা তা আজকের দিনের অবস্থা দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

আমি সে আলোচনা এস্থলে করতে চাই নে। আমি শুধু নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বান্বেষী তাঁদের দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় এক বৎসর তাঁর সখা সিংহ পরিবারের সঙ্গে রাইপুরে কাটান। তারপর ১৯০৭-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতন আশ্রমের

বার রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবারে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে। কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে।' (বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, ২ খণ্ড, পৃঃ ৯১৬।১৭।) বলাবহুল্য বঙ্কিম যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

১০ বস্তুত তখন বাঙলা দেশে প্রচলিত ধারণা ছিল, বিদ্যাসাগর ও 'কঁৎ-এর শিষ্য' বঙ্কিমের ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় নয়।

বাইরে (এখন রীতিমত ভিতরে) এসে আমৃত্যু (১৯২৬) বসবাস করেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে তিনজন লোক তাঁর নিত্যালাপী ছিলেন, স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও রেভরেণ্ড এণ্ড্রুজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই ভুলে যেতেন যে রবীন্দ্রনাথের বয়সও ষাট পেরিয়ে গেছে (আমি শেষের পাঁচ বৎসরের কথা বলছি—স্বচক্ষে যা দেখেছি) এবং শাস্ত্রীমশাই যদি দ্বিজেন্দ্রনাথের কোনো নূতন লেখা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলতেন, 'এটি গুরুদেবকে দেখাতেই হবে', তখন তিনি প্রথমটায় বুঝতেনই না, 'গুরুদেব' কে, এবং অবশেষে বুঝতে পেরে অট্টহাস্য করে বলতেন, 'রবি? রবি তো ছেলেমানুষ! সে এসব বুঝবে কি?' ভুলে যেতেন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আবার পর দিনই হয়তো বাঙলা ডিফথং সম্বন্ধে কবিতায় একটি প্রবন্ধ (!) লিখে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথকে। চিরকুটে প্রশ্ন, 'কি রকম হয়েছে?' রবীন্দ্রনাথ কি উত্তর দিতেন সেটি পাঠক খুঁজে দেখে নেবেন।

শিশুর মত সরল এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে যুগে কত লেজেণ্ড প্রচলিত ছিল তার অনেকখানি এখনো বলতে পারবেন শ্রীযুত গোস্বামী নিত্যানন্দবিনোদ, আচার্য নন্দলাল, আচার্য সুরেন কর, বন্ধুবর বিনোদবিহারী, অনুজপ্রতিম শান্তিদেব, উপাচার্য সুধীরঞ্জন। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দীপেন্দ্রনাথ তাঁরই জীবদ্দশায় গত হলে পর তিনি নাকি চিন্তাতুর হয়ে পুত্রের এক সখাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তা দীপু উইল-টুইল ঠিকমতো করে গেছেন তো?' এ গল্পটি বলেন শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত ও উপাচার্য শ্রীযুত সুধীরঞ্জন। সুধীরঞ্জন চীফ-জাস্টিস ছিলেন বলে আইনের ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'দুশ্চিন্তা' স্বতই তাঁর মনে কৌতুকের সৃষ্টি করে—এবং গল্পটি বলার পর তিনি বিজ্ঞভাবে গম্ভীর হয়ে চোখের ঠার মানেন।

তাঁর অপকট সরলতা নিয়ে যে-সব লেজেণ্ড (পুরাণ) প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে একাধিক আশ্রমবাসী একাধিক রসরচনা প্রকাশ করেছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামান্য। একবার আমার হাতে একটি সুন্দর মলাটের খাতা দেখে শুধোলেন, 'এটা কোথায় কিনলে?' আমি বললুম, 'কোপে'। 'সে আবার কি?' আমি বললুম, 'কো-অপারেটিভ স্টোর্সে'। তিনি উচ্চহাস্য[১১]

১১ তিনি একাধিকবার গীতা থেকে, 'প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে' 'প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্যবস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়', ছত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

(এ উচ্চহাস্য কারণে অকারণে উচ্ছ্বসিত হত এবং প্রবাদ আছে 'দেহলী'তে বসে গুরুদেব তাই শুনে মৃদুহাস্য করতেন) করে বললেন, 'ও! তাই নাকি! তা কত দাম নিলে?' আমি বললুম, 'সাড়ে পাঁচ আনা।' আমি চলে আসবার সময় একখানা চিরকুট আমার হাতে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'বউমা (কিংবা ঐ ধরনের সম্বোধন), আমাকে তুমি (কিংবা 'আপনি', তিনি কখন কাকে 'আপনি' কখন 'তুমি' বলতেন তার ঠিক থাকতো না—'তুই' বলতে বড় একটা শুনিনি) সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা দিলে আমি একখানা খাতা কিনি।' তাঁর পুত্র-বধূ তখন বোধ হয় দু'একদিনের জন্য উত্তরায়ণ গিয়েছিলেন।

তাঁর এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, একবার বাম্পার্-ক্রপ্ হলে পর সুযোগ বুঝে পিতা মহর্ষিদেব তাঁকে খাজনা তুলতে গ্রামাঞ্চলে পাঠান। গ্রামের দুরবস্থা দেখে তিনি নাকি তার ক'লেন, 'সেণ্ড ফিফ্‌টি থাউজেণ্ড'। (তাঁর 'গ্রামোন্নয়ন' করার বোধ হয় বাসনা হয়েছিল।) উত্তর গেল, 'কাম ব্যাক!'

* * *

তাঁর সাহিত্যচর্চা, বিশেষতঃ 'স্বপ্নপ্রয়াণ', মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য কাব্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে অত্যুত্তম আলোচনা করেছেন। বস্তুত তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করেননি বলে বঙ্গজন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভালো হয়।

আশ্চর্য বোধ হয়, এই সাতিশয় অন্-প্র্যাকটিক্যাল, অধ্যবসায়ী লোকটি কেন যে বাঙলায় 'শর্টহ্যাণ্ড' প্রচলন করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন! এ কাজে তাঁর মূল্যবান সময় তো একাধিকবার গেলই, তদুপরি আগাগোড়া বইখানা—দু'দু'-বার—ব্লকে ছাপতে হয়েছে, কারণ তিনি যেসব সাঙ্কেতিক চিহ্ন (সিম্‌বল) আবি-ষ্কার করে ব্যবহার করেছেন সেগুলো প্রেসে থাকার কথা নয়। তদুপরি মাঝে মাঝে পাখী, মানুষের মুখ, এসবের ছবিও তিনি আপন হাতে এঁকে দিয়েছেন।

প্রথমবারের প্রচেষ্টা পুস্তকাকারে প্রকাশের[১২] বহু পরে তিনি দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেন। তার প্রাক্কালে তিনি ৺বিধুশেখরকে যে পত্র দেন সেটি প্রথম (কিংবা দ্বিতীয়) প্রচেষ্টার পুস্তকের ভিতর একখানি চিরকুটে আমি পেয়েছি। তাতে লেখা,

'শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি বহু পূর্বে হোল্‌দে কাগজে রেখাক্ষর স্বহস্তে ছাপাইয়াছিলাম[১৩]—লাইব্রেরীতে তাহার গোটা চার-পাঁচ কপি আছে। তাহার একখানি পাঠাইয়া

১২, ১৩ এ-পুস্তক বোধ হয় কখনো সাধারণে প্রকাশ হয়নি। প্রাইভেট

দিন্।' নীচে স্বাক্ষর নেই। শুনেছি, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার একখানি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেন। প্রথমখানির সঙ্গে দ্বিতীয়খানি মিলালেই ধরা পড়ে যে তিনি এবারে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন করে বইখানা লিখলেন। এটির প্রকাশ ১৩১৯ সনে।

এবং বই দুইখানি না দেখা পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবেন না, যে, শর্টহাণ্ডের মত রসকশহীন বিষয়বস্তু তিনি আগাগোড়া লিখেছেন পদ্যে—নানাবিধ ছন্দ-ব্যবহার করে।

প্রথমেই তিনি লেগেছেন বাঙলার অক্ষর কমাতে ; লিখেছেন,

রেখাক্ষর বর্ণমালা

প্রথম ভাগ ॥

বত্রিশ সিংহাসন।

বাঙলা বর্ণমালায় উপসর্গ নানা।
অদ্‌ভুত নূতন সব কাণ্ডকারখানা ॥
ষ-য়ে শূন্য, ড-য়ে শূন্য, শূন্য পালে পাল!
দেবনাগরিতে নাই এসব জঞ্জাল ॥
য যবে জমকি বসে শবদের মুড়া।
জ বলে সবাই তারে—কি ছেলে কি বুড়া ॥
মাজায় কিম্বা ল্যাজায় নিবসে যখন।
ইয় উচ্চারণ তার কে করে বারণ ॥
ময়ূর ময়ূর বই মজুর তো নয়!
উদয উদজ নহে, উদয উদয় ॥

এর পর তাঁর বক্তব্য ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তিনি ড ঢ ও ড় ঢ় নিয়ে পড়লেন :

কেন এ ঘোড়ার ডিম ড-য়ের তলায়?
বুঢ়াটাও ডিম পাড়ে! বাঁচিনে জালায়!
একি দেখি! বাঙ্গালার বর্ণমালী যত
সকলেই আমা সনে লঢ়িতে উদ্যত!
ব্যাকরণ না জানিয়া অকারণ লঢ়।
শবদের অন্তে মাঝে ড ঢ-ই তো ড় ঢ়।

সার্কুলেশনের জন্য ছিল। তার অন্যতম কারণ তাতে প্রকাশক বা প্রকাশস্থানের নাম নেই।" এবং লেখক বলছেন, তিনি 'স্বহস্তে' ছাপিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যাপারটি তিনি আরো সংক্ষেপে সারছেন :

শূন্যের শূন্যত্ব।

শবদের অন্তে মাঝে বসে যবে সুখে।
বেরোয় য়-ড়-ঢ় বুলি য-ড-ঢ'র মুখে ॥
জানো যদি, কেন তবে শূন্য দেও নীচে ?
চেনা বামুনের গলে পৈতে কেন মিছে !
নীচের ছত্তর চারি চেঁচাইয়া পড়—
যাবৎ না হয় তাহা কণ্ঠে সড়গড় ॥

পাঠ

আষাঢে ঢাকিল নভ পযোধর-জালে।
বাযস উডিযা বসে ডালের আডালে ॥
ঘনরবে মযূরের আনন্দ না ধরে।
খুলিযা খডম জোডা ঢুকিলাম ঘরে ॥

একেই বোধ হয় গ্রীক অলঙ্কারের অনুকরণে ইংরাজিতে 'বেথস্' বলা হয়। প্রথম তিন লাইনে নৈসর্গিক বর্ণনার মায়াজাল নির্মাণ করে হঠাৎ খড়ম-জোড়ার মুদ্গর দিয়ে আলঙ্কারিক মোহ-মুদ্গর নির্মাণ।

ছন্দ মিল ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস—কবিতা রচনার যে কটি টেকনিক্যাল স্কিল প্রয়োজন তার সবটাই কবির করায়ত্ত। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নিই ! এর পরেই দেখুন সাদামাটা পয়ার ভেঙে ১১ অক্ষরের (!) ছন্দ :

চারি বর্গপতি

ক চ-বরগের ক মহারথী :
ত প-বরগের ত কুলপতি ;
ন ট-বরগের ন নটবর ;
র স-বরগের র গুণধর ;—
চারি বরগের চারি অধিপ
বরণমালার কুলপ্রদীপ ॥

শুধু তাই নয়, পাঠক লক্ষ্য করবেন, প্রথম চার ছত্রের প্রথম অংশে ছ' অক্ষর, শেষের অংশে চার অক্ষর ; ফলে জোর পড়বে সপ্তম অক্ষর ক, ত, ন, র-এর উপর। এবং সেইটেই লেখকের উদ্দেশ্য, জোর দিয়ে শেখানো।

ঐ যুগে অনেকেই বৈষ্ণবদের "ঢলাঢলি" পছন্দ করতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁদের বহু উর্ধ্বে। তাই :

'এই' 'এউ' 'আউ' ইত্যাদি ডিফ্‌থং-এর অনুশীলন করাতে এগুলো নিয়ে কি রকম কবিতা ফেঁদেছেন, দেখুন :

আউলে গোঁসাই গউর চাঁদ
ভাসাইল দেশ টুটিয়া বাঁধ
দুই ভাই মিলি আসিছে অই[১৪]
কি[১৫] মাধুরী আহা কেমনে কই ॥
পাষাণ হৃদয় করিয়া জয়
আধা-আধি করি বাঁটিয়া লয়
শওশ হাজার দোধারি লোক।
দোঁহারে নেহারে ফেরে না চোক ॥
কুল ধসানিয়া প্রেমের ঢেউ
দেখেনি এমন কোথাও কেউ
এই নাচে গায় দু'হাত তুলি
এই কাঁদে এই লুটায় ধুলি ॥

কে বলবে এটা নিছক রসসৃষ্টি নয়, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা? নিতান্ত গদ্যময় শর্টহ্যাণ্ড—পদ্যে!

এর পর তিনি যেটা প্রস্তাব করেছেন সেটি বহু বৎসর পরে মেনে নেওয়া হল :—

শুনিবে গুরুজি মোর কি বলেন? শোনো!
তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনো ॥
আর্‌-ত দিলে "আর্ত"-এ ছাড়িবে আর্তরব।
আর-দ চাপাইলে পিঠে রবে না গর্দভ ॥
ইষ্ট করিও না নষ্ট বোঝা করি পুষ্ট।
অৰ্দ্ধে[১৬] দিয়া জলে ফেলি অর্ধে থাক' তুষ্ট ॥

১৪ এটি বহু বৎসর পরে বানান-সংস্কার-সমিতি গ্রহণ করেন।

১৫ পরবর্তী যুগে তিনি প্রধানত বিস্ময় স্থলে (যেমন এখানে) কী লিখতেন। অবশ্য বানান-সংস্কার-সমিতির বহু পূর্বে।

১৬ এখানে দ্ধ আছে। আজকাল প্রেসে তার উপর রেফ দেবার ব্যবস্থা আছে কি না, অর্থাৎ দ+ধ+রেফ, জানি না।

কর্ম্মের ম এ ম ফলা অকর্ম বিশেষ।
কার্য্যের যয়ে য ফলা অকার্যের শেষ॥

প্রথম পাঠ সাঙ্গ হলে 'কবি-মাস্টার' ভরসা দিচ্ছেন 'পুরো লেখা সাঙ্গ হবে অর্ধেক পাতায়।' এবং তদুপরি

কাগজ বাঁচিবে ঢের নাহি তায় ভুল।
বাঁচিতেও পারে কিছু ডাকের মাশুল॥

এ না হয় হল। কিন্তু গড়ের মাঠে যখন কংগ্রেসিরা (তখনো কমুনিস্টি আসেননি), বাক্যের ঝড় বওয়াবেন তখন? তখন কি সেটা শব্দে শব্দে তোলা যাবে? না।

ওবিদ্যার কর্ম নহে—যখন বক্তার
মুখে ঝড় বহি চলে ছাড়ি হুহুঙ্কার—
তার সঙ্গে লেখনীর টক্কর লাগানো
এ বিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে হয়েছে বাগানো।

তখন

মস্তকে মথিয়া লয়ে পুস্তকের সার,
হস্তকে করিবে তার তুরুক-সোআর॥
হইবে লেখনী ঘোড় দোউড়ের ঘোড়া।
আগে কিন্তু পাকা করি বাঁধা চাই গোড়া॥

এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পুস্তক সমাপ্তিতে বলছেন:

তখন তাহাকে হবে থামানো কঠিন।
ছুটিবে—পরাণ ভয়ে যেমতি হরিণ॥

এ বইয়ের প্রতিটি ছত্র তুলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্থানাভাব। তবে সর্বশেষে কয়েকটি ছত্র না তুলে দিলে সে আমলের কয়েকটি তরুণ—আজ তাঁরা বৃদ্ধ—মর্মাহত হবেন। কারণ রেখাক্ষর তাঁরা না শিখলেও এ-কবিতাটি মুখে মুখে এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে আজো সেটি কিয়জ্জনের কণ্ঠস্থ:—

আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥[১৭]
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি!
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি।

১৭ প্রথম সংস্করণে এর পাঠ: বন্ধ হলো বৃন্দাবনে যাহার যা কাজ।
ভঙ্গ হল ভৃঙ্গগীত কুঞ্জবন মাঝ॥

কালিন্দীর কূলে বসি কান্দে গোপনারী,
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আর কাণ্ডারী ॥[১৮]
আর কি সে মনোচোর দেখা দিবে চক্ষে
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে ॥

কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি রাষ্ট[১৯] পথে হাটে।
শুষ্ক মুখ রাধিকার দুশ্‌খে বুক ফাটে ॥
কৃষ্ণ বলি ভ্রষ্ট বেণী বক্ষে ধরি চাপি।
ভূপৃষ্ঠে লুটায় পড়ে মর্মদাহে তাপি ॥
কষ্ট বলে অষ্ট সখী মর্মদাহে কোলে
চিন্তা করিও না রাই কৃষ্ণ এল ব'লে ॥
এত বলি হাহু করে বাষ্প আর মোছে।
সবারই সমান দশা কেবা কারে পোছে ॥
দুষ্ট বধে পুরে নাই কৃষ্ণের অভীষ্ট
অদৃষ্টে অবলাবধ আছে অবশিষ্ট ॥[২০]

কে বলবে প্রথমাংশ লেখা হয়েছে ন, ঙ, ম-প্রধান যুক্তাক্ষর ও দ্বিতীয়টি ষ-প্রধান যুক্তাক্ষরের অনুশীলনের জন্য! আরেকটি কথা এই সুবাদে নিবেদন করি—আমার এক আত্মজনের মুখে শোনা: বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রমাণ করতে চাইলেন, গীতার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যক্তি নন, তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বলেন, 'বঙ্কিমবাবু, এসব কি আরম্ভ করলেন, রবি? বৃন্দাবনের রসরাজকে মেরে ফেলছেন যে!' বাঙলা সাহিত্য বৈষ্ণব-পদাবলীর উপর কতখানি খাড়া, আজ সেটা স্বীকার করতে আমাদের আর বাধে না। কিন্তু সেই মারাত্মক পিউরিটান যুগে, যখন কেউ কেউ নাকি কদম্ববৃক্ষকে 'অশ্লীলবৃক্ষ' (এটা অবশ্য বিরুদ্ধ পক্ষের ব্যঙ্গ—'রিডাকসিও অ্যাড আবসার্ডাম' পদ্ধতিতে) বলতেন তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ জানতেন, বৃন্দাবনের

---

১৮ ডোঙ্গাখানি ভাসিতেছে নবেন্দুসুঠাম/পারাপার হইবার নাহি আর নাম। কালিন্দী বহিয়া যায় কান্দ কান্দ স্বরে/কুঞ্চিত কুন্তল প্রায় মন্দানিল ভরে ॥

১৯ দ্বিজেন্দ্রনাথ বরাবর 'রাষ্ট' লিখতেন; 'রাষ্ট্র' লেখেননি।

২০ বলা বাহুল্য 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কুষ্ট' বা কেষ্ট পড়তে হবে।

শ্রীকৃষ্ণকে গীতার শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন করে ফেললে বৃন্দাবন-লীলা নিতান্তই মানবিক প্রেমে পর্যবসিত হয়; ভক্তজন তাঁদের আধ্যাত্মিক অমৃত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রথম যৌবন থেকেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্ম-সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন তাঁর এগারো বছর বয়সে 'আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে

তিনি (পিতা) নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।'

এই গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা; এবং রেখাক্ষর বর্ণমালাতেও তিনি অনুশীলন হিসাবে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁর মাত্র ত্রিশটি গান পাওয়া যায়, তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই তিনি বিস্তর গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের রচনা সম্বন্ধে এমনই উদাসীন ছিলেন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—যে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি।

ধীরে ধীরে তিনি সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শব্দতত্ত্ব, ইতিহাসের দর্শন সব জিনিস থেকে বিদায় নিয়ে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও তার অনুশীলনে নিযুক্ত হলেন। এ যে কী অভ্রভেদী দুর্জয় সাধনা তার বর্ণনা দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। এক দিকে ইয়োরোপীয় দর্শন তাঁর নখাগ্রদর্পণে ছিল—অন্যদিকে বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ—উপনিষদ, গীতা এবং মহাভারতের তত্ত্বাংশ। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান শুধু স্পেকুলেট তথা তর্কবিতর্ক করতে শেখায় না। গোড়ার থেকেই ধ্যানধারণা, সাধনা করতে হয়। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান মেণ্টাল্ জিমনাস্টিক নয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণায় মগ্ন হলেন।

এখনো বাঙলা দেশে বিস্তর না হোক, বেশ কিছু লোক বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁর সে ধ্যানমূর্তি দিনের পর দিন দেখেছেন। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই তিনি আগের দিনের বাসি জলে স্নান করে ধ্যানে বসতেন। সে সময় ছোটো ছোটো পাখী, কাঠ-বেরালি তাঁর গায়ের উপর এসে বসতো, ওঠা নামা করতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। পাখীরা অপেক্ষা করতো, ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি তাদের খাওয়াবেন। ময়দার গুলি বানিয়ে মুনীশ্বর তার ব্যবস্থা করে রাখতো।

বহু বৎসর একাগ্রচিত্তে ধ্যানধারণা ও শাস্ত্র-চর্চার ফলস্বরূপ তাঁর গ্রন্থ, বাঙলা তত্ত্বকথার অতুলনীয় সম্পদ, 'গীতাপাঠ'।

এখানে এসে আমার ব্যক্তিগত মত অসংকোচে বলছি—বিড়ম্বিত হতে আপত্তি

নেই, যদি শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, আমার মতের কীই বা মূল্য—বাঙলা ভাষায় এরকম গ্রন্থ তো নেই-ই, ভারতীয় তথা ইংরিজি, ফরাসী, জর্মনেও ভারতীয় তত্ত্বালোচনার এমন গ্রন্থ আর নেই।

যাঁদের সামনে (এবং খুব সম্ভব তাঁদের অনুরোধেই তিনি এ-গ্রন্থখানি লেখেন) তিনি এই গ্রন্থখানি পাঠ করে শোনান (পুস্তকের ভূমিকায় আছে 'এই "গীতাপাঠ" তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীতে ছাপাইতে দিবার পূর্বে সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্যগণের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর-ক্রমে শুনানো হইয়াছিল') তাঁদের অনেকেই ইয়োরোপীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য (আজো তাই ইয়োরোপীয় দর্শনের পণ্ডিতদের কাছে এ-বইটি অমূল্য) তিনি প্রয়োজনমত ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের অভিমতও প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করি: উপনিষদে আছে 'অবিদ্যা' শব্দটি; সেটি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আরেক শাস্ত্র আছে; সে শাস্ত্রে বলে এই যে, ১। সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, ২। কাণ্টের Thing-in-itself, ৩। Schopenhauer-এর অন্ধ Will, ৪। Mill-এর ইন্দ্রিয়-চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যা শক্তি, ইংরাজী ভাষায় —Permanent Possibility of Sensation, ৫। বেদান্তের সদসদ্‌ভ্যামনির্বাচনীয়া অবিদ্যা; পাঁচ শাস্ত্রের এই পাঁচ রকমের বস্তু একই বস্তু।' পূর্বেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথের মূল উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, বেদান্ত (দর্শন) সাংখ্য ও যোগ। পাঠক আরো পাবেন, বেন্থাম, চার্বাক, সফিস্ট, স্টয়িক্, ডারুইন, ভোজরাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ভাস্করাচার্য, সেণ্ট আইগুস্টিন, নীলকণ্ঠ, স্পেন্সার প্রভৃতি।

সম্পূর্ণ পুস্তিকায় পাঠক পাবেন কি? এর নাম নাকি গোড়াতে ছিল 'গীতাপাঠের ভূমিকা'—পরে 'গীতাপাঠ'-এ পরিবর্তিত হয়। সাংখ্য বেদান্ত তথা তাবৎ ইয়োরোপীয় জ্ঞান (এবং বিজ্ঞান) ও দর্শনের ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তরুণ সাধককে গীতাপাঠ এবং তার অনুশীলনে নিয়ে যেতে চান।

তাই তিনি আরম্ভ করেছেন সাংখ্য নিয়ে।

'দুঃখত্রয়াভিঘাতজ জিজ্ঞাসা।'

অর্থাৎ 'ত্রিবিধ দুঃখের (বাইরে থেকে, নিজের থেকে এবং দৈবদুর্বিপাকে ঘটিত দুঃখ) কিরূপে বিনাশ হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়।' এবং সেটা যেন 'একান্তাত্যন্ততোঽভবাৎ' ক্ষণিক বা আংশিক বিনাশ না হয়; হয় যেন ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ। কারণ, দুঃখ লোপ পেলেই সুখ দেখা দেবে।

যে রকম শরীর থেকে সর্বরোগ দূর হলে স্বাস্থ্যের উদয় হয়। তা ভিন্ন স্বাস্থ্য বলে অন্য কোনো জিনিস নেই। এবং এ-সুখ যা-তা সুখ নয়। উপনিষদের ভাষায় অমৃত, আনন্দ।

গ্রন্থের মাঝামাঝি এসে তিনি এই তত্ত্বটি গীতা থেকে উদ্ধৃত করে আরো পরিষ্কার করে বলেছেন :

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ
প্রবিশন্তি যদবৎ।
তদ্‌বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স
শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

অর্থাৎ 'স্বস্থানে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছেন যে আপূর্যমান সমুদ্র, তাহাতে যেমন নদনদী সকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, যিনি আপনাতে স্থির থাকেন, আর, চতুর্দিক হইতে কামনা সকল যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন ; যিনি কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি না।'

এরই টীকা করতে গিয়ে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য, মানবমাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন :

'আত্মসত্তার রসাস্বাদ-জনিত এক প্রকার নিষ্কাম প্রেমানন্দ যাহা মনুষ্যের অন্তঃকরণের অন্তরতম কোষে নিয়তকাল বর্তমান রহিয়াছে, তাহা জীবাত্মার অনন্তকালের পাথেয় সম্বল, এবং সেইজন্য তাহারই পরিস্ফুটন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।' (গীতাপাঠ পৃঃ ১৬২)

এই চরম মোক্ষকেই মুসলমান সাধকেরা বলে থাকেন, ফানা ও বাকা। খৃষ্টীয় সাধকরা এরই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee।'

এদেশে একাধিক সাধকও ঐ একই বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব ভাল ক[illegible]যুগে কেন, সর্বযুগেই মানুষ সাধনার এই কঠিন পথ বরণ ক[illegible] চায় না। তাই তি[illegible] পাঠের তৃতীয় অধিবেশনের অন্তে বলেছেন :

'আনন্দ সম্বন্ধে [illegible]হা আমি কথা-প্রসঙ্গে ব[illegible]—এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা ; অ[illegible] কিন্তু রহিয়াছি এপারে [illegible]বদ্ধ ; কাজেই আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আ[illegible] কথাবার্তার আন্দোলন [illegible] প্রকার "গাছে কাঁটাল—

গোঁফে তেল।" এ-রকম বাক্যবাণ আমার সহা আছে ঢের; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম; —যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীন যোগে (অর্থাৎ প্রথম তিন অধিবেশনে তিনি যে অবতরণিকা নির্মাণ করেছেন তা দিয়ে—লেখক) তাঁহাদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব যাত্রী ভায়ারা পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন।[২১]

এই অমূল্য পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করা আমার জ্ঞানবুদ্ধির ত্রিসীমানার বাইরে। তবে বর্ণনা দিতে গিয়ে এইটুকু নিবেদন করতে পারি, জড়-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি, তথা জীবের সুখদুঃখ বিশ্লেষণ করার সময় তিনি প্রধানত শরণ নিয়েছেন সাংখ্যের, সাধনার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন সেটি যোগের এবং আস্থা ও আশা রেখেছেন বেদান্তের উপর।

তবে এ পুস্তিকায় মৌলিকতা কোথায়? ছত্রে ছত্রে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। তিন দর্শন এক করে (প্রয়োজনমত ইউরোপীয় দর্শন দিয়ে সেটা আমাদের আরো কাছে টেনে এনে) তার সঙ্গে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমজনিত দীর্ঘকালব্যাপী সশ্রদ্ধ সাধনা-লব্ধ অমূল্য নিধি যোগ করে, কবিজনোচিত অতুলনীয় তুলনা, ব্যঞ্জনা, বর্ণনা দিয়ে অতিশয় কালোপযোগী করে তিনি এই পুস্তকখানি নির্মাণ করেছেন।

সকলেই বলে, এ পুস্তক বড় কঠিন। আমিও স্বীকার করি। তার প্রধান কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ একই সময়ে একাধিক ডাইমেনশনে বিচরণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও পুনরায় সবিনয় নিবেদন করি, এ রকম কঠিন জিনিস এতখানি সরল করে ইতিপূর্বে আর কেউ লেখেননি।

২১ দ্বিজেন্দ্রনাথ বলতেন, বাংলা ভাষা এখনো এমন দুর্বল যে সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা কঠিন; তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটি কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরেই একটি জুতসই—mot juste—সহজ বাংলা শব্দ আসে, তবে নির্ভয়ে সেখানে লাগানো উচিত। অর্থাৎ তিনি 'গুরুচণ্ডালী' অনুশাসন মানতেন না।

রবীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ

কেউ দেশের জন্য প্রাণ দেয়, কেউ বা দয়িতের জন্য, কেউ বংশের সম্মানরক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করে। যাঁরা প্রাণ দিয়ে শহীদ হন তাঁদের অনেকেই তখন সুদ্ধমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে, বিবেকের অলঙ্ঘ্য আদেশ পালন করার জন্যই নিজের জীবন বিসর্জন দেন। আবার কেউ কেউ ভাবেন, কর্তব্যকর্ম না করলে তাঁরা মুক্তি-মোক্ষ-নির্বাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

এদেশে সাধারণজনের ধারণা, মুক্তি বা মোক্ষের অর্থ নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে কঠোর-কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। অথচ আমাদের দেশে সর্ব দার্শনিক সর্ব ঋষি একবাক্যে বলেছেন মানুষের চরম কাম্য বা মোক্ষ বলতে বোঝায় পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—যে আনন্দের সঙ্গে পার্থিব কোন সুখেরই তুলনা হয় না। মুসলমান সাধকরা ঐ কথাই বলেছেন, এবং ইহুদি মহাপুরুষ তো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall the Lord rejoice over thee" এবং এইটিই খৃষ্টানদের মূলমন্ত্র।

কয়েক মাস পূর্বে আমি 'মৃত্যু'—হয়তো 'শোক' বললে ভালো হত—নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুদূত বার বার এসে তাঁকে যে কী গভীর বেদনা দিয়েছে তার বিবরণ দি। আরো বহু, বহু বেদনা তিনি পেয়েছেন, যার স্মরণে আপন জন্মদিন উপলক্ষে পিছন পানে তাকিয়ে বলছেন,

'পায়ে বিঁধেছে কাঁটা
ক্ষতবক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।'[১]

১ সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

'যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা।' —পূরবী

এ-সব-কিছু তিনি সয়ে নিয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল দিয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পেয়েছেন, যখন তাঁর আত্মজন পেয়েছে আঘাত। যেখানে তাঁকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে, বেদনা-বেদনায় সে আত্মজনের ধূলিতলে অবলুণ্ঠন। সান্ত্বনা দেবার মত ভাষাও খুঁজে পাননি তখন। নিজের বেলা তিনি অন্তরের দিকে তাকিয়ে নিরাশ হননি, কিন্তু আত্মজনের বেলা?

বলা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন শোক পায় মা, যখন সে পুত্রহারা হয়। এবং সে মাও যদি দুঃখিনী হয়, এবং ঐ পুত্রই যদি একমাত্র পুত্র হয়। এবং তার চেয়ে নির্মম আঘাত পান যদি সে মাতার আপন পিতা জীবিত থাকেন তবে তিনি। রবীন্দ্রনাথের বেলা তাই হয়েছিল। 'দুর্ভাগিনী'কে মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে বলছেন,

'তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রণয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ!
প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো
খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিরূপ।'

কী হৃদয়ভেদী তুলনা! যেন আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এসেছে 'লাভা' হয়ে মাতার বাৎসল্যরস! তারপর সে মায়ের আকুলিবিকুলি,

'সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে ;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে
খুঁজিছ বুকের ধন সে আর তো নেই
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।'

এর চেয়ে নিদারুণতর বর্ণনা আর মানুষ কি দিতে পারে—মায়ের পুত্র-শোকের? আমার লেখাপড়া সীমাবদ্ধ। পাঠক, তুমি যদি পেয়ে থাকো, তবে সেটি আমায় পাঠিয়ো। না, ভুল বললুম, পাঠিয়ো না। পড়ে দরকার নেই।

'চিরচেনা ছিল চোখে চোখে
অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।'

স্বল্পপরিচিত জনের মৃত্যুসংবাদ শুনেই আমরা শোকে, এক অজানা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যাই—আর, এখানে কল্পনা করুন যে বাচ্চাটিকে মা ক্ষণতরে চোখের আড়াল হতে দিত না, যার কণ্ঠস্বরের সামান্যতম রেশ, যার ক্ষুদ্রতম অঙ্গভঙ্গী তার চেনা, আর সে যখন হঠাৎ খেলা ছেড়ে ছুটে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো, 'মা', সে হঠাৎ নেই হয়ে গেল? চিরতরে? এ মহাশূন্যতা—কল্পনায়—এ যে আপন মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও নির্মম!

কিন্তু তারপর শুনুন, বীভৎসতার চূড়ান্ত:

দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

চরম দুঃখে মা যখন কোনো সান্ত্বনা পেয়ে তার পুজোর ঘরে মাথা কুটতে গেল—ইষ্টদেবতার সামনে—, যে-দেবতা যুগ যুগ ধরে এ-বংশের কত না দুঃখী, কত না দুঃখিনীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন, সে-দেবতা তখন যদি লজ্জায় গা ঢাকা দিতেন তাও কিছু বিচিত্র হত না, কিন্তু তার চেয়েও পৈশাচিক পরিস্থিতি। দেবতার জায়গায় হনুমান বসে মায়ের শোকের দিকে ভেংচি কাটছে!

* * * *

এ-সব দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির পথ কি রবীন্দ্রনাথ জানবেন না? জানতেন, খুব ভাল করেই জানতেন—অন্তত আমার মনে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

একাডেমিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন না। অর্থাৎ কান্টের 'থিং ইন্ ইট্-সেল্ফ্' এবং বেদান্তের 'অ-সত্য' একই বস্তু কি না, ব্রহ্ম যেখানে নির্গুণ সেখানে ত্রিগুণ তাঁর ভিতরে লোপ পায়, না, তিনি তখন ত্রিগুণের অতীত এ-সব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এ-কথা তিনি খুব ভাল করেই জানতেন ভারতীয় দর্শনের চরম আদর্শ আনন্দ। এবং সাংখ্য দর্শনের গোড়ার কথাই হচ্ছে, দুঃখের কারণ কি ভাবে, ঐকান্তিকরূপে সমূলে বিনষ্ট করা যায়। আমার সঙ্গে সকলে একমত না হলেও নিবেদন করি, যোগ যত না ব্রহ্মানন্দের পথ নির্দেশ করেছেন, তার চেয়ে বেশী পথ নির্দেশ করেছেন আপনাতে স্থির হয়ে আপন 'আনন্দময় কোষ' থেকে আনন্দ আহরণ করতে।

বেদান্ত প্রণবমন্ত্রের অনুসরণে ত্রিভুবনে—অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—যা-কিছু আনন্দ আছে তা ব্রহ্মে লীন আছে জেনে সেই ব্রহ্মে যোজিত হয়ে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত-দেশব্যাপী পরিপূর্ণানন্দে লীন হতে আদেশ দেয়।

পাঠক! মা ভৈঃ! আমি তোমাকে দর্শনশাস্ত্রের গোলকধাঁধাঁয় ঢুকিয়ে অযথা হায়রান করতে চাই নে—যদিও আমার বিশ্বাস পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্কর তাঁদের মূল বক্তব্য আমাদের মত সাধারণজনের জন্যই বলে গেছেন, এবং সামান্য একটু শ্রদ্ধাভরে এঁদের মূল বক্তব্য বার বার পড়লে আপাতদৃষ্টিতে যা কঠিন বলে মনে হয় সেটি সরল হয়ে যায়। অবশ্য এঁরা প্রত্যেকেই যেস্থলে আপন বক্তব্য সপ্রমাণ করতে, অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে আপন বক্তব্যের কোন্‌খানে গরমিল সেটা বোঝাতে গিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কের অবতারণা করেছেন—সেগুলো বোঝা পরিশ্রম- ও ধ্যান-সাপেক্ষ। যেমন স্বাস্থ্যবান হতে হলে বৈদ্যরাজ প্রদত্ত কয়েকটি মূলসূত্র পালনই যথেষ্ট; পুরো আয়ুর্বেদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা পরিশ্রমসাপেক্ষ ও নিষ্প্রয়োজন।

এ-সব তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই জানতেন।

এবং সেটা সপ্রমাণ করা কঠিন নয়।

* * * *

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ কবিতা রচনা করে যান অস্ত্রোপচারের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। এবং সকলেই জানেন, সে অস্ত্রোপচার ব্যর্থকাম হয়, ও কবি অন্য কোনো রচনাতে হাত দিতে পারেননি। এ কবিতা সকলেই পড়েছেন, তবু আলোচনার সুবিধার জন্য এটি তুলে দিচ্ছি:

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে!
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে না পারে তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

শেষ লেখা, ৩০ জুলাই ১৯৪১।

এস্থলে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ করবার জন্য কবিতা লিখতেন না। একথা তিনি নিজেও একাধিক বার বলেছেন। কবিতা তার নিজের মহিমায় মহিমময়ী,—দর্শন বিজ্ঞান এমন কি ধর্মর সেবা-দাসী হয়েও সে তার চরম মোক্ষের অনুসন্ধান করে না (ধর্মও ঠিক সেই রকম দর্শন বা বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়)। কাল যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ঐতিহাসিক কড়ায় কড়ায় প্রমাণ করে দেন যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আদৌ হয়নি, কৃষ্ণার্জুন সংবাদের তো কথাই ওঠে না, তাহলেও গীতার মূল্য কানাকড়ি কমবে না। মধুসূদন যখন উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন,

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!'

তখন তিনি এ-কথা সপ্রমাণ করতে কোমর বাঁধেননি যে 'আশার ছলনে' ভুলতে নেই। বস্তুত তিনি তারপরও আশার ছলনে ভুলেছেন, বেঁচে থাকলে আরো ভুলতেন—এবং না ভুললে আমাদের ক্ষতি হত।

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী নিশ্চল এবং ধ্রুবতারা ধ্রুবস্থির। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু বলেন, এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—মায় ধ্রুবতারা—প্রচণ্ড গতিবেগে কোন্ অজানার দিকে যে ধেয়ে চলেছে সে খবর কেউ জানে না। তাই বলে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন,

'দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।'

তখন তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে, তারপর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সেটি কবিতার রসে প্রকাশ করছেন না। এটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুত্রশোকে মাতার কাতরতা যেমন সোজা অনুভূতি, প্রিয়জনবিরহ আমাদের বুকে যেরকম সরাসরি বেদনার অনুভূতি এনে দেয়, সেইরকম।

তাই যখন কবি বলছেন 'তোমার সৃষ্টির পথ' 'বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ' করে রেখেছ তখন তিনি একটি সহজ সত্য অনুভব করেছেন। এটি দার্শনিক গবেষণা নয়।

এখন প্রশ্ন, এই 'ছলনাময়ী'টি কে ?

তিনি পরব্রহ্ম হতে পারেন না, কারণ তাঁর লিঙ্গ নেই, এবং এ-স্থলে শব্দটি-পরিষ্কার স্ত্রীলিঙ্গে আছে।

তাই এখানে সাংখ্যদর্শনের আশ্রয় নিলে কবিতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বোঝবার সুবিধে হয়—রসগ্রহণ অবশ্য অন্য ক্রিয়া।

'কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপন অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখ-দুঃখাদির গুণদ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখ-দুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন।'[১]

১ ঠাকুর রামকৃষ্ণ বোঝাতেন উপনিষদ দিয়ে: 'বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে আবার অবিদ্যা-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যা-রূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে। বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। অবিদ্যামায়া পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।'

উপনিষদে আছে: 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,
ততো ভূয়ো ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।'

অর্থাৎ,

'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে

এ টীকাটি করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতা-পাঠ' গ্রন্থে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে এঁর মত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তিনি তাঁর জীবনে আর দেখেননি।[২] পাছে পাঠক ভাবেন আমি আমার নিজস্ব টীকা দিয়ে তাঁকে অতিশয় কঠিন বস্তু সাতিশয় সরল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের টীকা উদ্ধৃত করলুম।

তাহলে দাঁড়ালো এই ঃ

'হে ছলনাময়ী' (অয়ি প্রকৃতি!), তুমি তোমার আপন হাতে 'সৃষ্টির পথ' (যে-পথ দিয়ে মানুষ চলে) 'বিচিত্র ছলনা' দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ করে রেখেছ (যেমন দড়ির টুকরো দেখে সাপ ভেবে আঁৎকে উঠি, আবার ঝিনুকের টুকরোটাকে কোম্পানির টাকা ভেবে উল্লাসে নৃত্য করি)। তারপর কবি এই 'বিচিত্র ছলনা' উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছেন, চতুর্থ ছত্রে,—'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে।' যে 'জীবন সরল' বলে মনে হয়, সেখানে রয়েছে 'মিথ্যা বিশ্বাসে'র ছলনা (তাই প্রকৃতি 'ছলনাময়ী')। এই 'মিথ্যা বিশ্বাস' কি সেটা রবীন্দ্রনাথ এ-কবিতা লেখার সতেরো বছর পূর্বে বর্ণনা করেছেন—তাঁর আপন জীবনে,

'পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে সে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে সে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে।'

তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ।

এখানে স্পষ্টত একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেটা সরল হয়, কাণ্ট যেটাকে thing-in-itself বলেছেন সেটাকে অবিদ্যা অর্থে নিলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই অর্থে নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'এই জিনিসই সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, শোপেন-হাওয়ারের অন্ধ Will, Mill-এর ইন্দ্রিয়চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যাশক্তি, ইংরাজীতে Permanent possibility of sensation, বেদান্তের সদসদ্-ভ্যাসমনির্বাচনীয়া অবিদ্যা।' সাংখ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি বুঝবার চেষ্টা করলে সরল হয় বলে আমি সাংখ্য নিয়েছি।

২ সুদ্ধমাত্র পণ্ডিত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নাম করতেন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।

আর এ-কথা বুঝতে তো কণামাত্র অসুবিধা হয় না, সরলকেই ফাঁকি দেয় ধুরন্ধর! বিদ্যাসাগরের মত সরল লোকই ঠকেছেন সব চেয়ে বেশী!

এর পর আবার একটুখানি সাংখ্যদর্শনে আসতে হয়। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যার নাম মহান্ দেওয়া হয়েছে সেই মহান্ শব্দের অর্থ অবাধিত অপরিচ্ছিন্ন (বাঙলা মলিন অর্থে নয়, সংস্কৃত অর্থে অখণ্ডিত) বুদ্ধিতত্ত্ব।

এই মহান্-ই চিরানন্দের পথ দেখায়।

সেই মহান্-কে, 'হে ছলনাময়ী,' তুমি 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' পেতে

'প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত'

অর্থাৎ মহান্-কে আচ্ছাদিত করেছ। সাংখ্যের সেই মহান্-কে এখানে কবি 'মহত্ত্ব'রূপে ব্যবহার কয়েছেন। এর পর বোঝার সুবিধার জন্য একটি 'কিন্তু' যোগ দিতে হবে।[৩] পড়তে হবে,

(কিন্তু) 'তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।'

এর পর বাকি কবিতাটুকু সহজ; তাতে তিনটি কথা আছে:

১। যে-পথ দিয়ে জীব ছলনা থেকে মুক্ত হয়ে 'শান্তির অক্ষয় অধিকার' পায়, সেটা তার ভিতরেই আছে। সেটা তার 'অন্তরের পথ'।

২। সে যখন মানুষকে সরল বিশ্বাস করে ঠকবে, সে হয়তো জানতেই পারবে না যে বুদ্ধিমতী (ছলনাময়ী) তাকে ঠকাচ্ছে, এবং অন্য লোক তার সরলতা ও ছলনাময়ীর নষ্টামি দেখে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে—'লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।'

৩। সে-ই শুধু 'শান্তির অক্ষয় অধিকার পায়' যে 'অনায়াসে' 'ছলনা সহিতে' পারে। সেই লোক যে ছলনাময়ীকে—তা সে রমণীরূপেই দেখা দিক, আর পুরুষরূপেই দেখা দিক [সে ছলনা—সে বেদনা—তিন প্রকারের হতে পারে: ক) বাহ্যবস্তু-ঘটিত খ) আপনা-ঘটিত কিংবা গ) দেবতা-ঘটিত—অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টাল] সে যখন তার বেদনার জন্য দায়ী দুষ্টকে কঠোর সাজা দিয়ে প্রতিহিংসা নেয় না, হাসিমুখে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নেয়—সে-ই পায় 'শান্তির অক্ষয় অধিকার।' (অবশ্য সে যখন লোকের কাছে আরো বেশী হাস্যাস্পদ, বিড়ম্বিত।)

৩ মনে রাখতে হবে এ-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ডিক্টেট্ করেন। যখন সেটি read-back করা হল তখন তিনি বলেছিলেন যে ওটাকে আবার দেখে দিতে হবে। সে সুযোগ তিনি পাননি।

আবার অন্তরের পথে ফিরে যাই। এ-প্রবন্ধের সেইটেই মূল বক্তব্য।

এই অন্তরের পথের শেষ প্রান্তে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ। কুরান শরীফও বলেন তিনি জ্যোতিস্বরূপ।[৪]

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জীবনে কতবার উল্লেখ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনিই জীবন-দেবতা। যে-পাঠক 'জীবন-দেবতা' জাতীয় কবিতা কঠিন বলে মনে করেন তিনি যেন গল্পে গল্পে বলা—ঐ বিষয় নিয়েই—'সিন্ধুপারে' (চিত্রা) কবিতাটি পড়েন। কবি এক গভীর রাত্রে হঠাৎ ডাক শুনতে পেয়ে, ঘুম থেকে জেগে উঠে, 'দুরু-দুরু বুকে' বাইরে এসে দেখেন, 'কৃষ্ণ অশ্বে' বসে আছে এক 'রমণীমূরতি'—'আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে অদূরে পুচ্ছ ভূতল চুমে।' কবিকে নিয়ে রমণী উধাও—'বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া।' তার পর কি হল, পাঠক নির্ভয়ে পড়ে নেবেন, ঠিক 'কথা ও কাহিনী'র গল্পেরই মত সরল—সাস্‌পেন্‌স নষ্ট হবে বলে আমি আর বাকিটা বললুম না।

এঁকে তিনি ঠিক চিনতে পারেননি বলে রবীন্দ্রনাথ বার বার দুঃখ করেছেন:

'জানি, জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।'

এবং এই ধরনের ক্ষোভ ও আক্ষেপ কবি বহু শত বার করেছেন। এ নিয়ে কৌতূহলী তরুণ পাঠক চর্চা করলে উপকৃত হবেন।

তাহলে প্রশ্ন, এই 'অন্তরের পথ' ধরে তিনি সেই 'অন্তরের গহনবাসী'র সম্মুখীন হলেন না কেন?

তাঁর অসাধারণ চরিত্রবল ছিল, জীবনমরণ পণ করে যে-কোনো সাধনার পথে এগিয়ে যাবার মত বিধিদত্ত বীর্যবল তাঁর ছিল, তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষোত্তম ছিলেন—এসব কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতার সম্বন্ধে এখানকারই এক গুরুজনকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কখনো পা পিছলোয়নি!'

তবে শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সে সাধনা করলেন না কেন, যাতে করে তিনি

৪ কুরান শরীফ, ২৪ অধ্যায়, 'অন্‌-নূর' (জ্যোতিঃ) মণ্ডল দ্রষ্টব্য। বাইবেলেও মহাপুরুষ তাঁর প্রভু ইয়াহ্‌ভেকে অগ্নিরূপে দেখেছিলেন। সর্বকলুষ পুড়ে গিয়ে জীবাত্মা যখন অগ্নিশিখারূপে পরিবর্তিত হয় তখন ব্রহ্মাগ্নিতে লীন হতে মাঝখানে আর কোনো প্রতিবন্ধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন,

'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃ সমুদ্রেই।'

দুঃখবেদনার ওপারে চলে যেতে পারেন ?

আমার মনে হয়—এবং পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, এইখানে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নাও হতে পারে—তাহলে তাঁকে কাব্যের কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। আমার দুঃখানুভূতি হবে, আমার আনন্দোচ্ছ্বাস হবে, পুত্রবিয়োগে, সন্তানহারা মাতার হাহাকারে আমার অনুভূতির কেন্দ্র, আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তবে তো আমি সেটা রসস্বরূপে প্রকাশ করতে পারব। যদি মহাপুরুষের বাণী

'সর্বদা নিত্য প্রত্যক্ষ আত্মনে তন্ময় হয়ে থাকবে'

বরণ করে নি, তবে সুখদুঃখ আমাকে স্পর্শ করবে কি করে ?

প্রাচীন যুগের কথা বলা কঠিন। এ যুগে দেখতে পাচ্ছি, যে-দ্বিজেন্দ্রনাথ (শুনেছি মধুসূদনের মত কবি তাঁর কবিতা পড়ে বলেছিলেন, ঐ একটিমাত্র লোক কবিতা লিখতে পারে; হ্যাট্ অফ্ টু দ্যাট্ ম্যান্—তাকে নমস্কার) 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র মত অতুলনীয় কাব্য রচনা করে বাগ্দেবীর বরপুত্ররূপে স্বীকৃত হলেন, তিনি যেদিন থেকে তাঁর 'অন্তরের পথে'র প্রয়াণ আরম্ভ করলেন, সেদিন রুদ্ধ হল—কিংবা আপন হাতেই তিনি রুদ্ধ করলেন—গোলাপের-পাপড়ি-ছড়ানো পথের শেষের ('প্রিম্‌রোজ্ পাথ টু ইটার্নেল বন-ফায়ার') কাব্যলক্ষ্মীর দেউল-দ্বার। স্বামী বিবেকানন্দের অতুলনীয় সৃজনীশক্তি ছিল; প্যারিসে (বোধ হয়) তিনি এক-খানা উপন্যাসও আরম্ভ করেছিলেন—শেষ করলেন না কেন ? শ্রীঅরবিন্দও কবিতা রচেছিলেন, কিন্তু সে তো গায়ত্রীর সমগোত্র—আপনার আমার নিত্য-দিনের হাসিকান্নার সন্ধান তাতে কোথায় ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ, দক্ষিণভারতের রমণ মহর্ষি উভয়ই এ-যুগের বিখ্যাত পরমহংস, জীবন্মুক্ত। সাধারণজনের সুখদুঃখ নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন অতি ললিত মধুর ভাষায়—কিন্তু সে তো রসসৃষ্টি নয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, দাসী মুনিব-বাড়িতে কাজ করে নিখুঁতভাবে, কিন্তু তার মনে পড়ে থাকে আপন বাড়িতে আপন বাচ্চার কাছে। আমরা এ-সংসারের কর্তব্য কর্ম করবো দাসীর মত, কিন্তু মন পড়ে রইবে ব্রহ্মার পদতলে !

এই উপদেশ নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন, দাসীকে যদি আদেশ করা হয়, তাকে কাপড় কাচা বাসন-মাজার মেকানিক্যাল্ রুটিন কাজ নয়, তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান, কিংবা উদ্ভাবন করতে হবে কাঁথা সেলাইয়ের নিত্য নব প্যাটার্ন—পারবে কি সে ? দাসী কেন যদি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বলা হত, জমিদারী চালানো বা ছাত্র-অধ্যাপনা নয়—

াম্যুটি মেকানিক্যাল্ কাজ—তোমাকে তন্ময় হয়ে গাইতে হবে গান কিংবা হবে কবিতা অথচ তোমার সর্বসত্তা পড়ে থাকবে পরব্রহ্মের পদপ্রান্তে, তবে ন কি সেটা পারতেন? এই ডবল তন্ময়তা কি সম্ভবপর? হয়তো ধর্মসঙ্গীত নার সময় সম্ভবপর (যদিও কেউ কেউ বলেন, তাঁর ধর্মসঙ্গীত অনবদ্য হলেও র প্রেম বা প্রকৃতি সঙ্গীতের তুলনায় নিচে) কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বেদনার ণে তন্ময় হয়ে সে-বেদনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর, বিশ্বজননমস্য রূপ দিয়ে সৃষ্টি করা কি ম্ভবপর? দুঃখে যে-জন অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যে-জন বিগতস্পৃহ সে তো শান্ত; ন্ত রস কি রস? খৃষ্টান মিস্টিক্ তরুণ সাধককে বলেছেন, 'যা বলার এই বেলা লে নাও। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর যে অভূতপূর্ব আনন্দ পাবে তখন আর-কোনো-কিছু বলতে চাইবে না।'

চতুর্দিক থেকে তারস্বরে প্রতিবাদ উঠবে—আমি জানি—তবু ক্ষীণকণ্ঠে নিবেদন করে যাই, রবীন্দ্রনাথ সেই ব্রহ্মানন্দে লীন হতে চাননি। তিনি আমাদের মত পাপীতাপীদের যে ভাঙা নৌকা, সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চাননি। সুখের মলয় বাতাসে ঝঞ্ঝাবাতের ক্রুর আঘাতে নিমজ্জমান তরীতে বসে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, আমাদেরই হৃদয়ের গীতি—যে গীতির প্রকাশক্ষমতা আমাদের নেই।

যুধিষ্ঠিরের মত তিনিও স্বর্গারোহণ করতে চাননি।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাপ্য সম্মানের শতাংশের একাংশও পাবেন বলে আমি আর আশা করি না।

এই যে আজ আমরা অজন্তা বাঘ গুহার ছবি নিয়ে এত দাপাদাপি করি, অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর কীর্তিকলাপ নিয়ে গর্ব অনুভব করি—আমাদের চোখের সামনে এঁদের তুলে ধরলো কে? এবং তখন তাঁকে কী অন্যায় প্রতিবাদের সামনে না দাঁড়াতে হয়েছিল! শুধু প্রতিবাদ নয়, নীচ আক্রমণ।

আজ আর তাই নিয়ে ক্ষোভ করি না। তার কারণ, প্রতিবাদ এবং ভিন্নমত (অপজিশন) না থাকলে অসৎ মানুষ যে আরো কতখানি অসততার দিকে এগিয়ে যায় সে তো আজ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পারছি। রামানন্দের ...মার থাকতে পারে কিন্তু তিনি অসৎ একথা বললে আমাদের মত লোক

মানবজাতির উপর শ্রদ্ধা হারাবে। তিনি সৎ ছিলেন তৎসত্ত্বেও তাঁর অপজিশনের দরকার ছিল। পেয়েছিলেন পূর্ণমাত্রার চেয়েও বেশী।

এই বক্তব্যটি আবার উল্টো করেও দেখা যায়।

আশুতোষ কৃতী পুরুষ। রামানন্দ ও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। কিন্তু একটি বিষয়ে দুজনাতে বড়ই মিল। দুজনাই জহুরী। ভারতের সুদূরতম প্রান্তের কোন্ এক নিভৃত কোণে কে কোন্ গবেষণা নিয়ে পড়ে আছে, আশুতোষ ঠিক জানতেন। তাকে কি করে ধরে নিয়ে আসা যায় সেই সন্ধানে লেগে যেতেন। রামানন্দের বেলাতেও ঠিক তাই। কোথায় কোন্ এক অখ্যাতনামা কাগজে তার চেয়েও অখ্যাতনামা এক পণ্ডিত তিন পৃষ্ঠার একটি রচনা প্রকাশ করেছে—ঠিক ধরে ফেলতেন রামানন্দ! আপন হাতে চিঠি লিখে তাঁকে সবিনয় অনুরোধ জানাতেন তাঁর কাগজে লেখবার জন্য। শুধু তাই নয়, এ-পণ্ডিত কোন্ বিষয়ে হাত দিলে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতি বিকশিত হবে সেটি ঠিক বুঝতে পারতেন--সে দিকে ইঙ্গিতও দিতেন কোনো কোনো স্থলে।

তাই রামানন্দ ছিলেন আশুতোষের অপজিশন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন কৈশোরে পা দিয়েছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি অতিশয় স্বাভাবিক। আশুতোষ তার গুরু, রামানন্দ তার গার্জেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সৌভাগ্য যে সে এই মণিকাঞ্চন সংযোজিত বিজয়মাল্য একদিন পরতে পেয়েছিল।

* * * *

সে যুগের প্রবাসীতে এক মাসে যা নিরেট সরেস বস্তু বেরুতো, এ যুগের কোনো মাসিক সাপ্তাহিত পত্রিকা পূর্ণ এক বছরেও তা দেখাতে পারবে না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি,—ঈশান ঘোষ 'জাতক' অনুবাদ করলেন বাঙলায় (জর্মন, হিন্দী বা অন্য কোনো অনুবাদ তার শত যোজন কাছেও আসতে পারে না) এবং তার সমালোচনা করলেন বিধুশেখর। এ যুগে কই ঈশান, কোথায় বিধুশেখর? এ সুবাদে আরেকটি কথার উল্লেখ করি। রামানন্দের উৎসাহ না পেলে বহু পণ্ডিতই হয়তো তাঁদের গবেষণা ইংরেজিতে প্রকাশ করতেন; বাঙলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হত।

* * *

রামানন্দ ছিলেন চ্যামপিয়ন অব্ লস্ট কজেস—তাবৎ বাঙলা দেশে দু'জন কিংবা তিনজন হয়তো লেখাটি পড়বেন, তিনি দিতেন ছাপিয়ে, কারণ দার্শনিক

রামানন্দ জানতেন 'কান্টিয় দর্শন ও পতঞ্জলির পথমধ্যে কোলাকুলি'[১] জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে পারে এমন লোক দ্বিজেন্দ্রনাথের মত আর কেউ নেই। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে রামানন্দ মাসের পর মাস দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অপাঠ্য' প্রবন্ধরাজি প্রকাশ করেছিলেন, কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনো প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরেই সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন। (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞান সে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। বাকিটুকু রমন মহর্ষির কাছ থেকে ও বিবেকানন্দ পড়ে। হিন্দু দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে সূফীতত্ত্বের মূল মর্মকথা বুঝিয়ে দেন। সূফীতত্ত্বে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে)।

এই দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলায় শর্টহ্যাণ্ড বই ছাপিয়েছিলেন। তার ১২।১৪ বছর পর রামানন্দের অনুরোধে বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ সেটি আবার নূতন করে লেখেন। রামানন্দ তাবৎ বইখানা নিজের খর্চায় ব্লক করে ছাপান (কারণ এতে প্রতি লাইনে এত সব সিম্‌বল্‌ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না)। এটা আরেকটা লস্‌ট্‌ কজ্‌। এরকম বই কেউ পড়েও না। কিন্তু রামানন্দ ঘন ঘন তাড়া না লাগালে এই অতুলনীয় পুস্তক সৃষ্ট হত না।

আবার অন্য দিকটা দেখুন। পাবলিসিটি কারে কয় সেটা মার্কিনদের পূর্বেই রামানন্দ জেনে গিয়েছিলেন। সে যুগের যে কোনো 'প্রবাসী' সংখ্যা নিলেই পাঠক তত্ত্বকথাটি বুঝে যাবেন।

রামানন্দ কোহিনূর বেচতেন আবার সঙ্গে সঙ্গে মুড়িও বেচতেন। কিন্তু কখনো ভেজাল বেচেননি।

এই পাবলিসিটি ব্যাপারে স্বর্গত চারু বাঁড়ুয্যেকে স্মরণে এনে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানানো উচিত।

'প্রবাসী'র কথা (এবং সুদ্ধমাত্র যে কথা লিখতে গেলেই পুরোপুরি একখানি ভলুম লিখতে হয় ; আমার মনে হয় প্রবাসীর কর্মকর্তারা যদি 'প্রবাসী সঞ্চয়ন' জাতীয় একটি ভলুম বের করেন তবে বড় ভালো হয়—এতে থাকবে প্রবাসী থেকে বাছাই বাছাই জিনিস) বাদ দিলেই আসে 'মডার্ন রিভ্যু'র কথা। তখনকার দিনে মডার্ন রিভ্যু খাস লণ্ডনে প্রচারিত যে কোনো কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো। আজও প্রাচ্যভূমিতে এর চেয়ে সেরা ইংরিজি মাসিক বেরোয় নি।

১ হুবহু শিরোনামটি আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

* * * *

প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যু ('বিশাল ভারতে'র সঙ্গে আমি পরিচিত নই ; পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে—'হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক রামানন্দ'—লিখবেন) এই একাধিক পত্রিকার মাধ্যমে রামানন্দ ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এনে দেন স্পষ্ট চিন্তন, স্পষ্ট ভাষণ ও সর্বোপরি নির্ভীকতম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রচার। আমার মত বহু মুসলমান তখন রামানন্দকে চিন্তার জগতে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর এমন একদিন এল যখন তাঁকে অনুসরণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। কিন্তু একশ বার বলবো, তিনি তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে যেটি সত্য পথ বলে ধরে নিয়েছিলেন সেই পথেই এগোলেন। কোন সস্তা রাজনীতির চাল তাতে এক কানাকড়িও ছিল না।

বিশ্বভারতীতে আমি ছাত্র থাকার সময় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামানন্দ কিছু-দিনের জন্য অধ্যক্ষ ছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য না হয়েও তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। অন্য সব কথা বাদ দিন, আমাকে স্তম্ভিত করেছিল তাঁর চরিত্রবল। এবং সঙ্গে সাতিশয় মৃদুকণ্ঠে কঠোরতম, অকুণ্ঠ সত্যপ্রচার।

* * * *

এদেশে এরকম একটি লোক আজ চাই। কর্তাদের কানে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য।

* * * *

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঃ।

সরলাবালা

সরলাবালার অমরাত্মার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাই।

বাঙলার সংস্কৃতি জগতে তিনি এতই সুপরিচিতা যে, বহু কীর্তিমান লেখক তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করবেন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অকুণ্ঠ প্রশংসা করবেন, তাঁর সরল জীবনাদর্শ তিনি দেশের দশের চিন্ময় জগতে যে কতখানি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন, তা দেখে বার বার বিস্ময় মানবেন।

কিন্তু আমরা যারা তাঁর স্নেহ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি—আমাদের শোকের অন্ত নেই যে, আজ আমরা যাঁকে হারালুম, তাঁর আসন নেবার মত আর কেউ রইলেন না। সাহিত্য জগতে তিনি ছিলেন আমাদের স্নেহময়ী

মাতার মত। আমরা জানতুম, যে সাপ্তাহিক-দৈনিক পত্রিকার জগতে আমরা বিচরণ করি, সেখানে নানা বাধাবিঘ্ন আছে, কিন্তু এ-কথাও আরো সত্যরূপে জানতুম যে, শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের ফরিয়াদ-আর্তনাদ এমন একটি মাতার কাছে নিয়ে যেতে পারবো, যেখানে সুবিচার পাবই পাব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না।

১৯৪৪ ইংরিজিতে আমি 'সত্যপীর' নাম নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পরবর্তী স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি। দুটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরই সরলাবালার এক আত্মীয়, আমার বন্ধু এসে আমাকে জানালেন, আমার লেখা তাঁর মনঃপূত হয়েছে।

নিজেকে ধন্য মনে করেছিলুম। ঐ দিনই আমার আত্মবিশ্বাসের সূত্রপাত।

তাই আজ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথাও বার বার মনে পড়ছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সরলাবালার অনুমোদন না পেলে বাঙ্গালীকে আমার সামান্য যেটুকু বলার ছিল, সেটুকু বলা হত না।

একটুখানি ব্যক্তিগত কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু ঠেকবে, কিন্তু আজ যদি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা সর্বজনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ না করি, তবে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ-নেমকহারামের আচরণ হবে। বরঞ্চ সে-আচরণ দৃষ্টিকটুকর হোক।

এ-কথা সত্য, 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান', 'দেশ' পত্রিকায় আমার একাধিক বন্ধু ও স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁদেরই একজনের—এঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—মাধ্যমে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কিন্তু এ-কথা আরো সত্য যে, এঁরা সকলেই সহৃদয় বলে আমার মত আরো বহু বহু অচেনা অজানা লেখককে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছেন। সুরেশচন্দ্র যেমন এক দিকে পাকা জহুরীর মত কড়া সমালোচক ছিলেন, অন্য দিকে ঠিক তেমনি অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। এই দ্বন্দ্বের সমাধান না করতে পেরে তিনি অনেক সময় অভাজন জনকেও গ্রহণ করতেন—আমি তাদেরই একজন।

সুরেশচন্দ্রকে আমি বাঘের মত ডরাতুম, যদিও খুব ভালো করেই জানতুম যে, তাঁকে ডরাবার কণামাত্র কারণ নেই। কঠিন কথা দূরে থাক—যে ক'বৎসর আমি তাঁর স্নেহ-রাজত্বে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তার মধ্যে একদিন একবারও তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেননি, কোনো আদেশ বা উপদেশও দেননি।

মনে পড়ছে ১৯৪৪-৪৫ কলকাতায় একবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়।

আফ্‌টার-এডিট না লিখে লিখলুম একটি কবিতা। মনে ভয় হল, আফ্‌টার-এডিটের এরজাৎস্‌ তো কবিতায় হয় না! তাই এ নিয়ে গেলুম সুরেশবাবুর কাছে স্বহস্তে। তিনি মাত্র দুটি ছত্র পড়েই প্রেসে পাঠিয়ে দিলেন। 'ওরে—এঁকে চা দে, আর কি দিবি দে, আর'—বাক্য অসমাপ্ত রেখে তিনি ফের কাজে মন দিলেন।

তবু তাঁকে আমি ডরাতুম। কিন্তু যেদিন শুনলুম, সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন সরলাবালাকে এবং তিনি আমার রচনার উপর আশীর্বাদ রেখেছেন, সেদিন আমার মনে এক অদ্ভুত সাহস সঞ্চার হল। আমার মনে হল, পত্রিকা জগতের সুপ্রীম কোর্টের (তখন বোধ হয় প্রিভি কৌন্সিল ছিল) চীফ জস্‌টিসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল—সে জগতে যদি আমার মনোবেদনার কারণ ঘটে, তবে আপীল করবো খুদ সুপ্রীম কোর্টে! অবশ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমাকে কখনো স্মল-কজ কোর্টেও যেতে হয়নি। হবে না, সে বিশ্বাসও ধরি।

এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। বহু কর্মী, প্রচুর সাহিত্যিক আমার কথায় সায় দেবেন।

সরলাবালা ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লের (এণ্ড অব দি সেঞ্চুরির) লোক। গত শতাব্দীর শেষ এবং এ শতাব্দীর অর্ধাধিক তিনি দেখেছেন। ফরাসীতে যেমন এঁদের ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্লের প্রতিভূ বলে, আরবীতে ঠিক তেমনি বলে জুঁঅল্‌-করনেন্‌—'দুই শতাব্দীর মালিক'। এঁদের সম্বন্ধে লেখা কঠিন। বঙ্কিম রমেশের মধ্যাহ্ন গগন, রবীন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্রের উদয় সরলাবালা চোখের সামনে দে[illegible]ছেন—এবং আর পাঁচজনের তুলনায় অনেক বেশী ভালো করে দেখেছেন, কারণ সাহিত্যে তাঁর রসবোধ ছিল তো বটেই, তদুপরি তাঁর আসন ছিল ঘোষ সরকার উভয় পরিবারের পত্রিকা-জগতের মাঝখানে। এদিকে বৈষ্ণবধর্মের রসকুণ্ডে তিনি আবাল্য নিমজ্জিতা, অন্য দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আন্দোলন, বিবেকানন্দের কর্মযোগ এবং সর্বশেষ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তিনি ছিলেন সক্রিয় কর্মী। অত্যন্ত উদারচিত্ত না হলে মানুষ এ তিনটেকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। আমার কাছে আরো আশ্চর্য বোধ হয়, যে রমণী কোনো বিদ্যালয়েও কখনো যাননি, চিরকাল অন্তঃপুরের অন্তরালেই রইলেন, তাঁর পক্ষে এতখানি উদার, এতখানি ক্যাথলিক হওয়া সম্ভব হল কি প্রকারে?

ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্ল সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু পড়েছি, কিন্তু তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্তটাই পুরুষের লেখা। তার মাঝখানে সরলাবালার কোমল নারীহৃদয় সব কিছু অনুভব করছে হৃদয় দিয়ে, মাতৃরসে সিক্ত করে।

ইংরিজিতে বলতে গেলে বলবো, তাঁর বর্ণনা 'রিচ্ উইদ্ নলেজ' না হতে পারে সর্বক্ষেত্রে, কিন্তু নিশ্চয় নিশ্চয় অতিনিশ্চয় 'রেডিয়েন্ট উইদ্ লাভ্'।

অথচ তাঁর লেখাতে ভাবালুতা উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নেই। অত্যন্ত মধুর, আন্তরিক লেখার মধ্যেও সর্বক্ষণ পাই, কেমন যেন একটা বৈরাগ্যের—ডিটাচমেণ্টের ভাব। আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল থেকে অনেক শোক পেয়েছিলেন বলেই বৈরাগ্য-যোগে আপন চেষ্টায় সেসব শোক সংহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনাতে পদে পদে তারই পরিচয় পাই।

ছেলের হৃদয়ের আঁকুবাঁকু মা কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারেন, এবং তিনি যখন সেটা সরল ভাষায় প্রকাশ করেন, তখন ছেলে বিস্ময় মানে, যে জিনিস সে-ই ভালো করে বুঝতে পারেনি, মা বুঝল কি করে এবং এত সরল ভাষায় প্রকাশ করলো কি করে?

বাঙলার চিন্ময় জগতে সরলা ছিলেন মাতৃরূপা। অতি অল্প বয়সেই তিনি মাতৃক্রোড় পেতে দিয়েছিলেন বাঙলার তরুণকে। তাই শুনতে পাই, বাঙালীর উপর যখনই অত্যাচার এসেছে, তিনি ক্ষুব্ধা মাতার মত অনশন করেছেন। এবং তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বাঙালীর মনোবেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অতি মহৎ ভাষায় সেটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সে ভাষায় আছে দার্ঢ্য অথচ মাধুর্য।

এবং সর্বোপরি সে ভাষা অতিশয় সরলা।

সার্থক নাম সরলাবালা॥

হাসনোহানা

বছর বারো পূর্বে ভারতীয় একখানা জাহাজ সুয়েজের কাছাকাছি লোহিত সাগরে আগুন লেগে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কাপ্তেন সারেঙ্গ মাঝিমাল্লা বেবাক লোক মারা যায়। আশপাশের জাহাজ মাত্র একটি অর্ধদগ্ধ জীবন্মৃত খালাসীকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তাকে সুয়েজ বন্দরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবরের কাগজে মাত্র কয়েক লাইনে সমস্ত বিবরণটা প্রকাশিত হয়, এবং সর্বশেষে লেখা ছিল, সেই অর্ধদগ্ধ খালাসীটি কাতর কণ্ঠে জল চাইছে কিন্তু বার বার জল এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জল খাচ্ছে না।

অলস কৌতুহলে আমি আর পাঁচজনের মত খবরটি পড়ি। কিন্তু হঠাৎ মগজের ভিতর ক্লিক্ ক্লিক্ করে কতকগুলো এলোপাতাড়ি ফেলে-দেওয়া টুকরো

টুকরো তথ্য একজোট হয়ে কেমন যেন একটা প্যাটার্ন তৈরি করে ফেললে।

প্রথমত, সুয়েজ বন্দরের কাছে-পিঠে আমি আমার প্রথম যৌবনের একটি বছর কাটিয়েছিলুম। সেখানে 'জল'-কে 'মা-ই' বলা হয়; যদিও খাঁটি আরবীতে 'জল'-কে 'মা-আ' বলা হয়। দ্বিতীয়ত ভারতীয় জাহাজের খালাসী পুব বাঙলার মুসলমান হওয়ারই কথা। এবং পুব বাঙলায়, বিশেষ করে সিলেট মৈমনসিং অঞ্চলে 'মা'-কে 'মা-ই' বলে।

অতএব খুব সম্ভব ঐ অর্ধ-দগ্ধ খালাসী বেচারী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে কাতরকণ্ঠে আপন মাতাকে স্মরণ করে বার বার যে 'মা-ই' 'মা-ই' বলছিল তখন সে সুয়েজের আরবীতে জল চাইছিল না। তাই জল দেওয়া সত্ত্বেও সে সে-জল প্রত্যাখ্যান করছিল।

অর্থাৎ একই শব্দ একই ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধরতে পারে।

তাই একটি শব্দ নিয়ে আমি হালে অনেক চিন্তা করেছি।

হাস্নোহানা। রাজশেখরবাবু এইভাবেই বানান করেছেন। কিন্তু বানান নিয়ে আমার মাথাব্যথা নয়। শিরঃপীড়া শিকড়ে। অর্থাৎ শব্দটার রুট কি? ব্যুৎপত্তি কি?

রাজশেখর বলছেন, [জাপানী। =পদ্মফুল] সাদা সুগন্ধ ছোট ফুল বিঃ (অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত)।

সুবল মিত্র বলছেন, জাপানী। একরকম ছোট সুগন্ধী ফুল।

বাঙলায় আর যে দুখানা উত্তম অভিধান আছে তার প্রথম, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ এবং দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা ভাষার অভিধান। উভয় অভিধানেই শব্দটি নেই। এটা কিছু বিচিত্র নয়। পঞ্চাশ-ষাট বছর মাত্র হল শব্দটা লেখাতে ঢুকেছে—আমার যতদূর জানা।

শুনেছি, বাঙলা থেকে সংস্কৃতাগত শব্দ বাদ দিলে শতকরা ষাটটি শব্দ আরবী ফার্সী কিংবা তুর্কী। ডজন দুত্তিন পর্তুগীজ এবং শ' কয়েক ইংরিজি। ফরাসী ইত্যাদি নগণ্য। জাপানী আর কোনো শব্দ বাঙলাতে আছে বলে জানি নে। আমরা শান্তিনিকেতনের লোক 'কিমোনো'—জাপানী আলখাল্লা—শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু সেটি কোনো অভিধানে ঢুকেছে বলে জানি নে, সাহিত্যে তো নয়ই। কিমোনো পরিহিত সত্যপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি রবীন্দ্ররচনাবলীতে পাওয়া যায়।

তাই প্রশ্ন, হঠাৎ দুম্ করে একটা জাপানী শব্দ বাঙলায় ঢুকল কি করে? তবে কি জাপান থেকে এসেছে হাসনোহানা ফুল? সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা? চিত্রকর

বিনোদ মুখুজ্যে, নন্দলালের নন্দন বিশ্বরূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জাপান দেখে এসেছেন। অন্ধ্রের বীরভদ্র রাও, মালাবারের হরিহরণ। এঁরা সবাই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। তাই এঁদের চিনি। এঁরা সবাই অজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বলেন হাসনো-হানা ফুল জাপানে নেই—অর্থাৎ আমরা এদেশে যেটাকে হাসনোহানা বলে চিনি—এবং শব্দটার ব্যুৎপত্তি জাপানী এ সম্বন্ধে সকলেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার অন্যতম কারণ এঁরা সকলেই বাঙলা জানেন—বীরভদ্র হরিহরণ শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সাহচর্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখেছেন—এবং জাপানী আর কোনো শব্দ হুট্ করে বাঙলায় ঢুকে গিয়ে থাকলে তাঁরা এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

কলকাতার উর্দুভাষী, তথা বাঙলা এবং উর্দু দোভাষীরা বলেন, হুস্‌ন্-ই-হিনা। 'হুস্‌ন্' শব্দটি আরবী, অর্থ সৌন্দর্য, খুবসুরতী—যার থেকে আমাদের মহরমের হাসন হোসেন জিগির—স্লোগান—শব্দদ্বয় এসেছে। 'হিনা' শব্দ বাঙলায় হেনা। রবীন্দ্রনাথের গান আছে হেনা, হেনার মঞ্জরী। হেনা শব্দের অর্থ মেহদি। হাসনোহানার পাতা অনেকটা মেহদি-পাতার মত। তাহলে দাঁড়ালো এই—'হেনার সৌন্দর্য'। অর্থাৎ সুন্দরতম হেনা। অর্থাৎ হেনা par excellence। কিন্তু জিনিসটা তো আর 'হেনা' নয়।

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ লক্ষ্ণৌ-দিল্লি, আজমীর-বরদা সর্বত্রই এ ফুলটি ডাকা হয় রাতকী রানী নাম ধরে। গুজরাতে অবশ্য রাত-নী রানী ধরে। অর্থ, রাতের রানী। হুস্‌ন্-ই-হিনা সমাস এরা চেনেন না। দিল্লিতে আপনি হাসনোহানার আতর কিনতে পাবেন। কিন্তু চাইবার সময় বলতে হবে, রাতকী রানীর আতর। হাসনো-হানা বা হুস্‌ন্-ই-হিনা বললে চলবে না। খাস হেনার আতর আলাদা।

কাবুল কান্দাহার তব্রীজ তেহরানে এ ফুল নেই। ত্রিশ বছর পূর্বে ছিল না এ-কথা আমি বুক ঠুকে বলতে পারি। হেনা অর্থাৎ মেহদি পাতা অবশ্য আছে। এবং ইরানের কবিরা ভারতের মেহদির প্রচুর গুণ-গান গেয়েছেন। যথা—

পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা
ইরাণ দেশের ভূঁয়ে,
মেহদীর পাতা রুড়া লাল হয়
ভারতের ভুঁই ছুঁয়ে।
নীস্ত দর্ ঈরান্ জমীন্ সমান-ই
তহসীল-ই কামিল '

তা নিয়ামিদ্ সোঈ হিন্দোস্তান
হিনা রঙীন ন্ শুদ্।[১]

হাসনোহানা গাছ ইরান-তুরানে নেই কিন্তু শব্দটা তো অভিধানে থাকতে পারে—যেমন 'আকাশ কুসুম' কিংবা 'অশ্ব-ডিম্ব' ত্রিভুবনে নেই বটে (যদিও তার অনুসন্ধান চলে, যেমন পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শোপেনহাওয়ার দর্শনচর্চার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'অমাবস্যার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান') তবু অভিধানে শব্দগুলো পাওয়া যায়। হাতের কাছে রয়েছে স্টাইনগাস্ সাহেবের অত্যুৎকৃষ্ট—এমন কি সর্বোৎকৃষ্ট বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না —অভিধান। আর রয়েছে ক্যাথলিক পাদ্রী হাভা সাহেবের আরবী কোষ, বেইরুৎ থেকে প্রকাশিত। এই ফার্সী আরবী কোনো কোষেই হুস্ন্-ই-হিনা নেই। 'হুস্ন্' ও 'হিনা'র মাঝখানে যে 'ই' আছে এটি খাঁটি ফার্সী। কাজেই এই সমাসটি আরবী অভিধানে থাকার কথা নয়। তবু, যেহেতু আরবরা ইরান বিজয়ের পর বহু ফার্সী শব্দ আপন ভাষায় গ্রহণ করে, তাই ভাবলুম, হয়তো শব্দটা থাকতেও পারে। বিশেষ করে ফুলের মামেলা যখন রয়েছে। কারণ 'গুল্' ফার্সীতে 'ফুল'।

'আপ' (সংস্কৃত অপ্) ফার্সীতে 'জল'। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি গোলাপ ফুল। আসলে কিন্তু গোলাপ (গুলাপ) অর্থ রোজওয়াটার। আরবীতে 'গ' এবং 'প' ধ্বনি নেই বলে গোলাপ হয়ে গেল 'জুলাব'। গোলাপ-জল বিরেচক। তাই বাঙলাতে 'জোলাপ' 'গোলাপ' দুটি সমাসই প্রবেশ করেছে।

তা সে যাই হোক, আরবরা যখন 'গুল' নিয়েছে তখন হাসনোহানা নিতে আপত্তি কি ?

কিন্তু আরবী অভিধান নীরব। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় উর্দু অভিধানও শব্দটির উল্লেখ করে না। উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষীরা হাসানোহানাকে 'রাতকী রানী' বলেন বলুন, কিন্তু কোষকার কলকাতায় প্রচলিত হুস্ন্-ই-হিনা তাঁর অভিধানে দিলে ভালো করতেন।

---

[১] উর্দুতে হেনা নিয়ে অজস্র দোহা কবিতা আছে। হেনা বলছে-
পিস্ গয়ী তো পিস্ গয়ী,
ঘুঁ হো গয়া তো হো গয়া
নাম তো বর্গে হিনাকা
দুল্‌হিনোঁ মে হো গয়া

তাই আমার সমস্যা :—

(১) হয় শব্দটা জাপানী থেকে এসেছে।

(২) নয়, এটি কলকাতার উর্দুভাষীদের নিরবদ্য 'অবদান'।

পাঠক ভাববেন না আমি রাজশেখরের ভুল দেখাবার জন্য এ আলোচনা তুলেছি। রাজশেখর শত ভুল করলেও তাঁর অভিধান চলন্তিকা শতায়ু— সহস্রায়ু। চলন্তিকা চলে এবং চলবে।

আমার নিবেদন, বাঙলা দেশে এখন গোটা চারেক বিশ্ববিদ্যালয়। সেগুলোতে বাঙলা ভাষা পুরো সম্মান পাচ্ছে। বাঙলায় আরবী, ফার্সী, তুর্কী শব্দ নিয়ে পয়লানম্বরী গবেষণা হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে কোন পাঠক-পাঠিকা যদি বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন তবে বড় উপকৃত হই।[২]

'আমায় পিষে ফেললে তো ফেললে, আমি রক্তাক্ত হয়ে গেলুম তো গেলুম। কিন্তু কনেদের ভিতর তো মেহদি পাতার নাম রাষ্ট্র হল।' ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান কনেদের মেহদি দিয়ে হাত রাঙা করতে হয়। আরেক কবি বলেছেন, 'হেনার পাতার উপর হৃদয়-বেদনা লিখি ; হয়তো পাতাটি একদিন প্রিয়ার হাতে পৌছবে।'

২ 'হাসনোহানা' যখন "দেশে" বেরয় তখন এ বিষয়ে "দেশ" পত্রিকায় একাধিক পত্র 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বাড়ির লোক আমার লেখার কাটিং রাখে, আলোচনার রাখে না। যতদূর মনে পড়ছে, একাধিক লেখক আপ্রাণ চেষ্টা দেন, আমাকে বোঝাবার জন্য, 'হাসনো-হানা' ও 'হেনা' ভিন্ন। আমার রচনাটি একটু মন দিয়ে পড়লে আমি যে দুটোতে ঘুলিয়ে ফেলিনি সেটা পরিষ্কার হবে। 'হেনা—par excellance' এস্থলে ঐ দুটি ফরাসী শব্দ বোঝায় যে par excellence রূপে যে বস্তু ধারণ করে, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্র ও বর্ণের হতে পারে। একটি মহিলা সুদূর 'হৈদ্রাবাদ' থেকে 'হেনা' ও 'হাসনোহানা'র পাতা আলাদা করে, নিশ্চয়ই অনেকখানি কষ্ট স্বীকার করে, পাঠান। তাঁকে ধন্যবাদ। দুটি গাছই আমার বাগানে আছে॥··· অন্য একজন লেখেন, "সুনীতিবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, হাসনোহানা জাপানী শব্দ।" সুনীতিবাবু দৃঢ় না ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন সেটা গুরুত্বব্যঞ্জক নয়, গুরুত্ব ধরতো যদি পত্রলেখক সুনীতিবাবুর যুক্তিগুলোর উল্লেখ করতেন। কারণ আমার এক সহকর্মী হিন্দী ও উর্দু বাবদে তাঁর আপন কর্মক্ষেত্রে, সুনীতিবাবুরই মত যশস্বী

বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি

আজ যদি শুধুমাত্র সংস্কৃত পুস্তকপত্র থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে হয় তা হলে এ দেশে মুসলমান ধর্ম আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না সে নিয়ে বিলক্ষণ তর্কের অবকাশ থাকবে। অথচ আমরা ভালো করেই জানি, মুসলমান-আগমনের পরও প্রচুর সংস্কৃত পুস্তক লেখা হয়েছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা পাননি সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর জমিজমার উপর হস্তক্ষেপ না হওয়ার ফলে তাঁদের ঐতিহ্যগত বিদ্যাচর্চা বিশেষ মন্দীভূত হয়নি। কিন্তু এইসব পণ্ডিতগণ পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকেই আপন আপন লেখনী সঞ্চালনা করেছেন।[১] অল্লোপনিষদ্ জাতীয় দু-চারখানা পুস্তক নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত। বরঞ্চ এরা সত্যানুসন্ধানকারীকে পথভ্রষ্ট করে।

পণ্ডিত (নাম বলে কাউকে 'বুলি' করার কী দরকার।) দৃঢ়তর কণ্ঠে বলেন, সমাসটা ফার্সী—এদেশে নির্মিত।...তবে এস্থলে বিশ্বকোষের শ্রীযুত পূর্ণ মুখুয্যে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি লেখেন যে, যে সময়ে এদেশে হাসনোহানা ফুল বিদেশ থেকে আসে তখন জাপনীরা কলকাতার বাজারে 'হাসনোহানা' নাম দিয়ে একটি সুগন্ধি পদার্থ (সেণ্ট) ছাড়ে। তাঁর চিঠির ভাবার্থ এই ছিল। তাই আমার মনে হয়, সেই সেণ্টের নাম নিয়ে ঐ সময় আগত বিদেশী ফুলকে 'হাসনোহানা' নাম দেওয়া হয়। এটা অসম্ভব নয়। প্রাগুক্ত উর্দু পণ্ডিত সেটা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তিনি ছেলেবেলা থেকেই 'হুস্‌ন্-ই-হিনা' শুনেছেন। ঐ সেণ্ট কলকাতা আগমনের বহু পূর্ব থেকে।

১ টয়িনবি সাহেব যে রীতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্যাটার্নের অনুসন্ধান করেন বর্তমান লেখক সে নীতি অনুসরণে বিরত থাকবে। শুধু যেখানে প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে দিলে আলোচ্য বিষয়বস্তু স্পষ্টতর হবে সেখানেই এই নীতি মানা হবে। এস্থলে তাই শুধু উল্লেখ করি, যখনই কোন জাতি বৈদেশিক কোনো ভিন্নধর্মাবলম্বী দ্বারা পরাজিত হয় তখন নূতন রাজা এঁদের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কোনো প্রধানকর্মে আমন্ত্রণ জানান না বলে এঁদের এক মানসিক পরিবর্তন হয়। এঁদের চিন্তাধারা তখন মোটামুটি এই : 'আমাদের ধর্ম সত্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা ম্লেচ্ছ বা যবন কর্তৃক পরাজিত হলুম কেন? এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, আমরা আমাদের ধর্মের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারিনি। ধর্মের অর্থকরণে (ইণ্টারপ্রিটেশনে) নিশ্চয়ই

এ এক চরম পরম বিস্ময়ের বস্তু। দশম, একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমুদ বাদশার সভাপণ্ডিত আবু-র্-রইহান মুহম্মদ অলবীরূনী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রামাণিক পুস্তকে একাধিকবার সবিনয়ে বলেছেন, 'আমরা (অর্থাৎ আরবীতে) যাঁরা জ্ঞানচর্চা করি, দার্শনিক চিন্তা আমাদের মজ্জাগত নয়। দর্শন নির্মাণ করতে পারে একমাত্র গ্রীক ও ভারতীয়েরা।'

সেই ষড়দর্শননির্মাতা আর্য মনীষীগণের ঐতিহ্যগর্বিত পুত্রপৌত্রেরা মুসলমান-আগমনের পর সাত শত বৎসর ধরে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করলেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মাদ্রাসায় ঐ সাত শত বৎসর ধরে যে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে নিওপ্লাতনিজম তথা কিন্দী, ফারাবী, বূ আলীসিনা (লাতিনে আভিসেনা), অল-গজ্জালী[২] (লাতিনে অল-গাজেল), আবূ রুশ্‌দ্ (লাতিনে আভেরস) ইত্যাদি মনীষীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো সন্ধান পেলেন না। এবং মুসলমান মৌলানারাও কম গাফিলী করলেন না। যে মৌলানা অমুসলমান প্লাতো-আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় সোৎসাহে সানন্দে জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুষ্পাঠীতে কিসের চর্চা হচ্ছে। তিনিও জানতে পেলেন না যে, তিনি প্লাতোর আদর্শবাদ দৃঢ়ভূমিতে নির্মাণ করার জন্য যেসব যুক্তি আকাশ-পাতাল থেকে আহরণ করেছেন তাঁর পাশের চতুষ্পাঠীতেই হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্যের আদর্শবাদ সমর্থনার্থে সেইসব যুক্তিই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি 'গুলাত' নাস্তিকদের জড়বাদ যেভাবে খণ্ডন করছেন, ব্রাহ্মণও চার্বাকের নাস্তিকতা সেইভাবেই খণ্ডন করছেন। এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি যে চরক-সুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট বূ আলী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র—'য়ুনানী' নামে প্রচলিত (কারণ তার গোড়াপত্তন গ্রীক [আইওনিয়ান = য়ুনানী] চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর)—আপন মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন, সুলতান বাদশার চিকিৎসার্থে প্রয়োগ করছেন, সেই চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ানো হচ্ছে। সিনা উল্লিখিত যে-ভেষজ কি, তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কিংবা সিনা বলেছেন, ফলানা ওষধিবনস্পতি এ দেশে (অর্থাৎ

আমাদের ভুল রয়ে গিয়েছে। আমরা তা হলে নূতন করে ব্যাখ্যা করে দেখি, ত্রুটি কোন্ স্থলে হয়েছে।' ফলে পরাজয়ের পরবর্তী যুগে তাবৎ সৃষ্টিশক্তি টীকাটিপ্পনী রচনায় ব্যয় হয়।

২ ইসলামের অন্যতম প্রখ্যাত পথপ্রদর্শক বা ইমাম। ইনি দার্শনিক—কিয়ৎকালের জন্য নাস্তিক—এবং পরিণত-বয়সে সুফী (মিস্টিক, ভক্তিমার্গ ও

আরবে) জন্মে না, সেগুলো যে তাঁর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড়ে গজাচ্ছে তারও সন্ধান তিনি পেলেন না। কিঞ্চিৎ কল্পনাবিলাস করলে, এ পরিস্থিতিও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে মৌলানার বেগমসায়েবা সিনা-উল্লিখিত কোন শাক তাঁকে পাক করে খাওয়ালেন, আর তিনি সেটি চিনতেই পারলেন না।

পক্ষান্তরে ভারতীয় আয়ুর্বেদ মুসলমানদের ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই দুস্তর মরুভূমির মাঝখানে মাত্র একটি লোক দেখতে পাই। আওরঙ্গজেবের অগ্রজ যুবরাজ মুহম্মদ দারাশীকূহ্। ইনিই সর্বপ্রথম দুই ধর্মের সমন্বয় সম্বন্ধে বহুতর পুস্তক লেখেন। তার অন্যতম মজমা'-উল্-বহরেন, অর্থাৎ দ্বিসিন্ধু-সঙ্গম। দারাশীকূহ্ বহু বৎসর অনাদৃত থাকার পর তাঁর সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা বিশ্বভারতীতেই হয়। শ্রীযুত বিক্রমজিৎ হস্‌রৎ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'দারাশীকূহ্ : লাইফ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস' নামক একখানি অত্যুত্তম গ্রন্থ লেখেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক সেটি প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনমত আমরা এই পুস্তকখানি সদ্ব্যবহার করব।

আরও তিন শত বৎসর পর প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ফার্সীতে রচনা করেন তাঁর সর্বপ্রথম পুস্তক, 'তুহ্ফাতু অল্-মুওয়াহ্‌হিদীন' : 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎসর্গ'। রাজা খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন বলে তাঁর পুস্তককে 'ত্রিরত্ন'ধারী বা ত্রিপিটক বললে অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা সামান্যতম অনুসন্ধান করেছেন তাঁরাই জানেন রাজার শিক্ষাদীক্ষা ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নিকট কতখানি ঋণী এবং পরবর্তী জীবনে যদিও তিনি উপনিষদের উপর তাঁর ধর্মসংস্কারসৌধের দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তবু শেষদিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কণামাত্র হ্রাস পায়নি। প্রয়োজনমত আমরা তাঁর রচনাবলীরও সদ্ব্যবহার করব।

প্রায় ছ'শ বৎসর ধরে এ দেশে ফার্সীচর্চা হল। হিন্দুরা না হয় বিদেশাগত

যোগের সমন্বয়কারী) হয়ে যান। এঁর জনপ্রিয় পুস্তক 'কিমিয়া সাদৎ' এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলায় অনূদিত হয়ে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই পুস্তকের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং আমাদের মন্দিরের উপাসনায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। বিধুশেখর অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ 'টোলো পণ্ডিত' ছিলেন। স্মরণ রাখবার সুবিধার জন্য উল্লেখযোগ্য—গজ্জালীর মৃত্যু ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে।

ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল না দেখাতে পারেন, কিন্তু যাদের রাজ্যচালনা করতে হয়েছে তাদের বাধ্য হয়ে এ দেশের ভাষা রীতিনীতি অল্পবিস্তর শিখতে হয়েছে। উত্তম সরকারী কর্ম পাবার জন্য বহু হিন্দুও ফার্সী শিখেছিলেন। মাত্র একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবেঃ এ দেশে বহু হিন্দুর পদবী মুনশী। আমরা বাঙলায় বলি, লোকটির ভাষায় মুন্সিয়ানা বা মুন্‌শীয়ানা আছে, অর্থাৎ সে নাগরিক বিদগ্ধ চতুর (স্কিলফুল) ভাষা লেখে। এর থেকেই বোঝা যায়, কতখানি ফার্সী জানা থাকলে তবে মানুষ বিদেশী ভাষায় এ রকম একটা উপাধি পায়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারেঃ আমরা প্রচুর ইংরিজি চর্চা করেছি, কিন্তু ইংরেজ মুন্‌শী-জাতীয় কোনো উপাধি আমাদের কাউকে দেয়নি—বরঞ্চ আমাদের 'ব্যাবু-ইংলিশ' নিয়ে ব্যঙ্গই করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা পরে হবে, উপস্থিত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মুন্‌শী-শ্রেণীর যাঁরা উত্তম ফার্সী শিখেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কায়স্থ, সংস্কৃতের পটভূমি তাঁদের ছিল না, কাজেই উভয় ধর্মশাস্ত্রের সম্মেলনে করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু এঁরা ফার্সী শিখেছিলেন অর্থোপার্জনের জন্য—জ্ঞানান্বেষণে নয়। তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে, আমরা প্রায় দুই শত বৎসর ইংরিজি বিদ্যাভ্যাস করেছি বটে, তথাপি খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন অতি অল্পই অনুভব করেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন থেকে সশিষ্য বাঙলা দেশে আসার সময় পথিমধ্যে এক মোল্লার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই মোল্লা নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ভ্রান্ত ধর্মপথে চালনা করছেন কেন? শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তখন মুসলমান শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ভ্রান্ত ধর্মপ্রচার করছেন না। মুসলমান ধর্মে বলা হয়, যে লোক আর্তের সেবা করে, মিথ্যাচরণ বর্জন করে সৎপথে চলে—অর্থাৎ কুরান-শরীফ-বর্ণিত নীতিপথে চলে—তাকে 'পয়গম্বরহীন' মুসলমান বলা যেতে পারে, হজরৎ মুহম্মদকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করেনি বলেই সে ধর্মহীন নয়। (আমরা এস্থলে 'কাফির' না বলে 'ধর্মহীন' শব্দ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করছি, পরে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হবে)। অতএব অনুমান করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় যে, বোধ হয় চৈতন্যদেব ঐ মতবাদেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তদুপরি চৈতন্যদেবের মত উদার প্রকৃতিবান ব্যক্তির পক্ষে হজরৎ মুহম্মদকে অন্যতম মহাপুরুষ বা পয়গম্বররূপেও স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। বস্তুত সে যুগে, এবং এ যুগেও বহু হিন্দু সজ্জন মহাপুরুষ মুহম্মদকে আল্লার প্রেরিত পুরুষরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা, কাজী-কর্তৃক সংকীর্তন বন্ধ করা নিয়ে। কথিত আছে, সেবারেও তিনি যুক্তিতর্কে কাজীকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্বের অনুমান এস্থলেও প্রযোজ্য।

কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার।

তবুও এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

এ যাবৎ আমাদের মূল বক্তব্য ছিল, মুসলমান যে জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মঙ্গোল-জর্জরিত ইরান-তুরান থেকে যে সব সহস্র সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মজ্ঞ দার্শনিক এ দেশে এসে মোগল রাজসভায় আপন আপন কবিত্ব পাণ্ডিত্য নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, দার্শনিকরা কণামাত্র লাভবান হননি। এবং বিদেশাগত পণ্ডিত দার্শনিক এ দেশে এসেছিলেন একমাত্র অর্থলাভের উদ্দেশ্যে—কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর এঁদের অধিকাশ তাঁদের চরম নিমক-হারামীর পরিচয় দিয়েছেন পঞ্চমুখে এ দেশের নিন্দাবাদ করে। নিন্দা করেছেন মুসলমান রাজা এবং আমীর-ওম্‌রাহেরই—হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।

ফার্সী সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাউন উপরে উল্লিখিত যুগকে ফার্সী সাহিত্যের 'ইণ্ডিয়ান সামার' 'পুনরুচ্ছলিত যৌবন' নাম দিয়েছেন। বস্তুত বর্বর মঙ্গোল অভিযানের ফলস্বরূপ ফার্সী সাহিত্যের যে অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল সে তখন অন্নজল পায় মোগল-দরবারে। ইরান আজকের দিনে ভারতের কাছে কতখানি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না, কিন্তু ভারতবর্ষে ফার্সী সাহিত্যের এই যুগ নিয়ে অতি অল্প আলোচনাই হয়েছে, তাও উর্দুতে, বাঙলাতে কিছুই হয়নি।

এ তো প্রধানত সাহিত্য ও অন্যান্য বাঙ্ময়ের কথা, কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বলে মনে হয় এই দেখে যে, ভুবন-বিখ্যাত ষড়দর্শনের দেশের লোক মুসলমান মারফতে প্লাতো-আরিস্তুতল, সিনা-রুশ্‌দ্‌ নিয়ে সপ্তম দর্শন নির্মাণ করল না। কল্পনা করতে এক অদ্ভুত অনুভূতির সঞ্চার হয়—ভারতবর্ষ তা হলে দর্শনের ক্ষেত্রে কত না দিক্‌চক্রবাল উত্তীর্ণ হয়ে যেত—দেকার্ত কাঁণ্টের অগ্রগামী পথপ্রদর্শক এ-দেশেই জন্মাতেন!

পক্ষান্তরে মুসলমান যে-আরবী দর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে পড়ে রইলেন। মঙ্গোল কর্তৃক বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পর, এবং স্পেন থেকে মুররা বিতাড়িত হওয়ার ফলে আরব-জগতে দর্শনের অপমৃত্যু ঘটে। এ দেশের মুসলমান দার্শনিককে অনুপ্রাণিত করার জন্য বাইরের সর্ব উৎস সম্পূর্ণ শুষ্ক হল। হায়, এঁরা যদি পাকে-চক্রে কোনোগতিকে ষড়দর্শনের সন্ধান পেতেন!

এ তো কিছু অসম্ভব কল্পনা-বিলাস নয়। আজকের দিনের হিন্দু দার্শনিক এক দিকে নব্যন্যায় চর্চা করেন, অন্য দিকে দেকার্ত অধ্যয়ন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁদের পথ-প্রদর্শক। কবি ইক্‌বালের ঐতিহ্যভূমি আভেরস-আভেচেন্নার উপর—তাঁর সৌধনির্মাণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন কাণ্ট-হেগেলের।

আমরা এতক্ষণ যে অবস্থার বর্ণনা করলেম তার থেকে আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত নয় যে, ভারতবর্ষে তা হলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয়নি। যেহেতু ব্রাহ্মণের দেবোত্তর বাদশা কেড়ে নেননি তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে আপন শাস্ত্র চর্চা করে যেতে লাগলেন, এবং যেহেতু আলিম-ফাজিলরা ওয়াকৃফ্-সম্পত্তি পেয়ে গেলেন তাই তাঁরাও পরমানন্দে তাঁদের মক্তব-মাদ্রাসায় কোরান-হদীসের চর্চা করে যেতে লাগলেন। একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না।

কিন্তু দেশের সকলের তো লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ওয়াকৃফ্-সম্পত্তি নেই। চাষা তিলী জোলা কাঁসারী মাঝি চিত্রকর কলাবৎ বৈদ্য কারকুন এবং অন্যান্য শত শত ধান্দার লোককে অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ করতে হয়। সে স্থলে হিন্দু মুসলমানকে বর্জন করে চলতে পারে না, মুসলমানকেও হিন্দুর সংস্পর্শে আসতে হয়। তদুপরি উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা সংগীত স্থাপত্য বাদশা ও তাঁর অর্থশালী আমীর-ওমরাহের সাহায্য বিনা হয় না। বাদশারও দরকার হিন্দু রাজ-কর্মচারীর। কোনো দেশ জয় করা এক কর্ম, সে দেশ শাসন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া। বাদশা ইরান-তুরান থেকে দিগ্বিজয় করার সময় রাজকর্মচারী সঙ্গে আনেননি। আর আনবেনই বা কি? তারা এ-দেশের ভাষা জানে না, রাজস্বব্যবস্থা বোঝে না, কোন্ দণ্ডনীতি কঠোর আর কোন্‌টাই বা অতি সদয় বলে দেশের লোকের মনে হবে—এ সম্বন্ধে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বখ্‌শী (চীফ পে-মাস্টার, অ্যাকাউণ্টেন্‌ট্-কম্-অডিটার জেনারেল), কানুনগো (লিগেল রিমেমব্রেন্‌সার), সরকার (চীফ সেক্রেটারি), মুন্‌শী (হুজুরের ফরমান

লিখনেওলা, নূতন আইন নির্মাণের খসড়া প্রস্তুতকারী), ওয়াকে'-নওয়ীস্ (যার থেকে Waqnis), পর্চা-নওয়ীস্ (রাজকর্মচারীর আচরণ তথা দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করনেওলা) এসব গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করবে কারা ?

আমরা জানি, কায়স্থরা স্মরণাতীত কাল থেকে এসব কাজ করে আসছেন। এঁরাই এগিয়ে এলেন। মুসলমানপ্রাধান্য প্রায় দু-শ বৎসর হল লোপ পেয়েছে, কিন্তু আজও এসব পদবী—প্রধানতঃ কায়স্থদের ভিতর—সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, উর্দু ভাষা এবং অন্যান্য বহু জিনিস যে হিন্দু-মুসলমানের অনিবার্য মেলামেশার ফলে হয়েছিল সে কথা সকলেই জানেন।

শুধু ভাস্কর্য ও নাট্যকলা বাদশা-আমীর-ওমরার কোনো সাহায্য পায়নি। তার কারণ, ইসলামে মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ এবং নাট্যকলা ভারতের বাইরে মুসলিম জগতে সম্পূর্ণ অজানা।

হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। কাজেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য নেই। মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবী কেউ করেন না। হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানকে বলেন, 'তুমি দূরে থাকো'। মুসলমান মৌলবী হিন্দুকে বলেন, 'এসো, তুমি মুসলমান হবে'। তৃতীয় পন্থাও যে থাকতে পারে সেটা কারো মনে উদয় হয় না। হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে অথচ উভয়ের মধ্যে মিলন হবে, হৃদ্যতা হবে।

এ পন্থার চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তাদের প্রয়োজন। তাই এলেন ধর্মের জগতে জননেতা, জনাবতার কবীর দাদূ নানক ইত্যাদি। পরম শ্লাঘার বিষয়, শান্তিনিকেতনেই এঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এত দিন ধরে ভারতের হিন্দু-মুসলমান গুণী-জ্ঞানীরা যেসব মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেই সে-সময়ের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেনশাস্ত্রী তাঁদের নিয়ে সমস্ত জীবন ব্যয়িত করেন। তাঁর 'দাদূ' 'কবীরে'র পরিচয় এস্থলে নূতন করে দেবার প্রয়োজন নেই।

সে পুণ্যকর্ম এখনো বিশ্বভারতীতে পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধ বয়সের সহকর্মী বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত রামপূজন তিওয়ারীর 'সুফীমত-সাধনা ঔর সাহিত্য' সুচিন্তিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ পুস্তক হিন্দী সাহিত্য তথা মধ্যযুগীয়

লোকায়ত ধর্ম-চর্চার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরল ভাষায় লিখিত এ ধরনের গ্রন্থ সর্ব ভাষায়ই বিরল।

কিন্তু চিন্তাজগতে—দর্শন-ধর্মশাস্ত্র-জ্ঞানবিজ্ঞানে—হিন্দু-মুসলমানের মিলনভাব অথচ অনুভূতির ক্ষেত্রে—চারুকলা সঙ্গীত লোকসাহিত্যে গণধর্মে—আশাতীত মিলন। এ বিষয়ে অধ্যয়ন এবং চর্চা করতে হলে উভয় জনসমাজের মূলধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার গোড়া থেকে অধ্যয়ন করতে হয়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রায় কিছুই নেই। যা-কিছু আছে তা সরল ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং স্বধর্মবিশ্বাসীর হৃদয়-মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য—বিধর্মীর সম্মুখে আপন ধর্ম যুক্তিবিচারের উপর নির্মাণ করে তাকে আকর্ষণ করার কোনো প্রচেষ্টা তাতে নেই, আপন ধর্মের স্বতঃসিদ্ধ নীতিও যে বিধর্মীর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হতে পারে সে দুশ্চিন্তাও এ-সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করেনি। উপরন্তু ইংরেজ-আগমনের পর এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজির মারফতে পেলেন ইসলামের এক বিকট বিকৃত রূপ। সরল হিন্দু জানত না, খ্রীষ্টান এবং মুসলিমে স্বার্থসংঘাত লেগে যায় মহাপুরুষের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই, শত শত বৎসর ক্রুসেডের নামে একে অন্যের মরণালিঙ্গনে তারা সম্পিষ্ট ; ফলে খ্রীষ্টান কর্তৃক ইসলাম ও হজরৎ মুহম্মদের বিরুদ্ধে অকথ্য কটুবাক্য এ দেশে এসেছে 'নিরপেক্ষ গবেষণা'র ছদ্মবেশ ধরে। সাধারণ সরল হিন্দু এ ছদ্মবেশ বুঝতে পারেনি। (এস্থলে বলে রাখা ভালো, মুসলমান কিন্তু খ্রীষ্টানকে প্রাণভরে 'জাত তুলে' গালাগাল দিতে পারেনি, কারণ কুরান-শরীফ যীশুখ্রীষ্টকে অন্যান্য মহাপুরুষদের একজন বলে যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি মুহম্মদের পূর্বে সর্বপ্রধান পয়গম্বর বলে তাঁকে বিশেষ করে 'রূহল্লা' 'আল্লার আত্মা' 'পরমাত্মার খণ্ডাত্মা' উপাধি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান যুগ যুগ ধরে হজরৎ মুহম্মদকে 'ফল্‌স্ প্রফেট' 'শার্লট্যান' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেও 'ঐতিহাসিক' ওয়েল্‌স্ তাঁর 'বিশ্ব-ইতিহাসে' মুহম্মদ যে ঐশী অনুপ্রেরণার সময় স্বেদসিক্ত বেপথুমান হতেন তাকে মৃগীরুগীর লক্ষণ বলে মহাপুরুষকে উভয়ার্থে লাঞ্ছিত করেছেন)।

রামমোহন রামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সর্বদেশেই বিরল। এ দেশে তো অবশ্যই।

ইতিমধ্যে আর-একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

এতদিন যে হিন্দু পণ্ডিত দার্শনিক মুসলমানের-ধর্ম আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে

কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি তাতে হয়তো তাঁদের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি, কিন্তু স্বরাজলাভের পর তাঁদের সে দৃষ্টিবিন্দু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্থান ইরান ইরাক সিরিয়া সউদী-আরব ইয়েমেন মিশর তুনিস আলজীরিয়া মরক্কো তথা মুসলমানপ্রধান ইন্দোনেশিয়া ও নবজাগ্রত মুসলিম অধ্যুষিত আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা স্থাপনা করতে হবে। মুসলিমপ্রধান পাকিস্তানও এ ফিরিস্তির অন্তর্ভুক্ত। এদের ধর্ম, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বাতাবরণ-পার্থক্যে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-পরিবর্তন—এসব এখন অল্পবিস্তর অধ্যয়ন না করে গত্যন্তর নেই। সত্য, আমাদের ইস্কুল-কলেজে এখনো আরবী-ফার্সীর চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি, কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াটা সমীচীন হবে না। কিছু কিছু হিন্দুদেরও আরবী-ফার্সী শিখতে হবে। এবং এই সাত শ বৎসরের প্রাচীন আরবী-ফার্সীর শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যতই প্রয়োজনীয় হোক, এস্থানে কিঞ্চিৎ অবান্তর।

আমরা যে মূল উৎসের সন্ধানে বেরুচ্ছি তার জন্য আজ আর প্রাচীন মানচিত্র কাজে লাগবে না। ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ অথবা সন্দেহে সন্দেহে কণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন কোনো পদ্ধতির অনুসরণ করলে আজ আর চলে না। ধর্মকেও আজ রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতির কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করতে হয়।

কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনের সঙ্গে থাকবে সহানুভূতিশীল হৃদয়॥

পরিচিতি

কিছুদিন পর পরই নূতন করে আলোচনা হয়—এখনো লোকে মপাসাঁ পড়ে কিনা, পড়লে কারা পড়ে? ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ? ফ্রান্সের লোকের কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। তারা অল্পবিস্তর সব সময়ই পড়বে। উপস্থিত শুনতে পাই, মার্কিন দেশেই নাকি তাঁর সব চেয়ে বেশী কদর। যাঁরা এসব আলোচনা করেন তাঁরা প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যগুলোর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন বলে সেগুলোকে হিসেবেই নেন না। আমার জানামতে আরব দেশে এখনো তাঁর প্রচুর সম্মান; তার অন্যতম কারণ আরবী প্রচলিত মিশর থেকে বাইরুৎ-দামাস্কস পর্যন্ত ফরাসীর প্রচলন ইংরিজির তুলনায় বেশী। অধুনা মার্কিন ভাষা ঐসব দেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু তাতে মপাসাঁর কোনো ক্ষতি হবে না; কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, মার্কিনজাত মপাসাঁ-ভক্ত।

তা সে যা-ই হোক, ফ্রান্সের বাইরে কিন্তু তাঁর রচনা (essays) নিয়ে কখনো কোনো আলোচনা হতে দেখিনি। এ যেন অনেকটা কনান ডয়েলের মত। তাঁর শার্লক হোম্‌স নিয়ে সবাই এমনই মুগ্ধ যে তাঁর অন্যান্য লেখার দিকে কেউই বড় একটা নজর দেন না। শার্লক হোম্‌সে এমনই ঝাল যে তার পর বাকি তাবৎ রান্না অতিশয় সুনিপুণ হলেও ফিকে বলে মনে হয়।

আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে মপাসাঁর প্রবন্ধ তাঁর ছোট গল্পকে হার মানায়। বস্তুত তাঁর সর্বোত্তম উপন্যাসদ্বয়ই—'য়্যুন্ ভী' এবং 'বেল্ আমি'[১]—তাঁর ছোট গল্পকে হার মানাতে পারেনি।

তাঁর নাট্য ও কবিতাও নিম্নাঙ্গের। পক্ষান্তরে চেখফ্ ছোট গল্প এবং নাটক, উভয়েই অদ্বিতীয়।

আমার নিজের মনে হয়, মপাসাঁর প্রবন্ধগুলি অত্যুত্তম। তাঁর গুরু ফ্লোবের ও গুরুসম—ফ্লোবেরের অন্তরঙ্গ বন্ধু—তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে তিনি যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি অতুলনীয়। মপাসাঁর ছোট গল্প বা উপন্যাসে পাঠক পাবেন দেহ ও যৌন ক্ষুধার ছড়াছড়ি কিন্তু সত্যকার প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা, কিংবা সে-শ্রদ্ধার প্রতি সহানুভূতি, অথবা স্নেহের প্রতি অনুরাগ, মানুষের এসব তাবৎ মহামূল্যবান বৈভবের প্রতি মপাসাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। তিনি যা চান তাই ফুটিয়ে তুলতে পারেন বলে যখন এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তখন সেগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁর যাদুকাঠির পরশ দিয়েই কিন্তু তখন তাঁর উদ্দেশ্য অন্য, ঐ সব বৈভবকে সম্মান দেখানো নয়, ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেন প্যাডিং রূপে। অথচ আমরা জানি মপাসাঁ তাঁর মাকে ভালোবাসতেন গভীর রূপে—বস্তুত এরকম মাতৃভক্ত পুত্র সর্বকালেই সর্বদেশেই বিরল—যে-লোক প্রতিদিন ভালো-মন্দ-মাঝারি, ডাচেস থেকে স্বৈরিণী পর্যন্ত বিচরণ করে, আপন ফুর্তির জন্য কাঁড়া কাঁড়া টাকা ছড়ায়, হেন দুষ্কর্ম নেই যা তার অজানা এবং যার জন্য সে পয়সা খর্চা করতে রাজী নয়—সেই লোক ঠিক নিয়মিত মাকে মোটা টাকা পাঠায়, নিয়মিত মধুর চিঠি লেখে, পাছে মা টের পেয়ে যান তাই অতিশয় অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রাচীন

---

১ অনেকেরই বিশ্বাস, যেহেতু মপাসাঁ মেয়েদের 'ইটার্নেল হার্লট' বলেছেন তাই পুরুষদের তিনি খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। বস্তুত 'বেল্ আমি' পড়ার পর পুরুষকুলকেও 'ইটার্নেল জিগলো' (পুং বেশ্যা) বলা যেতে পারে। তবে যৌনক্ষুধাতুর মপাসাঁ স্বভাবতই মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বেশী এবং তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন বেশী।

প্রথামত নববর্ষের পরব রাখতে গাঁয়ে মায়ের বাড়িতে যায় (তার পাঁচ দিন পরই তাঁর মাথার ব্যামো—সিফিলিসজনিত উন্মাদরোগ—তাঁকে এমনি বিভ্রান্ত করে যে তিনি ছুরি দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা দেন ; অনুগত ভৃত্য ফ্রাঁসোয়া পিস্তলের গুলি আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় সরিয়ে রেখেছিল), সে যে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্মান দিত না, এ তো হতেই পারে না।

শুধু তাই নয়, সেই শ্রদ্ধার 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন ফ্লোবের ও তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লিখিত মপাসাঁর প্রবন্ধে।

তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে লেখা তাঁর প্রবন্ধটি অন্য দেশ কতখানি সম্মান দেয়, আমার জানা নেই। তবে রুশ দেশ তার চরম সম্মান দেয় ও দিয়েছে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গেনিয়েফের মৃত্যুর পঁচাত্তর বৎসর পূর্ণ হলে সারা রুশদেশব্যাপী তাঁকে স্মরণ করা হয়। সেই উপলক্ষে তুর্গেনিয়েফের ভাইয়ের মেয়ে (কিংবা আপন জারজ, পরে আইনসম্মত কন্যা) দেশবাসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ আরম্ভ করেন তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে মপাসাঁর প্রশংসাকীর্তন নিয়ে। তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধে রুশ দেশ এবং রুশ দেশের বাইরে বিস্তর প্রবন্ধ বের হয়েছে (এবং আশ্চর্য, মপাসাঁ যখন তাঁর খ্যাতির চরমে, যখন তাঁর ছোট গল্প ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তখন তিনি খাতির পাননি এক রুশ দেশে, যদিও রুশ দেশ সব সময়ই ফ্রান্স-পাগল, কারণ রুশে তখন তলস্তয়, তুর্গেনিয়েফ, লেস্কফ[২], দস্তয়েফ্স্কি, চেখফ্ কেউ বা তাঁর বিজয়শঙ্খ বাজাচ্ছেন বিপুল বিক্রমে, কারো বাণী দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কারো বা মধুর কণ্ঠের প্রথম কাকলি দেশের সর্বত্র নবীন চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে—মপাসাঁকে লক্ষ্য করবার ফুর্সৎ তাদের নেই) কিন্তু ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের প্রতিভূ স্মরণ করলেন মপাসাঁকে—সেই মপাসাঁ যাঁর প্রবন্ধ পৃথিবীর সর্বত্র অপরিচিত।[৩]

তাই বলছিলুম, মপাসাঁর 'নির্লজ্জ' উচ্ছ্বাস পাঠক পাবেন এ-দুটি প্রবন্ধে এবং

২ লেস্কফের একটি দীর্ঘ গল্প আমি অনুবাদ করেছি, বিশ্বসাহিত্যে এ গল্পটি অতুলনীয় ব'লে—যদিও আমি পাঁচটা বাবদের ন্যায় এটাতেও অক্ষম। একাধিক গুণীকে অনুরোধ করার পরও তাঁরা যখন সেটি অবহেলা করলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই করতে হল। 'প্রেম' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

৩ মপাসাঁর এই প্রবন্ধটি আমি অনুবাদ করি একই সময়ে—পঁচাত্তর বৎসরের পরব উপলক্ষে।

তাঁর অন্যান্য রচনায়। মানুষ মপাসাঁকে চেনবার ঐ একমাত্র উপায়। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা মপাসাঁ বন্ধুদের সঙ্গে তো করতেনই না, লেখাতে যা করেছেন তাও পঞ্চাশ লাইনের বেশী হয় কি না হয়।

আর আছে তাঁর চিঠি। কিন্তু সেগুলোতে তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর ব্যথা, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নিরব। তার কারণ গুরু ফ্লোবের কর্তৃক জর্জ সান্‌ড্‌কে লেখা তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠি যখন ছাপাতে প্রকাশিত হয়, তখন ফ্রান্সের মত দেশেও তাই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে। মপাসাঁ তখনই সাবধান হয়ে যান। পারলে মপাসাঁ ফ্লোবেরের চিঠিগুলো প্রকাশিত হতে দিতেন না। শেষটায় যখন দেখলেন প্রকাশ হবেই হবে তখন মপাসাঁ সে সংকলনের ভূমিকা লিখতে রাজী হন। তিনি আশা করেছিলেন গুরুর পদতলে তাঁর শ্রদ্ধা অর্ঘ্য নিবেদন দেশের পাঁচজনকে বুঝিয়ে দেবে, ফ্লোবেরকে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে দেখে তাঁর সত্য মূল্য দিতে হয়।

তবুও মপাসাঁর চিঠিগুলো যে অমূল্য, তুলনাহীন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমার জানা মতে তাঁর সর্বশেষ চিঠি তাঁর ডাক্তারকে লেখা—এইটি সর্বশেষ না হলেও এটিতে পাঠক পাবেন 'রাজহংসের মরণগীতি'।

তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার আঁরি কাজালি (জঁালাওর)-কে লিখিত,

"কান, ইজের কুটির।

আমি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। তারও বেশী। আমি এখন মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণায়। নাকের ভিতর নোনা জল ঢেলে সেটা ধুয়েছিলুম বলে তারই ফলে আমার মগজ নরম হয়ে গিয়েছে। সেই নুন মাথার ভিতর গাঁজিয়ে ওঠায় (ফের্মাতাসিয়োঁ—ফার্মেনটেশন্) সমস্ত রাত ধরে আমার মগজ গলে গিয়ে চ্যাটচেটে পেস্টের মত নাক আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ হচ্ছে আসন্ন মৃত্যু, আর আমি উন্মাদ।[৪] আমি প্রলাপ বকছি। শেষ-বিদায় বন্ধু, বিদায়! তুমি আমাকে আবার দেখতে পাবে না......"[৫]

আমি ডাক্তার নই, তাই বলতে পারবো না, মানুষের জীবিতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরও তার নাক কান দিয়ে মগজ গলে বেরয় কি না, নুনের ফার্মেণ্টেশন হয় কিনা তাও জানি নে। স্পষ্টতঃ এ চিঠি উন্মাদের প্রলাপ। কিন্তু প্রশ্ন, উন্মাদ কি-স্বীকার করে সে প্রলাপ বকছে?

৪-৫ এই দুটি ছত্র ক্যাপিটাল অক্ষরে।

* * * *

ফরাসী ভাষায় মপাসাঁর দু'খানি অত্যুত্তম রচনা ও পত্রসংগ্রহ আছে। ইংরিজিতে এগুলোর অনুবাদ হয়েছে কি না জানি নে।

(১) CHRONIQUES, ETUDES. CORRESPONDANCE
DE GUY DE MAUPASSANT
Recueillies Prefacees et Annotees par
RENE DUMESNIL
avec la collaboration de Jean Loize
et publiees pour la premiere fois avec nombreux
DOCUMENTS INEDITS
LIBRAIRIE GRUEND, 60, RUE MAZARINE, 60,
PARIS, VI, 1938

(২) CORRESPONDANCE INEDITE
DE
GUY DE MAUPASSANT
Recueiliie et presentee
ARTINE ARTINIAN
avec la collaboration d'
EDOURAD MAYNIAL
Editions Dominique Wapler,
6, Rue de Londres,
Paris, 1951

বছর কুড়ি পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা নানা দেশের চুয়াত্তর জন খ্যাতনামা লেখককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ কোন্ লেখক তাঁদের সৃষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। উত্তরে মপাসাঁ—জর্মন কবি হাইনে, এবং হোমার হুইট্‌মানের সমান সম্মান পান এবং ইব্‌সেন ও স্তাঁদালের চেয়ে বেশী।

এদেশেও মপাসাঁ নিয়ে কৌতূহল আছে।

কয়েকদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অধুনা লিখিত সাহিত্যিকদের জীবনী সম্বলিত সাহিত্যালোচনার একখানা অত্যুত্তম পুস্তক আমার হাতে এসে পৌঁছল। 'সোনার আল্পনা' (এভারেস্ট বুক হাউস, ১৯৬০)।

বইখানিতে অন্যান্য মনোরম প্রবন্ধের ভিতর গী দ্য মপাসাঁ ও ইভান

তুর্গেনিয়েফ সম্বন্ধেও দুটি রচনা রয়েছে।

আজকাল এদেশে অনেকেই ফরাসী শিখছেন। উপরের দুখানা মূল গ্রন্থ ও বাঙলা বইখানা নিয়ে আলোচনা হলে বাঙলা সাহিত্য উপকৃত হবে।

হতভাগ্য কাছাড়

প্রশ্ন উঠতে পারে, কাছাড়ের ভাষা আন্দোলন যখন তার চরমে তখন সম্পূর্ণ নীরব থেকে আজ এতদিন পরে সেই পুরোনো কাহিনী নিয়ে পড়ি কেন? কাছাড়ীতেও আছে,

স্বামী মরলো সন্ধ্যা রাত!
কেঁদে উঠলো দুপুর রাত!!

(খাস কাছাড়ীতে লিখলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে 'সংস্কৃত' করা হল।)

আসলে তখন ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রেষারেষি তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়েছে, এমন কি কোনো কোনো স্থলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে—অথচ কাছাড়ে কস্মিনকালেও কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী (তাদের ভিতরেও হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে), নাগা, লুসাই এবং আরো কত যে জাত-বেজাত কাছাড়ে সখ্যভাবে বসবাস করে সে সম্প্রীতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

তখন আমার জানা ছিল, এ আন্দোলন বেশীদিন চলবে না, একটা রফারফি হয়ে যাবেই, এবং তারপর কাছাড়বাসীরা ভাষার কথা বেবাক ভুলে গিয়ে আবার সুখ-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে। পারি যদি তখন তাকে জাগাবার চেষ্টা করবো। সর্বত্রই দেখেছি, পাকা বুনিয়াদ গঠনের কাজ আরম্ভ হয় তখনই।

*　　　*　　　*

কাছাড়ের উত্তর, পুব, দক্ষিণে পাহাড়। তার বেরবার পথ মাত্র পশ্চিম দিকে—পুব পাকিস্তানের সিলেটের ভিতর দিয়ে। সে পথ আজ বন্ধ। হিল্ সেকশন নামক যে রেলপথটি কাছাড়কে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেটি নির্মিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা চট্টগ্রাম বন্দর তথা চাঁদপুর হয়ে কলিকাতার বন্দরে পাঠাবার জন্য। ওটা কখনো কাছাড়ীদের বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি।

এর পূর্বে বলে রাখা ভালো, কাছাড় ঐতিহ্যহীন দেশ নয়। সিলেট-কাছাড়ের

ঐতিহ্য এক সঙ্গে জড়িত ছিল বলে এতদিন ধরে সবাই 'সিলেট সিলেট' করেছে এবং কাছাড় তারই তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কাছাড়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে আর্য-সভ্যতার শেষ পূর্বভূমি। এবং বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেষ পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশ। এর পরই মণিপুর—এঁরা বৈষ্ণব হলেও এঁদের রক্ত এবং ভাষা ভিন্ন। তারপর বর্মা। এবং আর্যসভ্যতা বাদ দিয়েও কাছাড়ের প্রাচীন আদিবাসীরাও আপন সভ্যতা নির্মাণ করে গিয়েছেন—তার নিদর্শন আজও কাছাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। কাছাড়ের রাজারা দীর্ঘকাল পূর্বেই বাঙলা ভাষা গ্রহণ করেন।[১] বস্তুত জয়ন্তিয়া (পাঠান-মোগল কেউই এ রাজ্য অধিকার করতে পারেননি), ত্রিপুরা, কাছাড় ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহম রাজারাই আসাম প্রদেশের চারিটি প্রধান রাজবংশ। আমার যতদূর জানা আছে, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করার সময় কাছাড়কেই কেন্দ্রভূমি করে সে কর্ম করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কাছাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। যাঁরা হিল-সেকশন দিয়ে রেলেও গিয়েছেন মাত্র, তাঁরাও এ বাবদে আমার মতে সায় দেবেন।

এবং সবচেয়ে বড় কথা, কাছাড়ে জমিদাররা কখনো দাবড়ে বেড়াননি বলে সেখানকার সমাজে অতি সুন্দর গণতন্ত্র প্রচলিত। জমিদার নেই বলে লেঠেলও ছিল না। তাই কাছাড়ীরা বড় শান্ত, নিরীহ। এমন কি সোনাই অঞ্চলে যেসব নাগারা বাস করে তারাও মাঝে-মধ্যে বাঙালী জনপদবাসীর কুকুর ধরে নিয়ে ভোজ-দাওয়াৎ করলেও এরা দা হাতে করে মানুষের মুণ্ডুর সন্ধানে বেরোয় না।

দেশ বিভাগের ফলে কত সহস্র, কিংবা লক্ষাধিক শরণার্থীকে কাছাড় আশ্রয় দিয়েছে সে সম্বন্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। 'পূর্ববঙ্গের রেফুইজী'দের আশ্রয় দেওয়ার প্রায় পুরো ক্রেডিট্ নেন পশ্চিম বাঙলা। শিলঙে অবস্থিত অহমিয়া সরকার 'বঙাল' কাছাড়ের আত্মত্যাগ সম্বন্ধে যে অত্যধিক লম্ফঝম্ফ করবেন না সে তো বেদ থেকে পাঁচকড়ি দে তক্ স্বর্ণাক্ষরে লেখা—আমিও দোষ দিই নে।

বস্তুত চৈতন্যভূমি শ্রীহট্টের শত শত ব্রাহ্মণকে কাছাড় আশ্রয় দিয়ে সংস্কৃত চর্চা যে কতখানি বাঁচিয়ে রাখলো তার খতিয়ান হওয়া উচিত। অথচ দেশ বিভাগের ফলে কাছাড়ের সর্বনাশ হয়েছে। তার ধনদৌলত, ধান, কাঠ, ছন, বাঁশ, চা

১ সৈয়দ মরতুজা আলী, A History of Jaintia, ও এঁর লেখা ঐ যুগের আসাম ও বাঙলার চার রাজবংশের মধ্যে বাঙলায় লেখা চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতিক আরো নানা সম্পদ সবই পাঠানো হত সিলেটের মাঝখান দিয়ে। আজ সে পথ বন্ধ। পূর্বেই বলেছি, তার তিন দিকে পাহাড়। হিল সেকশন দিয়ে যে খর্চা পড়বে তার অর্ধেক মূল্যে এসব বস্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পাওয়া যায়।

* * * *

দেশ বিভাগের পূর্বে কাছাড়-শ্রীহট্ট অর্থাৎ সুর্মা-উপত্যকা আসাম রাজ্যে প্রধান স্থান দখল করে ছিল। সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে কাছাড়ের বঙ্গভাষীগণ হয়ে গেল নগণ্যাধম মাইনরিটি—এবং যেটুকু তার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তাও সে পেল না—সেনসাস নিয়ে কারসাজি করার ফলে।[২]

ইউনাইটেড নেশনস বলেন, তাঁদের প্রধান সমস্যা, পৃথিবীর সর্বত্র, মাইনরিটি নিয়ে। কাজেই আজ যদি অসমীয়ারা কাছাড়বাসীর মাতৃভাষা ভুলিয়ে সেখানে অসমীয়া চালাতে চান তবে কেউ আশ্চর্য হবেন না। অবশ্য সেটা যে অন্যায় সে-কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।

কাছাড়ীরা বাঙলা ভাষা ও তাদের বাঙালী ঐতিহ্য কখনো ছাড়তে পারবে না —অহমিয়া ঐতিহ্য অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও পারবে না।

ভাষার উপর এ অত্যাচার নূতন নয়।

এর বিরুদ্ধে ঔষধ কি ?

অধম আকাশবাণীকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছে, শিলচরে একটি বেতার কেন্দ্র হওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কাছাড়ের লোক সচরাচর ঢাকা বেতার শোনে, কারণ কলকাতার আকাশবাণী সেখানে ভালো করে পৌঁছয় না। গৌহাটি কেন্দ্রের ভাষা অসমীয়া। ওদিকে আরেকটি মজার জিনিস। গৌহাটি কেন্দ্র নাগাকে শান্ত করার জন্য সেখান থেকে প্রচারকার্য করেন। আশ্চর্য হই, তাঁরা 'আর্তিস্ত' পান কোথায় ? প্রথমত টেপ-রেকর্ডার নিয়ে নাগা অঞ্চলে ঢোকা অনেকখানি হিম্মতের কাজ, দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র টেপ-রেকর্ডারের জোরে প্রচারকার্য চলে না। পক্ষান্তরে খাস কাছাড়েই মেলা নাগা রয়েছেন। মাঝখানে পাহাড় আছে বলে গৌহাটির বেতার-গলা, নাগা পাহাড়ে ভালো করে পৌঁছয় না। ওদিকে নাগা পাহাড় কাছাড়ের প্রতিবেশী।

কাছাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়। লুসাইরা নিরীহ। কিন্তু অহমিয়ারা

---

২ আমার অগ্রজ পূর্বোল্লিখিত সৈয়দ মরতুজা আলী আসামে রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি আমাকে ১৯৪১ সালেই (!) বলেন যে সেনসাস নিয়ে কারসাজি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

যেভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন তাতে কখন কি হয় বলা যায় না। এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত। লুসাইদের সর্ব আমদানি-রপ্তানি একমাত্র কাছাড়ের সঙ্গে। লুসাইদের জন্য প্রচারকর্ম করার জন্য শিলচরই সর্বোত্তম কেন্দ্র—গৌহাটি বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য কোনো স্থল নয়।

আরো নানা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণ আছে। স্থানাভাব।

শিলচরে এই বেতার কেন্দ্র নির্মাণের জন্য তীব্রকণ্ঠে দাবি জানাতে হবে। জনমত গড়ে তুলতে হবে। আসাম সরকার সাহায্য করবেন না। বাধা দিলে আমি আশ্চর্য হব না, দোষও দেব না।

কিন্তু এ তো বহুবিধ আশ্চর্য তথ্যের মধ্যে সামান্য জিনিস।

আমার মনে পড়ছে, অষ্ট্রিয়ার রাজা হাঙ্গেরির ভাষা নিধন করতে চেয়েছিলেন। ফলে বুদাপেস্তের হাঙ্গেরীয় স্টেজ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বোধ হয় রাজা আপন পায়ে কুড়োল মারলেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে পড়ল জিপসি ক্যারাভানে—শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে তারা এমন ভাষার বান জাগিয়ে তুললে যে, সমস্ত দেশ মনেপ্রাণে অনুভব করলো মাতৃভাষা মানুষের জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য ঐ তার একমাত্র গতি। যে সভ্যতা-সংস্কৃতি সে তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, যার কল্যাণে সে সভ্যজন বলে পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে, যাকে সে পরিপুষ্ট করে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে চায়—সে তার মাতৃভাষা।

এই তার সময়। ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভ-উচ্ছ্বাসের দুর্দিনে গড়ার কাজ করা যায় না। সে যেন আতসবাজি। সেটা শেষ হলে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। তার পূর্বেই ওরই ক্ষুদ্র শিক্ষা দিয়ে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে হয়।

* * *

এই তার সময়। রাজদণ্ডের ভয় নেই, রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত কারসাজি নেই—শান্ত সমাহিত চিত্তে চিন্তা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে কি প্রকারে মাতৃভাষার গৌরব সম্বন্ধে সর্ব কাছাড়বাসীকে পরিপূর্ণ সচেতন করা যায়।

সেই চৈতন্যের উপরই মাতৃভাষার দৃঢ়ভূমি নির্মিত হবে।

তাই যখন আবার বিপদ আসবে তখন উন্মাদের মত দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে হবে না, ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে মাইকে চিৎকার করতে হবে না। গ্রামের লোক নিজের থেকেই সাড়া দেবে। শহরে সীমাবদ্ধ যে-কোনো

আন্দোলনই সহজে দমন করা যায়। কিন্তু সে যদি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তবে তাকে দমন করা অসম্ভব।

এই তার সময়। চিন্তা করুন, গ্রামে গ্রামে কি প্রকারে সে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করতে পারি।

কিন্তু সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

এ আন্দোলন শান্তিময়, গঠনমূলক। এতে কোনো প্রকারের রাজনৈতিক স্বার্থ নেই। এবং সবচেয়ে শেষের বড় কথা—গঠন-কর্ম অগ্রসর হবে অহমিয়া ভ্রাতা, তথা কাছাড়ের কোনো সম্প্রদায় বা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি বৈরীভাব না রেখে॥[৩]

নেতাজী

আজ—এবং নেতাজী।

এ পৃথিবীতে ভারতের মত অতখানি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর নেই। এবং সে-জন্য যে আমরা ক্যাপিটালিস্ট কম্যুনিস্ট উভয় পক্ষেরই বিরাগভাজন হয়েছি তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সামাজিক জীবন লক্ষ্য করলেই এ তত্ত্বটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে-মানুষ দলাদলির মাঝখানে যেতে চায় না—তা সে স্বভাবে শান্তিপ্রিয় বলেই হোক্, আর দুই দলের গোঁড়ামিই তার কাছে আপত্তি-কর বলে মনে হয় বলেই হোক—সে উভয় দলেরই গালাগালি খায়।

তাই পাঁড় কম্যুনিস্টরা আমাদের টিটকারি দিয়ে বলছে, 'যাও, করো গে পীরিত ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে; এখন বোঝো ঠ্যালা।' আর পাঁড় ক্যাপিটালিস্টরা বলছে ঠিক এই একই কথা। আমরা নাকি কম্যুনিস্টদের গলায় পীরিতির মালা পরাতে গিয়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা।

পুরোপাক্কা সুস্থমস্তিষ্ক নিরপেক্ষ জন পাই কোথা যে তার মতটা জেনে নিয়ে আপন চিন্তা-ধারা আপন আচরণের বাছ-বিচার করি, জমা-খরচ নিই।

তবে পৃথিবীর লোক সচরাচর বলে থাকে সুইজারল্যাণ্ড নাকি বড় নিরপেক্ষ দেশ। আমার মনে হয়, লোকে তাকে যতটা নিরপেক্ষ মনে করে ঠিক ততটা সে নয়। তবু সবাই যখন এ-কথা বলছেন তখন সুইসদের মধ্যে যাঁরা সচরাচর লিব্‌রেল উদারপ্রকৃতি-সম্পন্ন বলে গণ্য (সব সুইসই যে সমান নিরপেক্ষ এ কথা

৩ অমিতাভ চৌধুরী, মুখের ভাষা বুকের রুধির ৮

সত্য হতে পারে না) তাঁদের মতটা শোনা যাক।

এঁরা প্রথমেই বলেন, চীন যে ভারত আক্রমণ করেছে এটা তার লাওস, ভিয়েটনাম বা কোরিয়াতে লড়াইয়ের মত নয়। ওসব জায়গায় সে লড়ে কম্যুনিজ্‌ম ধর্মকে 'কাফের' ক্যাপিটালিস্ট-ইম্‌পিরিয়ালিস্টদের অযথা আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য (ভারতবর্ষ আক্রমণে সে উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, কারণ এ-কথা কেউ বলতে পারবে না যে কম্যুনিজ্‌ম্-ধর্মবিশ্বাসী কম্যুনিস্টদের আমরা নির্যাতন করে করে নিঃশেষ করে আনছিলুম, বরঞ্চ বলবো ওদের প্রতি আমাদের সহিষ্ণুতা ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে বলে ধরে বাইরে অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন), এ-স্থলে চীন ভারত আক্রমণ করেছে নিছক রাজ্যজয়ার্থে।

আমরাও বলি তাই, যদিও অন্য একাধিক কারণ থাকতে পারে।

এর পর সুইস লেখক বলেছেন, এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি ?

(১) ভারতবাসীর স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়-ঐক্য রুদ্র জাগ্রত রূপ ধারণ করেছে এবং

(২) যে কম্যুনিজ্‌মের প্রতি এতদিন সে উদাসীন এবং সহিষ্ণু ছিল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে।

(৩) বিশ্বজন চীনকেই আক্রমণকারী পররাজ্য লোভী ইম্‌পিরিয়ালিস্ট বলেই ধরে নিয়েছে, কারণ তাঁরা নিরপেক্ষ জাতিদের মধ্যে ভারতকেই সর্বাগ্রগণ্য বলে শ্রদ্ধা করতেন ও ভারত যে তার দীনদুঃখীর ক্লেশ মোচনের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করছে সে সত্যও তাঁরা জানতেন (অর্থাৎ চীন যেমন অস্ত্র নির্মাণে আপন শক্তির অপচয় করছিল তা না করে)।

(৪) ভারতীয় কম্যুনিস্টরা পড়েছেন মহাবিপদে (আমার গাঁইয়া ভাষায় ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে) ; হয় তাদের প্রাণের পুত্তলি চৈনিক 'অগ্রগতির' সঙ্গে যোগ দিয়ে, সর্বভারতীয়ের সম্মুখে নিজেদের দেশদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা রূপে সপ্রকাশ করে' পরিশেষে রাজনৈতিক আত্মহত্যা বরণ করতে হবে, কিংবা চীনের বিপক্ষে, এমন কি শেষমেষ চীনের কম্যুনিস্ট সৎভাই বিশ্বপ্রলেতারিয়ার গুলিস্তান পরীস্তান রুশ—অবশ্য সৎভাই কারণ সে ছোটভাই চীনকে সাহায্য করতে আদৌ উৎসাহ দেখাচ্ছে না—এমন কি রুশেরও বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে।

(৫) শ্রীযুত খ্রুশ্চফকে হয় বিশ্বজনের সম্মুখে স্বধর্মানুরাগী পীতভ্রাতা চীনের বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গ নিতে হবে, কিংবা চীনের পক্ষ নিয়ে ভারত তথা এশো-আফ্রিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

(৬) ভারতকে এখন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে প্রচুর এবং প্রচুরতর

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। ফলে পশ্চিমের সঙ্গে মৈত্রী বাড়বে, কম্যুনিস্টদের প্রতি বৈরীভাব বৃদ্ধি পাবে। ধীরে ধীরে তার নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

পাঠক ভাববেন না, আমি সুইসের সঙ্গে একমত। আমিও ভাবছি না যে আপনি সুইসের সঙ্গে দ্বিমত। তবে একটা কথা আমরা উভয়েই মেনে নেব, নিরপেক্ষতা সর্বকালীন সর্বজনীন সার্বভৌম ধর্ম নয়। যদি সত্যই একদিন আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, কোনো বিশেষ নিরীহ দেশ অকারণে বলদৃপ্ত স্বাধিকার-প্রমত্ত রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে তবে আমরা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষতা বর্জন করে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষ নেব। মিশর আক্রান্ত হলে পর কমনওয়েলথের সম্মানিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা মিশরের পক্ষ নিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য আজ আমরা যে আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠাচ্ছি ঠিক সেই রকম আর্তজনকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষতা বর্জন করে ঠিক সেই রকমই সৈন্য পাঠাবো। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। তু হিটলার বিশ্বাস করেন, যেখানে জয় সেখানেই ধর্ম।

কিন্তু উপরের ছয় নম্বর বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলি, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আমাদের নিরপেক্ষতা বর্জন অবশ্যম্ভাবী নয়। ক্ষণেকের প্রয়োজনে যদি বা আমরা তৃতীয় পক্ষের সাহায্য নিতে বাধ্য হই, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চিরকালই তৃতীয় পক্ষের কেনা গোলাম হয়ে থাকবো। তার অর্থ এও নয়, আমরা নেমকহারাম। এবং যাতে করে তৃতীয় পক্ষের বা বিশ্বজনের এ-অন্যায় সন্দেহ না হয়, তাই সাহায্য নেবার পূর্বেই, আমাদের নীতি ও উদ্দেশ্য সর্বজনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে হবে।

এই দুঃখের দিনে নেতাজীর কথা মনে পড়ল।

দশ-বারো বৎসর পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলি, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি তিনজন নেতা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনাই আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের নেতাজী। তিনি ভারতের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন না।

"তিনজনই কপর্দকহীন, তিনজনই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন আপন যশ ও চরিত্রবল। প্রথম দুজনার স্বজাতি ছিল উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই কোনো সৈন্যবাহিনী গঠন করে তুনিসিয়া আলজারিয়ায় লড়তে পারলেন না; শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয়

অভিযানে বেরুলেন তখন এঁদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকে আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে অভিভূত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের গতি হল আর পাঁচজনের মত ইতালি থেকে বেতারে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে 'প্রোপাগাণ্ডা' করার।

"অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কী অলৌকিক কর্ম সমাধান করলেন! স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, 'ইংরেজের গর্ব ভারতীয় সৈন্যদের' এক করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার ভারতীয় সর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

"আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল, সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যগণ যেন জাপানী ঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর রশীদ জর্মনিকে সে সুযোগ দিতেও বাধ্য করাতে পারেননি)। সুভাষচন্দ্র কবুল জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আজাদ হিন্দ ও তার ফৌজের নেতা। আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে-রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম। যদি চাও তবে সে-রাষ্ট্রকে স্বীকার করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো। যদি ইচ্ছা হয় তবে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো—এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে রকম অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্তু আমি কোনো ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ 'আজাদ হিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।"

আজ আমরা স্বাধীন। পৃথিবীতে আমাদের গৌরব আজ অনেক বেশী। নেতাজী বিনাশর্তে সেদিন যে শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, আজ কি আমরা তা পারবো না? না পারলে বুঝতে হবে আমাদের রাজনীতি দেউলিয়া॥

মস্কো-যুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়

লজ্জায় জর্মন জাঁদরেলরা হিটলারকে মুখ দেখাতে পারতেন না। রুশ-যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বার বার সপ্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে, জাঁদরেলরা ভুল করছেন—সত্যপন্থা জানেন হিটলার।

ভের্সাইয়ের চুক্তিতে পরিষ্কার শর্ত ছিল জর্মন রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না। হিটলার যখন করতে চাইলেন তখন জেনারেলরা তারস্বরে

প্রতিবাদ করে বললেন, 'যদি তখন ফ্রান্স আমাদের আক্রমণ করে তবে…?' হিটলার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'করবে না।' হিটলারের কথাই ফলল। অবশ্য হিটলার পরে একাধিকবার স্বীকার করেছেন, তখন ফ্রান্স আক্রমণ করলে জর্মনি নির্ঘাত হেরে যেত। তারপর হিটলার পর পর অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করলেন—জেনারেলদের আপত্তি সত্ত্বেও—ফরাসী ইংরেজ রা-টি পর্যন্ত কাড়লে না। বার বার তিনবার লজ্জা পাওয়ার পরও পোলাণ্ড আক্রমণের পূর্বে জেনারেলরা ফের গড়িমসি করেছিলেন, এমন কি ফ্রান্স আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁরা ঐ 'জুয়ো খেলতে' চাননি। কিন্তু বার বার হিটলার প্রমাণ করলেন, জেনারেলদের আর যা থাকে থাক, সমরনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁদের নেই—ভবিষ্যদ্বাণী করা তো দূরের কথা।

এতবার লজ্জা পাওয়ার পর তাঁরা আর কোন্ মুখ নিয়ে আপত্তি করতেন—হিটলার যখন রুশ আক্রমণ করবার প্রস্তাব তাঁদের সামনে পাড়লেন? এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করার পর যে হিটলার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সে কথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন। বক্ষ্যমাণ 'টেস্টামেণ্টে'ই আছে,

'এ যুদ্ধে আমাকে যত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে তার মধ্যে কঠিনতম সিদ্ধান্ত রুশ আক্রমণ। আমি বরাবর বলে এসেছি, সর্বস্ব পণ করেও যেন আমরা দুই ফ্রণ্টে লড়াই করাটা ঠেকিয়ে রাখি, এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আমি নেপোলিয়ন এবং তাঁর রুশ-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপন মনে বহুদিন ধরে বিস্তর তোলাপাড়া করেছি।'

এ-সব তত্ত্ব জানা থাকা সত্ত্বেও জেনারেলরা তো মানুষই বটেন। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের আকছারই যে আচরণ হয় তাঁদেরও তাই হয়েছিল। অর্থাৎ জর্মনি যখন পোলাণ্ড, গ্রীস, ফ্রান্স একটার পর একটা লড়াই জিতে চললো তখন জাঁদরেলরা নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ে বললেন, 'আমরা জিতেছি, আমরা লড়াই জিতেছি।' হিটলারকে স্মরণে আনবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করলেন না।[১] কিন্তু হিটলার রুশযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করলে পর এই

১ একমাত্র জঙ্গীলাট কাইটেল করেছিলেন। ফ্রান্সের পরাজয়ের খবর পৌঁছলে তিনি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার হয়ে হিটলারকে উদ্দেশ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেছিলেন, 'আপনি সর্বকালের সর্ব সেনাপতির প্রধানতম'। Groesste Feldherr alle Zeiten। ঈষৎ অবান্তর হলেও এস্থলে বলি, হিটলার যখন রুশে পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন তখন জর্মন কাষ্ঠরসিকরা

জাঁদরেলরাই মোটা মোটা কেতাব লিখলেন, 'হিটলার অগা, হিটলার বুদ্ধু— তারই দুর্বুদ্ধিতে আমরা লড়াই হারলুম।' বাঙলা প্রবাদে বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবদ্দন'। ফ্রান্স-জয়ের দই খেলেন জাঁদরেলরা, রুশ-পরাজয়ের বিকার হল হিটলারের। অবশ্য তাঁর পক্ষে এই সান্ত্বনা যে, তিনি এসব বই দেখে যাননি।

অবশ্য তিনিও কম না। জাঁদরেলরা যা করেছেন, তিনিও তাই করে গেছেন। পোলাণ্ড ফ্রান্স জয়ের গর্ব তিনি করেছেন পুরো ১০০ নঃ পঃ, কিন্তু রুশ-অভিযান-নিষ্ফলতার জন্য দায়ী করেছেন তাঁর জাঁদরেলদের ন'সিকে। তিনি আত্মহত্যা করবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যে উইল লিখে যান তাতে তিনি লিখেছেন, 'বিমানবাহিনী লড়েছে ভালো, নৌবহরও কিছু কম নয়, স্থল-সৈনিকরাও লড়েছে উত্তম, কিন্তু সর্বনাশ করেছে ঐ জাঁদরেলরা।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তারা মূর্খ, তারা প্রগতিশীল নয়, যুদ্ধের সময় তাদের চিন্তা তাদের কর্মধারা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯৪১-৪৫ সালে তারা যে কায়দায় লড়ছে সেটা যেন ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধ! ব্লিৎস ক্রীগ—বিদ্যুৎ-গতি-যুদ্ধ—এ যে কি জিনিস তারা আদপেই বুঝতে না পেরে পদে পদে আমার আদেশ অমান্য করেছে।'[২]

অর্থাৎ এবার দই খাচ্ছেন হিটলার, বিকারের বেলা জাঁদরেলরা। ফ্রান্স, পোলাণ্ড জয় করেছিলেন তিনি, রুশ-যুদ্ধে হারলো জর্মন জাঁদরেলরা!

কিন্তু এহ বাহ্য। রুশ-যুদ্ধে জর্মনির হার হয়েছিল অন্য কারণে।

বহু রণপণ্ডিত এ-কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সে পরাজয়ের জন্য প্রধানত দায়ী শ্রীমান মুস্‌সোলীনী! হিটলার বলেছেন (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫),

'ইটালি যুদ্ধে প্রবেশ করা মাত্র আমাদের শত্রুদের এই প্রথম কয়েকটি সংগ্রাম

Groesste-এর Gro, Feldherr-এর F, aller-এর A এবং Zeiten-এর Z নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে Grofatz নির্মাণ করেন। এখানে Gro মানে বিরাট এবং fatz শব্দের অর্থ—গ্রাম্য ভাষায় বাতকর্ম। আমি বাংলায় ভদ্রশব্দটি প্রয়োগ করলুম। বাঙলা আটপৌরে শব্দটির সঙ্গে জর্মন শব্দটির উচ্চারণের মিল এস্থলে লক্ষণীয়।

২ যেমন মনে করুন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কানুন ছিল, শত্রু পরাজিত হলেও এক দিনের ভিতর কুড়ি মাইলের বেশী এগোবে না, পাছে তোমার লাইন অব কম্যুনিকেশন ছিন্ন হয়ে যায়। ব্লিৎসক্রীগে পঞ্চাশ মাইলও নস্যি।

জয় সম্ভব হল (এস্থলে হিটলার ইংরেজ কর্তৃক উত্তর আফ্রিকা জয়ের কথা বলছেন) এবং তারই ফলে চার্চিলের পক্ষে সম্ভব হল তার দেশবাসী তথা পৃথিবীর ইংরেজ-প্রেমীদের মনে সাহস এবং ভরসা সঞ্চার করা। ওদিকে মুসসোলীনী আবিসিনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় হেরে যাওয়ার পরও গোঁয়ারের মত হঠাৎ খামোখা আক্রমণ করে বসল গ্রীসকে—আমাদের কাছ থেকে কোনো পরামর্শ না চেয়ে, এমন কি আমাদের সে সম্বন্ধে কোনো খবর না দিয়ে।[৩] খেল বেধড়ক মার ; ফলে বল্কানের রাজ্যগুলো আমাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলো। বাধ্য হয়ে, আমাদের তাবৎ প্ল্যান ভণ্ডুল করে নামতে হল বল্কানে (এবং গ্রীসে) এবং তাতে করে আমাদের রুশ অভিযানের তারিখ মারাত্মক রকম পিছিয়ে (কাটাস্ট্রফিক্ ডিলে) দিতে হল। এবং তারই ফলে আবার বাধ্য হয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীর কতকগুলো অত্যুত্তম ডিভিশন পাঠাতে হল সেখানে। এবং সর্বশেষ নেট্ ফল হল, বাধ্য হয়ে আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যকে খোদার-খামোখা বল্কানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মোতায়েন করে রাখতে হল। (হিটলার বলতে চান, তা না হলে এ সৈন্যদের রুশ অভিযানে পাঠানো যেত। পক্ষান্তরে তখন তাদের সরালে ইংরেজ ফের গ্রীসে আপন সৈন্য নামাতো, এবং মুসসোলীনী একা যে তাদের ঠেকাতে পারতেন না, সে তো জানা কথা)।

হায় ইটালি যদি এ যুদ্ধে না নামত! তারা কোনো পক্ষে যদি যোগ না দিত!

এ যুদ্ধ একা যদি জর্মনিই লড়ত—এ যদি অ্যাকসিসের যুদ্ধ না হত—তবে আমি ১৫ই মে, ১৯৪১-এ-ই রাশা আক্রমণ করতে পারতুম। জর্মন সৈন্য ইতিপূর্বে কোথাও পরাজিত হয়নি বলে আমরা শীত আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই (১৯৪১-৪২-এর শীত) যুদ্ধ খতম করে দিতে পারতুম।' (ইটালির গ্রীস আক্রমণের ফলে ও তাকে সাহায্য করতে গিয়ে সময় নষ্ট হওয়াতে, হিটলার রাশা আক্রমণ করতে সমর্থ হলেন প্রায় এক মাস পরে। ফলে তিনি যখন মস্কোর কাছে এসে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ প্রচণ্ড শীত আর বরফপাত আরম্ভ হল—এ রকম ধারা শীত আর বরফ রাশাতেও বহুকাল ধরে পড়েনি—যুদ্ধের তাবৎ যন্ত্রপাতির তেল চর্বি জমে গেল, শীতের পূর্বেই জর্মন সৈন্য মস্কো দখল করে সেখানে শীতবস্ত্র লুট করতে পারবে বলে তারও কোনো ব্যবস্থা হিটলার করেননি, বহু হাজার সৈন্য শুধু শীতের

৩ মুসসোলীনী বলেছেন, 'হিটলার প্রতিটি লড়াই লড়েছে আমাকে নোটিশ না দিয়ে—আমিই বা কেন আগেভাগে দিতে যাব?'

অত্যাচারেই জমে গিয়ে মারা গেল। বলা যেতে পারে, এই শীতেই হিটলারের পরাজয় আরম্ভ হল—যদিও সেটা দৃশ্যমান হল তার পরের শীতে স্টালিনগ্রাডে।)

হিটলার হা-হুতাশ করে বলেছেন, 'হায়, তাই সব-কিছু সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিল!'

কিন্তু প্রশ্ন, মস্কো দখল করতে পারলেই কি হিটলার শেষ পর্যন্ত জয়ী হতেন? নেপোলিয়ন তো মস্কো জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি রুশ জয় করতে পারেননি।

॥ ২ ॥

গত প্রবন্ধে মস্কো যুদ্ধের বর্ণনা লেখার কালি শুকোতে না শুকোতে খাস মস্কো থেকে একটি চমকপ্রদ খবর এসেছে। মস্কো যুদ্ধের বিংশ বাৎসরিক স্মরণ দিবসে গত ৫ই ডিসেম্বর (১৯২১ খৃ) মস্কো শহরে মার্শাল রকসফ্স্কি তাস এজেন্সিকে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জর্মনরা স্থির করেছিল, মস্কোকে জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সেটাকে সমুদ্রের মত করে ফেলবে। পরে যখন দেখা গেল টেকনিকাল কারণে সেটা সম্ভবপর নয় তখন তারা বোমা ফেলে সেটা ধ্বংস করার চেষ্টা দিল।

আমার মনে হয়, টেকনিকাল কারণে সম্ভবপর হলেও কৃত্রিম বন্যায় মস্কো ভাসিয়ে দেবার প্রস্তাবে হিটলার স্বয়ং রাজী হতেন না। তাঁর প্ল্যান ছিল, জর্মন সৈন্য মস্কো লুট করে গরম জামা-কাপড় এবং কিছু কিছু খোরাক পাবে—কিন্তু প্রধানত গরম জামা-কাপড় ও শীতের আশ্রয়ই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য, কারণ যুদ্ধ শীতের পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে মনে করে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য সে-ব্যবস্থা করেননি। (এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, জর্মনিতে কোনো কালেই উলের প্রাচুর্য ছিল না—জর্মনি চিরকালই তার জন্য নির্ভর করেছে প্রধানত স্কটল্যাণ্ডের উপর এবং মস্কোর দোরে যখন জর্মনরা আটকা পড়ে গেল তখন হিটলারকে বাধ্য হয়ে জর্মনির জনসাধারণের কাছে শীতবস্ত্রের জন্য ঢালাও আবেদন জানাতে হল)। কাজেই মস্কো শহরকে সমুদ্রে পরিণত করলে তাঁর কোনো লাভই হত না। এবং মনে পড়ছে, নেপোলিয়নের বেলাতে রুশরা নিজেই কাঠের তৈরী মস্কো শহর পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার ফলে তিনি মস্কোর শ্মশানভূমিতে তাঁর সৈন্যের জন্য এক কণা ক্ষুদ, ঘোড়ার জন্য এক রত্তি দানা পাননি। এবারে রুশরা সেটা চাইলেও করতে পারতো না, কারণ ইতিমধ্যে তাবৎ মস্কো শহর কনক্রিট আর লোহাতে তার বাড়িঘর বানিয়ে বসে আছে। সেটাকে পোড়ানো অসম্ভব।

কাজেই মস্কো জয় করে নেপোলিয়ন লাভবান হননি, কিন্তু হিটলার হতেন।

মার্শাল রকসফ্স্কি আরো বলেছেন, মস্কোবাসী এবং সেখানকার রুশ সৈন্যদল জর্মনদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তারা সেটা গ্রহণ করেনি। এটা সত্যই অত্যন্ত চমকপ্রদ খবর। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, কোনো নগর আত্মসমর্পণ করলে সেটাকে বে-এক্তেয়ার লুটতরাজ করা যায় না।[১]

অবশ্য যে সব ভুলের ফলে হিটলার মস্কো দখল করতে পারলেন না, সেগুলো না করে মস্কো দখল করতে পারলে তিনি যে তারপর অন্য ভুল করে যুদ্ধ হারতেন না, সে কথা বুক ঠুকে বলবে কে?

* * *

সমস্ত জর্মনি যখন রুশ, ইংরেজ, মাকিন, ফরাসী সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছে, রুশবাহিনী প্রায় তাবৎ বার্লিন দখল করে হিটলারের বুংকারের থেকে দু' পাঁচ শ' গজ দূরে, বুংকার সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, বার্লিনের বাইরে তাঁর সৈন্যদল ও সেনাপতিরা আত্মসমর্পণে ব্যস্ত তখনো হিটলার কিসের আশায় পরাজয় স্বীকার করছিলেন না? আত্মহত্যার ঠিক তিন মাস পূর্বে হিটলার তাঁর আদর্শ মানব ফ্রেড্রিককে স্মরণ করে বলেছেন,

'না। একেবারে আর কোনো আশা নেই, এরকম পরিস্থিতি কখনো আসে না। জর্মনির ইতিহাসে আকস্মিক কতবার তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে সেইটে শুধু একবার স্মরণ করো। সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধে ফ্রেড্রিক তাঁর নৈরাশ্য এবং দুরবস্থার এমনই চরমে পৌঁছেছিলেন যে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি মনস্থির করেন যে, বিশেষ একটি দিনের ভিতর তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত না হলে তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। ঐ স্থির করা বিশেষ দিনের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে জারিনা হঠাৎ মারা গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন দৈবযোগে সমস্ত পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। মহান পুরুষ ফ্রেড্রিকের মত আমরাও কয়েকটি সমবেত শক্তির (কোয়ালিশনের) বিরুদ্ধে লড়ছি, এবং মনে রেখো, কোনো কোয়ালিশনই চিরন্তনী সত্তা ধরে না। এর অস্তিত্ব শুধু গুটি কয়েক লোকের

১ এর সঙ্গে তুলনীয় মাকিন কর্তৃক হিরোশিমায় অ্যাটম বম প্রয়োগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মনির পরাজয়ের পর জাপান নিরপেক্ষ সুইডেনের মারফতে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিন সেটা গ্রহণ করলে হিরোশিমায় অ্যাটম বম ফাটিয়ে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তাই করেনি। করলো এক্সপেরিমেণ্টটা দেখে নিয়ে।

ইচ্ছার উপর। আজ যদি হঠাৎ চার্চিল অবলুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তড়িৎশিখার ন্যায় এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ব্রিটেনের খানদানী মুরুব্বীরা সেই মুহূর্তেই দেখতে পাবে তারা কোনো অতল গহ্বরের সামনে এসে পড়েছে—এবং চৈতন্যোদয় হবে তখন।'

হিটলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন মার্কিন এবং ইংরেজ একদিন না একদিন অতি অবশ্য বুঝতে পারবে, ওদের শত্রু জর্মন নয়, ওদের আসল শত্রু রুশ। এবং সেই হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই তারা জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে, সবাই এক জোট হয়ে লড়াই দেবে রুশের বিরুদ্ধে। হিটলার আশা করেছিলেন, যেদিন মার্কিনিংরেজ জর্মনির কিয়দংশ দখল করার পর রুশের মুখোমুখি হবে সেইদিনই লেগে যাবে ঝগড়া। মার্কিনিংরেজ স্পষ্ট বুঝতে পারবে রুশ কী চীজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাবে। কিন্তু ঠিক সেইটেই হল না। বার্লিনকে বাইপাস করে রুশ এবং মার্কিনিংরেজ যখন মুখোমুখি হল তখন তারা সুবোধ বালকের ন্যায় আপন্ গোঠে জমিয়ে বসে গেল।

এবং অদৃষ্ট হিটলারের দিকে শেষ মুহূর্তে কী নিদারুণ মুখভেংচিই না কেটে গেলেন।

হিটলারের দুর্দশা যখন চরমে, তিনি যখন দিবারাত্রি আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্তনের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন, গ্যোবেল্‌স্ প্রভুর হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের জন্য কার্লাইলের লিখিত 'ফ্রেডরিক দি গ্রেটের ইতিহাস' মাঝে মাঝে পড়ে শুনিয়ে যান, এমন সময় উত্তেজনায় বিবশ গ্যোবেল্‌স্ প্রভুকে ফোন করলেন, 'মাইন ফ্যুরার, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিয়তি আপনার পরম শত্রুকে বিনাশ করেছেন। জারিনা মারা গেছেন।'

এস্থলে জারিনা অবশ্য রোজোভেল্ট: তিনি মারা যান ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫।

কিন্তু হায়, চার্চিল নয়, অদৃশ্য হলেন রোজোভেল্ট! তবু মন্দের ভালো। কিন্তু তার চেয়েও নিদারুণ—হায়, হায়—রোজোভেল্টের মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কিন তার সমর-নীতি বদলালো না। হিটলার প্রতিটি মুহূর্ত গুনলেন অধীর প্রত্যাশায়—ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আত্মহত্যা করলেন তার আঠারো দিন পরে। ফ্রেডরিককে করতে হয়নি।

* * *

এইবারে তাঁর শেষ ভবিষ্যদ্বাণী:

'জর্মনি হেরে গেলে, যতদিন না এশিয়া আফ্রিকা এবং সম্ভবত দক্ষিণ

আমেরিকার ন্যাশনালিজমগুলো জাগ্রত হয়, ততদিন পৃথিবীতে থাকবে মাত্র দুটি শক্তি যারা একে অন্যকে মোকাবেলা করতে পারে—মার্কিন এবং রুশ। ভূগোল এবং ইতিহাসের আইন এদের বাধ্য করবে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা অর্থনীতি এবং আদর্শবাদের (ইডিয়লজিকাল) সংগ্রাম। এবং সেই ইতিহাস ভূগোলের আইনেই উভয় পক্ষই হবে ইয়োরোপের শত্রু। এবং এ বিষয়েও কণামাত্র সন্দেহ নেই যে, শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক, উভয় পক্ষকেই ইয়োরোপের একমাত্র বিদ্যমান শক্তিশালী জর্মন জাতির বন্ধুত্বের জন্য হাত পাততে হবে।'

এর টীকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তোড়জোড় যে জর্মনিতেই হচ্ছে সে-কথা কে না জানে? আর আডেনাওয়ারের কণ্ঠস্বর যে ক্রমেই উঁচু পর্দায় উঠছে সেও তো শুনতে পারছি! এবং রুশ যে পূর্বজর্মনির মারফতে পশ্চিম জর্মনির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করতে উদ্‌গ্রীব, সেও তো জানা কথা॥

কুট্টি

পূব-বাঙলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাদের সংখ্যা একলপতে গুয়া গাছের ডগায় উঠে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও পূব-বাঙলার উপভাষা শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোনো কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখনো কোনো লেখক ওঠাননি। পূব-বাঙলার লেখকেরা ভাবেন 'করে' শব্দ 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গিতে বা 'ইডিয়মে' —অবশ্য সেগুলো ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করতে হয়, যাতে করে সে ইডিয়ম পশ্চিম-বঙ্গ তথা পূব-বাঙলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরীব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতীর লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে?' অর্থাৎ 'হাতীর সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলে কেন?' কিন্তু পাতি খেলা যে polo খেলা সেকথা বাঙলা দেশের কম লোকই জানেন; (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ঠিক ওৎরাবে না। আবার—

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা
দিঘল ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল
তিন-ই মন্দকারী।

'কামুফ্লাজ' বোঝাবার উত্তম ইডিয়ম। পূব, পশ্চিম কোনো বাংলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পূব-বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম অর্থাৎ চটুল, শৌখীন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেণ্ট।

কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক কিন্তু এদের সবাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির জবাব') এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলবো, কুট্টির সঙ্গে ফস্ করে মস্করা না করতে যাওয়াই বিবেচকের কর্ম। খুলে কই।

প্রথম তাহলে একটি সর্বজনপরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরিজীতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুল রুম টু দি ওয়ার্লড ওয়াইড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পার নে। তাই পশ্চিম বাঙলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী: রমনা যেতে কত নেবে?

কুট্টি গাড়োয়ান: এমনিতে দেড টাকা; কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।

যাত্রী: বলো কি হে? ছ আনায় হবে না?

গাড়োয়ান: আস্তে কন কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।

এর যুৎসই উত্তর আমি এখনো খুঁজে পাইনি।

মোটেই ভাববেন না যে এ জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর। কিন্তু কুট্টিরা হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরী করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন একটি কুট্টি গিয়ে যে ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কি ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?

কুট্টি হেসে বললে, 'কন কি কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা; বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথি অপটিমিজ্‌ম্'।

কিংবা আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীদের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং স্যুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌ কালো, তদুপরি তিনি হাড়-কিপ্‌টে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আশপাশ দেখলেন, কোনো কাপড়ই তাঁর পছন্দ হয় না অর্থাৎ দাম পছন্দ হয় না। যে-কুট্টি কোচম্যান সঙ্গে ছিল সে শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচ করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের ওপর ছ'টা বোতাম, আর দু হাতে কব্জীর কাছে তিনটে তিনটে করে ছ'টা বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্সকোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকির-খানী) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমির আলী এভিন্যুতেই অন্ততঃ আধা ডজন দোকানের সাইন বোর্ডে 'বাখরখানী,' লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম বাঙলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনো কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিলিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন—পরশুরাম যে রকম পশ্চিম বাঙলার নানা হাল্কা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম একদা কলকাতার নিতান্ত ককনিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে কিন্তু খরচের দিকে একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে ভাষা অন্যপক্ষ বা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে। তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পূব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ্' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এস্তার, ইলাহি, বেলেল্লা-বেহেড, দোগেড়ের চ্যাং এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পূব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য বক্তা যদি সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের ভদ্র আড্ডাতে পূব-বাঙালীর সংখ্যা থাকতো অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্যভঙ্গী বানাতেন যে রসিকজন মাত্র বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পূব-বাঙলার বহু লোক কলকাতার আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দবিন্যাস ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনো ব্যবহার করেন ; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না —আড্ডা জমে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পূব-বাঙলার সদস্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলি ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্রভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাঙলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাঙলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ ছিল ভাশুর-ভাদ্রবধুর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাঙলা এবং সে বাঙলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে বাঙলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে বাঙলা বলতেন তার ওপর বাঙলা সাহিত্যের

বা পূব-বাঙলার কথ্য ভাষার কোন ছাপ কখনো পড়েনি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্য-মনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরাণ, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ অধম এন্তার বাঙলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালী চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের একদিক দিয়ে গরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে জলতরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারী বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ টারালাপ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিকুটি হয়নি?

হায়, এ শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবু এখনো আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের ওপর।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপাদেয় 'স্মৃতিমন্থন' আমারও স্মৃতির ভিজে গামছাটি নিংড়ে বেশ কয়েক ফোঁটা চোখের জল বের করলো।

আমিও এ বাবদে একদা একটি প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য! ছাপাও হয়েছিল। এবং চাটগাঁয়ে প্রকাশিত একটি মাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আবার কোনো পুস্তকে সেটি স্থান পেয়েছে কিনা, মনে পড়ছে না।

আমার মনে হয়, কুট্টি সম্প্রদায় (ঢাকার গাড়োয়ান শ্রেণী) একদা মোগল সৈন্যবাহিনীর ঘোড়-সওয়ার সেপাই ছিল। যার ফলে তারা 'কুঠি' বাড়ির ব্যারাকে থাকতো। এবং তাই পরে এদের নাম কুট্টি হয়। পরবর্তী কালে ইংরেজ বাহিনীতে এদের স্থান হয়নি বলে, কিংবা মোগলের নেমকহারামী করতে চায়নি বলে এরা ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তাদের নিজেরই ছিল, এবং ঘোড়ার খবরদারী করতে তারা জানতো। বরোদা রাজ্যেও আমি শুনতে পাই, সেখানকার কোচম্যানরাও নাকি পূর্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ক্যাভলরি অঙ্গে কাজ করতো। ঢাকার কুট্টিরা এককালে উর্দু বলতো, পরে

ঢাকা শহরের চলতি বাঙলার সঙ্গে মিশে 'কুট্টি ভাষা'র সৃষ্টি হয়। তাই তারা এখনো 'লেকিন, মগর' এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে পূব-বাঙলার মৌলবী সায়েবরাও 'লেকিন, মগর' ছাড়া আরও বহু বহু আরবী ফার্সী শব্দ 'বাঙাল' কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকেন—ঐ অঞ্চলে হিন্দু পণ্ডিতরাও যে রকম গলায় ঘা হলে বলেন, 'কণ্ঠদেশে ক্ষত অইছে'। তাই শুনে মেডিকেল কলেজের গোরা ডাক্তার নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চীন দেশ হ্যায়, জাপান ভী দেশ হ্যায়, ফির কণ্ঠদেশ কোন্ দেশ হ্যায় ?'

বছর পঞ্চাশেক পূর্বে ঢাকার এই 'কুট্টি' ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে ঐ আমলের কুট্টি ভাষার উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় :

'করিম বক্স্‌কা মা নে আর রহিম বক্স্‌কা জরুনে এয়সা লাগিস্ লাগিস্তা কে এ ভি উস্‌কা বালমে ধরি টানিস্তা, উ ভী ইস্‌কা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা।'

অর্থাৎ 'করিম বখ্‌শের মা আর রহিম বখ্‌শের স্ত্রীতে এমন লাগাই লাগলো (কোঁদল) যে এ ওর চুল ধরে টানে, ও এর চুল ধরে টানে।'

(কুট্টি ভাষার উদ্ধৃতিতে কোন ভুল থাকলে যেন কুট্টিভাষাভাষী আমার উপর বিরক্ত না হন—কারণ কুট্টি গাড়োয়ান ছাড়া অন্য অনেক লোক এ-ভাষা বলে থাকেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চাতে আনন্দ পান। পূর্বে এঁরা সকলেই উর্দু সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। শুনতে পাই এঁদের কেউ কেউ নাকি ভাষা আন্দোলনে বাঙলা ভাষার পক্ষ নেন।)

* * *

'হাওয়া গাড়ি চইলা গেল গো
(আমার) বন্ধু আইল না।'

গানটি পূব-বাঙলায় রূপকার্থেও নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হাসন রাজার—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন (ধর্ম)॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদ্‌বয় (সুগন্ধ, দুর্গন্ধ)
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়॥

এ ছত্রগুলি ব্যবহার করেন, সেই হাসন রাজারই একটি গান আছে, 'হাওয়ার গাড়ি ধু ধা করে চলেছে (নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়ায় যে গাড়ি চলে অর্থাৎ শরীর) তার ভিতর সায়েব সোয়ারি (পরমাত্মা, আল্লা) বসে আছেন। হাসন রাজা (অর্থাৎ ব্যষ্টি পুরুষ) সেই সায়েবকে সেলাম করাতে (মর্মে মর্মে তাঁকে ভক্তিভরে অনুভব করাতে) তিনি হাসনকে আদর করে পাশে বসালেন।'

পুরো গানটি আমার স্মরণে নেই ; তবে শেষের দু'ছত্র আছে—

'হাসন রাজা, নাচতে আছে, 'আল্লা আল্লা' ধরি।
পবনের গাড়ি চলতে আছে ধু ধু ধা ধা করি' ॥

এখানে পবনের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, শ্রদ্ধেয় বসু মশায়েরও হাওয়া গাড়ি মোটামুটি একই। তাই অর্থ দাঁড়ায়, 'পবনের গাড়ি' অর্থাৎ 'আমার প্রাণবায়ু' চলে গেল, তবু আমার বন্ধু এল না। বলা বাহুল্য পুব-বাঙলার ভাটিয়ালী গীত রচয়িতা এবং পশ্চিম বাঙলার বাউল উভয়ই কিছুদিন আগে পর্যন্তও অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত স্রষ্টা ছিলেন বলে নূতন নূতন জিনিস আমদানি হলেও তাকে সিম্‌বল্, রূপক রূপে, এলেগরি করে মরমিয়া (মিস্টিক) গান রচনা করতেন। যেমন রেলগাড়ির ঘণ্টা বেজেছে (আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি বেজেছে), আমি যাত্রী ঘুমে অচৈতন্য (তমোগুণে আচ্ছন্ন) ইত্যাদি। বিজলি বাতি নিয়ে একটি গান আমার আবছা আবছা মনে পডছে। হাওয়া গাড়ি প্রবর্তিত হলে এ শতাব্দীর গোড়ার দি:ক ঐ 'মোতীফ' নিয়ে একাধিক গীত রচিত হয়।

*　　　*　　　*

প্রধানতঃ রিকশার চাপে কুট্টি গাড়োয়ান সম্প্রদায় ঢাকার রাস্তা থেকে প্রায় অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত এরা নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করে গিয়েছে—অনেকেরই ভুল বিশ্বাস, এদের রসিকতার একটি প্রাচীন ভাণ্ডার ছিল এবং তারা শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই খায়, আমি যে শেষ রসিকতাটি শুনেছি, সেটি ১৯৪৭।৪৮ সালে নির্মিত।

আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকার এক আত্মীয়কে শুধোই, 'মুসলিম লীগ কী রকম রাজত্ব চালাচ্ছেন ?'

তিনি বললেন, 'সে সম্বন্ধে একটি কুট্টি রসিকতা বাজারে চালু হয়েছে। অত্যন্ত ক্যারাকটিরিসটিক্—অর্থাৎ লীগের ক্যারাক্টার প্রকাশ করে। যদিও গল্পটি একটু 'রিস্‌কে'—অর্থাৎ গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে হয়।'

মুসলীম লীগ শাসনভার হাতে নিয়ে এক কুট্টি গাড়োয়ানকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন, সে যেন তার জাতভাইদের মধ্যে তাঁদের জন্য প্রচারকার্য বা প্রোপাগাণ্ডা করে। সে তাদের ডেকে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, 'ভাই সকল, শোনো (আমি এস্থলে কুট্টি ভাষার পরিবর্তে 'সাধুই' ব্যবহার করছি—লেখক)। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের মায়ের মত! মাকে যদি খাওয়াও পরাও তবে মায়ের দুধ তুমি-ই পাবে। খাজনাটা ট্যাক্সোটা ঠিকমত দাও ; মায়ের দুধ তুমিই পাবে।' তখন এক ব্যাক্‌বেঞ্চার (হেক্‌লার) বলে উঠলো, কইছো ঠিকই, লেকিন বাবা হালারা

যে খাইয়া ফুরাইয়া দিল।' অর্থাৎ মিনিস্টার, পলিটিশিয়ানের দলই সব লুটে নিচ্ছে।...মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ কারো প্রতিই আমাদের কোনো বৈরী ভাব নেই, তবে মনে হয়, গল্পটি বহু দেশ প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে খাটে।

* * *

এই কুট্টি গাড়োয়ানদের সম্বন্ধে শেষ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

পার্টিশনের, পূর্বে ও পরে, কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্ব পিতামাতা নির্ভয়ে তাঁদের কন্যাদের কুট্টির গাড়িতে তুলে দিতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক এরা ঠিক সময়ে মেয়েদের ফের ইস্কুল কলেজ থেকে ফিরিয়ে আনতো। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেলেও এবং শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে দাঙ্গার ফলে বাপ মা উধাও জানতে পেরে ভালো জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছে। কুট্টিরা এ জিম্মাদারীতে কখনো গাফিলি করেছে বলে শোনা যায়নি। এরা সত্যই শিভাল্‌রাস।

আর ঐ শিভাল্‌রাস কথাটা এসেছে ফরাসী 'শেভালিয়ের' থেকে। 'শেভাল' মানে ঘোড়া।

শেভালিয়ের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার। একদা খানদানী ফরাসীদের ছেলেরা এই ক্যাভালরি বা অশ্ববাহিনীর সদস্য ছিল। তাই বলছিলুম, কুট্টিরা আসলে মোগল বাহিনীর ঘোড়সওয়ার ছিল।

দরখাস্ত

এই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র ঝাড়া তেরোটি বচ্ছর কাজ করার পর মিন্ নোটিশে চাকরি হারাল। টাইপ করা একখানা কাগজ হাতে তুলে দিল, তার সারমর্ম—তোমাকে দিয়ে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই, কেটে পড়ো।

চোদ্দ বছর পর চাকরি গেলে খুব আশ্চর্য হতুম না। কারণ আজকাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থ চৌদ্দ বছর। তারপর মুক্তি। ঠিক সেইরকন আমার এক ফরাসী-বন্ধু তাঁর সিলভার ওয়েডিঙের পরবে আমায় শুধোলেন, আমাদের দেশে, জেলে ম্যাক্সিমাম ক'বছর পুরে রাখে? আমি ঐ উত্তর দিলে তিনি বললেন, 'তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

আমি শুধালুম, 'কিসের থেকে?'

কড়ে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বউকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ওর সঙ্গে

পঁচিশটি বৎসর বন্দী হয়ে কাটালুম। এখনো কি মুক্তি পাবো না?'

উল্টোটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম—নিজে বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন—ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে। বললেন, 'বিয়ের চোদ্দ বছর পর একদিন বউকে একটুখানি সামান্য কড়া কথা বলতেই সে ডান ভুরুটি একটু উপরের দিকে তুলে শুধলো, "ডালিং! তবে কি আমাদের হানি-মূন শেষ হয়ে গেল?" ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ঐ আমার আক্কেল হয়ে গেল। এরপর আর ককখনো রা-টি পর্যন্ত কাড়িনি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর যমজ সন্তান হলে পর আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে "যে লোক মোমবাতির খর্চা বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুয়ে পড়ে তারই যমজ সন্তান হয়"। ইংরেজ সেয়ানা; সঙ্গে সঙ্গে সক্কলকে একটা রাউণ্ড খাইয়ে দিলে।

এ বাবদে আমাকে লাখ কথার সেরা কথা শুনিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি—তখন অবশ্য তিনি কাশীতে সাদামাটা অধ্যাপক—জুলুদের অভিধানে নাকি স্বামীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকার জংলী পশু যাকে স্ত্রী পোষ মানায়।'

এবং দুই এক্সট্রিম সদাই মিলে যায় বলে অভিজাত চীনাদের অভিধানে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকারের বন্যজন্তু যাকে সম্পাদক পোষ মানায়।'

গেল চোদ্দটি বছর ধরে বঙ্গদেশের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চায় না। উত্তম শায়েস্তাপ্রাপ্ত কয়েদীকে জেলার ছাড়তে চায় না। বাড়ির এডা-সেডা করে দেয়—অথচ তাকে মাইনে দিতে হয় না।

আমি কিন্তু মহারাণীর কাছে আপীল করেছি—'চোদ্দ বছর পূর্বে ঠিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমার প্রথম বই বেরোয়। আজ ১৯৬৪, আমার ছুটি মঞ্জুর হোক।'

কুকর্ম করে মানুষ জেলে যায়। আমিও কুমতলব নিয়ে লেখক হয়েছিলুম।

সাধারণের বিশ্বাস, লেখকের কর্তব্য পাঠককে পরিচিত করে দেবে বৃহত্তর চিন্তা-জগতের সঙ্গে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবে মহান আদর্শের পানে, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জেরোম কে জেরোমের ভাষায়, তাকে 'এলিভেট' করবে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'মাই বুক উইল নট এলিভেট ঈভন্ এ কাউ!'

লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমতলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ-লাভ।

মহাকবি হাইনে একাধিকবার বলেছেন—তাই তাঁকে একাধিকবার উদ্ধৃত করতে আপত্তি নেই—'কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝেছি।' আমার বেলা তার চেয়েও সরেস। আমার হাতে অর্থ কখনোই আসেনি। কাজেই মূল্য বোঝা-না-বোঝার কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। আমি চিরটা কাল 'খেয়েছি লঙ্গরখানায়, ঘুমিয়েছি মস্‌জিদে'; কাজেই বছরটা আঠারো মাসে যাচ্ছিল।

এমন সময় লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে যিনি পুষতেন তিনি আল্লার ডাক শুনে ওপারে চলে গেলেন। বেহশ্‌তে গিয়েছেন নিশ্চয়ই; কারণ আমাকে নাহক পোষা ছাড়া অন্য কোনো অপকর্ম (গুনাহ্‌) তিনি করেননি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনের ঈভানং স্ট্যাণ্ডার্ডে বেরিয়েছে, ফ্লেমিঙের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'আন্‌অ্যাশেমর্ডলি আই অ্যাডমিট—আই রাইট ফর্ মানি।'

এরপর যে-সব পূর্বসূরিগণ নিছক অর্থের জন্যই লিখনবৃত্তি গ্রহণ করেন তাঁদের নাম করতে গিয়ে বাল্‌জাক্, ডিকেন্স, স্কট্, ট্রলোপের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিঃ কাউলি। তিনি তারপর আপন মন্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানেই থেমে যাওয়া কেন?' বস্‌ওয়েলের লেখা যাঁরা স্মরণে রাখেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন, ডঃ জনসনও এ-বাবদে কুহকাচ্ছন্ন ছিলেন না, 'নিতান্ত গাড়োল (blockhead) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'—এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তার চেয়েও বড় গাড়োল, যে টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারলো না।

আমি ডঃ জনসনের পদধূলি হওয়ার মতও স্পর্ধা ধরি নে; অতএব তাঁর মত কটুভাষা ব্যবহার না করে, অর্থাৎ কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে, সেই অনুযায়ী কে পাঠা, কে গোলাপফুল সে আলোচনা না করে শুধু বলবো আমি স্বয়ং লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

আমার বয়েস যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্। আর দেখ্, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।'

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন; তদুপরি আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একদা উত্তমরূপেই জমিদারী চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন চলে যাচ্ছিল তাই

বাগ্দেবীকে বানরীর মত ঘাগরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচতে হল না (এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অস্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া। বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ॥)

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। ১৯৩৮-এ গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন ? উত্তরে কি বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কায়ক্লেশে চলে গেল ১৯৪৯ পর্যন্ত। লঙ্গরখানা (অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট-মস্‌জিদে) বন্ধ হয়ে গেল তখন ; যেটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপ্‌রা কম্পজিস্ট রস্‌সীনি বলতেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপ্‌রা কম্পোজ করা ভিন্ন অন্য কোনো এলেম্ আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কম্পোজ করবো কোন্ দুঃখে !' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি এই আপ্তবাক্যটি ছাড়েন। তারপর তিনি বোধ হয় আরো দুটি অপ্‌রা তৈরি করেন—একবার নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেকবার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

রস্‌সীনির তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ঐ এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পয়সা কামাবার মত বিদ্যে আমার ব্রেন-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরি ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম। ফের চাকরি, ফের—ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজী' (পীপিং টম্—নোজী পার্কার) তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আমার চাকরি থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি ?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্ ফ্রম্ টাইম্ টু টাইম্)।'

ফরাসী শুধোলে, 'তাহলে চলে কি করে ?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছো ; আমি জব্‌গুলো দেখছি।'

পেটের দায়ে লিখেছি, মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা স্বেচ্ছায় না

লেখার কারণ—

(১) আমার লিখতে ভাল লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাই নে।

(২) এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক্ লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কি না, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যে রকম কোল্ড ব্লাডেড খুন হয়—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কি না?—শব্‌নমের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কি না, 'চাচা'টি কে, আমি আমার বউকে ডরাই কি না—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মত খাটাশ্‌টাকেও একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতায় ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতিমধ্যে আর কি করা যায়। এবং এসে রীতিমত হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ সৌম্যদর্শন নাতিবৃদ্ধ এক ভদ্রজন লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন বাঁধিপোতার গামছা পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মত লোম, মাথা-জোড়া-টাক—ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাতদিন খেউরি হয়ে নি বলে মুখটি কদমফুল,—হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!

আমি রীতিমত নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গত বৎসর মে মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফৎ সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন—তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তারপরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দাদন শোধের জন্য।

আর কথনো লিখব না, একথা বলছি নে। চাকরি গেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে।

উইট্‌নি বললে, 'ডান দিকে—ঠিক কোথায় জানি নে—বেশ বড় একটা দ্বীপ রয়েছে। সে একটা রহস্য—'

রেন্‌সফর্ড শুধালে, 'নাম কি দ্বীপটার ?'

'পুরানো দিনের ম্যাপে নাম রয়েছে "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ"। নামটার থেকেই অর্থ কিছুটা আমেজ করা যায়, নয় কি ? মাঝি-মাল্লাদের ভিতর দ্বীপটার প্রতি কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভয়। কি জানি কেন। কিছু একটা কুসংস্কার বোধ হয়—'

ইয়ট জাতের ছোট্ট জাহাজখানির চতুর্দিকে গরম দেশের গাঢ়, ভেজা ভেজা অন্ধকার যেন চেপে ধরেছে। তারই ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'ওটাকে দেখতে পাচ্ছি নে তো।'

উইট্‌নি হেসে বললেন, 'তোমার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর সে আমি জানি। চারশ গজ দূর থেকে মূস-মোষের মত শিকারকে ঝোপের ভিতর দেখে ফেলতে আমি তোমাকে দেখেছি কিন্তু ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের অন্ধকার রাত্রে চার পাঁচ মাইল দূর পর্যন্ত দেখা তোমারও কর্ম নয়।'

রেন্‌স্‌ফর্ড সম্মতি জানিয়ে বললে, 'চার গজও না। আখ্—অন্ধকারটা যেন কালো মখমল।'

উইট্‌নি যেন আশ্বাস দিয়ে বললে, 'রিয়ো পৌঁছলে বিস্তর আলোর মেলা পাবে, ভয় কি ! কয়েক দিনের ভিতরেই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছি। জাগুয়ার শিকারের বন্দুকগুলো পর্দোর কাছ থেকে পৌঁছে গেলেই হয়। আমাজন অঞ্চলে উত্তম শিকার পাবো বলে আশা করছি। শিকারের মত আর কোনো খেলই হয় না।'

'পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা খেল।' সম্মতি জানালে রেন্‌স্‌ফর্ড।

কিঞ্চিৎ সংশোধন করে উইট্‌নি বললে, 'শিকারীর পক্ষে—জাগুয়ারের পক্ষে নয়।'

'আবোল-তাবোল বকো না, উইট্‌নি। তুমি বড় বড় জানোয়ারের শিকারী—তুমি দার্শনিক নও। জাগুয়ার কি অনুভব করে, না করে—তাতে কার কি যায় আসে ?'

'হয়তো জাগুয়ারের যায় আসে '

'ছোঃ ! তারা আবার ভাবতে পারে নাকি ?'

'তা সে যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হয়, তারা অন্তত একটা জিনিস বোঝে—ভয়। যন্ত্রণার ভয় আর মৃত্যুভয়।'

'গাঁজা!'—হেসে উঠলো রেনস্‌ফর্ড। 'গরমে তোমার মগজ গলে যাচ্ছে—বুঝলে উইট্‌নি? বাস্তববাদী হতে শেখো। পৃথিবীতে দুটি শ্রেণী আছে। শিকারী আর শিকার। কপাল ভালো যে তুমি আমি শিকারী। আচ্ছা, আমরা কি ঐ দ্বীপটা পেরিয়ে এসেছি?'

'অন্ধকারে বলতে পারবো না। আশা তো করছি তা-ই।'

'কেন?'

'জায়গাটার নাম আছে—বদনাম।'

'নরখাদক আছে ওখানে?'

'তার সম্ভাবনা অল্পই। এমন লক্ষ্মীছাড়া জায়গাতে ওরাও থাকতে যাবে না। কিন্তু বদনামটা খালাসী-মাঝিদের মধ্যে যে করেই হোক রটে গেছে। লক্ষ্য করোনি আজ ওরা কি রকম যেন এক অজানা আতঙ্কে সন্ত্রস্ত ছিল?'

'তোমার বলাতে এখন মনে হচ্ছে, কেমন যেন তাদের ধরনধারণ আজ অন্য রকমের ছিল। কাপ্তান নীলসেন পর্যন্ত—'

'হ্যাঁ, এমন কি ঐ যে তাগড়া কলিজার বুড়ো সুইড্ নীলসেন—খুদ শয়তানের কাছে গিয়ে যে নির্ভয়ে দেশলাইটি চাইতে পারে, মাছের মত অসাড় তার নীল চোখেও আজ এমন ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম যেটা পূর্বে কখনো দেখিনি। যেটুকু বললে তার মোদ্দা, "খালাসী-লস্করদের ভিতর এ জায়গাটার ভারী দুর্নাম"। তার পর অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আমাকে শুধোলে "কেন, আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না?" যেন আমাদের চতুর্দিকের আকাশ-বাতাস বিষে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। দেখো, ঐ নিয়ে কিন্তু হেসে উঠো না, যদি বলি আমারও সর্বাঙ্গ যেন হঠাৎ হিম হয়ে গেল। ঐ সময়ে কোনো বাতাস বইছিল না। ফলে সমুদ্র জানলার শাসির মত পালিশ দেখাচ্ছিল। আমরা তখন ঐ দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল আমার বুকটা যেন শীতে জমে হিম হয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ যেন এক অজানা ত্রাসে।'

রেনস্‌ফর্ড বললে, 'নির্ভেজাল আকাশ-কুসুম! একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিক সমস্ত জাহাজের নাবিকদের মাঝে ভয় ছড়িয়ে দিতে পারে।'

'তাই হয়তো হবে। কিন্তু জানো, আমার মনে হয়, নাবিকদের যেন একটা আলাদা ইন্দ্রিয় আছে যেটা বিপদ ঘনিয়ে এলে তাদের জানিয়ে দেয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, অমঙ্গল যেন একটা বাস্তব পদার্থ—ধ্বনি বা আলোর থেকে

যে রকম তরঙ্গ বেরোয়, অমঙ্গলের শরীর থেকেও ঠিক তেমনি। সে ভাষায় বলতে গেলে বলবো, অমঙ্গলের পাপভূমি যেন বেতারে অমঙ্গল ছড়ায়। তা সে যা-ই হোক, এ এলাকাটা ছাড়িয়ে যেতে পারছি বলে আমি খুশী। যাক্ গে, আমি এখন শুতে চললুম, রেন্‌স্‌ফর্ড।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমার এখনো ঘুম পায়নি। পিছনের ডেকে বসে আমি আরেকটা পাইপ টেনে নিই।'

'তা হলে গুড নাইট্, রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল ব্রেকফাস্টে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে! গুড নাইট্, উইট্‌নি।'

রাত্রি নিস্তব্ধ নীবব। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যে ইঞ্জিন ইয়টটিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল শুধু তারই চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছিল আর তার সঙ্গে প্রপেলারের মার খেয়ে জলের শব্দ!

ডেক্-চেয়ারে হেলান দিয়ে অলসরভসে রেন্‌স্‌ফর্ড তার শখের ব্রায়ার পাইপে টান দিচ্ছিল। রাত্রি যেন ঘুমের ঢুলুঢুলু ভাব তার শরীরে আবেশ লাগাচ্ছিল। আপন মনে চিন্তা করলে, 'রাতটা এমনই অন্ধকার যে মনে হয় চোখের পাতা বন্ধ না করেই ঘুমুতে পারবো; রাতটিই হবে আমার চোখের পাতা—'

হঠাৎ একটা আওয়াজ এসে তাকে চমকে দিল। ডান দিক থেকে শব্দটা এসেছিল। এসব ব্যাপারে সে সজাগ, সব কিছু ঠিক ঠিক জানে। তার কান ভুল করতে পারে না। আবার সে সেই শব্দটা শুনতে পেল, তার পর আবার। ঐ দূরের অন্ধকারে কে যেন তিনবার গুলি ছুঁড়েছে।

কি রহস্য বুঝতে না পেরে রেন্‌স্‌ফর্ড লাফ দিয়ে উঠে ঝটিতি রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেই দিকে যেন চোখ ঠেলে দিল; কিন্তু এ যেন কম্বলের ভিতর দিয়ে দেখবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। আরেকটু উঁচু থেকে দেখবার জন্য সে রেলিঙের একটা রডে লাফ দিয়ে উঠে তার উপর দাঁড়ালো। তারই ফলে একটা দড়িতে লেগে তার পাইপটা মুখ থেকে ঠিকরে পড়ে যেতে সেটাকে ধরবার জন্য সে ঝটিতি সামনের দিকে ঝুঁকতেই তার গলা থেকে কর্কশ আর্তনাদ বেরুলো—কারণ সে তখন বুঝে গিয়েছে যে বড্ড বেশী এগিয়ে যাওয়ার ফলে সে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে। তার সে আর্তনাদ টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিলে ক্যারেবিয়ান সমুদ্রের কুসুম কুসুম গরম জল। তার মাথা পর্যন্ত তখন সে-জলে ডুবে গিয়েছে।

যেন ধস্তাধস্তি করে সে জলের উপরে উঠে চিৎকার দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ইয়টের দ্রুতগতির মারে ছুটে আসা জল যেন কষালে তার গালে চড় আর নোনা

জল তার খোলা মুখের ভিতরে ঢুকে যেন তার টুঁটি চেপে ধরে বন্ধ করে দিল। দু বাহু বাড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মরীয়া হয়ে ক্রমশ অদৃশ্যমান ইয়টের দিকে সাঁতার কাটতে লাগলো, কিন্তু পঞ্চাশ ফুট চলার পূর্বেই সে আর সে-চেষ্টা দিল না। ততক্ষণে তার মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে; জীবনে এই তার সর্ব-প্রথম কঠিন সঙ্কট নয়। জাহাজের কেউ তার চিৎকার শুনতে পাবে সে সম্ভাবনা অবশ্য একটুখানি ছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং ইয়ট যতই দ্রুতগতিতে এগুতে লাগলো সে-সম্ভাবনা ততই ক্ষীণতর হতে লাগলো। যেন পালোয়ানের মত শক্তি প্রয়োগ করে সে নিজেকে তার জামাকাপড় থেকে মুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু ইয়টের আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো, যেন দূরের ক্রমশ অদৃশ্যমান জোনাকি পোকা। সর্বশেষে ইয়টের আলোকগুলোকে অন্ধকার যেন শুষে নিল।

ইয়টের ডেকে বসে রেন্‌স্‌ফর্ড যে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সেগুলো তার স্মরণে এল। সেগুলো এসেছিল ডান দিক থেকে। চরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগলো—ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে সে ভেবেচিন্তে হাত দুখানা ব্যবহার করছিল। ক'বার সে হাত ছুঁড়ছে সেটা সে গুনতে আরম্ভ করলো: সম্ভবত সে আরো শ খানেক বার হাত ফেলতে টানতে পারবে, এমন সময়—

রেন্‌স্‌ফর্ড একটা শব্দ শুনতে পেল। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে উচ্চকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকারের শব্দ। কঠোরতম যন্ত্রণা ও ভীতির চিৎকার।

কোন্ প্রাণী এ আর্তরব ছাড়লো সে সেটাকে চিনতে পারলো না—চেষ্টাও করলো না। নবোদ্যমে সে সেই চিৎকারের দিকে সাঁতার কেটে এগুতে লাগলো। সেটা সে আবার শুনতে পেল। এবারে সেটা অন্য একটা ছোট্ট, হঠাৎ বেজে-ওঠা শব্দে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সাঁতার কাটতে কাটতে মৃদুকণ্ঠে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'পিস্তলের শব্দ।'

আরো দশ মিনিট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাঁতার কাটার পর রেন্‌স্‌ফর্ডের কানে আরেকটা ধ্বনি এল—জীবনে সে এরকম মধুর ধ্বনি আর কখনো শোনেনি—পাহাড়ী বেলাভূমির উপর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার মূর্ছনা এবং গুমরানো। পাড়ের পাথরগুলো দেখার পূর্বেই প্রায় সে সেখানে পৌছে গিয়েছে; রাত্রি অতখানি শান্ত না হলে ঢেউগুলো তাকে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে দিত। অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে সে কোনো গতিকে ঢেউয়ের দ' থেকে নিজেকে টেনে তুললো। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের পাড় বেরিয়ে এসেছে নিরেট অন্ধকার

থেকে। দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সে উপরের দিকে চড়তে আরম্ভ করলো। হাত তার ছড়ে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপরের সমভূমিতে এসে পৌছল। গভীর জঙ্গল সেই পাথুরে পাড়ের শেষ সীমা অবধি পৌছেছে। এই জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভিতর তার জন্য অন্য কোনো বিপদ আছে কি না, সে চিন্তা রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অন্তত তখন উদয় হল না। তার মনে তখন শুধু ঐটুকু যে, সে তার শত্রু সমুদ্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে আর তার সর্বাঙ্গে অসীম ক্লান্তি। জঙ্গলের প্রান্তে সে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়ে তার জীবনের গভীরতম নিদ্রায় ডুবে গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখে অপরাহ্ন শেষ হয় হয়। নিদ্রা তাকে নবীন জীবন রস দিয়েছে আর তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় পেট কামড়াতে আরম্ভ করেছে। প্রায় আনন্দের সঙ্গেই সে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো।

রেন্‌স্‌ফর্ড চিন্তা করলো, 'যেখানে পিস্তলের শব্দ হয় সেখানে মানুষ আছে। আর যেখানে মানুষ আছে সেখানে খাদ্যও আছে।' কিন্তু প্রশ্ন, কি রকমের মানুষ এরকম ভীষণ জায়গায় থাকে—এ চিন্তাও তার মনে উদয় হল। কারণ চোখের সামনেই একটানা আঁকাবাঁকা শাখা, এবড়ো খেবড়ো জড়ানো গুল্মলতা—একেবারে পাড় পর্যন্ত।

ঠাসবুনোটের লতাপাতা আর গাছের ভিতর দিয়ে সে সামান্যতম পায়ে চলার চিহ্ন বা পথও সে দেখতে পেল না। তার চেয়ে একেবারে পাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের কাছে কাছে এগিয়ে যাওয়াই সহজ। হোঁচট খেয়ে খেয়ে সে এগুতে লাগলো। যেখানে সে প্রথম পাড়ে নেমেছিল তার অদূরেই সে দাঁড়ালো।

নিচের ঝোপে কোনো আহত প্রাণী—চিহ্ন থেকে মনে হল বড় আকারেরই—আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়েছে। জঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়ে গিয়েছে আর শ্যাওলা থেঁতলে গিয়েছে। একটা জায়গা রক্তরাঙা। একটু দূরেই কি একটা চকচকে জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তুলে দেখলে কার্তুজের খোল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আপন মনে বললে, বাইশ নম্বরের। কি রকম অদ্ভুত ঠেকছে। আর ঐ শিকারটা বেশ বড় ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। খুবই ঠাণ্ডা মাথার শিকারী ছিল বলতে হবে যে তার সঙ্গে ঐ ছোট্ট হাতিয়ার নিয়ে মোকাবেলা করলো। আর এটাও তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে জন্তুটা বেশ লড়াইও দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, প্রথম যে তিনটে শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম তখন শিকারী তাকে দেখতে পেয়ে তিনটে গুলি ছুঁড়ে তাকে জখম করেছিল। তার পর তার পালিয়ে যাবার চিহ্ন ধরে ধরে এখানে এসে তাকে খতম করেছে। শেষ আওয়াজ

যেটা শুনতে পেয়েছিলুম সেটা সে-ই।

রেন্‌স্‌ফর্ড জমিটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে যা দেখতে পাবার আশা করেছিল তাই পেল—শিকারীর জুতোর চিহ্ন। সে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল জুতোর চিহ্ন সেই দিকেই গিয়েছে। উদগ্রীব প্রতীক্ষায় সে এগিয়ে চললো। কখনো বা পচা গাছের গুঁড়ি বা আধখসা পাথরে সে পিছলে যাচ্ছিল, কিন্তু অগ্রসর হচ্ছিল ঠিকই। দ্বীপের উপর তখন রাত্রির অন্ধকার আস্তে আস্তে নেমে আসছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড যখন প্রথম আলোকগুলো দেখতে পেল তখন ঠাণ্ডা অন্ধকার সমুদ্র আর জঙ্গলটাকে কালোয় কালোময় করে দিচ্ছিল। বেলাভূমির একটা বেঁকে-যাওয়া জায়গায় মোড় নিতে সে সেগুলো দেখতে পেল এবং প্রথমটায় তার মনে হয়েছিল সে কোনো গ্রামের কাছে এসেছে—কারণ আলো দেখতে পেয়েছিল অনেকগুলো। কিন্তু ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে বিস্মিত হল যে সব কটা আলো আসছে একই বিরাট বাড়ি থেকে—প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি, তার ছুঁচলো মিনারের মত টাওয়ার উপরের অন্ধকারের দিকে ঠেলে ধরেছে। বিরাট দুর্গের মত রাজপ্রাসাদের (শাটোর) আকার প্রচ্ছায়া তার চোখে ধরা পড়ল এবং দেখল শাটোটি একটি উঁচু জায়গার উপর নির্মিত। তার তিন দিকে খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সেখানে কালো ছায়াতে ক্ষুধার্ত সমুদ্র যেন দেওয়ালগুলো ঠোঁট দিয়ে চাটছে।

'মরীচিকাই হবে'—ভাবলে রেন্‌স্‌ফর্ড। কিন্তু যখন সে বাড়িটার ফলকওলা গেটটা খুললো তখন বুঝলো যে সেটা মোটেই মরীচিকা নয়। পাথরের সিঁড়িগুলোও যথেষ্ট বাস্তব; পুরু ভারী পাল্লার দরজাও যথেষ্ট বাস্তব—তার গায়ে রয়েছে দৈত্যমুখাকৃতি কড়া—কিন্তু তবু কেমন যেন সমস্ত জায়গাটার চতুর্দিকে অবাস্তবতার বাতাবরণ।

দরজার কড়া উপরের দিকে তুলে ঘা মারতে গেলে সেটা চড় চড় করলো; রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে হল ওটা যেন কখনো ব্যবহার করা হয়নি। কড়াটা ছেড়ে দিতেই সেটা এমনই সুগুরুগম্ভীর নিনাদ ছাড়লো যে রেন্‌স্‌ফর্ড নিজেই চমকে উঠলো। তার মনে হল ভিতরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল—দরজা কিন্তু খুললো না। সে তখন আবার কড়া তুলে ছেড়ে দিল। তখন এমনই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল যে তার মনে হল যে দরজাটা যেন স্প্রিং দিয়ে তৈরী। ঘরের ভিতর থেকে সোনালী অত্যুজ্জ্বল আলোর বন্যাধারা তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল। তার ভিতর দিয়ে রেন্‌স্‌ফর্ড সর্বপ্রথম যা দেখতে পেল সেটা তার

জীবনের এ পর্যন্ত দেখার মধ্যে সর্ববৃহৎ মনুষ্য কলেবর—বিরাট দৈত্যের মত আকার-প্রকার, নিরেট দড় মালে তৈরী, আর কোমর অবধি নেমে এসেছে কালো দাড়ি। তার হাতে লম্বা নালওলা রিভলভার আর সেটা সে নিশান করেছে সোজা রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকের দিকে।

সেই দাড়ির জঙ্গলের ভিতর থেকে দুটি ছোট্ট চোখ রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভয় পেয়ো না'—বলে রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিত হাস্য করলে; তার মনে আশা ছিল যে ঐ স্মিতহাস্য লোকটার মনের সন্দেহ দূর করে দেবে। 'আমি ডাকাত নই। একটা ইয়ট থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলুম, আমার নাম সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড—নিউ ইয়র্কের।'

কিন্তু লোকটার ভীতি-উৎপাদক দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হল না। রিভল-ভারটা নড়ন-চড়ন না করে ঠিক তেমনি তার বুকের দিকে নিশান করে রইল, যেন দৈত্যটা পাথরে তৈরী। রেন্‌স্‌ফর্ডের কথাগুলো যে সে বুঝতে পেরেছে তারও কোনো চিহ্ন দেখা গেল না—এমন কি সে আদপেই শুনতে পেয়েছে কি না তা-ই বোঝা গেল না। লোকটার পরনে কালো উর্দি—তার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের আস্ত্রাখান লোমের ঝালর।

রেন্‌স্‌ফর্ড আবার শুরু করলে, 'আমি নিউ ইয়র্কের সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ড। আমি একটা ইয়ট থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। আমার ক্ষিধে পেয়েছে।'

লোকটা উত্তরে শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে রিভলভারের ঘোড়াটা তুললো। তার পর রেন্‌স্‌ফর্ড দেখলো যে, লোকটার খালি হাতখানা মিলিটারি সেলাম দেবার কায়দায় কপাল ছুঁলো, এক জুতো দিয়ে অন্য জুতো ক্লিক করে এটেনশনে দাঁড়ালো। আরেক জন লোক চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন। ইভনিং ড্রেস পরা একদম খাড়া, পাতলা ধরনের লোক।

'বিখ্যাত শিকারী সেঙ্গার রেন্‌স্‌ফর্ডকে আমার বাড়িতে শুভাগমন জানাতে পেরে আমি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি।' চোস্ত খানদানী গলায় লোকটি কথাগুলি বললেন। তাতে বিদেশী উচ্চারণের সামান্য আমেজ ছিল বলে কথাগুলো যেন আরো সুস্পষ্ট, সুচিন্তিত বলে মনে হল।

আপনা-আপনি যেন রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলে।

লোকটি বুঝিয়ে বললেন, 'তিব্বতে বরফের চিতে বাঘ শিকার সম্বন্ধে আমি আপনার বই পড়েছি, বুঝলেন তো। আমার নাম জেনারেল জারফ।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম ধারণাই হল যে লোকটি অসাধারণ সুপুরুষ। দ্বিতীয়

হল যে জেনারেলের চেহারায় যেন এক অপূর্ব অনন্যতা, প্রায় বলা যেতে পারে বিচিত্র ধরন রয়েছে। লোকটি প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছেন, কারণ তাঁর চুল ধবধবে সাদা কিন্তু তাঁর ঘন ভুরু, আর মিলিটারি কায়দায় উপরের দিকে তোল ছুঁচলো গোঁফ মিশমিশে কালো—যেন ঠিক সেই অন্ধকারের কালো যার ভিতর থেকে রেন্‌স্‌ফড এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে। তাঁর চোখ দুটোও মিশমিশে কালো আর অত্যন্ত উজ্জ্বল। গালের হাড় দুটো তাঁর উঁচু, নাকটি টিকল আর মুখ শীর্ণ ধরনের ঈষৎ বাদামী,—এ ধরনের চেহারা হুকুম দিতে অভ্যস্ত—খানদানী লোকের চেহারা। জেনারেল সেই উর্দি-পরা দৈত্যটার দিকে তাকিয়ে ইশারা করাতে সে তার পিস্তল নামিয়ে নিয়ে তাঁকে সেলুট করে চলে গেল।

জেনারেল বললেন, 'ইভানের গায়ে অসুরের মত অবিশ্বাস্য শক্তি, কিন্তু বেচারীর কপাল মন্দ—সে বোবা আর কালা। সরল প্রকৃতির লোক, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার জাতের আর পাঁচ জনের মত একটুখানি বর্বর।'

'লোকটা কি রাশান ?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করাতে তাঁর লাল ঠোঁট আর ছুঁচলো দাঁত দেখা দিল। বললেন, 'কসাক। আমিও।' তার পর বললেন, 'চলুন, এখানে আর কথাবার্তা নয়। আমরা পরে সেটা করতে পারবো। আপনার এখন প্রয়োজন জামাকাপড়, আহারাদি এবং বিশ্রাম। সব পেয়ে যাবেন। এ জায়গাটি পরিপূর্ণ শান্তিময়।'

ইভান আবার দেখা দিল। জেনারেল তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন, শুদ্ধমাত্র ঠোঁট নেড়ে, কোন শব্দ উচ্চারণ না করে।

জেনারেল বললেন, 'আপনি দয়া করে ইভানের সঙ্গে যান। আপনি যখন এলেন তখন আমি সবে মাত্র ডিনারে বসেছিলুম। এখন আপনার জন্য অপেক্ষা করবো। আমার জামাকাপড় আপনার গায়ে ফিট করবে মনে হচ্ছে।'

বরগাওলা বিরাট এক বেডরুম, টোপরওলা যে বিছানা তাতে ছ'জন লোক শুতে পারে—সেখানে গিয়ে পৌঁছল রেন্‌স্‌ফর্ড নীরব দৈত্যের পিছনে পিছনে। ইভান একটি ইভনিং ড্রেস বের করে দিলে। পরার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড লক্ষ্য করলো স্যুটে লণ্ডনের যে দর্জির নাম সেলাই করা রয়েছে তারা সাধারণত ডিউকের নিচের পদবীর কারো জন্য স্যুট সেলাই করে না।

যে ডাইনিং রুমে ইভান তাকে নিয়ে গেল সেটাও বহু দিক দিয়ে লক্ষণীয়। ঘরটায় যেন ছিল মধ্যযুগীয় আড়ম্বর। দেয়ালে ওক কাঠের আস্তর, উঁচু ছাদ, বিরাট খাবার টেবিলে দু'কুড়ি লোক খেতে পারে—এসব সামন্তযুগের কোনো

ব্যারনের হলঘরের মত দেখাচ্ছিল। দেয়ালে লাগানো ছিল নানা প্রকারের পশুর মাথা—সিংহ, বাঘ, হাতী, ভালুক। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং বৃহৎ নমুনা রেন্‌স্‌ফর্ড ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেনি। সেই বিরাট টেবিলে জেনারেল একা বসে।

জেনারেল যেন প্রস্তাব করলেন, 'একটা ককটেল খাবেন তো, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?' ককটেলটি আশ্চর্য রকমের ভালো এবং রেন্‌স্‌ফর্ড আরো লক্ষ্য করলো যে টেবিলের সাজসরঞ্জামও সর্বোত্তম পর্যায়ের—টেবিলক্লথ, ন্যাপকিন, স্ফটিকের পাত্রাদি, রূপো এবং চীনেমাটির বাসনকোসন—সব কিছুই।

তাঁরা ঘন মশলাওলা সরে মাখানো বর্শ্‌ সুপ খাচ্ছিলেন। এ সুপটি রাশান-দের বড় প্রিয়। যেন আধো মাফ চাওয়ার ভঙ্গীতে জেনারেল জারফ বললেন, 'সভ্যতা যে-সব সুখ-সুবিধা দেয় আমরা এখানে সেগুলো রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দি। ত্রুটিবিচ্যুতি হলে মাফ করবেন। জনগণের গমনাগমনের বাঁধা রাস্তা থেকে আমরা যথেষ্ট দূরে—বুঝলেন তো? আপনার কি মনে হয় অনেক দূরের সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেছে বলে শ্যাম্পেনের স্বাদ খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'একদম না।' তার মনে হল জেনারেলটি অতিশয় অমায়িক ও যত্নশীল অতিথিসেবক—সত্যিকার বিশ্বনাগরিক। শুধু জেনারেলের একটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য রেন্‌স্‌ফর্ডের মনে অস্বস্তির সঞ্চার করছিল। যখনই প্লেট থেকে মুখ তুলে সে তাঁর দিকে তাকিয়েছে তখনই দেখেছে তিনি যেন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন, সূক্ষ্মতম ভাবে যাচাই করে নিচ্ছেন।

জেনারেল জারফ বললেন, 'আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়েছেন আমি আপনার নাম চিনলুম কি করে। বুঝেছেন কিনা, ইংরিজি, ফরাসী এবং জর্মন ভাষায় যেসব শিকারের বই বেরোয় আমি তার সব কটাই পড়ি। আমার জীবনের ব্যসন মাত্র একটি, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড—শিকার।'

সুপক ফিলে মিন্নো খেতে খেতে রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আপনার শিকারের মাথাগুলো চমৎকার। ঐ যে কেপ মহিষের মাথা—এত বড় মাথা আমি কখনো দেখিনি।'

'ও। ঐ ব্যাটা! পুরোদস্তুর দানব ছিল সে।'

'আপনার দিকে তেড়ে এসেছিল নাকি?'

'একটা গাছের উপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমার খুলিতে ফ্র্যাকচার হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমি ব্যাটাকে ঘায়েল করি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে বড় শিকারের ভিতর কেপের মোষই সব চেয়ে বিপজ্জনক শিকার।'

এক লহমার তরে জেনারেল কোন উত্তর দিলেন না—তাঁর লাল ঠোঁট দিয়ে তিনি সেই বিচিত্র স্মিত হাস্য হেসে যেতে লাগলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, 'না, আপনি ভুল করেছেন, স্যর! কেপ মহিষ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শিকার নয়।' তিনি মদের গেলাসে একটি ছোট্ট চুমুক দিলেন, 'এই দ্বীপে আমার খাস মৃগয়া ভূমিতে আমি তার চেয়েও বিপজ্জনক শিকার করে থাকি।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বিস্ময় প্রকাশ করে শুধোলে, 'এই দ্বীপে বড় শিকার আছে নাকি?'

জেনারেল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'সব চেয়ে বড়।'

'সত্যি?'

'ও! প্রকৃতিদত্ত নয়—নিশ্চয়ই। আমাকে স্টক্ করতে হয়।'

'আপনি কি আমদানি করেছেন, জেনারেল? বাঘ?'

জেনারেল স্মিত হাস্য করে বললেন, 'না। বাঘ শিকারে আমার আর কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই—কয়েক বছর হয়ে গেল বাঘের মুরোদ কতখানি তার শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে গিয়েছে। বাঘ আর আমাকে উত্তেজনা দিতে পারে না—কোনো সত্যকার বিপদে ফেলতে পারে না। আমি জীবন ধারণ করি বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড।'

জেনারেল তাঁর পকেট থেকে একটি সোনার সিগারেট-কেস বের করে তার অতিথিকে রুপালি টিপওলা একটি লম্বা কালো সিগারেট দিলেন; সুগন্ধি সিগারেট, —ধূপের মত সৌরভ ছাড়ে।

জেনারেল বললেন, 'আমরা অত্যুত্তম শিকার করবো—আপনাতে আমাতে। আপনার সঙ্গ পেলে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করবো।'

'কিন্তু কি ধরনের শিকার—'

'বলছি আপনাকে। আপনার খুব মজা লাগবে—আমি জানি। সবিনয়ে বলছি, আমি একটি নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছি। আপনাকে আরেক গেলাস পোর্টওয়াইন দেব কি?'

'ধন্যবাদ, জেনারেল।'

জেনারেল দুটি গেলাস পূর্ণ করে বললেন, 'ভগবান কোনো কোনো লোককে কবি বানান। কাউকে তিনি রাজা বানান, কাউকে ভিখিরি। আমাকে তিনি

বানিয়েছেন শিকারী। আমার পিতা বলতেন, আমার হাতখানি বন্দুকের ঘোড়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন খুবই ধনী ; ক্রিমিয়াতে তাঁর আড়াই লক্ষ একর জমি ছিল এবং শিকারে ছিল তাঁর চরম উৎসাহ। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন তিনি আমাকে ছোট্ট একটি বন্দুক দেন—বিশেষ অর্ডার দিয়ে সেটি মস্কোতে তৈরী করা হয়েছিল—চড়ুই শিকার করার জন্যে। আমি যখন ঐটে দিয়ে তাঁর কতকগুলো জাত টাকি মুর্গী মেরে ফেলি তিনি তখন আমাকে কোনো সাজা দেননি ; আমার তাগের তিনি প্রশংসা করলেন। দশ বছর বয়সে ককেসাসে আমি আমার প্রথম ভালুক মারি। আমার সমস্ত জীবন একটানা একটা শিকার। আমি ফৌজে যোগ দি—খানদানী ঘরের ছেলে মাত্রের কাছ থেকেই সে যুগে এই প্রত্যাশা করা হত—এবং কিছুকালের জন্য আমি একটা ঘোড়-সওয়ার কসাক ডিভিশনের কমাণ্ডারও হয়েছিলুম কিন্তু আমার সত্যকার আকর্ষণ সর্বসময়ই ছিল শিকার। সর্বদেশে আমি সর্বপ্রকারের জন্তু শিকার করেছি। আমি ক'টা জন্তু মেরেছি সেটা আপনাকে গুনে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

'রাশা যখন তছনছ হয়ে গেল তখন আমি দেশ ছাড়লুম। কারণ জারের একজন অফিসারের পক্ষে তখন সেখানে থাকা অবিবেচনার কাজ হত। অনেক খানদানী রাশান সর্বস্ব হারালেন। আমি কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রচুর মার্কিন শেয়ার কিনে রেখেছিলুম। তাই আমাকে কখনো মণ্টেকার্লোতে চায়ের দোকান করতে হবে না, বা প্যারিসে ট্যাক্সি ড্রাইভার হতে হবে না। অবশ্য আমি শিকার চালিয়ে যেতে লাগলুম। আপনাদের রকি অঞ্চলে গ্রিজলি, গঙ্গায় কুমীর, পূর্ব আফ্রিকায় গণ্ডার। আফ্রিকাতেই ঐ কেপ মহিষ আমাকে জখম করে ছ'-মাস শয্যাশায়ী করে রাখে। সেরে ওঠা মাত্রই আমি আমাজনে জাগুয়ার শিকার করতে বেরলুম, কারণ আমি শুনেছিলুম যে তারা অসাধারণ ধূর্ত হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কসাক বললেন, 'মোটেই না। বুদ্ধি সজাগ রাখলে আর জোরদার রাইফেল থাকলে তারা কোনো শিকারীর সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না। আমি মর্মান্তিক নিরাশ হলুম। এক রাত্রে আমি তাঁবুতে শুয়ে অসহ্য মাথাব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা আমার মাথায় ঢুকলো। শিকার আমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। এবং মনে রাখবেন শিকারই ছিল আমার জীবন। শুনেছি, মার্কিন দেশে ব্যবসায়ীরা আপন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে প্রায়ই যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েন, কারণ ঐ ব্যবসায়ই ছিল ওদের জীবন।'

রেন্‌সফর্ড বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

জেনারেল স্মিতহাস্য করলেন। 'আমার কিন্তু ভেঙে পড়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমাকে তা হলে কিছু একটা করতে হয়। দেখুন, আমার হল গিয়ে বিশ্লেষণকারী মন, মিস্টার রেন্স্‌ফর্ড। নিঃসন্দেহ সেই কারণেই আমি শিকারের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় এত আনন্দ পাই।'

রেন্স্‌ফর্ড বললে, 'এতে কোনো সন্দেহই নেই, জেনারেল জারফ।'

'তাই আমি নিজেকে শুধালুম, শিকার আমাকে এখন সম্মোহিত করে না কেন? আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট, মিস্টার রেন্স্‌ফর্ড, এবং আমি যতখানি শিকার করেছি আপনি ততখানি করেননি কিন্তু তবু আপনি হয়তো উত্তরটা অনুমান করতে পারবেন।'

'সেটা কি?'

'সোজাসুজি এই; শিকার তখন আমার কাছে আর "হয় হারি নয় জিতি" ধরনের বিষয় নয়। আমি প্রতিবারেই আমার শিকারকে খতম করছি। সব সময়। প্রতি বারেই। সমস্ত ব্যাপারটা তখন আমার কাছে অত্যন্ত সরল হয়ে গিয়েছে। আর পরিপূর্ণতার মত একঘেয়েমি আর কিছুতেই নেই।'

জেনারেল আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

'কোনো শিকারেরই আর তখন আমাকে এড়াতে পারবার সৌভাগ্য হত না। আমি দেমাক করছি না। এ যেন একেবারে অঙ্কশাস্ত্রের নিশ্চয়তা। পশুটার কি আছে?—তার পা আর সহজাত প্রবৃত্তি। অন্ধ প্রবৃত্তি তো বুদ্ধির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে না। এ চিন্তা যখন আমার মনে উদয় হল সে সময়টা আমার পক্ষে বিষাদময়, আপনাকে সত্যি বলছি।'

রেন্স্‌ফর্ড টেবিলের উপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গোগ্রাসে তাঁর কথা গিলছে।

জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'আমাকে কি করতে হবে, সেটা যেন একটা অনুপ্রেরণার মত আমার কাছে এল।'

'এবং সেটা কি?'

জেনারেল আত্মপ্রসাদের স্মিত হাস্য করলেন। মানুষ কোনো প্রতিবন্ধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটাকে অতিক্রম করতে পারলে যে মৃদু হাসি হাসে। বললেন, 'শিকার করার জন্য আমাকে নূতন পশু আবিষ্কার করতে হল।'

'নূতন পশু? আপনি ঠাট্টা করছেন।'

জেনারেল বললেন, 'মোটেই না। আমি শিকারের ব্যাপার নিয়ে কখনো মস্করা করি নে। আমার প্রয়োজন ছিল একটা নূতন পশুর। পেলুমও একটা

তাই আমি এই দ্বীপটা কিনলুম, বাড়িটা তৈরী করলুম এবং এখানে আমি আমার শিকার করি। আমার কাজের জন্য এই দ্বীপটি একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর—জঙ্গল আছে, তার ভিতর পায়ে চলা-ফেরার রীতিমত গোলকধাঁধা রয়েছে, পাহাড় আছে, জলাভূমি—'

'কিন্তু সেই পশুটা, জেনারেল জারফ ?'

জেনারেল বললেন, 'ও! এই দ্বীপ আমাকে পৃথিবীর সব চেয়ে উত্তেজনা-দায়ক শিকার করতে দিয়েছে। অন্য যে কোনো শিকারের সঙ্গে এর তুলনা এক লহমার তরেও হয় না। আমি প্রতিদিন শিকার করি এবং একঘেয়েমি আমার কাছেই আসতে পারে না কারণ আমার শিকার এমনই ধরনের যে তার সঙ্গে আমার বুদ্ধির লড়াই চালাতে পারি।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের মুখে হতভম্ব ভাব।

'আমি চেয়েছিলুম শিকারের জন্য একটা আদর্শ পশু। তাই আমি নিজেকে শুধালুম, "আদর্শ শিকারের কোন্ কোন্ গুণ থাকে ?" তার উত্তর স্বভাবতই ; "তার সাহস, চাতুর্য, এবং সর্বোপরি সে যেন বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে"।'

রেন্‌স্‌ফর্ড আপত্তি জানালে, 'কিন্তু কোনো পশুরই তো বিচারশক্তি নেই।'

জেনারেল বললেন, 'মাই ডিয়ার দোস্ত, একটা পশুর আছে।'

'কিন্তু আপনি তো সত্যিই সেটা বলতে—' রেন্‌স্‌ফর্ডের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

'না কেন ?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারি নে যে আপনি যথার্থ কথা বলছেন, জেনারেল জারফ। একটা বীভৎস রসিকতা।'

'আমি যথার্থ কথা বলবো না কেন ? আমি শিকারের কথা বলছি।'

'শিকার ? ভগবান সাক্ষী, আপনি যা বলছেন সে তো খুন !'

জেনারেল পরিপূর্ণ খুশ মেজাজে হেসে উঠলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের দিকে তিনি মজার সঙ্গে তাকালেন। বললেন, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যে আপনার মত সভ্য ও আধুনিক যুবা—আপনাকে দেখলে সেই তো মনে হয়—মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা পোষণ করবে। নিশ্চয়ই যুদ্ধে আপনার অভিজ্ঞতা—'

রেন্‌স্‌ফর্ড কঠিন কণ্ঠে বললো, 'নৃশংস খুন ক্ষমা করতে দেয় না।'

উচ্চহাস্যে জেনারেল দুলতে লাগলেন। বললেন, 'কী অসাধারণ মজার মানুষ আপনি! আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে—এমন কি আমেরিকাতেও

—এ ধরনের হাবাগোবা সরলবিশ্বাসী—আর যদি অনুমতি দেন তবে বলি—মধ্য ভিক্টোরীয় ধারণার মানুষ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তবে কিনা, কোনো সন্দেহ নেই আপনার পূর্বপুরুষ গোঁড়া শুদ্ধাচারী (প্যুরিটান) ছিলেন। কত না আমেরিকাবাসীর পিতৃপুরুষ এই সম্প্রদায়ের। আমি বাজী ধরছি, আমার সঙ্গে শিকারে বেরুলে এসব ধারণা আপনি ভুলে যাবেন। আপনার অদৃষ্টে খাঁটি নূতন রোমাঞ্চকর উত্তেজনা সঞ্চিত রয়েছে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি শিকারী ; খুনী নই।'

বিচলিত না হয়ে জেনারেল বললেন, 'হায়, আবার সেই অপ্রিয় শব্দ! কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি আপনার কাছে প্রমাণ করতে পারবো, আপনার নৈতিক দ্বিধা ভিত্তিহীন।'

'সত্যি?'

'জীবন জিনিসটাই শক্তিমানের জন্য, বেঁচে থাকবে শক্তিমান, এবং প্রয়োজন হলে সে জীবন নিতেও পারে। দুর্বলদের এই পৃথিবীতে রাখা হয়েছে শক্তিমানকে আনন্দ দেবার জন্য। আমি শক্তিমান। আমি আমার বিধিদত্ত উপহার কাজে খাটাবো না কেন? আমি যদি শিকার করতে চাই তবে করবো না কেন? তাই আমি দুনিয়ার যত আবর্জনাকে শিকার করি—রদ্দি জাহাজের খালাসী, মাঝিমাল্লা, কৃষ্ণাঙ্গ, চীনা, শ্বেতাঙ্গ, দুআঁসলা—একটি অবিমিশ্র রক্তের ঘোড়া বা কুকুর এদের কুড়িটার চেয়ে মূল্যবান।'

রেন্‌স্‌ফর্ড গরম হয়ে বললে, 'কিন্তু তারা মানুষ।'

জেনারেল বললেন, 'হুবহু খাঁটি কথা। সেই কারণেই আমি ওদের ব্যবহার করি। আমি তাতে আনন্দ পাই। তারা বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, অবশ্য যার ঘটে যেমন বুদ্ধি সেইটুকু দিয়ে। তাই তারা বিপজ্জনক।'

'কিন্তু শিকারের জন্য মানুষ যোগাড় করেন কি প্রকারে?' রেন্‌স্‌ফর্ড শুধালে।

ক্ষণতরে জেনারেলের বাঁ চোখের পাতাটি নড়ে গিয়ে যেন কটাক্ষ মারলো। উত্তর দিলেন, 'এ দ্বীপের নাম "জাহাজ-ফাঁদ দ্বীপ"। কখনো কখনো ঝঞ্ঝামথিত ক্রুদ্ধ সমুদ্রদেব আমার কাছে ওদের পাঠিয়ে দেন। যখন ভাগ্যদেবী অপ্রসন্না, তখন আমি তাঁকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করি। আমার সঙ্গে জানলার কাছে আসুন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড জানলার কাছে এসে বাইরের সমুদ্রের দিকে তাকালো।

জেনারেল বলে উঠলেন, 'লক্ষ্য করুন! ঐ ওখানে বাইরে!' রেন্‌স্‌ফর্ড

শুধু নিশির অন্ধকার দেখতে পেল। তারপর যেই জেনারেল একটি বোতাম টিপলেন অমনি দূর সমুদ্রে একাধিক আলোর ছটা দেখতে পেল।

জেনারেল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, 'ঐ আলোকগুলোর অর্থ, ওখানে চ্যানেল পথ আছে—যেখানে সে জাতীয় কিছুই নেই। বিরাট বিরাট পাথর তাদের ক্ষুরের মত ধারালো পাশ নিয়ে হাঁ করে ঘাপটি মেরে বসেছে সমুদ্র-দৈত্যের মত। তারা অতি অক্লেশে একখানা জাহাজ গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে পারে—এই যে রকম আমি অক্লেশে এই বাদামটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি।' তিনি শক্ত কাঠের মেঝের উপর একটি বাদাম ফেলে দিয়ে জুতোর হিল দিয়ে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিলেন। যেন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিতান্ত কথায় কথায় বললেন, 'আমার ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা আছে। আমরা এখানে সভ্য থাকবার চেষ্টা করি।'

'সভ্য? আর আপনি গুলি করে মানুষ খুন করেন?'

জেনারেলের কালো চোখে ক্রোধের সামান্য রেশ দেখা দিল। কিন্তু সেটা এক সেকেণ্ডের তরে। অতি অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'হায় কপাল! কী অদ্ভুত নীতিবাগীশ তরুণই না আপনি। আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি আপনি যা বলতে চাইছেন আমি সে রকম কিছুই করি না। সেটা হবে বর্বরতা। আমি আমার অতিথিদের চরম খাতির যত্ন করে থাকি। তারা প্রচুর খাদ্য পায়, প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রম করে শরীর সুস্থ সবল রাখতে পায়। তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার হয়ে ওঠে। কাল আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'মানে?'

মুচকি হেসে জেনারেল বললেন, 'কাল আমরা আমার ট্রেনিং স্কুল দেখতে যাবো। ইস্কুলটা মাটির নীচের সেলারে। উপস্থিত সেখানে আমার প্রায় ডজন খানেক ছাত্র আছে। তারা এসেছে হিস্‌পানি বোট "সানলুকার" থেকে—জাহাজখানার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা ঐ হোথায় পাথরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব কটাই অতিশয় নিরেস, বাজে-মার্কা—ডেকের উপর চলাফেরাতে যতখানি অভ্যস্ত জঙ্গলে ততখানি নয়।'

তিনি হাত তুলতেই ইভান—সে-ই ওয়েটারের কাজ করছিল—গাঢ় টার্কিশ কফি নিয়ে এল। রেন্‌স্‌ফর্ড অতি কষ্টে নিজেকে কথা বলা থেকে ঠেকিয়ে রাখছিল।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে খোলাখুলি ভাবে জেনারেল বলে যেতে লাগলেন, 'বুঝতে পারছেন তো এটা হচ্ছে শিকারের ব্যাপার। আমি এদের একজনকে

আমার সঙ্গে শিকারে যেতে প্রস্তাব করি। আমি তাকে যথেষ্ট খাদ্য আর উৎকৃষ্ট একখানা শিকারের ছোরা দিয়ে আমার তিন ঘণ্টা আগে বেরুতে দিই। পরে বেরুই আমি, সবচেয়ে ছোট ক্যালিবারের আর সবচেয়ে কম পাল্লার মাত্র একটি পিস্তল নিয়ে। পুরো তিন দিন যদি সে আমাকে এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তবে সে জিতলো। আর আমি যদি তাকে খুঁজে পাই—'জেনারেল মুচকি হেসে বললেন, 'তবে সে হারলো।'

'সে যদি শিকার হতে রাজী না হয় ?'

'ও! সেটা বাছাই করা নিশ্চয়ই আমি তার হাতে ছেড়ে দি। সে যদি না খেলতে চায় তবে খেলবে না। সে যদি শিকারে যেতে রাজী না হয় তবে আমি তাকে ইভানের হাতে সমর্পণ করি। ইভান একদা মহামান্য শ্বেত জারের সরকারি চাবুকদারের সম্মানিত চাকরি করেছে। এবং খেলাধুলা, শিকার বাবদে সে আপন নিজস্ব ধারণা পোষণ করে। কোনো ব্যত্যয় হয় না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, কোনো ব্যত্যয় হয় না। তারা সব্বাই আমার সঙ্গে শিকার করাটাই পছন্দ করে নেয়।'

'আর যদি তারা জিতে যায় ?'

জেনারেলের মৃদু হাস্য আরো বিস্তৃত হল। বললেন, 'আজ পর্যন্ত আমি হারিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'আপনি ভাববেন না, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, আমি দেমাক করছি। বস্তুত এদের বেশীর ভাগই অতিশয় সরল সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে দু-একটা দুঁদে দেখা দেয় বটে। একজন প্রায় জিতে গিয়েছিল। শেষটায় কুকুরগুলোকে ব্যবহার করতে হয়েছিল আমাকে।'

'কুকুর ?'

'এদিকে আসুন ; আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জেনারেল রেন্‌স্‌ফর্ডকে একটা জানলার কাছে নিয়ে গেলেন। জানলার আলোগুলো নিচের আঙিনায় আলো-ছায়ার হিজিবিজি প্যাটার্ন তৈরী করছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড সেখানে ডজন খানেক বিরাট আকারের কালো প্রাণীকে নড়াচড়া করতে দেখলো। তারা তার দিকে মুখ তুলতেই তাদের চোখে সবুজ রঙের ঝিলিমিলি খেলে গেল।

জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'আমার মতে উত্তম শ্রেণীর। প্রতি রাত্রে সাতটার সময় এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কেউ যদি আমার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে

কিংবা বেরিয়ে যাবার—তবে তার পক্ষে সেটা শোচনীয় হতে পারে।' জেনারেল গুন গুন করে ফলি বের্জেরের একটি গানের কলি ধরলেন।

জেনারেল বললেন, 'এখন আমি যে নূতন মাথাগুলো জমিয়েছি সেগুলো আপনাকে দেখাতে চাই। আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসবেন কি?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আশা করছি, আজকে রাত্রের মত আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আমার শরীরটা আদপেই ভালো যাচ্ছে না।'

জেনারেল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বললেন, 'আহা, তাই নাকি! কিন্তু সেইটেই তো স্বাভাবিক—এতখানি দীর্ঘ সাঁতার কাটার পর। আপনার প্রয়োজন রাত্রি-ভর শান্তিতে সুনিদ্রা। কাল তাহলে আপনার মনে হবে, আপনি যেন নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন—আমি বাজী ধরছি। তখন আমরা শিকারে বেরুবো—কি বলেন? কালকে শিকার উত্তম হবে বলেই আমি আশা করছি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড তখন তাড়াতাড়ি সে-ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে।

জেনারেল পিছন থেকে গলা তুলে বললেন, 'আজ যে আপনি আমার সঙ্গে শিকারে বেরুতে পারছেন না তার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। আজ ভালো শিকারের আশা আছে—বড় সাইজের, তাগড়া নীগ্রো। দেখে তো মনে হচ্ছে অন্ধিসন্ধি জানে—আচ্ছা, গুড নাইট, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড! আশা করি রাত্রিটা পুরো বিশ্রাম পাবেন।'

বিছানাটা ছিল খুব ভাল, বিছানায় পরার পাজামা কুর্তা সব চেয়ে নরম রেশমের তৈরী, তার সর্ব পেশী-স্নায়ুতে ক্লান্তি, কিন্তু তবুও নিদ্রার ওষুধ দিয়ে সে তার মগজটাকে শান্ত করতে পারলো না—পড়ে রইল দুটো খোলা চোখ মেলে। একবার তার মনে হল, তার ঘরের সামনের করিডরে কার যেন চুপিসাড়ে চলার শব্দ শুনতে পেল। সে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলো; খুললো না। জানলার কাছে গিয়ে সে বাইরের দিকে তাকালো। তার ঘরটা ছিল উঁচু টাওয়ারগুলোর একটাতে। বাড়ির আলো তখন নিভে গিয়েছে। নীরব, অন্ধকার। শুধু আকাশে এক ফালি পাণ্ডুর চাঁদ; তারই ফ্যাকাশে আলোতে সে আঙিনায় আবছায়া দেখতে পাচ্ছিল। কতকগুলো নিস্তব্ধ কালো আকারের কি যেন সেখানে আনাগোনা করে আলো-ছায়ার আলপনা কাটছিল; কুকুরগুলো জানলাতে তার শব্দ শুনতে পেয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষায় তাদের সবুজ চোখ তুলে তাকালো। রেন্‌স্‌ফর্ড বিছানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সে বহু পদ্ধতিতে চেষ্টা করলো। তার পর যখন কিছুটা ফল পেয়ে, পাতলা ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে—ঠিক ভোরের দিকে তখন অতি দূর জঙ্গলের ভিতর সে পিস্তল

ছোঁড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল।

দুপুরের খাওয়ার পূর্বে জেনারেল জারফ দেখা দিলেন না। লাঞ্চে যখন এলেন তখন তাঁর পরনে গ্রামাঞ্চলের জমিদারের নিখুঁত টুইডের স্যুট। তিনি রেন্‌স্‌ফর্ডের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনারেল বললেন, 'আর আমার কথা যদি তোলেন, তবে বলি আমার ঠিক ভালো যাচ্ছে না। আমার মনে দুশ্চিন্তা, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড। কাল রাত্রে আমি আমার পুরোনো ব্যারামের চিহ্ন অনুভব করলুম।'

রেন্‌স্‌ফর্ডের চাউনিতে প্রশ্ন দেখে জেনারেল বললেন, 'একঘেয়েমি। বৈচিত্র্যহীনতার অরুচি।'

আপন প্লেটে আবার খানিকটা ক্রেপ স্যুজেৎ তুলে নিয়ে জেনারেল বুঝিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে ভালো শিকার হয়নি। লোকটার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। সে এমন সোজাসুজি চলে গিয়েছিল যে তাতে করে কোনো সমস্যারই উদ্ভব হল না। খালাসীগুলোকে নিয়ে এই হল মুশকিল। একে তো আকাট, তায় আবার বনের ভিতর চলাফেরার কৌশল জানে না। নিরেট বোকার মত এমন সব করে যা দেখা মাত্রই স্পষ্ট বোঝা যায়। ভারি বিরক্তিজনক। আরেক গেলাস শাবলি চলবে কি মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড?'

রেন্‌স্‌ফর্ড দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'জেনারেল, আমি এখ্‌খুনি এই দ্বীপ ত্যাগ করতে চাই।'

জেনারেল তাঁর দুই ঝোপ-ভুরু উপরের দিকে তুললেন; মনে হল তিনি যেন আঘাত পেয়েছেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'সে কি দোস্ত! আপনি তো সবে এসেছেন। শিকারও তো করেননি—'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'আমি আজই যেতে চাই।' তার পর দেখে, জেনারেলের কালো চোখ দুটো তার দিকে মড়ার চোখের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে যেন যাচাই করে নিচ্ছে। হঠাৎ জেনারেল জারফের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বোতল থেকে প্রাচীন দিনের শাবলি ঢাললেন রেন্‌স্‌ফর্ডের গেলাসে। বললেন, 'আজ রাত্রে আমরা শিকারে বেরুবো—আপনাতে আমাতে।'

রেন্‌স্‌ফর্ড ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বললে, 'না জেনারেল, আমি শিকারে যাবো না।'

জেনারেল ঘাড় দুটো তুলে নামিয়ে অসহায় ভাব দেখালেন। বাগানের কাঁচের ঘরে বিশেষ করে ফলানো একটি আঙুর মোলায়েমসে খেতে খেতে

বললেন, 'আপনার অভিরুচি, দোস্ত! কি করবেন, না করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার হাতে। তবে যদি অনুমতি দেন তবে বলবো, শিকার-খেলা সম্বন্ধে ইভানের ধারণার চেয়ে আমার ধারণা আপনার অধিকতর মনঃপূত হবে।'

যে কোণে ইভান দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে জেনারেল মাথা নাড়লেন। দৈত্যটা সেখানে তার পিপের মত পুরু বুকের উপর দু' বাহু চেপে ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে তাকাচ্ছিল।

রেন্‌স্‌ফর্ড আর্তকণ্ঠে বললো, 'আপনি কি সত্যি বলতে চান—'

জেনারেল বললেন, 'প্যারা দোস্ত! আমি কি আপনাকে বলিনি, শিকার সম্বন্ধে আমি যা-ই বলি না কেন, সেটা সত্য সত্য বলি। কিন্তু এটা আমার খাঁটি অনুপ্রেরণা। আসুন, আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে আমি পান করি।'

জেনারেল তাঁর গেলাস উঁচু করে তুলে ধরলেন; কিন্তু রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর দিকে শুধু স্থির নয়নে তাকিয়ে রইল।

সোৎসাহে জেনারেল বললেন, 'আপনি দেখবেন এ শিকার শিকারের মত শিকার। আপনার বুদ্ধি আমার বুদ্ধির বিপক্ষে। আপনার শক্তি, আপনার লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা—আমার বিরুদ্ধে। মুক্তাকাশের নিচে দাবা খেলা! এবং যে বাজী ধরা হবে তার মূল্যও কিছু কম নয়—কি বলেন?'

'আর যদি আমি জিতি—', রেন্‌স্‌ফর্ডের গলা থেকে শব্দগুলো যেন ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বেরুল।

জেনারেল জারফ বললেন, 'তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রি অবধি যদি আমি আপনাকে খুঁজে না পাই তবে আমি সানন্দে আপন পরাজয় স্বীকার করে নেব। আমার নৌকা আপনাকে পার্শ্ববর্তী দেশের কোন শহরের কাছে ছেড়ে আসবে।'

জেনারেল যেন রেন্‌স্‌ফর্ডের চিন্তা পড়ে ফেলে বললেন, 'ও। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ভদ্রলোক এবং শিকারী হিসেবে আমি আপনাকে প্রত্যয় দিচ্ছি। অবশ্য আপনাকেও তার বদলে কথা দিতে হবে যে এখানে আপনার আগমন সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললেন, 'আমি আদপেই এরকম কোনো কথা দেব না।'

জেনারেল বললেন, 'ও! তাহলে—কিন্তু এখন কেন সে আলোচনা? তিন দিন পরে দুজনাতে এক বোতল ভ্যভ্‌ক্লিকো খেতে খেতে সে আলোচনা করা যাবে, অবশ্য যদি—'

জেনারেল মদে চুমুক দিলেন।

কারবারী লোকের ব্যস্ততা তাঁকে সজীব করে তুললো। রেন্‌স্‌ফর্ডকে বললেন, 'ইভান আপনাকে শিকারের কোটপাতলুন, আহারাদি ও একখানা ছোরা দেবে। আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে বলি, আপনি নরম চামড়ার তালিওলা জুতোই পরবেন। ওতে করে চলার পথে দাগ পড়ে কম। এবং পরামর্শ দি, দ্বীপের দক্ষিণপূব কোণের বিস্তীর্ণ জলাভূমিটা মাড়াবেন না। আমরা ওটাকে "মরণ-জলা" নাম দিয়েছি। ওখানে চোরাবালি আছে। এক আহাম্মুক ঐ দিক দিয়ে চেষ্টা দিয়েছিল। শোকের বিষয় যে, ল্যাজ্‌রাস্‌ তার পিছনে পিছনে যায়। আপনি আমার বেদনাটা কল্পনা করে নিতে পারবেন, মিস্টার রেন্‌স্‌ফড´। আমি ল্যাজ্‌রাস্‌কে ভালোবাসতুম; আমার দলের ঐটেই ছিল সবচেয়ে সরেস ডালকুত্তা। তাহলে, এখন আপনার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি। দুপুরে আহার করার পর আমি একটু গড়িয়ে নিই। আপনি কিন্তু নিদ্রার ফুরসৎ পাবেন না। নিশ্চয়ই আপনি রওয়ানা হতে চাইবেন। গোধূলি বেলার পূর্বে আমি আপনার পেছনে বেরুবো না। রাত্রিবেলার শিকারে উত্তেজনা অনেক বেশী, দিনের চেয়ে—কি বলেন? আচ্ছা তবে দেখা হবে, মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, ও রিভোয়া।'

নিচু হয়ে নম্র অভিবাদন জানিয়ে জেনারেল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ইভান অন্য দরজা দিয়ে ঘরে এল। তার এক বগলে শিকারের খাকি পোশাক, খাবারের হ্যাভারস্যাক্‌, চামড়ার খাপের ভিতর লম্বা ফলাওলা শিকারের ছোরা। তার ডান হাত রক্তরঙের কোমরবন্ধের ভিতরে গোঁজা রিভলভারের তোলা ঘোড়ার উপর।

দু'ঘণ্টা ধরে রেন্‌স্‌ফর্ড ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেন লড়াই ক'রে চলেছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করেছে, 'আমি মাথা গরম হতে দেব না, আমার মাথা গরম হলে চলবে না।'

শাটোর গেট্‌ যখন তার পিছনে কড়াক্‌ করে বন্ধ হয়ে যায় তখন তার মাথা খুব পরিষ্কার ছিল না। প্রথমটায় তার সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল তার আর জেনারেল জারফের মাঝখানে যতখানি সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে, আর ঐ উদ্দেশ্য মনে রেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে। যেন এক করাল বিভীষিকা ঘোড়-সওয়ারের জুতোর কাঁটার মত খোঁচা মেরে মেরে তাকে সম্মুখপানে খেদিয়ে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু এতক্ষণে সে অনেকখানি আত্মকর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে; সে দাঁড়িয়ে গিয়ে তার নিজের পরিস্থিতিটা বিচার-বিবেচনা করতে লাগলো।

সোজা, শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই—কারণ তাতে করে সে সমুদ্রের কাছে গিয়ে মুখোমুখি হবে। সে যেন চতুর্দিকে সমুদ্রের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির মাঝখানে ; সে যা-ই করুক না কেন, এই ফ্রেমের ভিতরই তাকে সেটা করতে হবে।

রেন্‌স্‌ফর্ড বিড়বিড় করে বললে, 'দেখি, আমার চলার পথ সে খুঁজে বের করতে পারে কিনা।' এতক্ষণ সে জঙ্গলের কাঁচা পায়ে-চলার-পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেটা ছেড়ে এখন নামলো দিকদিশেহীন ঘন জঙ্গলের ভিতর। সে অনেকগুলো জটিল ঘোর-প্যাঁচ খেয়ে তার উপর দিয়ে বার বার এলোপাতাড়ি আসা যাওয়া করতে করতে শেয়াল-শিকারের সমস্ত কলকৌশল, আর শেয়ালের এড়িয়ে যাবার তাবৎ ধূর্ত সধন্ধ-সুড়ুক স্মরণে আনতে লাগলো। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নামলো তখন সে গভীর জঙ্গলে ভরা একটা টিলার প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। পা দুটো শ্রমক্লান্ত, হাত আর মুখ জঙ্গলের শাখা-প্রশাখার আঁচড়ে ভর্তি। সে বেশ বুঝতে পারলো, এখন তার গায়ে শক্তি থাকলেও এই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে চলাটা হবে বদ্ধ পাগলামি। এখন তার বিশ্রাম নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। মনে মনে ভাবলো, 'এতক্ষণ আমি শেয়ালের যা করার তাই করেছি, এখন বেড়ালের খেলা খেলতে হবে।' কাছেই ছিল একটা বিরাট গাছ—মোটা গুঁড়ি আর বিস্তৃত কাণ্ড নিয়ে। অতি সাবধানে সামান্যতম চিহ্ন না রেখে সে গাছ বেয়ে উঠে যেখানে একটা মোটা শাখা গুঁড়ি থেকে বেরিয়েছে সেখানে চওড়া শাখাটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে যতখানি পারা যায় বিশ্রামের ব্যবস্থা করলো। এই বিশ্রান্তি তার বুকে যেন এক নূতন আত্মবিশ্বাস এনে দিল ; এমন কি সে অনেকখানি নিরাপত্তাও অনুভব করতে লাগলো। মনে মনে নিজেকে বললে, জেনারেল জারফ যত বড় উৎসাহী শিকারীই হোন না কেন এখানে তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না। সে যে গোলকধাঁধার প্যাঁচ পিছনে রেখে এসেছে তার জট ছাড়িয়ে অন্ধকারে এই জঙ্গলের ভিতর একমাত্র শয়তানই এগুতে পারবে। কিন্তু হয়তো জেনারেল একটা শয়তানই—

আহত সর্প যে রকম ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, এই উদ্বেগময়ী রজনীও সেই রকম কাটতে লাগলো, এবং জঙ্গলে মৃতা ধরণীর নৈস্তব্ধ্য বিরাজ করা সত্ত্বেও রেন্‌স্‌ফর্ডের চোখের পাতায় ঘুম নামলো না। ভোরের দিকে যখন আকাশ ঘোলাটে পাঁশুটে রঙ মাখছিল তখন চমকে-ওঠা একটা পাখীর চিৎকার রেন্‌স্‌ফর্ডের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করলো। কি যেন একটা আসছে ঝাড়-ঝোপের ভিতর দিয়ে—ধীরে, সাবধানে—সেই এলোপাতাড়ি গোলকধাঁধা বেয়ে,

ঠিক যেভাবে রেন্‌স্‌ফর্ড এসেছিল। ডালের উপর চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে পড়ে সে পাতায় বোনা প্রায় কার্পেটের মত পুরু আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যে বস্তু আসছিল সে মানুষ।

জেনারেল জারফ! সর্ব চৈতন্য কেন্দ্রীভূত করে, গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে তিনি এগিয়ে আসছিলেন। প্রায় ঠিক গাছটার সামনে তিনি দাঁড়ালেন, তার পর মাটিতে হাঁটু গেড়ে জমিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুমাত্র চিন্তা না করে রেন্‌স্‌ফর্ডের প্রথম রোখ চেপেছিল নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্য করলো জেনারেলের ডান হাতে ধাতুর তৈরী কি একটা বস্তু—ছোট্ট একটি অটোম্যাটিক পিস্তল।

শিকারী কয়েকবার মাথা নাড়লেন, যেন তিনি ধন্ধে পড়েছেন। তার পর সটান খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কেস্‌ থেকে তাঁর কালো একটা সিগারেট বের করলেন; তার তীব্র সুগন্ধ ভেসে উঠে রেন্‌স্‌ফর্ডের নাকে পৌছল।

রেন্‌স্‌ফর্ড দম বন্ধ করে রইল!

জেনারেলের চোখ তখন মাটি ছেড়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। রেন্‌স্‌ফর্ড বরফের মত জমে গিয়েছে, তার সব কটা মাংসপেশী লাফিয়ে পড়ার জন্য টনটন করছে। কিন্তু যে ডালটার উপর রেন্‌স্‌ফর্ড শুয়েছিল ঠিক সেখানে পৌছবার পূর্বে শিকারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেমে গেল। তার রোদে পোড়া মুখে দেখা দিল স্মিত হাস্য। যেন অতিশয় সুচিন্তিতভাবে তিনি ধুঁয়োর একটি রিং উপরের দিকে উড়িয়ে দিলেন; তারপর গাছটার দিকে পিছন ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফি... চললেন। ঘাস-পাতার উপর তাঁর শিকারের বুটের খস্‌খস্‌ শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো।

ফুসফুসের ভিতরে রেন্‌স্‌ফর্ডের বন্ধ প্রশ্বাস উগ্র বিস্ফোরণের মত ফেটে বেরুলো। তার মনে প্রথম যে চিন্তার উদয় হল সেটা তাকে ক্লিষ্ট, অবশ করে দিল। শিকার যেটুকু সামান্যতম চিহ্ন রেখে যেতে বাধ্য হয় জেনারেল সেই খেই ধরে রাতের অন্ধকারে বনের ভিতর এগুতে জানেন; তিনি ভুতুড়ে শক্তি ধরেন। সামান্যতম দৈববশে কসাক তাঁর শিকার এবার দেখতে অক্ষম হয়েছেন।

রেন্‌স্‌ফর্ডের দ্বিতীয় চিন্তা বীভৎসতর রূপে উদয় হল। সে কুচিন্তা তার সর্বসত্তার ভিতর মরণের হিমের কাঁপন তুলে দিল। জেনারেল মৃদু হাস্য করলেন কেন? তিনি ফিরে চলে গেলেন কেন?

তার সুস্থ বিচার-বুদ্ধি তাকে যে কথা বলছিল রেন্‌স্‌ফর্ড সে-সত্য বিশ্বাস করতে চাইল না—অথচ ঠিক সেই সময় প্রভাত-সূর্য যে রকম কুয়াশা ভেদ করে

বেরিয়ে এসেছিল সে সত্য ঠিক ঐ রকমই প্রত্যক্ষ। জেনারেল তাঁর সঙ্গে শিকার খেলা খেলছেন! আরেক দিনের শিকার খেলার জন্য জেনারেল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখছেন! কসাকই বেরাল; সে ইঁদুর। মৃত্যুর আতঙ্ক তার পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে এই প্রথম রেন্‌স্‌ফর্ডের কাছে আত্মপ্রকাশ করলো।

'আমি আত্মকর্তৃত্ব হারাবো না, কিছুতেই না।'

সে গাছ থেকে পিছলে নেমে আবার ঘন বনের ভিতর ঢুকলো। তার মুখ তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন এবং সে তার মস্তিষ্কযন্ত্র সবলে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়ে দিল। প্রায় তিন শ গজ দূরে সে বিরাট একটা মরাগাছের গুঁড়ির সামনে দাঁড়াল। সেটা বিপজ্জনক ভাবে পড়ো-পড়ো হয়ে একটা ছোট জ্যান্ত গাছের উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার খাবারের ব্যাগ মাটিতে ফেলে দিয়ে খাপ থেকে শিকারের ছোরা বের করে পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কর্ম সমাপ্ত হল। শ'ফুট খানেক দূরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল। রেন্‌স্‌ফর্ড তার আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বেরালটা ঐ তো আবার আসছে, ইঁদুরের সঙ্গে খেলবে বলে!

ডালকুত্তার মত দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে জেনারেল জারফ আসছেন রেন্‌স্‌ফর্ডের খেই ধরে ধরে। তাঁর সদাসন্ধানী কালো চোখকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না—একটি মাত্র থেঁতলে যাওয়া ঘাসের পাতা না, বেঁকে যাওয়া ছোট্ট ডালের টুকরোটি না, শ্যাওলার উপর ক্ষীণতম চিহ্নটি না—হোক না সে যতই ক্ষীণ। সন্ধান খুঁজে খুঁজে এগুতে গিয়ে জেনারেল এতই নিমগ্ন ছিলেন যে রেন্‌স্‌ফর্ড তাঁর জন্য যে জিনিসটি তৈরী করেছিল সেটা না দেখার পূর্বেই তার উপরে এসে পড়লেন। তাঁর পা পড়লো সামনে-এগিয়ে-পড়া একটা ঝোপের উপর—এইটেই রেন্‌স্‌ফর্ডের পাতা ফাঁদের হ্যাণ্ডিল। কিন্তু তাঁর পা ঐটে ছোঁয়া মাত্রই জেনারেলের চৈতন্যে বিপদের পূর্বাভাস চমক মারলো—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র বানরের মত তিনি তড়িৎ বেগে পিছনের দিকে লাফ দিলেন। কিন্তু যতখানি ক্ষিপ্র হওয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক ততখানি হননি; কাটা জ্যান্ত গাছের উপর সন্তর্পণে রাখা মরা গাছটা মড়মড়িয়ে পড়ার সময় জেনারেলের ঘাড়ের উপর মারলো ট্যারচা ঘা। জেনারেলের ক্ষিপ্র বিদ্যুৎগতি না থাকলে তিনি গাছের তলায় নিঃসন্দেহে গুঁড়িয়ে যেতেন। টাল খেয়ে তিনি টলতে লাগলেন বটে কিন্তু মাটিতে পড়লেন না; এবং পিস্তলটিও হস্তচ্যুত হল না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জখমী ঘাড়টাতে হাত ঘষতে লাগলেন। রেন্‌স্‌ফর্ডের বুকটাকে সেই

ভীতি আবার পাকড়ে ধরেছে ; সে শুনতে পেল জেনারেলের ব্যঙ্গ-হাস্য জঙ্গলের ভিতর খলখলিয়ে উঠছে।

তিনি যেন ডেকে বললেন, 'রেন্স্ফর্ড, আপনি যদি আমার কণ্ঠস্বরের পাল্লার ভিতরে থাকেন—এবং আমার বিশ্বাস আছেন, তবে আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই। মালয় দেশের মানুষ ধরার ফাঁদ খুব বেশী লোক বানাতে জানে না। কিন্তু আমার কপাল ভালো যে আমিও মালাক্কাতে শিকার করেছি। আপনি সত্যি এখন আমার কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছেন। আমি এখন আমার জখমটাকে পট্টি বাঁধতে চললুম ; জখমটা সামান্যই। কিন্তু আমি ফিরে আসছি। আমি ফিরে আসছি।'

জেনারেল যখন তাঁর ছড়ে-যাওয়া ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে চলে গেলেন তখন রেন্স্ফর্ড আবার আরম্ভ করলো তার পলায়ন। এবারে সত্যকার পলায়ন—আশাহীন, জীবনমরণের পলায়ন, এবং সে পলায়ন চললো কয়েক ঘণ্টা ধরে। গোধূলির আলো নেমে এল, তার পর অন্ধকার হল, তবু তার অগ্রগতি বন্ধ হল না। পায়ের নিচের মাটি তখন নরম হতে আরম্ভ করেছে, গুল্মলতা ঘনতর নিবিড়তর হতে লাগলো, পোকাগুলোও ভীষণভাবে তাকে কামড়াতে আরম্ভ করেছে। তার পর আরেকটু এগুতেই তার পা জলা মাটিতে ঢুকে বসে গেল। সে তার পা-টা মুচড়ে টেনে বের করবার চেষ্টা করলো কিন্তু সেই চোরা-কাদা বিরাট জোঁকের মত তার পা পাশবিক শক্তির সঙ্গে শুষতে লাগলো। প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে রেন্স্ফর্ড তার পা-খানা মুক্ত করলো। সে তখন বুঝতে পেরেছে, কোথায় এসে পৌঁচেছে! এ সেই 'মরণ-জলা' তার চোরাবালি নিয়ে।

তার হাত দুটি তখন মুষ্টিবদ্ধ। যেন তার বিচারবুদ্ধির সুস্থ স্নায়ুবল ধরা-ছোঁয়ার জিনিস এবং সেইটাকে অন্ধকারে কে যেন তার কব্জা থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ থলথলে মাটি তার মনে এক নূতন কৌশল এনে দিল। চোরাবালি থেকে ডজনখানেক ফুট পিছিয়ে গিয়ে যেন কোনো আদিম অন্ধকার যুগের মৃত্তিকা খননদক্ষ বিরাট বীভারের মত সে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

ফ্রান্সে যুদ্ধের সময় মাটি খুঁড়ে রেন্স্ফর্ড ট্রেঞ্চের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে—তখন এক সেকেণ্ডের বিলম্ব হওয়ার অর্থ ছিল মৃত্যু। তখনকার মৃত্তিকাখনন এর তুলনায় তার কাছে গদাইলস্করী চালের খেলাধুলো বলে মনে হল। গর্তটা গভীর হতে গভীরতর হতে লাগলো ; যখন সেটা তার ঘাড়ের চেয়েও গভীর হল তখন সেটার থেকে বেয়ে উঠে কতকগুলো শক্ত গাছের চারা কেটে ডগাগুলো

সূচাগ্র তীক্ষ্ণ করে বানালো বর্শার মত করে। ডগাগুলো উপরমুখো করে সেগুলো সে পুঁতে দিল গর্তের তলাতে। আগাছা আর ছোট ছোট ডাল নিয়ে দ্রুত হস্তে একটা এবড়ো-খেবড়ো কার্পেটের মত করে বুনলো এবং সেটা গর্তের উপর পেতে মুখটা বন্ধ করে দিল। ঘামে জবজবে ভেজা ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর নিয়ে সে গুঁড়ি মেরে বসলো একটা বাজে পোড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে।

সে বুঝতে পেরেছে তার তাড়নাকারী আসছে ; নরম মাটির উপর পায়ের থপ থপ শব্দ সে শুনতে পেয়েছে এবং রাত্রের মৃদু বাতাস জেনারেলের সিগারেট-সৌরভ তার কাছে নিয়ে এসেছে। তার মনে হল যেন জেনারেল অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন ; আগের মত এক ফুট এক ফুট করে সমঝে-বুঝে আসছেন না। যেখানে গুঁড়ি মেরে রেন্‌স্‌ফর্ড বসে ছিল সেখান থেকে সে জেনারেল বা গর্তটা কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। প্রত্যেকটি মিনিট যেন তার কাছে এক একটা বছরের আয়ুষ্কাল বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তার পর, হঠাৎ সে উল্লাসভরে সানন্দে চিৎকার করতে যাচ্ছিল—কারণ সে শুনতে পেয়েছে মড়মড় করে গর্তের ঢাকনা ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছে ; ধারালো কাঠের ডগাতে পড়ে কে যেন বেদনার তীক্ষ্ণ আর্তরব ছেড়েছে। তার লুকানো জায়গা থেকে সে লাফ দিয়ে উঠেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মুষড়ে গিয়ে পিছু হটলো। গর্ত থেকে তিন ফুট দূরে একজন মানুষ ইলেকট্রিক টর্চ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেনারেলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'শাবাশ রেন্‌স্‌ফর্ড, তোমার বর্মা-পদ্ধতিতে তৈরী গর্তটা আমার সবচেয়ে সেরা কুকুরদের একটাকে গ্রাস করেছে। আবার তুমি জিতলে। এবারে দেখবো মিস্টার রেন্‌স্‌ফর্ড, তুমি আমার পুরো পাল কুকুরের বিরুদ্ধে কি করতে পার। আমি এখন বাড়ি চললুম একটু বিশ্রাম করতে। ভারি আমোদে কাটলো সন্ধ্যাটা —তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জলাভূমির কাছে শুয়ে রাত কাটানোর পর ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙল এমন একটা শব্দ শুনে যেটা তাকে বুঝিয়ে দিল যে ভয় বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে এখনো তার নূতন-কিছু শেখবার আছে। শব্দটা আসছিল দূর থেকে—ক্ষীণ, এবং ভাসা ভাসা। এক পাল কুকুরের চিৎকার।

রেন্‌স্‌ফর্ড জানতো, সে দুটোর একটা করতে পারে। যেখানে আছে সেখানেই থেকে অপেক্ষা করা। সেটা আত্মহত্যার সামিল। কিংবা সে ছুট লাগাতে পারে। সেটা হবে অবধারিতকে মূলতুবী করা। এক মুহূর্তের তরে সে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো। তার মাথায় যা এল সেটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ। কোমরের বেল্ট শক্ত করে নিয়ে সে জলাভূমি ত্যাগ করলো।

কুকুরগুলোর চিৎকার আরো কাছে আসছে, তারপর আরো কাছে, তার চেয়েও আরো কাছে। পাহাড়ের খাড়াইয়ের উপরে একটা গাছে চড়ে রেন্‌স্‌ফর্ড দেখতে পেল, একটি জলধারার পোয়াটাক মাইল দূরে একটা ঝোপ নড়ছে। চোখ যতদূর সম্ভব পারে টাটিয়ে দেখতে পেল জেনারেলের একহারা শরীর আর তার সামনে আরেকজনের বিশাল স্কন্ধ জঙ্গলের উঁচু বোনো ঘাস ঠেলে ঠেলে এগুচ্ছে। এ সেই নরদানব ইভান। তাকে যেন কোন্‌ অদৃশ্য শ ক্ত টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে; রেন্‌স্‌ফর্ডের বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না সে কুকুর-গুলোর চেন হাতে ধরে রেখেছে।

যে কোনো মুহূর্তে তারা তার ঘাড়ে এসে পড়বে। তার মগজ তখন ক্ষিপ্র-বেগে চিন্তা করছে। ইউগাণ্ডায় শেখা গ্রামবাসীদের একটা ফন্দি তার মনে এল। গাছ থেকে নেমে সে একটা লিকলিকে চারাগাছের সঙ্গে তার শিকারের ছোরাটার ডগা নিচের দিকে মুখ করে বাঁধলে সে যে-পথ দিয়ে এসেছে তার ঠিক উপরে; সর্বশেষে চারাগাছটাকে লতা দিয়ে ধনুর মত বাঁকিয়ে পিছন দিকে বাঁধলো। তার পর সে দিল প্রাণপণ ছুট। কুকুরগুলো ইতিমধ্যে আবার তার গন্ধ পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে তীব্রতর স্বরে। এইবারে রেন্‌স্‌ফর্ড হৃদয়ঙ্গম করলো, কোণ-ঠাসা শিকারের বুকে কোন অনুভূতি জাগে।

দম নেবার জন্য তাকে থামতে হল। হঠাৎ কুকুরগুলোর চিৎকার থেমে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেন্‌স্‌ফর্ডের হৃদ্‌স্পন্দনও যেন থেমে গেল। তাহলে তারা নিশ্চয়ই ছোরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

রেন্‌স্‌ফর্ড উত্তেজনার চোটে চড়চড় করে একটা গাছে উঠে পিছনপানে তাকালো। তার তাড়নাকারীরা তখন দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু গাছে চড়ার সময় রেন্‌স্‌ফর্ড তার হৃদয়ে যে আশা পুষেছিল সেটা লোপ পেল; সে দেখতে পেল শুকনো উপত্যকার উপর জেনারেল জারফ আপন পায়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ইভান নয়। জ্যা মুক্ত চারাগাছের আঘাতে ছোরাটা সম্পূর্ণ নিষ্ফলকাম হয়নি।

রেন্‌স্‌ফর্ড হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে না পড়তে কুকুরগুলো আবার চিৎকার করে উঠলো।

আবার দৌড়তে আরম্ভ করে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলছে, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, হবে, হবে।' একদম সামনে, গাছগুলোর ফাঁকে দেখা দিয়েছে এক ফালি নীলরঙের ফাঁকা। রেন্‌স্‌ফর্ড প্রাণপণ ছুটলো সেদিক পানে। পৌঁছল সেখানে। সেটা সমুদ্রের পাড়। সমুদ্র সেখানে খানিকটে ঢুকে গিয়ে ছোট্ট

উপসাগরের মত আকার ধরেছে। রেন্‌স্‌ফর্ড তারই ওপারে দেখতে পেলো বিষণ্ণ পাণ্ডুটে পাথরের তৈরী জেনারেলের শাটো। রেন্‌স্‌ফর্ডের পায়ের বিশ ফুট নিচে সমুদ্র গজরাচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস করছে। রেন্‌স্‌ফর্ড দোটানায়। শুনতে পেল কুকুরগুলোর চিৎকার। লাফ দিয়ে পড়ল দূরে, সমুদ্রে।

জেনারেল আর তাঁর কুকুরের পাল সে জায়গায় পৌঁছলে পর তিনি সেখানে থামলেন। কয়েক মিনিটের তরে তিনি তাকিয়ে রইলেন নীলসবুজ বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে। ঘাড়ের ঝাঁকুনি দিয়ে 'যাকগে' ভাব প্রকাশ করলেন। তার পর মাটিতে বসে রূপোর ফ্লাস্ক থেকে ব্রাণ্ডি খেয়ে সুগন্ধি সিগারেট ধরিয়ে 'মাদাম বাটারফ্লাই' গীতিনাট্য থেকে খানিকটা গান গুনগুন করে গাইলেন।

সে রাত্রে তাঁর কাঠের আস্তরওলা বিরাট ডাইনিং হলে জেনারেল জারফ অত্যুৎকৃষ্ট ডিনার খেলেন। সঙ্গে পান করলেন এক বোতল পল রজের আর আধ বোতল শ্যাবেরত্যাঁ। দুটি যৎসামান্য বিরক্তিকর ঘটনা তাঁকে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগে বাধা দিল মাত্র। তার একটা, ইভানের স্থলে অন্য লোক পাওয়া কঠিন হবে এবং অন্যটা, তাঁর শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল বলে—স্পষ্টই দেখা গেল যে মার্কিনটা আইন মাফিক শিকারের খেলাটা খেলল না। ডিনারের পর লিক্যোরে চুমুক দিতে দিতে অন্তত জেনারেলের তাই মনে হল। আরাম পাবার জন্য তাই তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে মার্কুস্‌ আউরেলিয়ুসের রচনা পড়লেন। দশটার সময় তিনি শোবার ঘরে ঢুকলেন। দোরে চাবি দিতে দিতে তিনি আপন মনে বললেন, আজকের ক্লান্তিটা তাঁর বড় আরামের ক্লান্তি। সামান্য একটু চাঁদের আলো আসছিল বলে তিনি বাতি সুইচ্‌ করার পূর্বে জানলার কাছে গিয়ে নিচে আঙিনার দিকে তাকালেন। বিরাট কুত্তাগুলোকে দেখে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আসছে বারে তোমাদের কপাল ভালো হবে, আশা করছি।' তার পর তিনি আলো সুইচ্‌ করলেন।

খাটের পর্দার আড়ালে যে লোকটা লুকিয়ে ছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে।

জেনারেল চেঁচিয়ে বললেন, 'রেন্‌স্‌ফর্ড! ভগবানের দোহাই, তুমি এখানে এলে কি করে?'

রেন্‌স্‌ফর্ড বললে, 'সাঁতরে। আমি দেখলুম, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে না এসে এ ভাবেই তাড়াতাড়ি হয়।'

জেনারেল ঢোক গিললেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি শিকারে জিতেছেন।'

রেন্‌স্‌ফর্ড স্মিতহাস্য হাসলো না। নিচু স্বরে হিসহিসিয়ে সে বললে, 'আমি এখনো কোণ-ঠাসা শিকারের পশু। তৈরী হোন, জেনারেল জারফ!'

জেনারেল যে ভাবে নিচু হয়ে বাও করলেন সেটা তাঁর গভীরতম বাওয়ের একটি। বললেন, 'তাই নাকি? চমৎকার! আমাদের একজনকে কুত্তাগুলোর খানা হতে হবে। অন্যজন ঘুমুবে এই অতি উৎকৃষ্ট শয্যায়। এসো রেন্‌স্‌ফর্ড, হুঁশিয়ার...'

রেন্‌স্‌ফর্ড সিদ্ধান্ত করলো, এর চেয়ে ভাল বিছানায় সে কখনো ঘুমোয় নি॥*

অপর্ণার পারণা বা স্যালাড

বাসনা ছিল দু-একটি গাল-গল্প বলার পর যখন আসর খানিকটা ওম পেয়েছে তখন এই লেখাটিতে হাত দেব কিন্তু হিসেব করে দেখি সে আর হয় না। স্যালাড পাতা বাজারে ফুরিয়ে যাওয়ার পর এ লেখা বেরলে কে আর সেটি ন'মাস বাঁচিয়ে রাখবে? এমন কি মনে হচ্ছে এমনিতেই বোধহয় কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে গেল। অবশ্য কলকাতা এবং হিলস্টেশনে যাঁরা থাকেন তাঁদের কথা আলাদা।

স্যালাড শব্দের মূল অর্থ 'নোনতা' কিন্তু এখন শব্দটি অন্য নানা অর্থে ব্যবহার হয়। প্রধানত কাঁচা পাতা খাওয়ার অর্থে। তাই আমি যখন কোনো ইয়োরোপীয়কে পান দি, তখন বলি, 'হ্যাভ্‌ সাম নেটিভ স্যালাড।'—অবশ্য তারা পান বলতে সেটাকে স্যালাডের ভিতর ধরেনি।

স্যালাড বললে দেশে-বিদেশে প্রধানত লেটিস (ইংরেজিতে বানান lettuce কিন্তু উচ্চারণ লেটিস) স্যালাডই বোঝায়। তার নানা জাত-বর্ণ আছে কিন্তু এদেশে প্রধানত হেড্‌ এবং লীফ্‌ এই ধরনেরই রেওয়াজ বেশী। হেড্‌ অর্থাৎ মাথা—এ লেটিস দেখতে অনেকটা বাঁধাকপির মত। আর লীফ্‌ স্যালাডে থাকে শুধু পাতা। দুটোরই বাইরের দিকের পাতাগুলো পুরু এবং তেতো বলে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের নরম-বস্তু কাজে লাগাতে হয়। আর যদি আপন বাগানে লীফ্‌ ফলিয়ে থাকেন তবে সূর্য ওঠবার সময়—আগে হলে আরো ভাল—প্রয়োজন মত যে কটি পাতা দরকার সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন লেটিসের ভিতরকার দিক থেকে ছিঁড়ে তুলে নেবেন (ভিন্ন ভিন্ন লেটিসে সে-সব জায়গায় আবার নূতন কচি পাতা

* বিদেশী গল্পের অনুবাদ

গজাবে, বাইরের দিকে যে পাতাগুলো ছেঁড়েননি সেগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে)। কেউ কেউ বলেন স্যালাড তৈরী করা পর্যন্ত পাতাগুলো ভিজিয়ে রাখতে, আমি বলি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখতে।

অমলেট, মাছভাজা যেমন বেশী আগে তৈরী করে রাখা হয় না, স্যালাডও তেমনি খেতে বসার যত অল্পক্ষণ আগে করা যায় ততই ভালো; না হলে পাতাগুলো নেতিয়ে একাকার হয়ে যায়।

সবচেয়ে ঘরোয়া আটপৌরে স্যালাড কি করে বানাতে হয় তারই বর্ণনা দিচ্ছি। এটা বানাতে যে-সব মাল-মসলা লাগে সেগুলো আপনার ভাঁড়ারে আর সব্জার ঝুড়িতেই আছে—আপনাকে শুধু কিছু লেটিস পাতা কিনে আনতে হবে। আপনার যদি স্যালাড সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞানগম্যি থাকে তবে আপনি এখানেই তীব্র কণ্ঠে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'কিন্তু অলিভ ওয়েল?—সে তো আমাদের ভাঁড়ারে থাকে না!' দাঁড়ান বলছি, ওটা বড্ড আক্রা জিনিস—এমন কি খাজা ভেজালটাও কম আক্রা নয়। সেকথা পরে আসছে।

বাজার কিংবা বাগান থেকে লেটিস পাতা এনে তার বাইরের পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাইরের কটা পাতা? যত বেশী ফেলবেন, ভেতরের কচি পাতার গুণে স্যালাড তত সুস্বাদু হবে, কিন্তু তা হলে তো পরিমাণ এত কমে যাবে যে খরচায় পোষাবে না। অতএব আপনাকেই চিন্তা করে স্থির করতে হবে, বাইরের কটা পাতা ফেলে দেবেন। এ ব্যাপারে পাকা গিন্নীর মত বড্ড বেশী কঞ্জুসি করবেন না, কারণ লেটিস অতিশয় সস্তা জিনিস।

ভিতরের যে পাতাগুলো বাছাই করে নিলেন সেগুলো অতি সযত্নে ধুয়ে নেবেন। ধোয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ওগুলো থেকে ধুলোবালি ছাড়ানো—আর কিছু নয়। তার পর পাতাগুলো হাত দিয়ে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে নেবেন, এই মনে করুন টুকরোগুলো যেন তিন ইঞ্চির মত লম্বা হয়। কিন্তু সাবধান! বঁটি দিয়ে কাটবেন না। যে-জিনিস কাঁচা খাওয়া হয় সেগুলো লোহা দিয়ে কাটা উচিত নয়—এ তো জানা কথা। স্টেনলেস স্টিলের ছুরি অবশ্য ব্যবহার করতে পারেন—অথবা যাকে বলা হয় ফ্রুট নাইফ বা ফল কাটার ছুরি। কিংবা ঝিনুক, কিংবা বাঁশের ছিলকে দিয়ে। কাঁচা আম মা-মাসীরা যে পদ্ধতিতে কাটেন—বাংলা কথা। কিন্তু লেটিসের পাতা ছিঁড়বেন হাত দিয়েই। এগুলো দরকার হবে পরের জিনিসগুলো কাটবার জন্য।

এইবারে ছেঁড়া পাতাগুলো চিনেমাটির কিংবা শুধু মাটির চ্যাপ্টা থালাতে রাখুন। কাঁসা বা পেতল সম্পূর্ণ বর্জনীয়। কারণ এতে নেবুর রস আসবে।

সবচেয়ে ভালো হয়, ময়দা ছাঁকার ছাঁকনির উপর রাখলে। তাহলে পাতার গায়ের জল ঝরে পড়ে পাতাগুলো ফের শুকনো হয়ে যায়।

তার পর মোটা সাদা পেঁয়াজ চাকতি চাকতি করে কাটুন। টমাটো, শসাও চাকতি চাকতি করুন। ছোট ছোট নরম লাল মূলো কিংবা খুব নরম সাধারণ মূলোও চাকতি চাকতি করে দিতে পারেন। কাঁচা লঙ্কাও কুচি কুচি করে দেবেন, যদি বাড়ির লোক কাঁচালঙ্কার ঝাল পছন্দ করেন।

এইবারে সব-কিছু—অর্থাৎ লেটিসের ছেঁড়া পাতা ও এগুলো—একসঙ্গে রাখুন। তার উপর সরষের তেল ঢালুন। হ্যা, হ্যাঁ, সরষের তেল, যে তেল দিয়ে আমরা তেল-মুড়ি খাই। আপনি বলবেন, 'অলিভ তেলের কি হল?' উত্তরে নিবেদন, স্যালাড বানাবার সময় মার্কিন-ইয়োরোপীয় বিশেষ করে ফরাসীরা মাস্টার্ড পাউডার অর্থাৎ সর্ষেগুঁড়ো অলিভওয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, কিংবা আগেভাগে সর্ষেগুঁড়ো জলের সঙ্গে খুব পাতলা করে মিশিয়ে তার সঙ্গে লেটিস পাতা মাখিয়ে নেয়। অলিভ ওয়েলের আপন গন্ধ ও স্বাদ খুব কম। তার সঙ্গে সর্ষেগুঁড়ো মেশালে ফলে তো সর্ষের তেলই দাঁড়ালো—অবশ্য আমাদের সর্ষের তেলের ঝাঁজ এবং ধক তাতে থাকবে না। অবাঙালী সর্ষের তেলের ঝাঁজ সইতে পারে না বলেই 'অলিভ ওয়েল' করে। আমরা যখন ঐটেই পছন্দ করি তবে সর্ষে তেল দিয়ে স্যালাড বানাবো না কেন? আমি নিজে তো পুরনো আচারের মজা সর্ষের তেলই ব্যবহার করি।

সর্ষের তেলে সব কিছু আলতো আলতো করে মাখিয়ে নেওয়ার পর তার উপরে ঢালবেন পাতি বা কাগজী নেবুর রস। নুন। সব কিছু ফের আলতো আলতো করে মাখুন। ব্যস্—স্যালাড তৈরী।

নেবুর রসের বদলে অনেকেই ভিনিগার বা সিরকা দেয়। তার কারণ ইয়োরোপে ঐ ভিনিগার ছাড়া অন্য কোনো টক বস্তু নেই। নেবুর রসের বদলে যদি ভিনিগার ব্যবহার করেন তবে সেটা জল দিয়ে ডাইলুট অর্থাৎ কম-তেজ করে নেবেন।

প্রশ্নটা, কতখানি লেটিসের সঙ্গে কতখানি পেঁয়াজ, টমাটো, শসা, তেল, নেবুর রস দেব? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে মনে রাখা উচিত, লেটিস পাতাই হবে প্রধান জিনিস, সেই যেন বাকি সব জিনিসের উপর প্রাধান্য করে। পাতাগুলো তেলতেলে হওয়ার মত তেলে মাখানো হবে, কিন্তু জবজবে যেন না হয়। নেবুর রস তেলের এক সিকি ভাগের মত। বেশী টকটক যেন মনে না হয়। এবং খাবার সময় লেটিস পাতা যেন আর পাঁচটা জিনিসের চাপে আপন

স্বাদ না হারায়।

এ স্যালাড অন্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে খেতে হয়। অর্থাৎ ডাল-ভাত, ভাত-ঝোল, ভাত-মাংস, এক গ্রাস মুখে দেবার পর খানিকটা স্যালাড মুখে নিয়ে একসঙ্গে চিবোবেন। স্বাধীন পদ হিসাবে যে স্যালাড খাওয়া হয় সেটাতে মাছ, মাংস কিংবা ডিম থাকে, এবং মায়োনেজ দিয়েই তৈরী করা হয়। (ডিমের হলদে ভাগের সঙ্গে তেল সিরকা দিয়ে মেখে মেখে সেটা তৈরী করতে হয়; বড্ড খুঁটিনাটি বলে বাজারে তৈরী মায়োনেজ বোতলে পাওয়া যায়, টমাটো সসেরই মত, যদিও ইটালিয়ানরা প্রতিদিন তাজা টমাটো সস বাড়িতেই বানায়, আমরা যে রকম বাজারের কারি পাউডার না কিনে নিজেরাই হরেক জিনিস বেটে-গুলে রান্নায় ব্যবহার করি।) সে-সব স্বাধীন পদের স্যালাড বানাতে এটা ওটা সেটা এবং সময়ও লাগে বেশী—তদুপরি সবচেয়ে বড় কথা, বাঙালী রান্নার আর তিনটে পদের সঙ্গে ওটা ঠিক খাপ খায় না।

অনেকে আবার তেল-নেবুর রস ব্যবহার না করে লেটিসপাতা-টমাটো-প্যাজ সব-কিছু টক দইয়ে মেখে নেন, উপরে গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। আমার তো ভালোই লাগে।

কাবুলীরা ব্যত্যয়। তারা শুধু লেটিস পাতা এক ঠোঙ্গা মধুতে গুত্তা মেরে খেয়ে চলে রাস্তায় যেতে যেতে।

আমাদের দেশে শীতকালেও রোদ কড়া বলে লেটিস ভালো হয় না। তাই এ-দেশে লেটিস ফলাতে জানেন অল্প লোকই। লেটিস ক্ষেত যেন দিনে অল্পক্ষণের জন্য পূবের রোদ পায়, সার যেন বেশী না দেওয়া হয়, এবং জল সেচের পরিমাণও নির্ণয় কঠিন। মোট কথা, লেটিস যেন বড্ড বেশী প্রাণবন্ত না হয়। তাকে যেন খানিকটে জীবন্মৃত রাখা হয়। লেটিস পাতা পান ও তামাক পাতার মতই বড় ডেলিকেট লাজুক কোমল-প্রাণ। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বরজের মত কোনো একটা ব্যবস্থা করে লেটিস ফলিয়ে দেখলে হয়।

এখন সর্বশেষ প্রশ্ন, আমি স্যালাড নিয়ে অত পাঁচ কাহন লিখছি কেন?

প্রথম: স্যালাড জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। যে-কোনো ডাক্তারকে শুধোতে পারেন।

দ্বিতীয়: বাঙালী গরীব জাত। লেটিস সস্তা এবং স্যালাড বানাতে আর যে-সব জিনিস লাগে সেগুলো বাঙালীর ঘরে ঘরে কিছু-না-কিছু থাকে। প্রত্যেককে এক বাটি স্যালাড দিতে খর্চা তেমন কিছুই নয়। ডাল ভাত মাছ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গ্রাস কিংবা দ্বিতীয় তৃতীয় গ্রাসে কিছুটা স্যালাড খেলে

ঐ দিয়ে পেটের কিছুটা ভরে। একটা হাফ-পদও হল। পরে যদি স্যালাডে আপনার রুচি জন্মে যায় তবে আপনি তার পরিমাণ বাড়িয়ে পেটের আরো বেশী ভরাতে পারবেন।

তৃতীয়: স্যালাড এক্‌সপেরিমেণ্ট করে করে অনেক কিছু দিয়ে তার পরিমাণ বাড়ানো যায়। আলুসেদ্ধ চাকতি চাকতি করে (এমন কি আগের রাতের বাসি ঝোলের আলুগুলো তুলে নিয়ে, ধুয়ে, চাকতি চাকতি করে), মটরশুঁটি সেদ্ধ করে, গাজর বীট ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছুই তাতে দেওয়া যায়। এমন কি ঠাণ্ডা হাফবয়েলড ডিমও চাকতি চাকতি করে দেওয়া যায়—তবে ওটা স্যালাড তৈরী হয়ে যাবার পর সর্বশেষে; নইলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, অতি আলতো আলতো ভাবে মাখাবার সময়ও। অর্থাৎ বাড়ির কোনো কিছু খামকা বরবাদ হয় না। এমন কি আগের রাতের মাছ মাংস দিয়েও স্যালাড করা যায়—তবে সে অন্য মহাভারত, পদ্ধতি আলাদা।

সর্বশেষে পাঠক, এবং বিশেষ করে পাঠিকাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালাড এমন কিছু ভয়ঙ্কর সুখাদ্য নয়, (দেখতেই পাচ্ছেন, যে-সব মাল দিয়ে স্যালাড তৈরী হয় সেগুলো এমন কিছু মারাত্মক মূল্যবান সুখাদ্য নয়) যে আপনি হন্তদন্ত হয়ে স্যালাড তৈরী করে খেয়ে বলবেন, 'ও হরি! এই মালের জন্য আলী সাহেব এতখানি বকর বকর করলো।'

মনে পড়লো, এক মহিলাকে আমি কথায় কথায় এক বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সাবান ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। দিন সাতেক পরে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। নাক সিঁটকে বললেন, 'তা আর এমন কি সাবান!' আমি বললুম, 'ম্যাডাম, আপনি কি আশা করেছিলেন যে ঐ সাবান ব্যবহার করার সাত দিনের মধ্যেই আপনার কর্তা আপনাকে নূতন গয়না গড়িয়ে দেবেন!'—১৪ ক্যারেটের আগের কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার উপর দেশী বিদেশী কোন্ কোন্ মহাজন তথা কীর্তিমান লেখক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে-বিষয় নিয়ে বাঙলাসাহিত্যে বহু বৎসর ধরে আলোচনা গবেষণা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও একাধিক সজ্জন আছেন যাঁদের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অতি সহজে পাওয়া যাবে না, যদিও এঁদের প্রভাব থাক আর না-ই থাক, এঁদের

সাহচর্যে যে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে-একটি বিষয়ে অনুমতি পেলে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটি এই—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে ছাত্রাবস্থায় আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাস নিতে দেখেছি, সভাস্থলে সভাপতিরূপে, আপন প্রবন্ধ, ছোট গল্প, কবিতা, নাট্যের পাঠকরূপে এবং অন্যান্য নানারূপে তাঁকে দেখেছি। আমার মনের উপর সবচেয়ে বেশী দাগ কেটেছে, গুণীজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক, ভাবের আদান-প্রদান, আলোচনা। কিন্তু, এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে তাঁর সৃজনী সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটরেচারের) আঙ্গিকের (টেকনিকাল দিকের) আলোচনা করতে শুনিনি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলা' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল, কিংবা তার চেয়ে অনেক বড় সাধারণতত্ত্ব—লিরিকে কি গুণ থাকলে কবি এমনই শব্দের সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক শব্দ অর্থ ধ্বনি সব-কিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয়, এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন, যার একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব—আর্টে এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কৃতিত্ব আসে কি প্রকারে ? তিনি কোন্ পদ্ধতিতে এখানে এসে পৌঁছলেন ? কিংবা কোনো সুচিন্তিত পূর্ব-পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত সে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পক্ষে নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে তিনি কি দেখলেন, কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন ?

বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করে পেশ করতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে ভরসা আছে, যাঁরা শুধু পাঠক নন, কবিতা বা গল্প সৃষ্টি করেন, তাঁরা আমার বক্তব্যটি অনুমানে অনুভব করে নিয়েছেন।

অবশ্য শুনেছি, পরবর্তী যুগে কবি যখন তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গল্প-কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি ঐ নিয়ে বিস্তর আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেন। তার বোধহয় অন্যতম কারণ, 'আধুনিক' কবিতার বহুলাংশ বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে বলে তাই নিয়ে আলোচনা করা সহজ ; পক্ষান্তরে আমি পূর্বে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেটা প্রধানত বুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এমন কি সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদগুণ এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য নানা বিষয় তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি কিন্তু তিনি স্বয়ং যে তাঁর গানে শব্দ ও সুরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে পৌঁছলেন সেটা কি পদ্ধতিতে হল, তার ক্রমবিকাশের সময় কোন্ কোন্ দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হতে

হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করতে শুনিনি। আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু-বহুবার সঙ্গীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, খোশগল্প করতে শুনেছি, কিন্তু, যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথাসুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কি করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে শুনি নি। স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ এবং শ্রীযুত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন—এবং এখানকার শিক্ষক শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত—কিন্তু আমি এস্থলে যে বিষয়টির অবতারণা করেছি সেটি হত বলে জানি নে।

এবং এস্থলে আমার যদি ভুলও হয় তাতেও আমার মূল বক্তব্যের কোনো প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমার মূল বক্তব্য: চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ কাদের সঙ্গে বিচরণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর (১৯০৫।৬) শান্তিনিকেতনে এসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা করার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এখানেই মোটামুটি পাকাপাকিভাবে বাস করেন। সে-যুগে তাঁদের ভিতর কতখানি যোগাযোগ ছিল বলতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে একসঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনো দেখিনি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন। শুধু তাই নয়, আমি আশ্রমে কিংবদন্তী শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি একদা এক আশ্রমাচার্যকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলেছে, কিন্তু রবির কখনো পা পিছলায়নি।' অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে, কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করা মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু-একটি কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি কবিতা কিংবা অন্য ঐ ধরণের কোনো-কিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন অন্য কিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনিনি।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ছিল এ-কথা

সকলেই জানেন। এঁরা দুজনাই জীবনের শেষের ভাগ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারূপে ছিলেন। তা ছাড়া লেভি, ভিনটারনিৎস, তুচ্চি, ফরমীকি, স্টেন-কোনো, মর্গ্যানস্টিয়ের্নে, কলিন্‌স্ বগদানফ[১] প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু ঘণ্টা, বহুদিনব্যাপী প্রচুর আলোচনা করেছেন, কথনো বা সভাস্থলে (প্রধানত 'বিশ্বভারতী সাহিত্যসভায়') কথনও স্বগৃহের বারান্দায়। আর্ট কি, রস ও অলঙ্কার নিয়ে তিনি সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে। নন্দলাল স্বল্পভাষী গুণী—বরঞ্চ অসিতকুমারের সঙ্গে ঐ নিয়ে তাঁর মুখর আলোচনা হত বেশী। অবশ্য এ-কথাও স্মরণ রাখা উচিত, আর্ট বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন নন্দলালই সেটি শুনেছেন বহু বৎসর ধরে এবং সবচেয়ে বেশী। এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নন্দলালই। নন্দলালই তাঁকে একাডেমিক আর্টের মরুপথে তাঁর ধারা হারাতে দেননি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা—ধর্মদর্শন কাব্য অলঙ্কার এ নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গেঃ স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। আলোচনা বললে অত্যন্ত কমই বলা হল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতি কতখানি বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল সে-কথা আমরা সবাই জানি। বিধুশেখরের ছিল ঐ একমাত্র জগৎ। ক্ষিতিমোহন সেন সে-জগতে বাস করলেও দেশের গণধর্মের উৎপত্তি বিকাশের সত্য নির্ণয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। এই তিনজনের জীবন এবং রচনাতে বার বার মনে হয়—এঁরা যেন অভিন্ন। অথচ যেন ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ দেখছি। যেন বেদের উৎস থেকে তিনটি ধারা বেরিয়ে এসেছে অথচ তিনটি ধারাই আপন আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভেও যেন একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছে। এস্থলে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি যে, বিষয়টি আমার পক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন, কারণ এঁদের আলোচনা আমি শুনেছি অপরিণত বয়সে ও পরবর্তীকালে, এবং

---

১ এঁদের ছাড়া আরো বহু পণ্ডিতের নাম করতে হয়। তাঁদেরই একজন কোষকার স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেন। অন্যজন ভগবদ্‌কৃপায় এখনো আমাদের মাঝখানে আছেন। গোস্বামীরাজ নিত্যানন্দবিনোদ। ইনি ১৯২০।২১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিস্তর শাস্ত্রালোচনা করেন।

আজও আমার সংহিতাজ্ঞান এতই যৎসামান্য যে, ত্রিমূর্তির এই লীলাখেলা আমি প্রধানত অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছি, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিশ্লেষণ—গবেষণা দ্বারা নয়। এস্থলে 'ত্রিধারা' 'ত্রিমূর্তি' বলার সময় আমি স্মরণে রেখেছি যে অনেকেই (যেমন 'ত্রিবেদী') চতুর্থ বেদ স্বীকার করেন না।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন বাল্যবন্ধু, হয়তো বা সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ ও সংস্কৃত চর্চা করেন। উভয়েই শাস্ত্রী।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অত্যুত্তম সংস্কৃত এবং পালি জানতেন।

এ স্থলে পালি ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল। কারণ বৌদ্ধধর্ম তথা পালি ভাষার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুরাগ থাকে না। পণ্ডিত-জনোচিত বিশেষজ্ঞ না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ দুটি ভাষাই জানতেন। পরবর্তী যুগে সংহিতা পাঠের সুবিধার জন্য বিধুশেখর জেন্দ-আবেস্তার ভাষা শেখেন।[২] ক্ষিতিমোহন গণধর্মের সন্ধানে হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন। বেদ উপনিষদে তিনজনারই অবাধগতি।

কিন্তু সংহিতাই বিধুশেখরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, বিশেষ করে ঋগ্বেদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপ্রেরণা পেতেন উপনিষদ থেকে। এবং ক্ষিতিমোহনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল ভারতীয় গণধর্ম তথা ক্রিয়াকাণ্ডের সর্বপ্রাচীন ভাণ্ডার অথর্ববেদের প্রতি। আমি একাধিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, ক্ষিতিমোহন যতখানি শ্রদ্ধাসহ, মনোযোগ সহকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ততখানি এ-যুগে অন্য কোনো পণ্ডিতই করেননি। সংহিতায় সুপণ্ডিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যুডার্সকে বলতে শুনেছি, অথর্ববেদ বড়ই অবহেলিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরবর্তী যুগের বহু রহস্যের সমাধান অথর্ববেদে আছে। অরবিন্দও নাকি এই মত পোষণ করতেন।

বিধুশেখর যখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করেছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয়, ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী, আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ, ব্রহ্মচর্যের বহু ব্রত এখানে পালিত হয়, এবং গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অতি

২ বিধুশেখরের পালি ও আবেস্তাচর্চা, ক্ষিতিমোহনের পালিচর্চায় রবীন্দ্রনাথই প্রধান উৎসাহদাতা। হয়তো বা ভুল বলা হবে না, রবীন্দ্রনাথের আদেশেই বিধুশেখর আবেস্তাচর্চা আরম্ভ করেন।

এঁদের কাশীর সতীর্থ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালও প্রথম দিকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছিলেন।—প্রকাশক।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী। পাঠক এ যুগের ইতিহাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনীতে পাবেন।

বিধুশেখরের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-যুগে অল্পই জন্মেছেন। শুধু স্বপাকে ভক্ষণ, সন্ধ্যা আহ্নিক পালন তথা সশ্রদ্ধ বেদাধ্যয়নের কথা নয়—বাহ্যিক শুচি অশুচিতে পার্থক্যও তিনি করতেন অনায়াসে অবহেলে, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা ছিল অন্তর্জগৎকে পরিপূর্ণ শুচিশুদ্ধ পবিত্র করার। তাঁর আদর্শ ছিল তাঁর কল্পনার ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর কল্পনার আচার্য—অনাসক্ত পূত পবিত্র।

ক্ষিতিমোহনও নিষ্ঠাবান বৈদ্য-সন্তান। কিন্তু তাঁর সামাজিক আচার ব্যবহার ছিল অনেকটা বিবেকানন্দের মত।

আশ্রমে যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি পালন করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে মহাত্মা গাঁধী কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন, এতদিন আশ্রমবাসীরা যে জীবন কৃচ্ছ্রসাধনময় ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেটা বাস্তবিক বিলাস পরিপূর্ণ। আশ্রমের মেথর চাকর বিদায় দিয়ে তিনি এখানে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন সেটা এখানকার অনেক গুরুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে গাঁধী সাবরমতী চলে গেলেন। আশ্রমও ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তন করতে লাগল।

বিধুশেখর তবু তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদর্শে আকণ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'হ্যারিকেন লণ্ঠন যখন আশ্রম ব্যবহার করছে, বিজলিই বা করবে না কেন?'

বিধুশেখর বললেন, 'রেড়ির তেলে আমি সানন্দে ফিরে যাব। হ্যারিকেন আর রেড়ির তেল প্রায় একই—বিজলির তুলনায়। বিজলি আনবে বিলাস। তার সর্বনাশের সর্বশেষ সোপান আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

পাঠক ক্ষণতরে ভাববেন না, বিধুশেখর সঙ্কীর্ণচেতা কূপমণ্ডুক ছিলেন। তাঁর প্রতি এর চেয়ে নির্মম অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে খৃষ্টান পাদ্রী এণ্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ সখা, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের আসনে বসে যিনি মুগ্ধ কণ্ঠে 'যবন' ইমাম গজ্জালীর 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য-স্পর্শমণি) আবৃত্তি করে ব্রহ্মলাভের পন্থা-বর্ণনা করছেন, যিনি মৌলানা শওকৎ আলীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রম ভোজনাগারে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যদি সঙ্কীর্ণচেতা হন তবে প্রার্থনা করি সর্বভারতবাসী যেন এ রকম সঙ্কীর্ণচেতা হয়।

বিধুশেখর না থাকলে যে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে অক্সফর্ডে

পরিণত করতেন তা নয়। বিধুশেখর ছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তমান প্রতীক। তাঁর সন্তুষ্টি থাকলে রবীন্দ্রনাথ আপন কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হতে পারতেন। এবং যখনই তিনি বিধুশেখরকে—তা সে যত অল্পই হোক না কেন—আপন মতে টেনে আনতে পারতেন তখনই তাঁর মনে হত তিনি যেন ঐতিহ্যাবদ্ধ ভারতকে, তার ধর্ম থেকে তাকে বিচ্যুত না করে, বর্তমান প্রাচীন সংসারের বিশ্ব-নাগরিকরূপে তার প্রাপ্য আসন নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন।

এই বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি, আশ্রম যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নিত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাদর্শ সম্মুখে রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন বিশ্ব-ভারতীতে রূপান্তরিত হল (ইস্কুলের সঙ্গে কলেজও যুক্ত হল) তখন পূর্ণবয়স্ক কিশোর ও যুবাকেও গ্রহণ করতে হয়। এই বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ, চিত্রে নন্দলাল)। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন, 'এই শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের গুণীজ্ঞানীরা একত্র হবেন' সঙ্গে সঙ্গে বিধুশেখর সংস্কৃত থেকে উদ্ধার করে দিলেন, 'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্'।

বিধুশেখরের আনন্দের সীমা নেই। এতদিন আশ্রম বালক তাঁর কাছ থেকে সন্ধি-সমাস পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার পূর্বেই 'অর্ধস্নাতক' অবস্থায় আশ্রম ত্যাগ করতো, এখন ভারতের সর্ব খণ্ড থেকে আসতে লাগল প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী। এরা লুপ্তপ্রায় যাস্কের 'নিরুক্ত' অধ্যয়নে উদ্‌গ্রীব, বিধুশেখরেরই সম্পাদিত ও অনূদিত পালি গ্রন্থ 'মিলিন্দা পঞ্‌হো' থেকে তাঁকে বহুতর 'পঞ্‌হো' (প্রশ্ন) শুধায়। বিধুশেখরের আনন্দ উচ্ছলিত হয়ে উপচে পড়ছে। এইবারে সত্য জ্ঞানচর্চা হবে। এইবারে তিনি তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে পারবেন।

কিন্তু হায়, এই সব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই তো ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করে না। এমন কি এদের ভিতর 'নাস্তিক' 'চার্বাকপন্থী'ও একাধিক ছিল। খৃষ্টান মুসলমানও ছিল। এদের কেউ কেউ সমবেত উপাসনায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। খৃষ্টান ছেলেটির আপত্তি ছিল না কিন্তু সেই 'চার্বাকপন্থী' তাকে বোঝালে খৃষ্টানের সর্বপ্রার্থনা যীশুর মারফৎ পাঠাতে হয়, বেদমন্ত্রে তা হয় না; এবং মুসলমানকে আল্লা রসুলের দোহাই দিলে। খৃষ্টান ধাঁধায় পড়লো, মুসলমান বললে, পাঁচ রেকৎকে সাত রেকৎ করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু বেদমন্ত্রদ্বারা উপাসনা করছে এ-খবর পেলে তার পিতা অসন্তুষ্ট হবেন।

নাচার অধ্যক্ষ বিধুশেখর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাদ্রী এণ্ড্রুজের হাতে।

এণ্ড্রুজ আবেগ-ভরা কণ্ঠে বিশ্বমানবিকতার শপথ নিয়ে বেদমন্ত্রের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করলেন। আস্তিক নাস্তিক সকলেই সসম্ভ্রম নতমস্তকে তাঁর বক্তব্য শুনলো। কিন্তু সংশয়বাদী তথা নাস্তিকদের মত-পরিবর্তন হল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করলেন না।

ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন— তিনি শুচি অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু এমন কি ঋগ্বেদ থেকেও তিনি আহরণ করেননি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বৈদ্যকুলোদ্ভব, তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ; আহারবিহার তিনি তাই আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।

প্রাচীন অর্বাচীন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। উপনিষদের বাণীর সন্ধান তিনি অহরহ পাচ্ছেন আউল-বাউলে। আবার আউল-বাউলের আচার-আচরণ তিনি পাচ্ছেন অথর্ববেদে। তাঁর সম্মুখে বহু পন্থা, তিনি সব ক'টিতেই বিশ্বাস করেন।

তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ—এণ্ড্রুজ যে রকম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মাঝখানে। তিনি এ যুগে সনাতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের 'অসম্ভব' আদর্শে বিশ্বাস করতেন না, আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ, তার ধ্যানলোকের ঐতিহ্যের সন্ধানে বিধুশেখর শরণ নিতেন ঋগ্বেদের, আশ্রমের পাল-পার্বণের জন্য মন্ত্রসন্ধানে ক্ষিতিমোহন যেতেন অথর্ববেদে।

আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন, বিধুশেখর ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তার উপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময়—ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে —অদ্যকার ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী। অদ্য বাদশতান্তে সে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী।

রাষ্ট্রভাষা

॥ ১ ॥

ভারতবর্ষের সবাই যদি এক ভাষায় কথা বলত তাহলে সব দিক দিয়ে আমাদের যে কত সুবিধে হত সে-কথা ফলিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। শুধু যে কাজ-কারবারের মেলা বখেড়ার ফৈসালা হয়ে যেত তাই নয়, একই ভাষার ভিত্তিতে আমরা অনায়াসে নবীন ভারতীয় সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ইমারৎ গড়ে তুলতে পারতুম। মালমসলা আমাদের বিস্তর রয়েছে তাই সে ইমারৎ বাইরের পাঁচটা দেশের শাবাশীও পেত।

এ তত্ত্বটা নূতন নয়। কিন্তু একই ভাষার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ইমারৎ গড়ে তুলতে গেলেই এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে করজোড়ে স্বীকার করছি আমার জীবনে আমি যত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী কাবু করেছে—এ দ্বন্দ্বের সমাধান আমি কিছুতেই করে উঠতে পারিনি। বিচক্ষণ পাঠক যদি দয়া করে এ-অধমকে সাহায্য করেন।

বৈদিক সভ্যতাসংস্কৃতি একটিমাত্র ভাষার উপরই খাড়া ছিল সেকথা আমরা জানি তার কারণ সে যুগে আর্যরা ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েননি এবং দ্বিতীয়তর অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি বলে সে ভাষাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন অতি অল্পই হয়েছিল।

প্রভু বুদ্ধের যুগ আসতে না আসতেই দেখি, সে-ভাষা আর আপামর জন-সাধারণ বুঝতে পারছে না। যতদূর জানা আছে, প্রভু বুদ্ধ তাঁর নবীন ধর্ম প্রচারের জন্য বৈদিক ভাষা কিংবা সে ভাষার তৎকালীন প্রচলিত রূপের শরণ নেননি। তিনি তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার স্মরণ নিয়েছিলেন—সে ভাষাকে প্রাকৃত বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিংবা ব্রাহ্মণ্য ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তিনি যে বিহারে প্রচলিত তৎকালীন সর্বজনবোধ্য ভাষার স্মরণ নিয়েছিলেন তা নয়, কারণ সকলেই জানেন বুদ্ধদেব 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' এই সমাস বার বার ব্যবহার করেছেন, উভয়কে সমান সম্মান দেখাবার জন্য। জনপদ ভাষা যে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার একমাত্র কারণ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন এবং গণ-ভাষার প্রয়োগ ব্যতীত গণ-আন্দোলন সফল হতে পারে না।

এস্থলে লক্ষ্য করবার বিষয় বিহারের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করাতে বুদ্ধদেব সর্বভারতের পণ্ডিতজনবোধ্য ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনি তাতে বিচলিত হননি।

ঠিক একই কারণে মহাবীর জিনও আঞ্চলিক উপভাষার শরণ নিয়ে অর্ধ মাগধীতে আপন বাণী প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় মতবাদ এবং জীবহত্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতানৈক্য বাদ দিলে বৌদ্ধ ও জৈন গণ-আন্দোলন একই রূপ একই গতি ধারণ করেছিল।

অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ ভাষাও সংস্কৃত নয়।

তারপরের বড় আন্দোলন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আনয়ন করেন। তিনিও প্রধানত সর্বজনবোধ্য বাঙলার শরণ নিয়েছিলেন—যদিও তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান সে যুগের কোনো পণ্ডিতের চেয়ে কম ছিল না। পশ্চিম ও উত্তর ভারতেও তুকারাম মারাঠী ব্যবহার করেন। কবীর দাদু প্রভৃতি সাধকেরা হিন্দী ব্যবহার করেন। কবীর বললেন, "সংস্কৃত কূপজল," সে জল কূয়ো থেকে বের করে আনতে হলে ব্যাকরণ অলঙ্কারের লম্বা দড়ির প্রয়োজন কিন্তু "ভাষা" (অর্থাৎ সর্বজনবোধ্য প্রচলিত ভাষা) "বহতা নীর"—সে জল বয়ে যাচ্ছে, যখন তখন ঝাঁপ দিয়ে শরীর শান্ত করা যায়। আর তুকারাম বললেন, "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয় তবে মারাঠী কি চোরের ভাষা?"

তার পরের গণ-আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করেন। তিনি যদিও জনগণের ভাষা হিন্দীর শরণ নিয়েছিলেন তবু লক্ষ্য করার বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলন বাঙলা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালায় হিন্দী কিংবা ইংরিজির মাধ্যমে আপামর জনসাধারণে প্রসারলাভ করেনি; জনগণ যে সাড়া দিল সে বাঙলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম ভাষার মাধ্যমে—অসহযোগ আন্দোলন প্রচার করার ফলে। বারদলই সত্যাগ্রহের প্রধান বক্তা ছিলেন বল্লভভাই পটেল। তিনি যে অদ্ভুত তেজস্বিনী গুজরাতি ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন সে ভাষা অনায়াসে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে। বল্লভভাইয়ের গুজরাতির সঙ্গে তাঁর হিন্দীর কোনো তুলনাই হয় না।

এতক্ষণ ধরে যে ঐতিহ্যের বর্ণনা দিতুম সে শুধু ভারতের সীমাবদ্ধ নয়। প্রভু খৃষ্ট সাধু এবং পণ্ডিতী ভাষা হীব্রুতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেননি। তাঁর প্রথম ও প্রধান শিষ্যদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি সাধারণ জেলে। তাঁর প্রচারকার্য এঁদের নিয়েই আরম্ভ হয় বলে তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন গ্যালিলি-নাজারেৎ অঞ্চলবোধ্য আরামেইক উপভাষায়। মহাপুরুষ মহম্মদও যখন আরবীর

মাধ্যমে আল্লার আদেশ প্রচার করলেন তখন আরবী ভাষা ছিল পৌত্তলিকদের 'না-পাক' ভাষা, এবং সে ভাষায় ধর্ম প্রচারের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। ইসলামের ইতিহাসে লেখা আছে মহাপুরুষ মুহম্মদের ঈষৎ পূর্বে এবং তাঁর সমবর্তীকালে মক্কাবাসীদের যাঁরা সত্য পথের অনুসন্ধান করতেন তাঁরা হীব্রু শিখে সে ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। তাই যখন মহাপুরুষ হীব্রুর শরণাপন্ন না হয়ে আরবীর মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করলেন তখন সবাই তাজ্জব মেনে গেল। তার উত্তরে আল্লাই কুরান শরীফে বলেছেন, তাঁর প্রেরিত পুরুষ যদি আরব হয় তবে প্রচারের ভাষা আরবী হবে না তো কি হবে? আর আরবী না হলে সবাই বলত, "আমরা তো এসব বুঝতে পারছি নে"।

লুথারও পোপের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন জর্মনের পক্ষ নিয়ে—পণ্ডিতী লাতিন তিনি এই বলেই অস্বীকার করেছিলেন যে সে-ভাষার সঙ্গে আপামর জনসাধারণের কোনো যোগসূত্র ছিল না।

মোদ্দা কথা এই, এ পৃথিবীতে যত সব বিরাট আন্দোলন হয়ে গিয়েছে—তা সে নিছক ধর্মান্দোলনই হোক আর ধর্মের মুখোশ পরে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনই হোক—তার সব কটাই গণ-আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলন সর্বদাই আঞ্চলিক গণভাষার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছে।*

॥ ২ ॥

রাষ্ট্রভাষার যে প্রয়োজন আছে সে সত্য তর্কাতীত, কিন্তু প্রশ্ন সে ভাষা গণ-আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করতে পারবে কি না? যাঁরা মনে করেন, স্বরাজ লাভ হয়ে গিয়েছে এখন আর গণ-আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁরা হয় মারাত্মক ভুল করছেন নয় ভাবছেন দেশের জনগণ তাঁদের জন্য পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে খাটবে আর তাঁরা শহরে শহরে দিব্য খাবেন দাবেন আর কেউ কোনো প্রকারের তেরীমেরী করলে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ভয় দেখাবেন এবং তাইতেই সব কুছ বিলকুল ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে।

সেটি হচ্ছে না, সেটি হবার জো নেই। যে জনসাধারণকে একদা স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করে স্বরাজের জন্য লড়ানো হল তাদের এখন ডেকে আনতে হবে রাষ্ট্রনির্মাণ কর্মে। তারা যদি ভারতীয় রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্র বলে চিনতে না পারে,

* রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে বিপক্ষে যে ক'টি যুক্তি আছে, সব কটিরই আলোচনা করা এ প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য—লেখক।

সে রাষ্ট্রের প্রতি যদি তাদের আত্মীয়তাবোধ না জন্মে তবে নানাপ্রকারের বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—তার ফিরিস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। পাড়ার কম্যুনিস্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন—সে সব বাৎলে দেবে।

এখন প্রশ্ন, কোন ভাষার মাধ্যমে আমরা জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হব? বেশির ভাগ লোকই স্বীকার করে নিয়েছেন পাঠশালাতে মাত্র একটি ভাষা শেখানো হবে—অর্থাৎ হিন্দী যে সব অঞ্চলের আপন ভাষা সেগুলো বাদ দিয়ে আর সর্বত্র মাত্র প্রাদেশিক ভাষাটিই শেখানো হবে। অর্থাৎ বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র অঞ্চলের পাঠশালাগুলোতে ছেলেমেয়েরা শুদ্ধ আপন আপন মাতৃভাষা শিখবে। ভারতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতা কবে দূর হবে জানি নে, তবে আশা করি সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, নিরক্ষরতা দূর হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্ত এ দেশের শতকরা ৭০টি ছেলেমেয়ে পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করবে—এবং শিখবে শুধু মাতৃভাষা।

বাদবাকীরা হিন্দী শিখবেন—সে হিন্দী জ্ঞান কতটা হবে তার আলোচনা পরে হবে—এবং ক্রমে ক্রমে অতি অল্প সংখ্যক লোকই ইংরিজি শিখবেন, আজকের দিনে চীন কিংবা মিশরের লোক যে অনুপাতে ইংরিজি শেখে।

রাষ্ট্রভাষা সর্বভারতে চালু করনেওয়ালারা বলেন, আজ ইংরিজি ভাষা যে রকম ব্যবহৃত হচ্ছে একদিন হিন্দী তার আসনটি নিয়ে নেবে অর্থাৎ যাবতীয় রাজকার্য, মামলা-মোকদ্দমার তর্কাতর্কি, রায়, আপিল, বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য, পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা ঝাড়া ইত্যাদি তাবৎ কর্ম হিন্দীতে হবে। কলকাতা তথা অন্ধ্র, তামিলনাড়ু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে জ্ঞানদান হবে কি না সে সম্বন্ধে অনেকেরই মনে ধোঁকা রয়ে গিয়েছে তবে কট্টর রাষ্ট্রভাষীদের বাসনা যে তাই সে সম্বন্ধে খুব বেশি সন্দেহ নেই।

তাহলে অনায়াসে ধরে নিতে পারি ইংরেজ আমলে যে রকম আমাদের বেশীর ভাগ ভালো লেখকেরা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরিজিতে বই লিখতেন (রাধাকৃষ্ণনের ইণ্ডিয়ান ফিলসফি থেকে পণ্ডিতজীর ডিস্কভারি অব্ ইণ্ডিয়া ইস্তেক) ঠিক তেমন আমাদের ভবিষ্যতের শক্তিশালী লেখকেরা তাঁদের প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন হিন্দীর মাধ্যমে এবং যে সৎসাহিত্য—গল্প উপন্যাস কবিতাই সাহিত্যের একমাত্র কিংবা প্রধান সৃষ্টি নয়—হিন্দীতে গড়ে উঠবে সেটা, বাঙলা, তামিল, গুজরাতি সাহিত্য-সৃষ্টি-প্রচেষ্টার খেসারতি দিয়ে। এতদিন যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে নানামুখী সৃষ্টিকার্য প্রসার এবং প্রচার লাভ করতে পারছিল না তার জন্য আমরা প্রাণভরে ইংরিজির জগদ্দল পাথরকে গালমন্দ করেছি এখন হিন্দীর চাপে

সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়ত গালমন্দ করার অধিকার থাকবে না। পূর্ববঙ্গে যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করবার চেষ্টা হয়েছিল তখন আমি অন্যান্য যুক্তির ভিতর এইটিও পেশ করে তীব্রকণ্ঠে আপত্তি জানিয়েছিলুম এবং বহু পূর্ববঙ্গবাসী আমার যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন।

আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যের যে ক্ষতি হবে সে কথা এখন থাক। উপস্থিত মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, ভারতীয় নবীন রাষ্ট্রনির্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা, আলোচনা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ যেসব গ্রামভারী কেতাব, ব্লু বুক, দলিল-দস্তাবেজ, উৎসাহোদ্দীপক ওজস্বিনী এবং গম্ভীর পুস্তক রচিত হবে সেগুলো হবে হিন্দীতে এবং দেশের শত-করা সত্তরজন লোক গ্রামে বসে সেগুলো পড়তে পারবে না।

একদা এই সত্তরজন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র এই সত্তরজনকে বাদ দিয়ে নির্মাণ করা যাবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাবৎ কেতাব বাঙলাতে লিখলেই কি এরা সেগুলো পড়ে বুঝতে পারবে? সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। আমার বিশ্বাস দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ছাপের উপর নির্ভর করে না। এমন সব ইংরিজি অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধ বাঙলা-ভাষী পাঠশালার পণ্ডিত আছেন, যাঁরা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলে এবং বাংলা দৈনিকের মারফতে অতি অল্প যে রাষ্ট্রসংবাদ পান তারই জোরে গ্রাজুয়েটকে তর্কে ঘায়েল করতে পারেন। অনেক এম. এ. পাস লোক বই জমায় না—জমালে জমায় চেক বুক—আর অনেক পাঠশালার পণ্ডিত গোগ্রাসে যে কেতাব পান তাই গেলেন। পুনরায় নিবেদন করি, জ্ঞানতৃষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করে না।

তাই দেখতে হবে আমাদের রাষ্ট্রনির্মাণ প্রচেষ্টার সর্বসংবাদ যেন এমন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে ভাষা মানুষের মাতৃভাষা। ইংরেজ আমলে ইংরিজি জাননেওয়ালা ও না-জাননেওয়ালার মধ্যে যে ন্যক্কারজনক কৌলীন্যের পার্থক্য ছিল সেটা যেন আমরা জেনেশুনে আবার প্রবর্তন না করি।

॥ ৩ ॥

সুশীল পাঠক, মাঝে মাঝে ধোঁকা লাগে, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে এই যে আমি হপ্তার পর হপ্তা দাপাদাপি করছি তাতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠছ না তো? আমি তো হয়ে গিয়েছি কিন্তু বিষয়টি বড্ডই গুরুত্বব্যঞ্জক এবং আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের শুধু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে না, আমাদের অতীত

ঐতিহ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি সব কিছুই এর উপর নির্ভর করছে। একবার যদি ভুল রাস্তা ধরি তবে আমড়াতলার মোড়ে ফিরে আসতেই আমাদের লেগে যাবে বহু যুগ এবং তখন আবার নূতন করে সব কিছু ঢেলে সাজাতে গিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আজকের দিনে পৃথিবীতে কেউ বসে নেই—তখন দেখতে পাবেন, আর সবাই এগিয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ রাজনীতিতে আপনি অমুক দেশের ধামাধরা হয়ে আছেন, অর্থনীতিতে আপনি আর এক মুল্লুকের কাছে সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছেন এবং কৃষ্টি সংস্কৃতিতে নিরেট হটেন্‌টট বনে গিয়েছেন।

কেন্দ্রের ভাষা যে হিন্দী হবে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাষা হবে কি? অর্থাৎ প্রশ্ন, পার্লিমেণ্টে সদস্যেরা বক্তৃতা দেবেন কোন্ ভাষায়?

হিন্দীওলারা হিন্দীতে দেবেন—বাঙলা কথা। কিন্তু তামিল-ভাষীরা দেবেন কোন্ ভাষায়?

এতদিন একদিক দিয়ে আমাদের কোন বিশেষ হাঙ্গামা ছিল না। সব প্রদেশের সদস্যরা ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতেন—অথচ কারোরই মাতৃভাষা ইংরিজি ছিল না বলে অহেতুক সুবিধা কেউই পেত না। এবং যে সুবিধাটা পেত ইংরেজ রাজসম্প্রদায় এবং তারা যে সে সুযোগটা ন'সিকে কাজে লাগাত সেকথাও সবাই জানেন।

এখন অবস্থাটা হবে কি? কেঁদে-ককিয়ে যেটুকু হিন্দী শিখব তার জোরে কি পার্লিমেণ্টে বক্তৃতা ঝাড়া যায়? পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিন্দীকে যদি তিরু অনন্তপুরম (ত্রিভান্দরম) কিংবা বিশাখাপট্টনম (ভাইজাগ্) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করা হয় (কলকাতা কিছুতেই মানবে না, সে আপনি আমি বিলক্ষণ জানি) তবে তাদের আখেরটি ঝরঝরে হয়ে যাবে। অতএব অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালার লোক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে যেটুকু হিন্দী শিখবে—(সবাই শিখবে তাও নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নাও শিখতে পারে)—তা দিয়ে কি সে হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ চালাতে পারবে?

দু দণ্ড রসালাপ সব ভাষাতেই করা যায়। 'আমি তোমায় ভালবাসি', 'জ্য ত্যেম্', 'ইষ লীবে ডীষ'—আহা এসব কথা দেখতে না দেখতেই শিখে ফেলা যায়। মদন যেস্থলে গুরু, সখা কন্দর্পও হয়ত মজুত, কালটি মধুমাস, উর্বশী দু চক্কর নাচভী দেখিয়ে দিচ্ছেন, তার মধ্যিখানে সবাই এক লহমায় হরিনাথ দে হয়ে যান। কিংবা বলতে পারেন, সেখানে ভাষার দরকারই বা কি—কোন্ প্রয়োজন মধুর ভাষণের?

কিন্তু পার্লিমেণ্টে তো মানুষ রসালাপ করতে যায় না। সেখানে লাগে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, চিন্তাধারা চিন্তাধারায় টক্কর লেগে 'উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি', বজেটকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে হয় যেখানে—সেখানে 'করেঙ্গা, খায়েঙ্গা' হিন্দী দিয়ে কাজ চলে না। আমাদের বাঙাল দেশে বলে 'ছাগল দিয়ে হাল চালাবার চেষ্টা করো না।'

বিচক্ষণ পাঠক, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, ঘডেল প্যাসেঞ্জার কক্খনো, অর্থাৎ 'কাইট্যা ফালাইলে'ও বেহারী মুটের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তর্ক করার সময় হিন্দী বলে না। কারণ সে একখানা বলতে না বলতে মুটে ঝেড়ে দেবে পাঁচখানা পুরো পাঁচালী এবং লক্ষ্য করেছ, মুটেও ততোধিক ঘডেল—দিব্য বাঙলা জানে, কিন্তু মেশিন গান চালাচ্ছে তার বিহারী হিন্দী 'করত, খাওত,' আর 'ভজলু কী বহিনিয়া ভগলু কী বেটিয়া'র ভাষা দিয়ে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখা ভাষা দিয়ে কোনো মরণ-বাঁচনের ব্যাপারে তর্কাতর্কি করা যায় না। সে ভাষা দিয়ে বই পড়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়—ব্যস্।

আরেকটা উদাহরণ দি। ইংলণ্ড যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি পৌণ্ড খর্চা করেছে ইংরেজ ছোকরাদের ফরাসী শেখাবার জন্য—দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে। অথচ দশ হাজার ইংরেজ যদি প্যারিস বেড়াতে আসে তবে দশটা ইংরেজও ফরাসী বলতে পারে না।

সে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। বাপ, মা, ম্যাট্রিক-পাস ব্যাটা নাবলেন ক্যালে বন্দরে। ইস্টিমারে ইংরিজি চলে, কোনো অসুবিধা হয়নি। ক্যালেতেও হবে না, বাপ-মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ ছেলে ম্যাট্রিকে ফরাসীতে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। বাপ প্রতাপ রায়ের মত ছেলে বরজলালকে হেসে বললেন, 'জিজ্ঞেস কর তো বাবাজী, পোর্টারটাকে—প্যারিসের ট্রেন কটায় ছাড়বে ?'

ছেলে প্রমাদ গুনছে। বরজলালেরই মত আপন ফরাসী ভাষার গুরুকে স্মরণ করে ক্ষীণ কণ্ঠে যখন পোর্টারকে বিদঘুটে উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, 'আকেল আর পার লা এ্যাঁ পুর পারি ?' তখন পোর্টার মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর মিনিট তিনেক ঘাড় চুলকে চুলকে ভেবে নিলে। হঠাৎ মুখে হাসি ফুটল। চিৎকার করে আরেকটা পোর্টারকে ডাক দিয়ে বললে, 'এ, জ্যঁা ভিয়ানিসি, ওয়ালা আঁ মসিয়ো কি পার্ল লাংলে।' 'এই জন, এদিকে আয়, এক ভদ্রলোক ইংরিজি বলছেন। বুঝতে নারনু।'

হায়, কিন্তু বেচারা ফাঁকি দিয়ে গোল্ড মেডেল মারেনি। ফরাসী ব্যাকরণ

তার কণ্ঠস্থ, পাস্ট কণ্ডিশনাল, ফ্যচার সবজনকটিত তার নখাগ্রদর্পণে—কিন্তু ফরাসী জাতটাই নচ্ছার, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদেশীর মুখে ভুল উচ্চারণে আপন ভাষার শব্দরূপ ধাতুরূপ শুনতে কিছুতেই রাজী হয় না!

* * *

কিন্তু পাঠক নিরাশ হবেন না। পার্লিমেণ্টে বক্তৃতার ভাষা-সমস্যা সমাধান করা যায়। পরে নিবেদন করব।

॥ ৪ ॥

ভারতের ভবিষ্যৎ বৈদগ্ধ্য সংস্কৃতি কি রূপ নেবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হলেই দেখতে পাই অনেকেই মনে মনে আশা পোষণ করছেন, সে বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলোকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। এ অতি উত্তম প্রস্তাব এবং এতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। যখন ভাবি, এই ভারতবর্ষেই একদা একই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে কাবুল থেকে কামরূপ, হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী সর্ব কলাপ্রচেষ্টা সর্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, তখনই ঐক্যাভিলাষী হৃদয় উল্লসিত হয়ে ওঠে, আর তার পুনরাবৃত্তি দেখাতে চায়।

সংস্কৃতকে ব্যাপকভাবে পুনরায় সেরকম ধারায় চালু করার আশা আর কেউ করেন না। এখন প্রশ্ন, হিন্দীর মাধ্যমে সেটা সম্ভবপর কি না?

এই মনে করুন 'রামের সুমতি' কিংবা 'বিন্দুর ছেলে'। ধরে নিন অতি উত্তম অনুবাদক বই দুখানা হিন্দীতে অনুবাদ করলেন। আপনি উত্তম না হোক মধ্যম ধরনের হিন্দী জানেন, অর্থাৎ হিন্দী পুস্তক মাত্রই দিব্য গড় গড় করে পড়ে যেতে পারেন। এখন প্রশ্ন, আপনি কি সে সুখটা পাবেন যে সুখ ঐ দুখানা বাঙলা বই বাঙলাতে পড়ে পান? ('গোরা'র ইংরিজি তর্জমা পড়েছেন? তাতে তো কোনো সুখই পাওয়া যায় না—কারণ ইংরিজি অতি-দূরের ভাষা) কেন পান না? তার প্রধান কারণ বিন্দু কি ভাষায়, কি ভঙ্গিতে কথা বলে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে আপনার পরিচয় আছে; যখন দেখবেন তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না, সবই কৃত্রিম বোধ হচ্ছে, তখন আপনার কাব্যরসাস্বাদনের সব বাসনা চিরতরে না হোক, তখনকার মত লোপ পাবে। সংস্কৃতে যাঁরা নাটক লিখে গিয়েছেন, তাঁরা এ তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানতেন, তাই অন্ততঃ মেয়েদের দিয়ে সংস্কৃত বলাননি, বলিয়েছেন প্রাকৃত। নৃপ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বলেছেন, কারণ তাঁরা সংস্কৃত বলতে পারতেন, কিন্তু গোরা, বিনয়, অমিট রে কেউই দৈনন্দিন জীবনে হিন্দী

বলেন না, কখনো বলবেন বলে মনে হয় না। কাজেই হিন্দী দিয়ে এদের চরিত্র বিকাশ করে বাঙালীকে সুখ দেওয়া যাবে না। যাঁদের মাতৃভাষা বাঙলা নয়, তাঁদের কথা আলাদা—তাঁরা অবশ্য অনেকখানি রস পাবেন—যদিও স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, অনুবাদ সাহিত্য মাত্রই কাশ্মীরী শালের উল্টো দিকের মত, মূল নক্সাটি বোঝা যায় মাত্র, আর সব রসের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।*

উপরিস্থ তত্ত্ব-কথাটি সকলের কাছে এতই সুপরিচিত যে, আমার পুনরাবৃত্তিতে অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন, কিন্তু এইটির উপর নির্ভর করে আমি যে বক্তব্য পেশ করবো, সেটা যদি সকলে গ্রহণ করেন কিংবা অন্ততপক্ষে সেটি বিবেচনাধীন করেন, তবে আমি শ্রম সফল বলে মানব।

শুধু ভাষা এবং সাহিত্য নয়, অন্যান্য প্রচেষ্টাও স্বভাবতই প্রাদেশিক রঙ নেয়। অজন্তা ও মোগল-শৈলীর নবজীবন লাভ হয় বাঙলাদেশে, তাই সে সম্বন্ধে যত আলোচনা গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই বাঙলাতে। অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাকে একবার সার্বভৌম অধিকার দিলে যে বৈদগ্ধ্য গড়ে উঠে, সেটা প্রাদেশিক।

এইখানে লেগে গেল দ্বন্দ্ব। আমরা এ প্রবন্ধ প্রারম্ভ করেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভারতীয় বৈদগ্ধ্য যেন ঐক্যসূত্রে তাবৎ প্রদেশগুলিকে সম্মিলিত করে নব নব বিকাশের দিকে ধাবিত হয়। তাহলে মুক্তি কোন্ পন্থায়—প্রাদেশিক ভাষাকে সংস্কৃতি জগতের চক্রবর্তীরূপে স্বীকার করে প্রাদেশিক সংস্কৃতি গড়ব, না বাঙলা বর্জন করে হিন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করব?

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বর্জন করে নয়, তার সম্যক উন্নতি সাধন করে, এবং আমার আরো বিশ্বাস প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ন হবে না।

কারণ ভারতীয় ঐক্য (ইউনিটি) ও ভারতীয় সমতা (ইউনিফর্মিটি) এক বস্তু নয়। আজ যদি পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি সবাই ভাত খেতে আরম্ভ করে, তবে বিদেশ থেকে শস্য কেনার সময় আমাদের বহুৎ বখেড়া আসান হয়ে যাবে, আজ যদি তাবৎ ভারতীয়ের উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি হয়ে যায়, তবে সৈন্যদের ইউনিফর্ম বানাবার কত না সুবিধা হয়! তবু কেউ বলবেন না, সবাইকে

---

* সত্যই স্বামীজী বলেছেন কি না, হলপ করে বলতে পারব না; এক গুণীর মুখে শোনা।

জোর করে ভাত খাওয়াও, কিংবা ঢ্যাঙাদের শরীর থেকে দু ইঞ্চি কেটে ফেলো। এ ইউনিটি নয়, ইউনিফর্‌মিটি।

যাঁরা মেরে-পিটে ভারতীয় সমতা চাইছেন, তাঁরা যে জেনে-শুনে ভুল করেছেন তা নাও হতে পারে। আমার বিশ্বাস, তাঁরা ইউনিটি চাইছেন সত্য, কিন্তু ইউনিটি এবং ইউনিফর্‌মিটিতে গোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রত্যেক ভারতীয় প্রদেশ যদি আপন প্রাদেশিক সংস্কৃতি সভ্যতা আপন শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে গড়ে তোলে, তবে সেই সম্মিলিত সংস্কৃতিই হবে সত্যকার ভারতীয় সংস্কৃতি।

গুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে নিবেদন করি, তিনি বলেছিলেন, একতারা বাজানো সহজ, বীণা বাজানো কঠিন; কিন্তু সেটা বাজাতে পারলে তার থেকে যে harmony বা বহুধ্বনি আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঐক্যের যে-সঙ্গীত নির্মাণ করে তোলে, তার সঙ্গে একতারার ইউনিফর্‌মিটির কোনো তুলনা হয় না।

বহু প্রদেশের নানাবিধ সঙ্গীত জেগে উঠে যে harmonyর সৃষ্টি হবে, সে-ই সত্যকার ভারতীয় ঐক্য-সঙ্গীত। তবেই 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা সফল হবে।

॥ ৫ ॥

হিন্দীর প্রসার এবং প্রচার অতীব প্রয়োজনীয়, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করি—কিন্তু সে প্রসার যেন প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্যকে গলা টিপে না মেরে ফেলে। হুঁশিয়ার হয়ে সে প্রসার কর্ম সমাধান করলে কারোরই কোন আপত্তি থাকবে না। কি প্রকারে সেটা করা যেতে পারে, সে নিবেদন করার পূর্বে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে কয়টি আপত্তি বাঙলা দেশের কাগজে ইদানীং উঠেছে, তারই দু-একটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রধান এবং প্রথম আপত্তি, হিন্দীর লিঙ্গ বিভাগটা বড্ডই বদখদ। বাঙালী ভাবে, 'ছেলেটা যাচ্ছে,' 'মেয়েটা যাচ্ছে' বললে যখন দিব্য অর্থ বুঝতে পারি তখন 'লড়কা জাতা হৈ,' 'লড়কী জাতী হৈ' বলে মানুষকে বিরক্ত করা ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। এস্থলে বক্তব্য, 'অর্থ বুঝতে পারার' মান নিয়েই ভাষা সৃষ্টি হয় না। তাই যদি হত তবে বাঙলায় বলি না কেন, 'আমি গেলুম', তুমি গেলুম' 'সে গেলুম'? ইংরেজ তো খাসা এক 'ওয়েন্ট' দিয়েই বলে যায়,

'আই ওয়েণ্ট', 'ইউ ওয়েণ্ট', 'হি ওয়েণ্ট'—অর্থ জলের মত পরিষ্কার, বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষারই আপন আপন বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তা নিয়ে গোসা করলে চলে না। এখন প্রশ্ন, হিন্দী যে লিঙ্গভেদ করে সেটা কি নিছক তারই 'পাগলামি', না অন্যান্য ভাষাও করে? বাঙলা এককালে কিছুটা করত, সে কথা সকলেই জানেন, এবং এখনও কিছুটা করে। 'সুন্দর রমণী' বলতে এখনো বাধো বাধো ঠেকে, এবং কোন রমণীকে যদি বলি, 'ওগো সুন্দর, গঙ্গাস্নানে চললে নাকি'—তবে এখনো সেটা ভুল, 'সুন্দরী' বলতে হয়।

সংস্কৃতে যে লিঙ্গভেদ আছে এবং সে লিঙ্গভেদ যে সরল নয়, সে কথাও সকলেই জানেন। প্রাণহীন বস্তু মাত্রই যে ক্লীব হয় তাও তো নয়। বহু নদনদী এ জীবনে দেখেছি কিন্তু কোন্‌টারই নাম পুংলিঙ্গ আর কোন্‌টারই বা স্ত্রীলিঙ্গ—ক্লীবের তো কথাই উঠে না—সে তত্ত্বটি জলধারা দেখে ঠাহর করতে পারিনি। দিক্‌-সুন্দরীর (ডিক্‌শনারীর) শরণাপন্ন হলে পর তিনি দিশেহারাকে দিক বাতলে দেন।

উত্তরে হয়ত বলবেন, সংস্কৃতের উদাহরণ এখন আর চলবে না। চালু ভাষা থেকে নজীর পেশ করো।

এই মুশকিলে পড়ে গেলেন। ফরাসী, জর্মন, রুশ, ইতালী, ওলন্দাজ, আরবী, গুজরাতী, মারাঠী এ-সব ভাষাতেই লিঙ্গভেদ আছে—এবং আরো বহু ভাষায় আছে বলে শুনেছি—, সত্য বলতে কি লিঙ্গভেদ নেই এরকম ভাষাই বিরল। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলে, বড় ভাষার ভিতরে তিনটি মাত্র ভাষাতে লিঙ্গবিচার নেই—ইংরেজী, ফার্সী এবং বাঙলা। এ তিনটি ভাষা যতখানি ছাত্রত্রাস ব্যাকরণ বর্জন করতে পেরেছে অন্য ভাষাগুলো সে রকম পারেনি।

জর্মনের লিঙ্গ সবচেয়ে বেতালা বেহিসাব। 'ছুরি' 'কাঁটা' এবং 'চামচ' তিনটি শব্দই আমাদের কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী ক্লীব হওয়া উচিত অথচ জর্মন ভাষাতে 'ছুরি' ক্লীব, 'কাঁটা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'চামচ' পুংলিঙ্গ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'সূর্য' স্ত্রীলিঙ্গ, শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর 'চন্দ্রমা' পুংলিঙ্গ এবং 'নারী' ('ডাস ভাইব', 'ভাইব'—'ওয়াইফ') ক্লীব লিঙ্গ! শুধু তাই নয়, সূর্যের চেয়েও দোর্দণ্ডপ্রতাপ জর্মন পুলিস বাহিনী ('ডী পোলিৎসাই') স্ত্রীলিঙ্গ!

পুনরপি পশ্য, পশ্য, ফরাসী এবং হিন্দীতে 'দাড়ি' স্ত্রীলিঙ্গ।

তবে কি দাড়ির জৌলুসের মালিক এককালে রমণীরা ছিলেন? পুরুষেরা পরবর্তী যুগে জোর করে কেড়ে নিয়েছেন? কিন্তু ভুলবেন না, গোঁফ হামেশাই দাড়ির উপরে!

তবে বলুন তো, ভদ্র, হিন্দীকে দোষ দিয়ে লাভ কি ? বরঞ্চ হিন্দী জর্মনের তুলনায় ভদ্রতর। জর্মনে তিনটি লিঙ্গ ; 'লাগলে তাগ, না লাগলে তুক্কা' করে যদি লিঙ্গবিচার করেন তবে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র শতকরা ৩৩·৩ ভাগ ; হিন্দীতে ৫০ ভাগ, কারণ হিন্দীতে মাত্র দুটি লিঙ্গ।

যাঁরা হিন্দী জানেন তাঁরা হিন্দীর বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। হিন্দীতে বলি, 'মৈঁ রোটী খাতা হুঁ' 'আমি রুটি খাই', কিন্তু অতীত-কাল নিলে বলতে হয় 'মৈঁ নে রোটী খাঈ' 'আমি রুটি খেয়েছি'। অর্থাৎ অতীত-কালে 'আমি' আর কর্তা থাকলুম না, কর্তা হয়ে গেলেন 'রুটি' এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গেল, কারণ 'রোটী' হিন্দীতে স্ত্রীলিঙ্গ ('পানী', 'ঘি', 'দহী', 'মোতী'র মত মাত্র কয়েকটি ই-কারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ; তাই পুংভূষণ 'দাড়ি' বেচারী স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে গিয়েছে)। তার মানে 'আমা-দ্বারা রুটি খাওয়া হল' বললে অনেকটা হিন্দীর ওজনে বলা হল। কিংবা 'পাগলে কি না বলে!' সংস্কৃতে এরকম জিনিস আছে একথা সকলেই জানেন।

কিন্তু এসব সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। একবার কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ জানা হয়ে গেলে বাদবাকি জট তিন লহমায় ছাড়িয়ে নেওয়া যায়।

লিঙ্গ নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে কোন লাভ নেই। আমরা যদি হিন্দী-ভাষীকে বলি লিঙ্গ তুলে 'লড়কা জাতা', 'লড়কী জাতা' বলা আরম্ভ করে দাও, তবে ইংরেজ বাঙালীকে বলবে, 'আমি গেলুম', 'তুমি গেলুম', 'সে গেলুম', বলতে আরম্ভ করো। তাই ইংরেজ ফরাসী শেখার সময় ফরাসীর লিঙ্গবিচার নিয়ে আপত্তি তোলে না। চাঁদপানা মুখ করে, মুখস্থ করে 'শব্দের অন্তে বি, সি, ডি, জি, এল, পি, কিউ, জেড থাকলে শব্দ পুংলিঙ্গ হয়', অবশ্য বিস্তর ব্যত্যয় আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাসীতে হিন্দীর মত মাত্র দুটি লিঙ্গ—কিন্তু আমার মনে হয়, ফরাসীতে লিঙ্গবিচার হিন্দীর চেয়ে শক্ত।

এটা অবশ্য অসম্ভব নয় যে, হিন্দী বহু প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রাদেশিক অজ্ঞতাবশতঃ লিঙ্গে ভুল হতে আরম্ভ হবে এবং তারই ফলে হয়ত একদিন হিন্দী থেকে লিঙ্গ লোপ পেয়ে যাবে। তবে তার ফললাভ আমরা করতে পারবো না সে-কথা সুনিশ্চিত।

॥ ৬ ॥

হিন্দী-বিরোধী সম্প্রদায় বলেন, হিন্দীতে এমন কি সাহিত্য আছে, বাপু, যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হিন্দী শিখতে যাব? উত্তরে হিন্দীর দল বলেন, তাবৎ ভারত যদি হিন্দী গ্রহণ করে সে-ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ করে তবে দেখতে না দেখতেই হিন্দী ইংরিজি ফরাসীর সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করবে।

এ উত্তরটা ইতিহাসের ধোপে টেকে না। সকলেই জানেন, এককালে লাতিন সব ইউরোপের 'রাষ্ট্রভাষা' ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও লাতিন ভাষা গ্রীক কিংবা সংস্কৃতের মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তারপর ফরাসী ভাষা লাতিনের আসনটি কেড়ে নিল। কিন্তু ফরাসী সাহিত্য যে বিত্তবান হল সেটা ইংরেজ, জর্মন, ইতালিয়দের ফরাসী সাহিত্য-চর্চা করার ফলে নয়—ফরাসীর ব্যাপক সাহিত্য গড়ে উঠেছে ফরাসী যাঁদের মাতৃভাষা একমাত্র তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে। ঠিক সেই কারণেই প্রশ্ন, ক'টা বিদেশী ইংরিজিতে লিখে নাম করতে পেরেছে কিংবা কজন ইংরেজ ফরাসী জর্মনে লিখে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে? ইংরিজিতে ফিরে যাই; ফরাসীর পর এই যে ইংরিজি ভুবন জুড়ে রাজত্ব করল সে ভাষাতেই বা ক'টি বিদেশী নাম করতে পেরেছেন? এমন কি, কজন অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডাবাসী ইংরিজি সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের রচনা লিখতে সক্ষম হয়েছেন? এ জিনিসটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে কি ভাষাকে টবে পুঁতে বিদেশে পাঠালে সেখানে সে বেঁচে থাকতে সক্ষম হলেও ফল দিতে পারে না? আমেরিকার মত বিরাট দেশে তো আরো বেশী লেখকের জন্ম নেবার কথা ছিল—একদম পয়লা নম্বরের লেখক সে মহাদেশে জন্মেছেন কজন? অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকাবাসীর মাতৃভাষা ইংরিজি—তারাই যদি এ বাবদে কাহিল তবে যাঁদের মাতৃভাষা ইংরিজি নয় তাঁরাই বা কোন্ গন্ধমাদন উত্তোলন করতে পারবেন?

অথচ দেখুন, লাতিন ফরাসীর একচ্ছত্রাধিপত্য যেমন যেমন লোপ পেল সঙ্গে সঙ্গে জর্মন, ইংরিজি, ইতালি, রুশ, সুইডিশ, ওলন্দাজ সাহিত্য কী অল্প সময়ে কত না কত অদ্ভুত উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। তাই আজ আধমরা লাতিনের জায়গায় জেগে উঠেছে বহুতর ভাষা গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে। তাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বহু ভাষার শিখরতোরণ, মিনার-গম্বুজ দিয়ে গড়া 'ইউরোপীয় সাহিত্য' নামক এক গগনচুম্বী তাজমহল!

ইংরেজ ফরাসী ভাষায় লেখে না, ফরাসী জর্মনে লেখে না, রুশ দিনেমার

ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে যায় না, তথাপি এদের ভিতর আন্তরিক সহযোগিতার অন্ত নেই। আজ ফরাসী দেশে যে গঁকুর পুরস্কার পায় কালই তার বই ইংরিজিতে তর্জমা হয়ে যায়—অধিকাংশ স্থলে প্রাইজ পাওয়ার বহু পূর্বেই তর্জমা হয়ে গিয়েছে। আর নোবল পেলে তো কথাই নেই—হুস হুস করে ডজনখানেক ভাষায় খান বিয়াল্লিশ তর্জমা বাজার গরম করে তোলে।

ইংরেজ গেছে, আপদ গেছে। এখন আমি স্বপ্ন দেখি—সুশীল পাঠক তুমিও যোগ দাও—ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যেন উত্তম উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং এক সাহিত্যের ভালো লেখা যেন অন্য সব সাহিত্যে অনুবাদ করা হয়। ইংরেজের মতলব ছিল প্রদেশে প্রদেশে যেন ভাবের আদান-প্রদান না হয়। তৎসত্ত্বেও আমরা ইংরিজির মাধ্যমে একে অন্যকে কিছুটা চিনতে পেরেছি কিন্তু বহুস্থানেই অনেকখানি ভুল চেনাশোনা হয়েছে। এবারে সৎসাহিত্যের ভিতর দিয়ে আসল সদালাপ আরম্ভ হবে—আমরা এই স্বপ্ন দেখি।

বাঙলা বই হিন্দীতে অনুবাদ হবে, তারপর হিন্দী থেকে তামিলে—এ ব্যবস্থা আমার মনঃপূত হয় না। জ্যামিতি নাকি সপ্রমাণ করতে পারে, ত্রিভুজের যে কোনো এক বাহু যে কোনো দুই বাহুর চেয়ে হ্রস্বতর।

সোজাসুজি পরিচয় সবচেয়ে ভালো পরিচয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিই '
একখানি পুস্তকের প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নেই—এ সম্বন্ধে পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি—বইখানি স্বর্গীয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের 'গীতারহস্য'।

লোকমান্য গীতার এই নবীন ভাষ্য মারাঠীতে লিখেছিলেন এবং তার এক অতি জঘন্য ইংরিজি অনুবাদ আছে—একদম অখাদ্য অপাঠ্য। কিন্তু বৃদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে-শেখা, মরচে-ধরা, জাম-পড়া তাঁর মারাঠীজ্ঞানকে ঝালিয়ে নিয়ে বাঙলায় যে অনুবাদখানি করেছেন তার প্রশংসা করতে গিয়ে আমার অক্ষম লেখনী বার বার তার দুর্বলতা নিয়ে লজ্জিত হয়। এ তো অনুবাদ নয়, এ যেন বাঙালী টিলক বাঙলায় লিখেছেন। মারাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে এ অধম সে পুস্তক বহুবার অধ্যয়ন করেছে, প্রতিবার মনে মনে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, বন্ধুবান্ধবকে সে কেতাব-ই-কুৎব্-মিনার পড়তে অনুরোধ করেছে, এবং 'সত্যপীর' ছদ্মনামে সে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য 'আনন্দবাজারে' বিস্তর কান্নাকাটি করেছে।

এই বই পড়লে 'গীতা' নূতন করে চেনা যায় সে কথা অতি সত্য; কিন্তু উপস্থিত আমার নিবেদন, এ গ্রন্থ পড়লে মহারাষ্ট্র দেশকেও চেনা যায়। সংস্কৃত আজ সর্বত্রই মুমূর্ষু, কিন্তু কতখানি সংস্কৃত-চর্চা থাকলে পর এরকম গ্রন্থ বেরুতে

পারে সেটা এ বই পড়লে মহারাষ্ট্রের সেই ক্ষুদ্র পল্লী চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে বালক বালগঙ্গাধর সংস্কৃত-চর্চার মাঝখানে মানুষ হলেন। আমার গর্ব, আমি সে গ্রামে গিয়েছি, সে তীর্থ দেখেছি ॥*

বন্ধ-বাতায়নে

॥ ১ ॥

ইংরেজকে যত দোষই দিই না কেন, ইংরিজি সভ্যতার যত নিন্দাই করি না কেন, ইংরেজ যে একটা মহৎ কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একদিক দিয়ে বহু জাত-বেজাত ইংলণ্ড দখল করেছে, অন্যদিক দিয়ে ইংরেজ বিশ্বভুবনময় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে ইংলণ্ডে যে কত প্রকারের ভাব-ধারা এসে সম্মিলিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতী পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা, রসবোধ পদ্ধতি, আদর্শানুসন্ধান যখন পৃথক ভাবে যাচাই করি তখন বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না যে ইংরেজ কি করে সব কটাকে এক করে বহুর ভিতর দিয়ে ঐক্যের সন্ধান পেল।

কাব্যকলায় ইংরেজের যে খুব বেশী মৌলিকতা গুণ আছে তা নয়—ইয়োরোপীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলায় ইংরেজের দান অতি অল্পই—কিন্তু মনের সব কটি জানলা ইংরেজ সব সময়ই খোলা রেখেছে বলে বহু ভ্রমর তার ঘরে এসে নানা গুঞ্জন গান তুলেছে, নানা ফুলের সুবাস তার বৈদগ্ধ্যকে সুবাসিত করে তুলেছে। সে বৈদগ্ধ্যের প্রকাশও তাই সুভাষিত।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এই নানা বস্তু অন্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতার পিছনে রয়েছে সহিষ্ণুতা। এ গুণটি বড় মহৎ, এবং জর্মন জাতির এ গুণটি নেই বলেই তারা বহু প্রতিভাবান কবি, গায়ক, দার্শনিক পেয়েও কখনোই ইয়োরোপে একচ্ছত্রাধিপত্য করতে পারেনি।

---

* এ-প্রবন্ধ আমি বহু বৎসর পূর্বে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে লিখি, কিন্তু তখনো রাষ্ট্র-ভাষা সমস্যা তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেনি বলে—আমি জানতুম একদিন নেবেই নেবে, তাই আগেভাগেই সাবধানবাণী শোনাতে চেয়েছিলুম—(দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম প্রয়োজনাতীত তাণ্ডব রূপ ধারণ করে—সে তো তার বহু পরের ঘটনা!) আমার প্রিয় পাঠকবর্গ সমস্যাটির গুরুত্ব অনুভব করতে পারেননি। ফলে, উৎসাহাভাবে, আমি প্রবন্ধটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারিনি।

ইংরেজ রাজত্বের সময় আমাদের প্রধান কর্ম ছিল ইংরেজকে খেদানোর কল-কৌশল বের করা।—আমরা সহিষ্ণু এবং উদার কিনা, ছুঁৎবাইগ্রস্ত এবং কূপমণ্ডুক—এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ফুরসৎ এবং প্রয়োজন আমাদের তখন ছিল না।

এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সময় আজ এসেছে।

আমাদের বৈদেশিক রাজনীতি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমাদের চরিত্রের উপর।

আমরা যদি হাম-বড়াই প্রমত্ত হয়ে দেশবিদেশে সর্বত্র এরকম ধারা ভাবখানা দেখাই যে কারো কাছে আমাদের কিছু শেখবার নেই, আমাদের পুরাণাদি অনুসন্ধান করলে এটম বম্ বানানোর কৌশল খুঁজে পাওয়া যায়, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির সামনে যে লোক মাথা না নোওয়ায় সে আকাট মূর্খ, আমরা যদি দেশ-বিদেশে আপন সামাজিক জীবনে পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করে, নিমন্ত্রণ রেখে হৃদ্যতাযোগে সকলের সঙ্গে এক না হতে পারি তবে আমরা বৈদেশিক রাজনীতিতে মার খাব—বেধড়ক মার খাব, সে বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

যুদ্ধের সময় কত মার্কিন, ফরাসী, চেক্, বেলজিয়াম আমার কাছে ফরিয়াদ করেছে, বাঙালীদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তারা পেল না। এক মার্কিন আমাদের একখানা বাজে ইংরেজী কাগজের রবিবাসরীয় পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলল, "তোমরা যদি এ-রকম ইংরেজী লিখতে পারো তবে বাঙলাতে তোমাদের চিন্তাধারা কত না অদ্ভুত খোলতাই হয় তার সন্ধান পাব কি প্রকারে? বাঙলা শেখবার মত দীর্ঘকাল তো আর এদেশে থাকবো না, তাই অন্ততঃ দু-চারজন গুণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, দু-দণ্ড রসালাপ আর তত্ত্বালোচনা করে লড়াই-য়ের খুনকতলের কথাটা যাতে করে ভুলে যেতে পারি।"

আলাপ করিয়ে দিলুম কিন্তু জমলো না।

আমার বাঙালী বন্ধুরা যে জাত মানেন তা নয়, কিংবা মার্কিন ভদ্রলোকটি যে আমাদের ঠাকুরঘরে বসে গোমাংস খেতে চেয়েছিলেন তাও নয়, বেদনাটা বাজলো অন্য জায়গায়।

আলাপ-পরিচয়ের দু'দিন বাদেই ধরা পড়ে, আমাদের মনের জানালাগুলো সব বন্ধ। আমরা করি সাহিত্যচর্চা ও কিঞ্চিৎ রাজনীতি। নিতান্ত যাঁরা অর্থ-শাস্ত্র পড়েছেন, তাঁদের বাদ দিলে আমাদের রাজনীতিচর্চাও নিতান্ত একপেশে; আর আমাদের নিজেদের দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, নৃত্য সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খানিকটে আছে বটে কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্যের আর পাঁচটা সম্পদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন।

তাই গালগল্প ভালো করে জমে না। যে আমেরিকান পঁচিশপদী খানা খায় তাকে দু'বেলা ডালভাত দিলে চলবে কেন? রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ করে তো আর দিনের পর দিন কাটানো যায় না।

এর চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এখনো আমাদের যেটুকু বৈদগ্ধ্য আছে, যে-সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের বেশীর ভাগ লোকই অচেতন, সেটুকু গড়ে উঠেছে এককালে আমাদের মনের সব কটি জানলা খোলা ছিল বলে।

শুধু তাজমহল নয়, সমস্ত মোগল-পাঠান স্থাপত্য—জামি মসজিদ, আগ্রা দুর্গ, হুমায়ুনের কবর, সিক্রি এবং তার পূর্বেকার হৌজখাস, কুৎবমিনার সব কিছু গড়ে উঠলো ভারতবাসীর মনের জানলা খোলা ছিল বলে; দিল্লী আগ্রার বাইরে যে-সব স্থাপত্যশৈলী রয়েছে, যেমন ধরুন আহমদাবাদ বাঙলা দেশ কিংবা বিজাপুরে সেগুলোও তাদের পরিপূর্ণতা পেয়েছে, এককালে আমাদের মনের দরজা খোলা ছিল বলে; খানসাহেব আব্দুল করীম খান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে চরমে পৌঁছতে পেরেছিলেন তার সোপান নির্মিত হয়েছে ভারতীয় পূর্বাচার্যগণের ঔদার্যগুণে।

এই বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যই নিন। বৌদ্ধচর্যাপদে তার জন্ম, তার গায়ে বৈষ্ণব পদাবলীর নামাবলী, 'মঙ্গল'-মুকুট তার শিরে, আরবী-ফারসী শব্দের খানা খেয়েছে সে বিস্তর আর তার কথার ফাঁকে ফাঁকে যে ইংরিজি বোল ফুটে ওঠে তার জ্বালায় তো মাঝে মাঝে প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে।

আর কিছু না হোক আরবী-ফারসীর যে দুটো জানলা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি—যেগুলো সামান্য ফাঁক করে দিয়েই কবি নজরুল ইসলাম আমাদের গায়ে তাজা হাওয়া লাগিয়ে দিলেন—সেগুলোই যদি আমরা পুনরায় খুলে ধরি তা হলে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, সীরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর, লীবিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সহজ হয়ে যাবে। আফগানিস্থান ও ইরানে ফার্সী প্রচলিত আর বাদবাকি দেশ আরবী।

স্বার্থের সন্ধানে একদিন আমরা তাদের কাছে যাবো, তারাও আমাদের অনুসন্ধান করবে। তখন যদি তারা আমাদের যতটা চেনে তার চেয়ে তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশী হয় তবে আমরাই জিতব।

আর পূবের জানলাও তো খুলে ফেলা সহজ। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটক তো ভারতের পিটকেই বন্ধ আছে। ত্রিশরণ ত্রিরত্নের রত্নাকর তো আমরাই।

॥ ২ ॥

পশ্চিমের জানলা খুললে দেখতে পাই, পাকিস্তান ছাড়িয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব দেশের পর ভূমধ্যসাগর, অর্থাৎ ভারত এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ভূমি মুসলিম। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিশাল ভূখণ্ড যদি ধর্মের উদ্দীপনায় ঐক্যলাভ করতে পারে তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-পঞ্চায়েতে এদের উচ্চকণ্ঠ কি মার্কিন, কি রুশ কেউই অবহেলা করতে পারবে না।

তার পূর্বে প্রশ্ন, বহুশত বৎসর ধরে এ-ভূখণ্ডে কোনো প্রকারের স্বাধীন ঐক্য যখন নেই তখন আজ হঠাৎ কি প্রকারে এদের ভিতর একতা গড়ে তোলা সম্ভব? উত্তরে শুধু এইটুকু বলা চলে যে এ-ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে আর কখনো এমন কট্টর জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত হয়নি। তাই আজ যদি প্রাণের দায়ে এরা এক হয়ে যায়!

ঐক্যের পথে অন্তরায় কি?

প্রথম অন্তরায় ধর্মই। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যেমন বর্মা চীন এবং অন্যদিকে মুসলিম ভূমি, ঠিক তেমনি শীয়া ইরানের একদিকে সুন্নী আফগানিস্থান পাকিস্তান এবং ভারতীয় মুসলমান, অন্যদিকেও সুন্নী আরবিস্থান। শীয়া ইরানের সঙ্গে সুন্নী আফগানিস্থানের মনের মিল কখনো ছিল না, এখনো নেই। একটা উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্যটা খোলসা হবে; আফগান বিদগ্ধজনের শিক্ষাদীক্ষা এবং রাষ্ট্রভাষা ফার্সী, আর ইরানের ভাষা তো ফার্সী বটেই, তৎসত্ত্বেও কাবুলের লোক কস্মিনকালেও ইরানে লেখা-পড়া শেখবার জন্য যায়নি এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় যে তারা লেখা-পড়া এবং ধর্ম-চর্চার জন্য আসতো ভারতবর্ষে, এখনো আসে, যদ্যপি সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশের লোকই ফার্সীতে কথা বলে না। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেও তাই ছিল—আফগানিস্থান এককালে বৌদ্ধ ছিল, তার পূর্বে সে হিন্দু ছিল, কিন্তু ইরানী জরথুস্ত্র ধর্ম সে কখনো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি।

ইরান আফগানিস্থানে তাই অহরহ মনোমালিন্য। আফগানিস্থান ও ইরান সীমান্ত নিয়ে দু'দিন বাদে বাদে ঝগড়া লাগে ও আজ পর্যন্ত সে-সব ঝগড়া-কাজিয়া ফৈসালা করার জন্য কত যে কমিশন বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। আফগানিস্থানের পশ্চিমতম হিরাত ও ইরানের পূর্বতম শহর মেশেদে প্রায়ই শীয়া-সুন্নীতে হাতাহাতি মারামারি হয়। আফগান ইরানেতে বিয়ে শাদী হয় না, কাবুলরাজ কখনো তেহরান যান না, ইরান অধিপতিও কখনো কাবুলমুখো হন

না। ব্যত্যয় আমানউল্লা খান এবং তাঁর ইরান গমনের সংবাদ পেয়ে আফগানরা কিছুমাত্র উল্লসিত হয়নি।

ওদিকে যেমন ইরানের সঙ্গে আফগানিস্থানের মনের মিল নেই, এদিকে তেমনি আফগান পাকিস্তানীতে মন-কষাকষি চলছে। সিন্ধুর পশ্চিম পার থেকে আসল পাঠানভূমি আরম্ভ হয়, এবং পূর্ব আফগানিস্থানের উপজাতি সম্প্রদায়ও পাঠান। তাই আফগান সরকারের দাবী, পাকিস্তানের পাঠান হিস্সাটা যেন তার জমিদারীতে ফেরত দেওয়া হয়। এ দাবীটা আফগানিস্থান ইংরেজ আমলে মনে মনে পোষণ করত, কিন্তু ইংরেজের ডাণ্ডার ভয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করত না।

এই তো গেল পাকিস্তান, আফগানিস্থান, ইরানের মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক বা আঁতাঁৎ কর্দিয়ালের কেচ্ছা!

ওদিকে আবার ইরান আরবে দোস্তী হয় না। প্রথমতঃ ধর্মের বাধা ইরান শীয়া, আরব সুন্নী; দ্বিতীয়তঃ ইরানীরা আর্য, আরবরা সেমিতি, তৃতীয়তঃ ইরানের ভাষা ফার্সী, আরবের ভাষা আরবী।

কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর বাধা হয়েছে এই যে, খুদ আরব ভূখণ্ড ঐক্য-সূত্রে গাঁথা নয়। খুদ আরবভূমি যদি এক হয়ে ইরানের উপর তার বিরাট চাপ ফেলতে পারত তবে হয়ত ইরান প্রাণের দায়ে ভালো হোক মন্দ হোক কোনো প্রকারের একটা দোস্তী করে ফেলত (তা সে-'আঁতাঁৎ', 'হার্দিক, হার্টি' অর্থাৎ 'কর্দিয়াল' হল আর নাই হল) কিন্তু তাবৎ আরব ভূখণ্ডকে এক করবার মত তাগদ আজ কারো ভিতরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আরবভূমি আজ ইরাক, সীরিয়া, লেবানন, ট্রান্স্-জর্ডান, সউদী আরব, প্যালেস্টাইন ও ইয়েমেন এই সাত রাষ্ট্রে বিভক্ত। তাছাড়া, কুয়েৎ, হাদ্রামুত, অধুনা 'নির্মিত' আদন ইত্যাদি ক-গণ্ডা উপরাষ্ট্র আছে সে তো অশুমার! এদের সকলেরই ভাষা ও ধর্ম এক ও তৎসত্ত্বেও এদের ভিতর মনের মিল নেই। এবং সে ঐক্যের অভাব এই সেদিন মর্মন্তুদরূপে সপ্রমাণ হয়ে গেল—যেদিন কথা নেই বার্তা নেই আড়াই গণ্ডাই ইহুদী হঠাৎ উড়ে এসে আরবীস্থানের বুকের উপর প্যালেস্টাইনে জুড়ে বসল। যে আরব হাজারো বৎসর ধরে প্যালেস্টাইনের পাথর নিংড়ে সরস জাফা কমলালেবু বানিয়ে নিজে খেত, দুনিয়াকে খাওয়াত, সেই আরবের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করল আড়াই গণ্ডা 'রণভীরু' ইহুদী! আরব রাষ্ট্রেরা আপন গৃহকলহ নিয়ে মশগুল—ওদিকে প্যালেস্টাইন পয়মাল হয়ে গেল।

লেবাননকে বাদ দিয়ে আরব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্—কারণ লেবানন রাষ্ট্রে মুসলিম-আরবের চেয়ে খৃষ্টান-আরবের সংখ্যা একটুখানি বেশী; লেবাননের

খৃষ্টান আরবেরা ইহুদীদের সঙ্গে দোস্তী করতে চায় না একথা খাঁটি এবং তারা হয়ত বৃহত্তর আরবভূমির পঞ্চায়েতে হাজিরা দিতে রাজি নাও হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, কারণ লেবানন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রাষ্ট্র।

আসল লড়াই দুই পালোয়ানে। তাঁদের একজন আমীর আব্দুল্লা, ট্র্যান্স-জর্ডনের রাজা, অন্যজন মক্কা-মদীনা, জিদ্দা-নেজদের রাজা ইবনে সউদ। আব্দুল্লার বংশই ইরাকে রাজত্ব করেন, কাজেই এ দু'রাষ্ট্রে মিতালি পাকা, কিন্তু ইবনে সউদ একাই একশ। কারণ রাজা বলতে আমরা যা বুঝি সে হিসেবে আজকের দুনিয়ায় একমাত্র তিনিই খাঁটি রাজা। আব্দুল্লার পিছনে রয়েছে ইংরেজের অর্থবল, বাহুর দম্ভ; কিন্তু ইবনে সউদ কারো তোয়াক্কা করে আপন রাজ্য চালান না। মার্কিনকে তেল বেচে তিনি এযাবৎ কয়েকশ মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন বটে, তবু মার্কিন তাঁর রাজত্বে কোনো প্রকারের নাম-প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মক্কার কাবা শরীফের তদারকদার—বিশ্ব মুসলিম, সেই খাতিরে তাঁকে কিছুটা মানেও বটে।

যেন ঘোঁটালাটা যথেষ্ট প্যাঁচালো নয় তাই মিশরকেও এই সম্পর্কে স্মরণ করতে হয়। কারণ মিশরবাসীর শতকরা নব্বুই জন আরবীতে কথা বলে, ধর্ম তাদের ইসলাম ও তাদের বেশীর ভাগের রক্তও আরব-রক্ত। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ইসলাম এবং মুসলিম ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অছি কাইরোর সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় অল-অজহর। আরব, আফগানিস্থান, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মালয়, জাভা এক কথায় তাবৎ দুনিয়ার কুল্লে ধর্মপ্রাণ মুসলিমের আন্তরিক কামনা অজহরে ধর্মশিক্ষা লাভ করবার।

তদুপরি মিশর প্রগতিশীল এবং বিত্তশালী রাষ্ট্রও বটে।

কিন্তু মিশরের উপরে রয়েছে ইংরেজের সরদার।

সেই হল আরেক বখেড়া। আরবদের ভিতর ঝগড়া-কাজিয়া তো রয়েছেই, তার উপর আবার আরব হাঁড়ির ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে বসে আছেন ইংরেজ এবং স্বয়ং মার্কিন চতুর্দিকে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হাঁড়ির কিছুটা স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ইতিমধ্যেই তাঁর লাঙ্গুলকে কিঞ্চিৎ চেকনাই এনে দিয়েছে—সেকথা পূর্বেই নিবেদন করেছি।

তাই সব কিছু ছয়লাপ করে দেয় তেলের বন্যা। ইরান ইরাকের তেল ইংরেজের, আর সউদী আরবের তেল মার্কিনের। পাঠক বলবেন, তাহলেই হল, ব্রাদারলি ডিভিশন, কিন্তু সুশীল পাঠক, আপনি উপনিষদ পড়েননি তাই এ-রকম ধারা বললেন। ভূমৈব সুখম—অল্পে সুখ নেই। মার্কিন চায় তৈলযজ্ঞের

একক পুরোহিত হতে, আর ইংরেজ চায় মার্কিনকে দরিয়ার সে-পারে খেদাতে।

কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম আর কোথায় এসে পড়েছি। কোথায় আফগানিস্থানের প্রস্তরময় শৈলশিখর আর কোথায় স্নেহভরে ডগমগ আরবের পাতাল-তল। এ সবকিছুর হিসেবনিকেশ করে পররাষ্ট্র নীতির হদিস বানানো তো সোজা কর্ম নয়।

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এ-দেশের বিস্তর লোক আরবী এবং ফার্সী উভয় ভাষাই জানেন। ইচ্ছে করলে এঁদের সম্বন্ধে আমরা নিজের মুখেই ঝাল খেতে পারি।

তাই বলি খোলো খোলো জানলা খোলো॥*

এ্যারোপ্লেন

॥ ১ ॥

পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রথম এ্যারোপ্লেন চড়েছিলুম। ✽ দশ টাকা দিয়ে কলকাতা শহরের উপর পাঁচ মিনিটের জন্য খুশ সোওয়ারী বা 'জয়-রাইড' নয়, রীতিমত দু'শ মাইল রাস্তা—পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে নদী-নালা পেরিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহর যেতে হয়েছিল। তখনকার দিনে এদেশে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস ছিল না, কাজেই আমার অভিজ্ঞতাটা গড়পড়তা ভারতীয়দের পক্ষে একরকম অভূতপূর্বই হয়েছিল বলতে হবে।

তারপর ১৯৪৮ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গায় প্লেনে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। একদিন হয়তো পুষ্পক-রথে করেই স্বর্গে যাব, অর্থাৎ প্লেন-ক্র্যাশে অক্কালাভ করবো—তাতে আমি আশ্চর্য হব না, কারণ এ তো জানা কথা, 'ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।' সে-কথা থাক্।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে প্রতিবারেই লক্ষ্য করি, পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্লেনে যে সুখ-সুবিধে ছিল আজও প্রায় তাই। ভুল বলা হল, 'সুখ-সুবিধে' না বলে 'অসুখ-

* এ প্রবন্ধটি লিখি ১৩৫৬ (১৯৪৯ খৃঃ) সালে—(অর্থাৎ দেশে-বিদেশে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময়)। ইতিমধ্যে আরব ভূখণ্ডে রাজার বদলে কোনো কোনো জায়গায় ডিকটেটর হয়েছেন, মিশর থেকে ইংরেজ অনেক দূরে হটে গিয়েছে। নইলে এ প্রবন্ধের মূল দর্শন তখন যা ছিল, আজও তাই। আমি তাই প্রবন্ধের কোনো পরিবর্তন করিনি।

✽ রচনাটি লেখা হয় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে।

অসুবিধে' বলাই উচিত ছিল কারণ প্লেনে সফর করার মত পীড়াদায়ক এবং বর্বরতর পদ্ধতি মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যে সব হতভাগ্য প্লেনে চড়েন তাঁরা ওকীব-হাল, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। উপস্থিত তাই তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদন, প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যাঁদের এযাবৎ হয়নি।

রেলে কোথাও যেতে হলে আপনি চলে যান সোজা হাওড়া। সেখানে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেন—ব্যস হয়ে গেল। অবশ্য আপনি যদি বার্থ রিজার্ভ করতে চান তবে অন্য কথা, কিন্তু তবু এ-কথা বলবো, হঠাৎ খেয়াল হলে আপনি শেষ মুহূর্তেও হাওড়া গিয়ে টিকিট এবং বার্থের জন্য একটা চেষ্টা দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনোগতিকে একটা বার্থ কিংবা নিদেনপক্ষে একটা সীট জুটে যায়ই।

প্লেনে সেটি হবার যো নেই। আপনাকে তিন দিন, পাঁচ দিন, কিংবা সাত দিন পূর্বে যেতে হবে 'এ্যার আপিসে'। এক হাওড়া স্টেশন থেকে আপনি বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, গৌহাটি—এমন কি ব্যাণ্ডেল-হুগলী হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত যেতে পারেন কিন্তু একই 'এ্যার আপিস' আপনাকে সব জায়গার টিকিট দেয় না—কেউ দেবে ঢাকা আর আসাম, কেউ দেবে মাদ্রাজ অঞ্চল, কেউ দেবে দিল্লীর।

এবং এ-সব এ্যার আপিস ছড়ানো রয়েছে বিরাট কলকাতার নানা কোণে, নানা গহ্বরে। এবং বেশির ভাগই ট্রামলাইন, বাসলাইনের উপরে নয়। হাওড়া যান ট্রামে, দিব্য মা গঙ্গার হাওয়া খেয়ে, এ্যার আপিসে যেতে হলে প্রথমেই ট্যাক্সির ধাক্কা।

এ্যার আপিসে ঢুকেই আপনার মনে হবে ভুল করে বুঝি জঙ্গী দফতরে এসে পড়েছেন। পাইলট, রেডিয়ো অফিসার তো উর্দী পরে আছেনই—এমন কি টিকিটবাবু পর্যন্ত শার্টের ঘাড়ে লাগিয়েছেন নীল-সোনালির ব্যাজ-বিল্লা-রিবন-পট্টি—যা খুশী বলতে পারেন। রেলের মাস্টারবাবু, গার্ড সাহেবরা উর্দী পরেন কিন্তু সে উর্দী জঙ্গী কিংবা লস্করী উর্দী থেকে স্বতন্ত্র—এ্যার আপিসে কিন্তু এমনই উর্দী পরা হয়—খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই—যে আমার মত কুনো বাঙালী সেটাকে মিলিটারী কিংবা নেভির য়ুনিফর্মের সঙ্গে গুবলেট পাকিয়ে আপন অজানাতে ডুম্ করে একটা সলুট মেরে ফেলে।

তারপর সেই উর্দী পরা ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা কইবেন ইংরিজিতে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আপনি ধুতি-কুর্তা-পরা নিরীহ বাঙালী তবু ইংরিজি বলা চাই। আপনি না হয় সামলে নিলেন—বি. এ., এম. এ. পাস করেছেন—কিন্তু

আমি মশাই, পড়ি মহা বিপদে। তিনি আমার ইংরিজি বোঝেন না, আমি তাঁর ইংরিজি বুঝতে পারি নে—কী জ্বালা! এখন অবশ্য অনেক পোড় খাওয়ার পর শিখে গিয়েছি যে জোর করে বাঙলা চালানোই প্রশস্ততম পন্থা। অন্ততঃ তিনি আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারেন।

তখ্খুনি যদি রোক্কা টাকা ঢেলে দিয়ে টিকিট কাটেন তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল কিন্তু যদি শুধু 'বুক' করান তবে আপনাকে আবার আসতে হবে টাকা দিতে। নগদা টাকা ঢেলে দেওয়াতে অসুবিধে এই যে পরে যদি মন বদলান তবে রিফাণ্ড পেতে অনেক হ্যাঁপা পোয়াতে হয়। সে না হয় হল, রেলের বেলাও হয়।

কিন্তু প্লেনের বেলা আরেকটা বিদকুটে নিয়ম আছে। মনে করুন আপনি ঠিক সময় দমদমা উপস্থিত না হতে পারায় প্লেন মিস করলেন। রেলের বেলা আপনি তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশ টাকা কিংবা তারো কম কম-বেশী খেসারতির আক্কেলসেলামি দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। প্লেনের বেলা সে-টি হচ্ছে না। অথচ আপনি পাকা খবর পেলেন, প্লেনে আপনার সীট ফাঁকা যায়নি, আরেক বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোক পুরো ভাড়া দিয়ে আপনার সীটে করে ট্রাভেল করেছেন, এ্যার কোম্পানীও স্বীকার করলো কিন্তু তবু আপনি একটি কড়িও ফেরত পাবেন না। এ্যার কোম্পানীর ডবল লাভ! এ-নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা লাগালে কি হবে বলতে পারি নে, কারণ আমি আদালতকে ডরাই এ্যার কোম্পানীর চেয়ে একটুখানি বেশী।

টিকিট কেটে তো বাড়ি ফিরলেন। তারপর সেই মহামূল্যবান 'মূল্যপত্রিকা'-খানি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে প্লেন দমদমা থেকে ছাড়বে দশটার সময়, আপনাকে কিন্তু এ্যার আপিসে হাজিরা দিতে হবে আটটার সময়! বলে কি? নিতান্ত থাড্ডো কেলাসে যেতে হলেও তো আমরা এক ঘণ্টার পূবে হাওড়া যাই নে—কাছাকাছির সফর হলে তো আধঘণ্টা পূর্বে গেলেই যথেষ্ট আর যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেণ্ডের (প্লেনে আপনি ভাড়া দিচ্ছেন ফার্স্টের চেয়েও বেশী—অনেক সময় ফার্স্টের দেড়া!) বার্থ রিজার্ভ থাকে তবে তো আধ মিনিট পূবে পৌঁছলেই হয়। আপনি হয়ত প্লেনে থাকবেন পৌনে দু'ঘণ্টা, অথচ আপনাকে এ্যার আপিসে যেতে হচ্ছে পাকি দু'ঘণ্টা পূর্বে (মোকামে পৌঁছে সেখানে আরো কত সময় যাবে সে-কথা পরে হবে)।

এইবার মাল নিয়ে শিরঃপীড়া। আপনি চুয়াল্লিশ (কিংবা বিয়াল্লিশ) পৌণ্ড লগেজ ফ্রী পাবেন। অতএব,

'সোনা-মুগ সরু চাল সুপারি ও পান,
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল,
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—'

ইত্যাদি মাথায় থাকুন, বিছানাটি যে নিয়ে যাবেন তারো উপায় নেই। অথচ আপনি গৌহাটি নেমে হয়ত ট্রেনে যাবেন লামডিং, সেখানে উঠবেন ডাক বাঙলোয়। বিছানা—বিশেষ করে মশারি—বিন কি করে গোঁয়াবেন দিন-রাতিয়া ?

বিছানাটা নিলেন কি ? না। তার ভেতরে যে ভারী জিনিস কিছু কিছু লুকোবেন ভেবেছিলেন সেটিও তা হলে হল না। অবশ্য লুকিয়ে কোনো লাভ হত না কারণ জিনিসটিকে ওজন তো করা হতই—মালে আপনি ফাঁকি দিতে পারতেন না।

এ্যার ট্রাভেল করবেন—মাত্র বিয়ালিশ পৌণ্ড ফ্রী লগেজ—অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের মত একটি পিচবোর্ডে কিংবা ফাইবারের স্যুটকেসে মালপত্র পুরে—সেটার অবস্থা কি হবে মোকামে পৌঁছলে পর বলবো—রওয়ানা দিলেন এ্যার আপিসের দিকে, ছাতা-বরসাতি এটাচি হাতে, তার জন্য ফালতো ভাড়া দিতে হবে না (থ্যাঙ্ক ইউ !)। ট্যাক্সি যখন নিতেই হবে তখন সঙ্গে চললেন দু' একজন বন্ধু-বান্ধব। যদিস্যাৎ দৈবাৎ প্লেন মিস্ করেন তবে একটি কড়িও ফেরত পাবেন না বলে দু-দশ মিনিট আগেই রওয়ানা দিলেন এবং এ্যার আপিসে পৌঁছলেন পাকি সোয়া দু ঘণ্টা পূর্বে—আমার জাত-ভাই বাঙালরা যে রকম ইস্টিশানে গাড়ি ছাড়ার তিন ঘণ্টা পূর্বে যায়।

এ্যার আপিসের লোক হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি থেকে আপনার মাল নামাবে। সে লোকটা কুলি-চাপরাসীর সমন্বয়—তা হোক্ গে, কিন্তু তার বাই সে 'হিন্দীতে'—রাষ্ট্রভাষাতে—অর্থাৎ তার অউন, অরিজিন্যাল হিন্দীতে কথা বলবেই—যে রকম তার বসের ইংরেজি বলার বাই, অথচ উভয় পক্ষই বাঙালী। আমাদের বঙ্কিম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলতে আমরা অজ্ঞান, কিন্তু এই বাঙলা দেশের মহানগরী রামমোহন রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমিতেই আপিস-আদালতে, রাস্তা-ঘাট 'আ মরি বাংলা ভাষার' কী কদর, কী সোহাগ !

॥ ২ ॥

কলকাতা বাঙালীর শহর। বাঙালী বলতে আপনি আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীই বুঝি তাই আমাদের এ্যার আপিসগুলোর অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মত। অর্থাৎ মাসের পয়লা তিন দিন ইলিশ মুর্গী তারপর আলুভাতে আর মসুর ডাল।

ঢাক-ঢোল শাঁক-করতাল বাজিয়ে যখন প্রথম আমাদের এ্যার আপিসগুলো খোলা হয় তখন সেগুলো বানানো হয়েছিল একদম সায়েবি কায়দায়। বড় বড় কৌচ, বিরাট বিরাট সোফা, এন্তার ফ্যান, হ্যাট-স্ট্যাণ্ড, গ্লাস-টপ টেবিল, তার উপরে থাকতো মাসিক, দৈনিক, এ্যাশট্রে আরো কত কি। সাহস হত না বসতে, পাছে জামাকাপড়ের ঘষায় সোফার চামড়া নোংরা হয়ে যায়—চাপরাসীগুলোর উর্দীই তো আমার পোশাকের চেয়ে ঢের বেশী দুরস্ত, ছিমছাম।

আর আজ? চেয়ারগুলোর উপর যা ময়লা জমেছে তাতে বসতে ঘেন্না করে। ফ্যানগুলো কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে ছুটির আবেদন জানাচ্ছে, দেওয়ালে চুনকাম করা হয়নি সেই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে—সমস্তটা নোংরা, এলোপাতাড়ি আর আবহাওয়াটা ইংরিজিতে যাকে বলে ড্রেয়ারি, ডিসমল্।

একটা এ্যার আপিসে দেখেছি—ভিতরে যাবার দরজায় যেখানে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে হয় সেখানে যা ময়লা জমেছে তার তুলনায় রান্নাঘরের তেলচিটে কালি-মাখা দরজাও পরিষ্কার। আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, আসুন একদিন আমার সঙ্গে, আপনাকে দেখিয়ে দেব।

এইবারে একটু আনন্দের সন্ধান পাবেন। দশাশয়ী লাশদের যখন ওজন করা হবে তখন আড়নয়নে ওজনের কাঁটাটার দিকে নজর রাখবেন। ১৬০ থেকে তামাসা আরম্ভ হয়, তারপর ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে কেউ কেউ মুশতাক আলীর মত ট্রিপলের কাছাকাছি পৌঁছে যান। আমার বন্ধু '—' মুখুয্যে যখন একবার ওজন নিতে উঠেছিল তখন কাঁটাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় থপ করে শূন্যেতে এসে ভিরমি গিয়েছিল। মুখুয্যে আমাকে হেসে বলেছিল, 'কিন্তু ভাড়া তুমি যা দাও আমিও তাই।'

কী অন্যায়!

তারপর আবার সেই একটানা একঘেয়ে অপেক্ষা।

তিন কোয়ার্টার পরে খবর আসবে—মালপত্র সব বাসে তোলা হয়ে গিয়েছে। আপনারা গা-তুলুন।

রবিঠাকুর কি একটা গান রচেছেন না?

আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরের সুরে সুর মেলাতে—

এ্যার কোম্পানীর বাসগুলো কিন্তু আপিসগুলোর সঙ্গে দিব্য সুর মিলিয়ে বসে আছে। লড়াইয়ের বাজারে যখন বিলেত থেকে নূতন মোটর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কচু-বন থেকে কুড়িয়ে-আনা যে সব বাস গ্রামাঞ্চলে চড়েছিলুম আমাদের এ্যার কোম্পানীর বাস প্রায় সেই রকম। ওদেরই আপিসের মত নোংরা, নড়বড়ে আর সীটগুলোর স্প্রিং অনেকটা আরবিস্থানের উটের পিঠের মত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়ীন' হওয়ার শখ যদি আপনার হয়, আরব দেশ না গিয়ে, তবে এই বাসের যে কোনো একটা দু'দণ্ডের তরে চড়ে নিন। আপনার মনে আর কোন খেদ থাকবে না।

মধ্য কলকাতা থেকে দমদম ক'মাইল রাস্তা সে খবর বের করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়; কিন্তু সেই বাসে চড়ে আপনার মনে হবে:—

'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

মোটর, ট্যাক্সি, স্টেট বাস, বেসরকারী বাস এমন কি দু-চারখানা সাইকেল-রিক্সাও আপনাকে পেরিয়ে চলে যাবে। ত্রিশ না চল্লিশ জন যাত্রীকে এক খেপে দমদম নিয়ে যাবার জন্য তৈরী এই ঢাউস বাস—প্রতি পদে সে জাম্ হয়ে যায়, ড্রাইভার করবে কি, আপনিই বা বলবেন কি?

দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার সময় একবার দেখেছিলুম, যে যাত্রী প্লেনের দোলাতে কাতর হয়নি সে এই বাসের ঝাঁকুনিতে বমি করেছিল।

দমদমা পৌঁছলেন। এবারে প্লেন না-ছাড়া পর্যন্ত একটানা প্রতীক্ষা। সেও প্রায় তিন কোয়ার্টারের ধাক্কা।

তবে সময়টা অত মন্দ কাটবে না। জায়গাটা সাফ-সুতরো, বইয়ের স্টল আছে, দমদম আন্তর্জাতিক এ্যার-পোর্ট বলে জাত-বেজাতের লোক ঘোরাঘুরি করছে, ফুটফুটে ফরাসী মেম থেকে কালো-বোরকায় সর্বাঙ্গ ঢাকা পর্দা-নশিনী হজযাত্রিণী সব কিছুই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে।

তবে এ-কথাও ঠিক হাওড়ার প্ল্যাটফর্মের তুলনায় এখানে উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য কম। প্লেনে যখন মাল আর আপনার জায়গা হবেই তখন আর হুতো-হুতি গুঁতোগুঁতি করার কি প্রয়োজন?

তবু ভারতবর্ষ তাজ্জব দেশ। দিনকয়েক পূর্বে দমদম এ্যার-পোর্ট রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক গেলাস জল চাইলুম। দেখি জলের রঙ ফিকে হলদে। শুধালুম, শরবত

কি ফ্রী বিলোনো হচ্ছে ? বয় বললে, জলের ট্যাঁকি সাফ করা হয়েছে তাই জল ঘোলা এবং মৃদুস্বরে উপদেশ দিলে ও-জল না-খাওয়াই ভালো।

শুনেছি, ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে নরনারী এমন কি বাচ্চা-কাচ্চারাও নাকি জল খায় না। দমদমাতে যদি কিছুদিন ধরে নিত্যি নিত্যি ট্যাঁকি সাফ করা হয় তবে আমরা সবাই সায়েব হয়ে যাবো। শুধু কি তাই, জলের জন্য উদ্বাস্তুরা উদ্ব্যস্ত করে তুলবে না কলকাতা কর্পোরেশনকে। আমরা সবাই তখন রুটির বদলে কেক খাবো। সে কথা থাক্!

কিন্তু দমদম এ্যার-পোর্টের সত্যিকার জৌলুস খোলে যেদিন ভোরে কুয়াশা জমে। কাণ্ডটা আমি এই শীতেই দুবার দেখেছি।

ভোর থেকে যে সব প্লেনের দমদম ছাড়ার কথা ছিল তার একটাও ছাড়তে পারেনি। তার প্যাসেঞ্জার সব বসে আছে এ্যার-পোর্টে। আরো যাত্রী আসছে দলে দলে, তাদেরও প্লেন ছাড়তে পারছে না। করে করে প্রায় দশটা বেজে গেল। একদিক থেকে যাত্রীরা চলে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে আসছে, এই স্রোত বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তখন দমদমাতে যে যাত্রীর বন্যা জাগে, তাদের উৎকণ্ঠা, আহারাদির সন্ধান, খবরের জন্য এ্যার কোম্পানীর কর্মচারীদের বার বার একই প্রশ্ন শোধানো, 'ড্যাম ক্যালকাটা ওয়েদার' ইত্যাদি কটুবাক্য, নানারকমের গুজোব—কোথায় নাকি কোন্ প্লেন ক্র্যাশ করেছে, কেউ জানে না—যে সব বন্ধুরা 'সী অফ্' করতে এসেছিলেন তাঁদের আপিসের সময় হয়ে গেল অথচ চলে গেলে খারাপ দেখাবে বলে কষ্টে আত্মসম্বরণ, প্লেন 'টেক অফ্' করতে পারছে না ওদিকে ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে বলে যাত্রীদের ফ্রী খাওয়ানো হচ্ছে, কঞ্জুস কোম্পানীগুলো গড়িমসি করছে বলে তাদের যাত্রীদের অভিসম্পাত—আরো কত কি ?

লাউড স্পীকার ভোর ছটা থেকে রা কাড়েনি। খবর দেবেই বা কি ?

দমদমা নর্থ-পোল হলে কি হত জানি নে—শেষটায় কুয়াশা কাটলো। হঠাৎ শুনি লাউড স্পীকারটা কুয়াশায়-জমা গলায় কাশি বার কয়েক সাফ করে জানালে, 'অমুক জায়গার প্যাসেঞ্জাররা অমুক প্লেনে (ডি বি জি, হি বি জি, হিজিবিজি কি নম্বর বললে বোঝা গেল না) করে রওয়ানা দিন।'

আমি না হয় ইংরিজি বুঝি নে, আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু লক্ষ্য করলুম, আরও অনেকে বুঝতে পারেননি। গোবেচারীরা ফ্যাল ফ্যাল করে ডাইনে-বাঁয়ে তাকালে, অপেক্ষাকৃত চালাকেরা এ্যার আপিসে খবর নিলে, শেষটায় যে-প্লেন ছাড়বে তার কোম্পানীর লোক আমাদের ডেকে-ডুকে জড়ো করে প্লেনের দিকে

রওয়ানা করে দিলে—পাণ্ডারা যে-রকম গাঁইয়া তীর্থযাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি দিয়ে ঠিক গাড়িতে তুলে দেয়।

আমার সঙ্গে পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছিলেন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, 'আজকাল তো অনেক ইংরেজী না-জাননেওয়ালা যাত্রী-ভী প্লেন চড়ছে—তব্ বাঙালী জবান মে প্লেনকা খবর বলে না কাহে?'

ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

॥ ৩ ॥

দেবরাজকে সাহায্য করে রাজা দুষ্মন্ত যখন পুষ্পক রথে চড়ে পৃথিবীতে ফিরছিলেন, তখন যেমন যেমন তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-পর্বত, গৃহ-অট্টালিকা অতিশয় দ্রুতগতিতে তাঁর চক্ষের সম্মুখে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগল। যতদূর মনে পড়ছে, রাজা দুষ্মন্ত তখন তাই নিয়ে রথীর কাছে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

পুণার জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তারই উল্লেখ করে আমার কাছে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, দুষ্মন্তের যুগ পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই খপোত নির্মাণ করতে পারতেন, না হলে রাজা ক্রমাসন্ন পৃথিবীর এহেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন কি প্রকারে?

তার বহু বৎসর পরে একদা রমন মহর্ষি কোনো একটি ঘটনা বিশদভাবে পরিস্ফুট করার জন্য তুলনা দিয়ে বলেন, উপরের থেকে নিচের দিকে দ্রুতগতিতে আসার সময় পৃথিবীর ছোট ছোট জিনিস যে রকম হঠাৎ বৃহৎ অবয়ব নিতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই রকম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহর্ষির এক প্রাচীন ভক্ত আমার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে কানে কানে বললেন, 'এখন তো তোমার বিশ্বাস হল যে, মহর্ষি যোগবলে উড্ডীয়মান হতে পারেন।' আমাকে এ-কথাটি তাঁর বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, আমি একদিন অলৌকিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ফার্সী প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করে বলেছিলুম,

'পীর্‌হা নমীপরন্দ,
শাগির্‌দার উস্থারা মীপরানন্দ্।'

অর্থাৎ 'পীর (মুরশাদ) ওড়েন না, তাঁদের চেলারা ওঁদের ওড়ান (cause them fly)'।

তার কিছুদিন পরে আমি রমন মহর্ষির পীঠস্থল তীরু-আন্নামলাই

(শ্রীআন্নামলাই) গ্রামের নিকটবর্তী অরুণাচল পর্বত আরোহণ করি। মহর্ষি এই পর্বতে প্রায় চল্লিশ বৎসর নির্জনে সাধনা করার পর তীরু-আন্নামলাই গ্রামে অবতরণ করেন—সাধনার ভাষায় অবতীর্ণ হন।

পাহাড়ের উপর থেকে রমনাশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির সব কিছুই খুব ছোট দেখাচ্ছিল। তারপর নামবার সময় পাহাড়ের সানুদেশে এক জায়গায় খুব সোজা এবং বেশ ঢালু পথ পাওয়ায় আমি ছুটে সেই পথ দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, আশ্রম, দ্রৌপদী-মন্দির কি রকম অদ্ভুত দ্রুত-গতিতে বৃহৎ আকার ধারণ করতে লাগলো।

আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে এটা কিছু সপ্রমাণ হয় না যে, পুষ্পক রথ কল্পনার সৃষ্টি কিংবা রমন মহর্ষি যোগবলে আকাশে উড্ডীয়মান হননি, কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে দ্রুতগতিতে অবতরণ করার সময় ভূপৃষ্ঠ কিরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে।

কিন্তু এর উল্টোটা করা কঠিন –কঠিন কেন, অসম্ভব। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে উপরের দিকে যাচ্ছি আর দেখছি পৃথিবীর তাবৎ বস্তু ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে—এ-জিনিস অসম্ভব, কারণ দৌড় মেরে উপরের দিকে যাওয়া যায় না।

সেটা সম্ভব হয় এ্যারোপ্লেন চড়ে।

মাটির উপর দিয়ে প্লেন চলছিল মারাত্মক বেগে, সেটা ঠাহর হচ্ছিল এ্যারড্রোমের দ্রুত পলায়মান বাড়িঘর, হাঙ্গার, ল্যাম্পপোস্ট থেকে ; কিন্তু যেই প্লেন শ-পাঁচেক ফুট উপরে উঠে গেল, তখন মনে হল আর যেন তেমন জোর গতিতে সামনের দিকে যাচ্ছি নে।

উপরের থেকে নিচের দিকে তাকাচ্ছি বলে খাড়া নারকোল গাছ, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তিনতলা বাড়ি ছোট তো দেখাচ্ছিলই, কিন্তু সবকিছু যে কতখানি ছোট হয়ে গিয়েছে, সেটা মালুম হল, পুকুর, ধানক্ষেত আর রেল লাইন দেখে। ঠিক পাখির মত প্লেনও এক একবার গা-ঝাড়া দিয়ে দিয়ে এক এক ধাক্কায় উঠে যাচ্ছিল বলে নিচের জিনিস ছোট হয়ে যাচ্ছিল এক এক ঝটকায়।

জয় মা গঙ্গা! অপরাধ নিও না মা, তোমাকে পবননন্দনপদ্ধতিতে ডিঙিয়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মা, তুমি যে সত্যি মা, সেটা তো এই আজ বুঝলুম তোমার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়। তোমার বুকের উপর কৃষ্ণাম্বরী শাড়ি, আর তার উপর শুয়ে আছে অগুণতি ক্ষুদে ক্ষুদে মানওয়ারি জাহাজ, মহাজনী নৌকা—আর পানসিডিঙির তো লেখা-জোখা নেই। এত দিন এদের পাড় থেকে অন্য

পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছি বলে হামেশাই মনে হয়েছে, জাহাজ নৌকা এরা তেমন কিছু ছোট নয়, আর তুমিও তেমন কিছু বিরাট নও, কিন্তু 'আজ কি এ দেখি, দেখি, দেখি, আজ কি দেখি ?—' এই যে ছোট ছোট আণ্ডা-বাচ্চারা তোমার বুকের উপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছে, তারা তোমার বুকের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য ! এদের মত হাজার হাজার সন্তান-সন্ততিকে তুমি অনায়াসে তোমার বুকের আঁচলে আশ্রয় দিতে পারো।

প্লেন একটুখানি মোড় নিতেই হঠাৎ সর্বব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরশ্মি এসে পড়লো মা গঙ্গার উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন এ-পার ও-পার জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো, কিন্তু এ-আগুন যেন শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি দিয়ে ইস্পাত বানিয়ে। সেদিকে চোখ ফিরে তাকাই তার কি সাধ্য ? মনে হল স্বয়ং সূর্যদেবের—রুদ্রের—মুখের দিকে তাকাচ্ছি ; তিনি যেন শুধু স্বচ্ছ রজত-যবনিকা দিয়ে বদন আচ্ছাদন করে দিয়েছেন। এ কী মহিমা, এ কী দৃশ্য ? কিন্তু এ আমি সইব কি করে ? তোমার দক্ষিণ মুখ দেখাও, রুদ্র। হে পূষন, আমি উপনিষদের জ্যোতির্দ্রষ্টা ঋষি নই, যে বলবো,

'হে পূষন, সংহরণ
করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো
তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ
তোমার আমার মাঝে এক।'

আমি বলি, তব রশ্মিজাল তুমি সংহরণ করো, তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার মধুর রূপে, তোমার রুদ্র রূপে নয়। তোমার বদন-যবনিকা ঘনতর করে দাও।

তাই হল—হয়ত প্লেন তাঁরই আদেশে পরিপ্রেক্ষিত বদলিয়েছে—এবার দেখি গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ রজত-আচ্ছাদন আর তার উপর লক্ষ কোটি অলস সুরসুন্দরী সব শুধু মাত্র তাঁদের নূপুর দৃশ্যমান করে নৃত্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এ নৃত্য দেখবার অধিকার আমার আছে কি ? রুদ্র না হয় অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চেলা নন্দীভৃঙ্গীরা তো রয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাদের সমঝে চলতেন, যদিও ওদিকে পূষনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল—তাই বলেছেন,

'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি !'

অস্ট্রিচ পাখি যে রকম ভয় পেলে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে, কেউ তাকে

দেখতে পাচ্ছে না, আমিও ঠিক তেমনি পকেট থেকে কালো চশমা বের করে পরলুম—এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

শুনি, 'স্যর, স্যর!' এ কী জ্বালা! চেয়ে দেখি প্লেনের স্টুয়ার্ড ট্রে'তে করে সামনে লজেঞ্চুস ধরেছে। বিশ্বাস করবেন না, সত্যি ল্যাবেঞ্চুস্! লাল, পিলা, ধলা, হরেক রঙের। লোকটা মস্করা করছে নাকি—আমি ছোঁড়ার বাপের বয়সী—আমাকে দেখাচ্ছে লজেঞ্চুস! তারপর কি ঝুমঝুমি দিয়ে বলবে, 'বাপধন এইটে দোলাও দিকিনি, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে—আর—বাঁয়ে!'

এদিকে রসভঙ্গ করলো, ওদিকে দেখাচ্ছে লজেঞ্চুসের রস। আমি মহা বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটা আচ্ছা গবেট তো! শুধালে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়েস; অর থ্যাঙ্ক ইউ, নো।' মনে মনে বললুম, 'তোমার মাথায় গোবর।' বাইরে বললুম, 'নো।' কিন্তু এবারে আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বললুম না।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, মশাইরা, বেশির ভাগ ধেড়েরাই লজেঞ্চুস নিলে এবং চুষলে।

তবে কি হাওয়ায় চড়ে এদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে, আর ঐ বাচ্চাদের মাল নিয়ে গলা ভেজাচ্ছে? আল্লায় মালুম।

ওমা ততক্ষণে দেখি সামনে আবার গঙ্গা। কাটোয়ার বাঁক।

প্লেন আবার গঙ্গা ডিঙলো। ওকে তো আর খেয়ার পয়সা দিতে হয় না। কে বলেছে,

> 'ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ-সংসারে
> তাই লোকে কড়ি দিয়ে যেতে পারে ও-পারে'॥

চরিত্র-বিচার

অঙ্কশাস্ত্রে প্রশ্ন ওঠে না, এ বাবদে আপনার কিংবা আমার অভিজ্ঞতা কি? রস নির্মাণে ঠিক তার উল্টো। সেখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতা থেকে চরিত্র নির্মাণ করেন আর পাঠক আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটাকে অল্পবিস্তর যাচাই করে নেয়। কিন্তু যখন কোনো জাতির চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয় তখন সেটাকে একদিক দিয়ে যেমন অঙ্কশাস্ত্রের মত—নৈর্ব্যক্তিক করা যায় না, ঠিক তেমনি সেটাকে সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার উপরও ছেড়ে দেওয়া যায় না। এবং তখন আবার এ প্রশ্নও ওঠে, যে-সব লোক এ আলোচনায় যোগ দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা

এ বাবদে কতখানি।

আমার অতি সামান্য আছে। তাই এই ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করতে হল। এবং অনুরোধ, নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই যদি মাত্রা পেরিয়ে যায় তবে যেন পাঠক অপরাধ না নেন। সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। 'বাঙালী চরিত্র' সম্বন্ধে যদি প্রামাণিক পুঁথিপ্রবন্ধ থাকতো তবে তারই উপর নির্ভর করে আলোচনা অনেক-খানি এগিয়ে যেতে পারতো। তা নেই। বস্তুতঃ আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অন্য প্রদেশের লোক দ্বারা বাঙালী সম্বন্ধে অকৃপণ, অকরুণ নিন্দাবাদ থেকে। যথা 'বাঙালী বড় দম্ভী', 'বাঙালী অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিশতে চায় না',—সহৃদয় মন্তব্য যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না, তা নয়—যেমন শুনবেন, 'বাঙালী মেয়ে ভালো চুল বাঁধতে জানে', কিংবা 'ব্যবসাতে বাঙালীকে ঘায়েল করা (অর্থাৎ ঠকানো) অতি সরল।'

আমি ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই বাস করেছি। দিল্লীতেও প্রায় চার বৎসর ছিলুম। চোখ কান খোলা খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজোব শুনতে হয়।

বাঙালীর প্রতি আপনার যদি কোনো দরদ থাকে তবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি কতকগুলো জিনিস স্পষ্ট বুঝে যাবেন।

(১) সিন্ধী পাঞ্জাবী দেশহারা হয়ে দিশেহারা হয়নি। সিন্ধীরা বোম্বাই অঞ্চলে, পাঞ্জাবীরা দিল্লী অঞ্চলে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য দিব্য গোছগাছ ছিমছাম করে নিয়েছে। বরঞ্চ, অনেক স্থলে এদের সুবিধেই হয়েছে বেশী। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। দিল্লীর কনট সার্কাস থেকে মুসলমান হোটেলওয়ালারা চলে যাওয়াতে সেখানে পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তোরাঁ খুলেছে। (ফলে খাস দিল্লীর মোগলাই রান্না সেখান থেকে লোপ পেয়েছে—এখন যা পাবেন সে বস্তু পাঞ্জাবী রান্না, লাহোর অঞ্চলের। দিল্লীর রান্নার কাছে সে রান্না অজ পাড়াগেঁয়ে।) এই পাঞ্জাবীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এদের কেউ কেউ পারমিট গিরমিট ব্যাপারে আমার কাছে দৈবেসৈবে সাহায্য নিতে এসেছে—কিন্তু কখনো হাত পাতেনি। এরা যা খাটছে এবং খেটেছে তা দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে এদের কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছি।

তাই অতিশয় সভয়ে শুধাই, পূব বাঙলার লোক পশ্চিম বাঙলায় এসে অনেক করেছে কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীরা যতখানি পেরেছে ততখানি কি তাদের দ্বারা হয়েছে? এ বড় বে-দরদ এবং বেয়াদব প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রশ্নে আমার উপর চটে গিয়ে অনেক কড়া কড়া উত্তর শুনিয়ে দেবেন। আমি নতশিরে সব

উত্তর মেনে নিচ্ছি। এবং এস্থলে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমি তাদের উকিল হয়েই এ-আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাদেরই সাফাই গাইবার জন্য। একটু ধৈর্য ধরুন।

(২) চাকরি যেখানে ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যবসা-বিশেষের চাকরি সেখানে সে চাকুরির মূল্য চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু দেশের দশের পক্ষে তা যৎসামান্য। কিন্তু চাকরি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে হয়, তখন তার গুরুত্ব অসাধারণ। সকলেই জানেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মুখে অনেকগুলো বিরাট বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। এ-সব পরিকল্পনা ফলবতী করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায়, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর।

তাই প্রশ্ন, এই সব চাকরি পাচ্ছে ক'জন বাঙালী? পূর্বের তুলনায় এদের উপস্থিত বেশিয়ো কি? পূর্বের তুলনা বাদ দিলেও, প্রাদেশিক জন-সংখ্যার হিসেবে তারা তাদের ন্যায্য হকগত বেশিয়ো পাচ্ছে কি?

দিল্লীবাসী বাঙালীমাত্রই একবাক্যে তারস্বরে বলবে, 'না, না, না।' পরশ্রী-কাতর অবাঙালীও সে-ঐক্যতানে যোগ দেয়। মনে মনে হয়তো বলে 'ভালোই হয়েছে'।—তা সে কথা থাক্।

কেন পায়নি তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেব না। দোষ বাঙালীর। কেন পারলে না, সেই সাফাই গাইবার জন্যই এ-আলোচনা। আরো একটু ধৈর্য ধরুন।

(৩) অথচ দ্রষ্টব্য, দিল্লীর সাংস্কৃতিক মজলিসে বাঙালী এখনো তার আসন বজায় রাখতে পেরেছে। এই কিছুদিন পূর্বেই শম্ভু মিত্র দিল্লীতে যা ভেল্কীবাজি দেখালেন সে কেরামতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। অল্পের ভিতর লিট্‌ল্‌ থিয়েটার চালায় চাটুয্যে। দিল্লীতে যাবতীয় চিত্র-ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয় বাঙালী উকিলবাবুর তাঁবেতে। গাওনাবাজনাতে বাঙাল আলাউদ্দীন সায়েব—রবিশঙ্করের কথা নাই বা তুললুম, কারণ তিনি সরকারী নোকরি করেন। শিক্ষাদীক্ষায় মৌলানা আজাদ সায়েব। সাহিত্যে হুমায়ুন কবির।

ইতিমধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তোলা 'পথের পাঁচালী' দিল্লী ছাড়িয়েও কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে গিয়েছে। নভেম্বরে বুদ্ধ-জয়ন্তী হওয়ার পূর্বেই হাঁকডাক পড়ে গিয়েছে, 'কে করে তবে "নটীর পূজা", কাকে ডাকা যায় "চণ্ডালিকা"র জন্য?'

অর্থাৎ বাঙালীর রসবোধ আছে, অর্থাৎ সে স্পর্শকাতর। তাই সে সেন্‌সিটিভ এবং অভিমানী।

আলিপুর বোমা মামলার সময় শমস্থল হক্ (কিংবা ইসলাম) নামক একজন

ইন্‌স্পেক্‌টর আসামীদের সঙ্গে পীরিত জমিয়ে ভিতরের কথা বের করে ফাঁস করে দেয়। বোমারুরা তাই তার উল্লেখ করে বলতো, 'হে শমস্থল, তুমিই আমাদের শ্যাম, আর তুমিই আমাদের শূল।'

স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর শ্যাম এবং ঐ স্পর্শকাতরতাই তার শূল। শুদ্ধমাত্র কিছু না দিয়ে স্টেজ সাজিয়ে নিয়ে দশটা বাঙালী তিন দিনের ভিতর যে রকম একটা নাট্য খাড়া করে দিতে পারে অন্য প্রদেশেব লোক সে রকম পারে না। আবার যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল ডিসিপ্লিনের দরকার। আর ওসব জিনিস পারে বুদ্ধিসুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়াধারী।

স্পর্শকাতরতা এবং ডিসিপ্লিন এ-দুটোর সমন্বয় হয় না? বোধ হয় না। লাতিন জাতটা স্পর্শকাতর; তাদের ভিতর ডিসিপ্লিনও কম। ইংরেজ সাহিত্য ছাড়া প্রায় আর সব রসের ক্ষেত্রে ভোঁতা—তাই তার ডিসিপ্লিনও ভালো।

এ আইনের ব্যত্যয় জর্মনিতে। চরম স্পর্শকাতর জাত মোক্ষম ডিসিপ্লিন মেনে নিলে কি মারাত্মক অবস্থা হতে পারে হিটলার তার সর্বোত্তম উদাহরণ। হালের জর্মনরা তাই বলে, 'অতখানি ডিসিপ্লিন ভালো নয়।' কিন্তু এ-কথা কাউকে বলতে শুনিনি, 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভালো নয়।'

কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, সে তো আমরা জানি, কিন্তু আসল প্রশ্ন, লাইন টানবো কোথায়? জাতীয় জীবনে স্পর্শকাতরতা থাকবে কতখানি আর ডিসিপ্লিন কতখানি? কিংবা শুধাই, উপস্থিত যে মেকদার বা প্রোপর্শন আছে সেটাতে বাড়াই কোন্ বস্তু—স্পর্শকাতরতা না ডিসিপ্লিন?

গুণীরা বিচার করে দেখবেন॥

দিল্লী,
১৩৬৩।

গান্ধীজীর দেশে ফেরা

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইতালি থেকে জাহাজে ফিরছিলুম; ঝক্‌ঝকে চকচকে নূতন জাহাজ, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়। যাত্রী-পালের সুখ-সুবিধার তদারক করনেওয়ালা স্টুয়ার্ডের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাকে বললুম, "এরকম সাফ্‌সফা জাহাজ কখনো দেখিনি।"

সে বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললে, "হবে না। নূতন জাহাজ! তার উপর এই কিছুদিন আগে তোমাদের মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে দেশে ফেরেন।"

আমার অদ্ভুত লাগল। মহাত্মাজী শরীর খুব পরিষ্কার রাখেন জানি, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ঘর-দোরও, কিন্তু এত বড় জাহাজখানাও কি তিনি মেজে ঘষে— ? বললুম, "সে কি কথা?"

স্টুয়ার্ড বললে—"মশায়, সে এক মস্ত ইতিহাস। এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেছি। ইংরেজ যদি ঘন ঘন গোলটেবিল বৈঠক বসায়, আর তোমাদের ঐ গাঁধী যদি নিত্যি নিত্যি এই জাহাজে যাওয়া আসা আরম্ভ করেন, তবে আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না।"

আমি বললুম—"তোমার কথাগুলো নতুন ঠেকছে। গান্ধীজী তো কাউকে কখনো জ্বালাতন করেন না।"

স্টুয়ার্ড বললে—"আজব কথা কইছেন স্যার; কে বললে গাঁধী জ্বালাতন করেন? কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি। ব্যাপারটা তাহলে শুনুন—

ইতালির বন্দরে জাহাজ বাঁধা। দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি-ঘুমোচ্ছি, কাজকর্ম চুকে গেছে, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, শুনতে পেলুম কাপ্তেন সাহেব পাগল হয়ে গেছেন। ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি তিনি দু হাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর সাতান্নবার করে একই টেলিগ্রাম পড়ছেন। খবর সবাই জেনে গেছে ততক্ষণে। ইল্ দুচে (অর্থাৎ মুসোলীনি) তার করেছেন, মহাত্মা গাঁধী এই জাহাজে করে দেশে ফিরছেন। বন্দোবস্তের যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

তারপর যা কাণ্ড শুরু হল, সে ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। গোটা জাহাজ-খানাকে চেপে ধরে ঝাড়ামোছা, ধোওয়া-মাজা, মালিশ-পালিশ যা আরম্ভ হল, তা দেখে মনে হল ক্ষয়ে গিয়ে জাহাজখানা কপ্‌পুর হয়ে উবে যাবে। কাপ্তেনের খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। যেখানে যাও, সেখানেই তিনি তদারক করছেন। দেখছেন, শুনছেন, শুঁকছেন, চাখছেন, আর সবাইকে কানে কানে বলছেন, 'গোপনীয় খবর, নিতান্ত তোমাকেই আপনজন জেনে বলছি, মহাত্মা গাঁধী

আমাদের জাহাজে করে দেশে ফিরছেন।' এই যে আমি, নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমাকেও নিদেনপক্ষে বাহান্নবার বলেছেন ঐ খবরটা যদিও ততদিন সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে গাঁধীজী এই জাহাজে যাচ্ছেন ; কিন্তু কাপ্তেনের কি আর খবরের কাগজ পড়ার ফুরসত আছে ?

আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের শৌখিন কেবিন-(কাবিন্ দ্য ল্যুক্স) গুলো দেখেছেন ? সেগুলো ভাড়া নেবার মত যথের ধন আছে শুধু রাজা-মহারাজাদের আর মার্কিন কারবারীদের। সেবারে যারা ভাড়া নিয়েছিল তাদের তার করে দেওয়া হল, 'তোমাদের যাওয়া হবে না, গাঁধীজী যাচ্ছেন। আধেকখানা জাহাজ গাঁধীজীর জন্য রিজার্ভ—পল্টনের একটা দল যাবার মত জায়গা তাতে আছে।

শৌখিন কেবিনের আসবাবপত্র দেখেছেন কখনো ? সোনার গিল্টি রুপোর পাতে মোড়া সব। দেয়ালে দামী সিল্ক, মেঝেতে ঘন সবুজ রঙের রবর আর ইরানি গাল্‌চে—ছ ইঞ্চি পুরু—পা দিলে পা বসে যায়। সেগুলো পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হল। ইল্ দুচে বিশেষ করে পালাদ্‌সো ভেনেদ্‌সিয়া (অর্থাৎ ভেনিসীয়-রাজপ্রাসাদ) থেকে চেয়ার-টেবিল, খাটপালঙ্ক পাঠিয়েছেন। আর সে খাট, মশয়, এমন তার সাইজ, ফুটবলের বি টীমের খেলা তার উপরে চলে। কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে কি করে ! আন্ মিস্ত্রী, ডাক্ কারিগর, খোল্ কবজা, ঢোকা খাট। হৈ হৈ ব্যাপার—মার-মার কাণ্ড। খাবারদাবার আর বাদবাকী যা সব মালমশলা যোগাড় হল, সে না হয় আরেক হপ্তা ধরে শুনবেন।

সব তৈরী। ফিট্‌ফাট্। ওই যে বললেন, তিলটি পড়লে কুড়িয়ে তোলা যায়, ছুঁচটি পড়লে মনে হয় হাতী শুয়ে আছে।

গাঁধীজী যেদিন আসবেন সেদিন কাগ্‌কোকিল ডাকার আগে থেকেই কাপ্তেন সিঁড়ির কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে, পিছনে সেকেণ্ড অফিসার, তার পিছনে আর সব বড়র্কতারা, তার পিছনে বড় স্টুয়ার্ড, তার পিছনে লাইব্রেরিয়ান, তার পিছনে শেফ্ দ্য কুইজিন (পাচকদের সর্দার), তার পিছনে ব্যাণ্ড বাদ্যির বড়কর্তা, তার পিছনে—এক কথায় শুনে নিন, গোটা জাহাজের বেবাক কর্মচারী। আমি যে নগণ্য স্টুয়ার্ড, আমার উপর কড়া হুকুম, নট-নড়ন-চড়ন-নট-কিচ্ছু। বড় স্টুয়ার্ডের কাছে যেন চব্বিশ ঘণ্টা থাকি। আমার দোষ ? দু-চারটে হিন্দী কথা বলতে পারি। যদি গাঁধীজী হিন্দী বলেন, আমাকে তর্জমা করতে হবে। আমি তো বলির পাঁঠার মত কাঁপছি।

গাঁধীজী এলেন। মুখে হাসি, চোখে হাসি। 'এদিকে স্যর, এদিকে স্যর' বলে কাপ্তেন নিয়ে চললেন গাঁধীজীকে তাঁর ঘর—কেবিন দেখাতে। পিছনে

আমরা সবাই মিছিল করে চলেছি। কেবিন দেখানো হল,—এটা আপনার বসবার ঘর, এটা আপনার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন তাঁদের অপেক্ষা করার ঘর, এটা আপনার পড়ার, চিঠিপত্র লেখার ঘর, এটা আপনার উপাসনার ঘর, এটা আপনার খাবার ঘর যদি বড় খাস কামরায় যেতে না চান, এটা আপনার শোবার ঘর, এটা আপনার কাপড় ছাড়ার ঘর, এটা আপনার গোসল-খানা, এটা চাকরবাকরদের ঘর। আর এ অধম তো আছেই—আপনি আমার অতিথি নন, আপনি রাজা ইমানুয়েল ও ইল্ দুচের অতিথি। অধম, রাজা আর দুচের সেবক।'

গাঁধীজী তো অনেকক্ষণ ধরে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বললেন, 'কাপ্তেন সায়েব, আপনার জাহাজখানা ভারী সুন্দর। কেবিনগুলো তো দেখলুম; বাকী গোটা জাহাজটা দেখারও আমার বাসনা হয়েছে। তাতে কোন আপত্তি—?'

কাপ্তেন সায়েব তো আহ্লাদে আটখানা, গলে জল। গাঁধীজীর মত লোক যে তাঁর জাহাজ দেখতে চাইবেন এ তিনি আশাই করতে পারেননি। 'চলুন, চলুন' বলে তো সব দেখাতে শুরু করলেন। গাঁধীজী এটা দেখলেন, ওটা দেখলেন, সব কিছু দেখলেন। ভারী খুশী। তারপর গেলেন এঞ্জিন-ঘরে। জানেন তো সেখানে কি অসহ্য গরম। যে-বেচারীরা সেখানে খাটে তাদের ঘেমে ঘেমে যে কি অবস্থা হয় কল্পনা করতে পারবেন না। আপনি গেছেন কখনো?"

আমি বললুম, "না।"

"গাঁধীজী তাদের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাপ্তেনের মুখেও হাসি নেই। আমাদের কাপ্তেনটির বড নরম হৃদয়; বুঝতে পারলেন গাঁধীজীর কোথায় বেজেছে।

খানিকক্ষণ পরে গাঁধীজী নিজেই বললেন, 'চলুন কাপ্তেন।' তখন তিনি তাঁকে বাকী সব দেখালেন। সব শেষে নিয়ে গেলেন খোলা ডেকের ওপর। সেখানে কাঠফাটা রদ্দুর। কাপ্তেন বললেন, 'এখানে বেশীক্ষণ দাঁডাবেন না, স্যার। সর্দিগর্মি হতে পারে।'

গাঁধীজী বললেন, 'কাপ্তেন সায়েব, এ জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে এখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিন, আমি তাতেই থাকব।' কাপ্তেনের চক্ষু স্থির! অনেক বোঝালেন, পড়ালেন। গাঁধীজী শুধু বলেন, 'অবিশ্যি আ-প-না-র যদি কোন আপত্তি না থাকে।' কাপ্তেন কি করেন। তাঁবু এল, খাটানো হল। গাঁধী সেই খোলা ছাদের তাঁবুতে ঝাড়া বারোটা দিন কাটালেন।

কাপ্তেন শয্যাগ্রহণ করলেন। জাহাজের ডাক্তারকে ডেকে বললেন, "তোমার হাতে আমার প্রাণ। গাঁধীজীকে কোনো রকমে জ্যান্ত অবস্থায় বোম্বাই পৌঁছিয়ে দাও। তোমাকে তিন ডবল প্রমোশন দেব।"

আমি অবাক হয়ে শুধালুম,—"সব বন্দোবস্ত ?"

স্টুয়ার্ড হাতের তেলো উঁচিয়ে বললো, "পড়ে রইল। গাঁধীজী খেলেন তো বক্‌রীর দুধ আর পেঁয়াজের শুরুয়া। কোথায় বড় বাবুর্চি, আর কোথায় গাওনা-বাজনা। সব ভণ্ডুল। শুধু রোজ সকালবেলা একবার নেবে আসতেন আর জাহাজের সবচেয়ে বড় ঘরে উপাসনা করতেন। তখন সেখানে সকলের অবাধ গতি—কেবিন-বয় পর্যন্ত।

কাপ্তেনের সব দুঃখ জল হয়ে গেল বোম্বাই পৌঁছে। গাঁধীজী তাঁকে সই করা একখানা ফোটো দিলেন। তখন আর কাপ্তেনকে পায় কে ? আপনার সঙ্গে তাঁর বুঝি আলাপ হয়নি ? পরিচয় হওয়ার আড়াই সেকেণ্ডের ভিতর আপনাকে যদি সেই ছবি উনি না দেখান তবে আমি এখান থেকে ইতালি অবধি নাকে খৎ দিতে রাজী আছি। হিসেব করে দেখা গেছে ইতালির শতকরা ৮৪.২৭১৯ জন লোক সে ছবি দেখেছে।"

স্টুয়ার্ড কতটা লবণ লঙ্কা গল্পে লাগিয়েছিল জানি নে ; তবে এই কথাগুলো ঠিক যে—গান্ধীজী ঐ জাহাজেই দেশে ফিরেছিলেন—পালাদ্‌সো ভেনেদ্‌সিয়া থেকে আসবাব এসেছিল, গান্ধীজী এঞ্জিনরুমে গিয়েছিলেন, জাহাজের দিনগুলো কাটিয়েছিলেন তাঁবুতে, আর নীচে নাবতেন উপাসনার সময়ে। অন্য লোকের মুখেও শুনেছি ॥

তপঃ-শাস্ত্র

শাস্ত্র তো মানি না আজ। হে তরুণ, তব পদাঘাত
দেশের তন্দ্রারে দিল কী রূঢ় চেতনা ! ঝঞ্ঝাবাত
ঘূর্ণবায়ু দিগ্বিদিক আন্দোলিয়া কী মহাপ্রলয়
নটেশ তাণ্ডব-নৃত্য। হে তরুণ ! জয়, জয়, জয়
জয় তব ; অর্থহীন মূল্যহীন কে বৃথা শুধায়
কোথায় তোমার লক্ষ্য ! বন্যা যবে বাঁধ ভেঙে যায়
মিথ্যা প্রশ্ন কোথা তার গতি। হে তরুণ, হে প্লাবন
নহ তো তটিনী। দু'কূলের শাস্ত্র মিথ্যা। চিরন্তন,

মৃত্যুঞ্জয়, হে নবীন, তোমার ধমনী রক্তবীণ,
অন্তহীন। পঞ্চনদে তার শাখা—সে তো নহে ক্ষীণ
সে তো নহে ধর্মে বর্ণে অবরুদ্ধ।

পঞ্চনদবাসী
কিবা হিন্দু কি মুস্‌লিম্ শিখ আর যত শ্বেতত্রাসী
লালকেল্লা অধিবাসী—পাইল তোমার বক্ষে স্থান ;
কে বলে বাঙালী তুমি ? তব রক্তপাতে অভিযান
দেশের বিশ্বের অনন্ত মঙ্গল লাগি। হে অভয়,
জয় তব জয়।

প্রদোষের অন্ধকারে
নির্জীব নিদ্রায় ছিনু রুদ্ধ ; নৈরাশ্যের কারাগারে
অবিশ্বাসে নিমজ্জিত। হেনকালে শুনি বজ্রশঙ্খ
হে পার্থ-সারথি লক্ষ। লৌহের কীলক পেতে অঙ্ক,
বক্ষ, ভাল, কী আদরে নিলে বরি মৃত্যু তুচ্ছ করি।
জীর্ণ এ জীবন মম পুণ্য হল বারে বারে স্মরি।

ক্ষান্ত রণ ?
নহে নহে। শিবের তাণ্ডব অন্তহীন অনুক্ষণ,
কখনো বাহিরে কভু অন্তর্মুখী। এবে শান্ত শিব
লহ সংহরিয়া নিগূঢ় ধ্যানেতে, জ্বালো অন্তর্দীপ
জ্যোতির্ময়, গহন সাধন মাঝে হও নিমজ্জিত
যে-শক্তি সঞ্চয় হল চক্রাকারে করুক প্লাবিত
বৃদ্ধি পেয়ে, গতিবেগে, পর্বত কন্দরে নদী যথা
অবরুদ্ধ, কিন্তু বহির্মুখী।

তার পর এক দিন বাহিরিবে তপঃ সাঙ্গ হলে
শৃঙ্খল হবে মুক্ত—এ প্রলয় অভিজ্ঞতা বলে
হবে না তো উচ্ছৃঙ্খল ; অচঞ্চল দৃঢ় পদক্ষেপে
সমাহিত, রিপু শান্ত, স্বর্গ মর্ত্য ত্রিভুবন ব্যেপে

চলিবে হে ত্রিবিক্রম। পরিবে দুর্জয় বরমালা
পূত শান্ত স্নিগ্ধ পুণ্য সর্ব-বিশ্ব-প্রেম গন্ধ ঢালা ॥*

২৫।১১।১৯৪৫

মৃত্যু

বুড়ো হওয়াতে নাকি কোনো সুখ নেই।

আমি কিন্তু দেখলুম, একটা মস্ত সুবিধা তাতে আছে। কোনো কিছু একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে—যেমন ধরুন প্রিয়-বিয়োগ—মনকে এই বলে চমৎকার সান্ত্বনা দেওয়া যায়—'যাক্! এটার তিক্ত স্মৃতি আর বেশীদিন বয়ে বেড়াতে হবে না। মৃত্যু তো আসন্ন।' যৌবনে দাগা খেলে তার বেদনার স্মৃতি বয়ে বেডাতে হয় সমস্ত জীবন ধরে। কিংবা, এই যে বললুম, প্রিয়-বিয়োগ—আমার যখন বয়স বছর চৌদ্দটাক তখন আমার ছোট ভাই দু'বছর বয়সে ওপারে চলে যায়। কালাজ্বরে। তার ছ'মাস পরে ব্রহ্মচারীর ইন্‌জেক্‌শন বেরোয়। তারপর যখন গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তারই কল্যাণে কালাজ্বরের যমদূতগুলোকে ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় কষিয়ে ড্যাং ড্যাং করে শহরময় চষে বেড়াতে লাগলো তখন আমার শোক যেন আরো উথলে উঠলো। বার বার মনে পড়তে লাগলো, ঐ চৌদ্দ বছর বয়সেই আমি তার জন্য কত না ডাক্তার, কবরেজ, বদ্যি, হেকিমের বাড়ি ধন্না দিয়েছিলুম। ইস্কুল থেকে ফিরেই ছুটে যেতুম মায়ের কাছে; শুধাতুম, 'আজ জ্বর এসেছিল?' মা মুখটি মলিন করে ঘাড় ফিরিয়ে নিতেন। একটু পরে বলতেন, 'আজ আরো বেশী।'

আমি চুপ করে বারান্দায় ভাবতে বসতুম—'নাঃ, এ-কবরেজটা কোনো কর্মের

---

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ সরকার যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের লালকেল্লায় বিচার শুরু করে, তখন তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। শাহনওয়াজ-ধীলন-ভোঁসলে দিবসে বাংলার তরুণ সমাজ কলকাতায় সেদিন যে সম্পূর্ণ অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা দেখান তার তুলনা বিরল। অথচ সেই অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর ইংরেজ পুলিস গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি। এই গুলিবর্ষণের ফলে রামেশ্বর নামে একটি তরুণ ছাত্র নিহত হন। সেদিনের ঘটনার পটভূমিকায় এই কবিতা লিখিত হয়।

নয়। কিন্তু শহরের এই তো নাম-করা শেষ কবরেজ। তবে দেখি হেকিম সায়েবকে দিয়ে কিছু হয় কিনা—'

আপনারা হয়তো ভাবছেন, 'চৌদ্দ বছরের ছেলে করবে এ-সব ডিসিশন! বাড়ির কর্তারা করছিলেন কি?'

আসলে আমি বুঝতে পারতুম না, কর্তারা, দাদারা এমন কি মা পর্যন্ত অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন, আমার ভাইটি বাঁচবে না। তাঁরা আমাকে সে খবরটি দিতে চাননি। আমার জন্মের পূর্বে আমার এক দাদা আর দিদিও ঐ ব্যামোতে যায়।

ডাক্তার-কবরেজরাও আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতেন যে তার অর্থটা আজ আমার কাছে পরিষ্কার—তখন বুঝতে পারিনি। তবু তাঁদের এই চৌদ্দ বছরের ছেলেটির প্রতি দরদ ছিল বলে আসতেন, নাড়ী টিপতেন, ওষুধ দিতেন।

ঐ দুই বছরের ভাইটি কিন্তু আমাকে চিনতো সবচেয়ে বেশী—কি করে বলতে পারবো না। আমাকে দেখা মাত্রই তার রোগজীর্ণ শুকনো মুখে ফুটে উঠতো ম্লান হাসি।

সে হাসি একদিন আর রইল না। আমাকে সে ডরাতে আরম্ভ করলো। আমাকে দেখলেই মাকে সে আঁকড়ে ধরে রইত। আমার কোলে আসতে চাইতো না। আমার দোষ, আমি কবরেজের আদেশমত তার নাক টিপে, তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাইয়েছিলুম।

ঐ ভয় নিয়েই সে ওপারে চলে যায়।

তার সেই ভীত মুখের ছবি আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বাকি জীবন ধরে।

* * *

ঠিক এক বছর পূর্বে আমার এক প্রিয়-বিয়োগ হয়। এবারেরটা নিদারুণতর। কিন্তু ঐ যে বললুম, এটা আর বেশীদিন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন, আমি এসব করুণ কথা পাড়ছি কেন? বিশ্বসংসার না জানুক, আমার যে ক'টি পাঠক-পাঠিকা আছেন তাঁরা জানেন আমি হাসাতে ভালোবাসি। কিন্তু 'উল্টোরথে'র পাঠক-পাঠিকারা নিত্য নিত্যি সিনেমা দেখতে যান —সেখানে করুণ দৃশ্যের পর করুণ দৃশ্য দেখে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলেন। ভগ্নহৃদয় নায়ক কি রকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যান, আর সুস্থহৃদয় নায়িকা কি রকম ড্যাং ড্যাং করে বিজয়ী সপত্নের সঙ্গে ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে হানিমুন করতে মন্টিকার্লো পানে রওয়ানা হন। আমার করুণ-কাহিনী তো তাঁদের কাছে ডাল-ভাত।

তবু আমি ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে এ রচনা আরম্ভ করেছি মহত্তর আদর্শ নিয়ে।

আমাদের সবচেয়ে বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আর পাঁচটা রসের সঙ্গে হাস্যরসও আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, অথচ কেউ কি কখনো চিন্তা করে, তাঁর জীবনটা কি রকম বিষাদবহুল ঘটনায় পরিপূর্ণ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যে-কোন সাধারণজন এরকম আঘাতের পর আঘাত পেলে কিছুতেই আর সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো না। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না, কতখানি শোক তিনি বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভেঙে তো পড়েনইনি, এমন কি তীব্র শোকাবেগে কখনো কোনো অধর্মাচরণও করেননি —অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি, যা তাঁর 'ধর্ম' সেটি থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঋষিতুল্য সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কিন্তু কখনো পা পিছলোয়নি'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের আদর পাননি। কিন্তু তাঁর বয়স যখন ৭।৮ তখন তাঁর দাদা বিয়ে করে আনলেন কাদম্বরী দেবীকে। বয়সে দুজনাই প্রায় সমান। কিন্তু মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধটি অল্প বয়সেই হয়ে যায় বলে তিনি তাঁর মায়ের অভাব পূর্ণ করে দেন। *এই সমবয়সী দেবরটিকে* তিনি দিয়েছিলেন সর্বপ্রকারের স্নেহ ভালোবাসা। প্রভাত মুখোর রবীন্দ্রজীবনীতে তার সবিস্তার পরিচয় পাঠক পাবেন।

এই প্রাণাধিকা বৌদিটি আত্মহত্যা করেন রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ। কী গভীর শোক তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর কাব্যে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রাতা আত্মহত্যা করলে পর বৃদ্ধ কবি তাঁকে তখন সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখেন। সেটিও রবীন্দ্র-জীবনীতে উদ্ধৃত হয়েছে। পাঠক পড়ে দেখবেন। কী আশ্চর্য চরিত্রবল থাকলে মানুষ এমনতরো গভীর শোককে আপন ধ্যানলোকে শান্ত সমাহিত করে পরে রসরূপে, কাব্যরূপে নানা ছন্দে নানা গানে প্রকাশ করতে পারে,—পাঠক, শ্রোতার হৃদয় অনির্বচনীয় দুঃখে-সুখে মেশানো মাধুর্যে ভরে দিতে পারে। কবির ক্ষয়ক্ষতি বাঙলা কাব্যের অজরামর সম্পদে পরিবর্তিত হল। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গত হলেন, পিতা গত হলেন—এগুলো শুধু বলার জন্যে বললুম, হিসেব নিচ্ছি না।

তারপর পুরো কুড়ি বছর কাটেনি—আরম্ভ হল একটার পর একটা শোকের পালা।

প্রথমে গেলেন স্ত্রী[১]। তাঁর বয়স তখন ত্রিশ পূর্ণ হয়নি। (বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের কয়েক মাস পরেই।) তিনি কন্যা আর তুই পুত্র রেখে। সর্বজ্যেষ্ঠর বয়স পনেরো, সর্বকনিষ্ঠের সাত। মাধুরীলতা ছাড়া আর সব কটি ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ভার রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর ('কাব্যপরিক্রমা'র লেখক) মাতা কবিজায়ার মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পর আমাকে বলেন, মৃণালিনী দেবী তাঁর রোগশয্যায় এবং অসুস্থাবস্থায় তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যে সেবা পেয়েছিলেন তেমনটি কোনো রমণী কোনো কালে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে বলে তিনি জানেন না। তিনি বলেন, স্ত্রীর মানা অনুরোধ না শুনে তিনি নাকি রাত্রির পর রাত্রি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন, স্পর্শকাতর কবিকে এই মৃত্যু কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁকে জীবনের রহস্য শেখায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০।৪১—দেখাতো ৩০।৩১। অটুট স্বাস্থ্য। কিন্তু তিনি পুনরায় দারগ্রহণ করেননি।

এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় মেয়ে রেণুকা বারো বছর বয়সেই পড়ল শক্ত অসুখে। যখন ধরা পডলো ক্ষয় রোগ, তখন কবি তাকে বাঁচাবার জন্য যে কী আপ্রাণ পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়া আমার শক্তির বাইরে। কিছুটা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন—তখনো তিনি জানতেন না, মেয়েটি কিছুদিন পরেই তাঁকে ছেড়ে যাবে। অসুস্থ অবস্থায়ও এই মেয়েটির প্রাণ ছিল আনন্দরসে চঞ্চল। পিতা-কন্যায় গাড়িতে করে স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাবার সময় যে মধুর সময় যাপন করেন তার কিছুটা আভাস পাঠক পাবেন 'পলাতকা'র 'ফাঁকি' কবিতাতে।

(বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে 'হাওয়া বদল করো'।

পাঠক, এই 'তখন' শব্দটির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। রোগের প্রথম অবস্থায় নয়—যখন মৃত্যু আসন্ন। এ নিদারুণ অভিজ্ঞতা ক্ষয়-রুগীর অনেক আত্মীয়-স্বজনের হয়েছে।)

১ ইনি কি রোগে গত হন জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'উদরের পীড়া, খুব সম্ভব এপেণ্ডিসাইটিস।' আমি বাল্যকালে গুরুজনদের মুখে শুনেছি সূতিকা।

দু বছরের ভিতরই দুইটি অকালমৃত্যু—অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন, যেন মানুষকে নিছক পীড়া দেবার জন্য ভগবান তাকে পীড়া দিচ্ছেন। তারপর চার বছর যেতে না যেতেই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ তেরো বছর বয়সে এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটিতে বেড়াতে যায় মুঙ্গেরে। 'সেইখানে শমীন্দ্রের কলেরা হয়; কবি টেলিগ্রাফ পাইয়া কলিকাতা হইতে মুঙ্গের চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্রনাথই এই সময়ের এক চিঠিতে লিখছেন, 'যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল, তাহার পরে আর ফিরিল না।'

অনেকের মুখেই শুনেছি, শমীন্দ্র তার পিতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেন, সে 'আকৃতিতে প্রকৃতিতে পিতার অনুরূপ ছিল।

ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐ দিনে কলিকাতায় শমীন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।'—প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পুত্রের স্মরণে যে কবিতা লেখেন তাতে আছে,

'বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহু-বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।'

আবার অকালমৃত্যু! শুধু ভগবান জানে তাঁর ভূমণ্ডল ব্যবস্থায়, ত্রিলোক-নিয়ন্ত্রণে 'ইন হিজ স্কীম অব্ থিংস'—এর কি প্রয়োজন?'[২] শমী আমাদের পুত্র নয়, কিন্তু এ কবিতাটি পড়ে কার না 'বুক ফাটে'? এ কবিতাটি আমি জীবনে মাত্র একবার পড়েছি। দ্বিতীয়বার পড়তে পারিনি।

এর পর দশ বছর কাটেনি। সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান, বড় মেয়ে মাধুরীলতার হল ক্ষয়রোগ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, আমিও শুনেছি, মাধুরীর স্বামীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির সদ্ভাব ছিল না (যদিও তাঁর পিতার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল বলেই এ বিয়ে হয়। কবি বিহারী চক্রবর্তী ছিলেন কাদম্বরী

---

২ রবীন্দ্রনাথও পুত্রহারা-মাতা তাঁর কন্যার দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছেন, 'তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে / নির্বাক অপার নির্বাসনে।/ অশ্রুহীন তোমার নয়নে / অবিরাম প্রশ্ন জাগে যেন—/ কেন, ওগো কেন!'/—দুর্ভাগিনী, বীথিকা, পৃঃ ৩০৯।

দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি)। রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা মেয়েকে দেখতে যেতেন বন্ধ গাড়িতে করে। জামাই তখন আদালতে। সমস্ত দুপুর মেয়েকে গল্প শোনাতেন। হয়তো বা কবিতা পড়তেন। বোধহয় তারই দু'একটি 'পলাতকা' (নামকরণ অবশ্য পরে হয়) বইয়ে স্থান পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাড়ির সামনে পৌঁছতেই বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কবি কোচম্যানকে গাড়ি ঘোরাতে হুকুম দিলেন। বাড়িতে প্রবেশ করলেন না। আমি শুনেছি, এই মেয়ে নাকি বড় উৎসুক আগ্রহে পিতার লেখার জন্য প্রতীক্ষা করতেন। ভাগলপুরে, কলকাতায়।

বহু বহু বৎসর পর এঁর সখী ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবী লেখেন, (উভয়ের শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুর—বোধহয় সেইসূত্রে পরিচয় ও সখ্য) মেয়ের স্মরণে কবির চোখ দিয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বোধহয় 'পলাতকা'র 'মুক্তি' কবিতায় এ মেয়ের কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

* * *

পূর্বেই বলেছি, মাধুরীলতার রোগশয্যায় কবি তাঁকে গল্প বলতেন। এবং শেষের দিকে বোধহয় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন যে এ মেয়েও বাঁচবে না। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, এঁরা সব তাঁর মায়ার বন্ধন কেটে সময় হবার বহু পূর্বেই পালিয়ে যাচ্ছেন—এঁরা সব 'পলাতকা'। তাই মাধুরীলতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বেরল 'পলাতকা'। এ বইয়ের উপর মাধুরী, রেণুকা, শমী তিনজনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। আরো হয়তো কয়েক জনের ছাপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা হয়তো তাঁর পরিবারের কেউ নয়, তাই তাঁদের ঠিক চেনা যায় না।

'পলাতকা'র সর্বশেষের কবিতাটিতে আছে,—কবিতাটির নাম 'শেষ প্রতিষ্ঠা'—

'এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে, গেছে চলে"
তবু রাখি বলে
বোলো না 'সে নাই'।

* * *

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে "আছে" "নাই" পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।'

এই কবিতাটি কবির সর্ব পলাতকার উদ্দেশে লেখা। কিন্তু প্রশ্ন, 'আছে' ও 'নাই' দুটোই একসঙ্গে অস্তিত্ব রাখে কি প্রকারে? কবি এর উত্তর দিলেন—অবশ্য সে উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট হবেন কিনা জানি নে—তাঁর জীবনের শেষ শোকের সময়।

'পলাতকা'র সব কটি পালিয়ে যাবার পর কবির রইলেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও

কন্যা মীরা। এই মীরাদির একটি পুত্র ও কন্যা। এ নাতিটিকে রবীন্দ্রনাথ যে কী রকম গভীর ভালবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সে কথা ঐ সময়ে আশ্রম-বাসী সবাই জানে। একটু ব্যক্তিগত কথা বলি—নীতু যদিও আমার চেয়ে বছর নয়েকের ছোট ছিল তবু হস্টেলে সে প্রায়ই আমার ঘরে আসতো। ভারী প্রিয়-দর্শন ছিল সে। মাঝে মাঝে ফিনফিনে ধুতি-কুর্তা পরে এলে মানাতো চমৎকার —আমরা শুধাতুম, কে সাজিয়ে দিল রে ?

সে উত্তর না দিয়ে শুধু মিটু মিটু করে হাসতো। চট্টগ্রামের জিতেন হোড় বলতো, 'নিশ্চয়ই দাদামশাই'। আমি বলতুম, 'মা'। (আশা করি, এ লেখাটি মীরাদি বা তাঁর মেয়ে 'বুড়ী'র চোখে পড়বে না—তাঁদের শোক জাগাতে আমার কতখানি অনিচ্ছা সে কথা অন্তর্যামী জানেন।) সেই নীতু গেল ইয়োরোপে। ক্ষয়রোগে মারা গেল ১৯।২০ বছর বয়সে। এই শেষ শোকের বর্ণনা দিতে কারোই ইচ্ছা হবে না। কবির বয়স তখন ৭১। একে নিজের শোক, তার উপর কন্যা —পুত্রহারা মাতার শোক।

শুধু একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করি—শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' থেকে নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন বরানগরে মহলানবিশদের সঙ্গে। বন্ধু এণ্ডরুজ সায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন, নীতুর শরীর আগের চেয়ে একটু ভালো।

'পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজে রয়টারের টেলিগ্রামে দেখলাম, ছ'দিন (দু'দিন ?) আগে ৭ই আগস্ট জার্মানীতে নীতুর মৃত্যু হয়েছে।'

এ খবরটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাঙা যায় কি প্রকারে ?

'শেষে স্থির হল খড়দায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে টেলিফোন করে আনিয়ে আমরা চারজনে একসঙ্গে কবির কাছে গেলে কথাটা বলা হবে। প্রতিমাদিরা এলে সবাই মিলে কবির ঘরে গিয়ে বসা হল। রথীন্দ্র-নাথকে কবি প্রশ্ন করলেন, "নীতুর খবর পেয়েছিস, সে এখন ভাল আছে, না ?" রথীবাবু বললেন, "না, খবর ভালো না।" কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভালো ? কাল এণ্ডরুজও আমাকে লিখেছেন যে নীতু অনেকটা ভাল আছে। হয়তো কিছুদিন পরেই ওকে দেশে নিয়ে আসতে পারা যাবে।"[৩] রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন,

৩ এর আগের দিন রথীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত মহলানবিশকেও বলেন, 'কাল এণ্ডরুজের চিঠি পেয়ে অবধি নীতুর জন্য মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যদিও তিনি

"না, খবর ভাল নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে।" কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ, রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। একটু পরেই শান্তভাবে সহজ গলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতন চলে যান, সেখানে বুড়ি একা রয়েছে। আমি আজ না গিয়ে কাল যাবো, তুই আমার সঙ্গে যাস"।'

নীতুর মা জর্মনি গিয়েছিলেন পুত্রের অসুস্থতার খবর পেয়ে। তিনি যেদিন বোম্বাই পৌঁছবেন, তার কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বোম্বাইয়ের ঠিকানায় চিঠি লেখেন। তাতে সেই 'আছে' ও 'নাই'-য়ের উত্তর আছে। তাতে এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'যে রাত্রে শমী গিয়েছিল,[৪] সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনও টিকে থাকে কেন?'

এই সেই মূল কথা। সে নেই কিন্তু আমার ভালোবাসার মধ্যে সে 'আছে'। বার বার নমস্কার করি গুরুকে, গুরুদেবকে। বার বার দুরদৃষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে তিনি কাতর হয়েছেন, কিন্তু কখনও পরাজয় স্বীকার করেননি।

এবং পাঠক-পাঠিকাদের উপদেশ দি, প্রিয়-বিয়োগ—এমন কি প্রিয়বিচ্ছেদ—হলে তাঁরা যেন উপরে বর্ণিত এই চিঠিখানা পড়েন। এ চিঠি মুক্তপুরুষের লেখা চিঠি নয়। কারণ গীতায় আছে মুক্তপুরুষ 'দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন'। রবীন্দ্রনাথ দুঃখে আমাদের মতই কাতর হতেন—হয়তো বা আরো বেশী, কারণ তাঁর দিলের দরদ, হৃদয়ের স্পর্শকাতরতা ছিল আমাদের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী—কিন্তু তিনি পরাজয় মানতেন না। আমরা পরাজয় মেনে নিই। এ-চিঠি যদি একজনকেও

লিখেছেন, ও এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাহেব লিখেছেন, নীতুকে হয়তো শীগ্‌গিরই দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা হলে ভাবছি তাকে একটা কোনো ভালো জায়গায় অনেকদিন ধরে রেখে দেবো। ভাওয়ালি কি কোনো পাহাড়ে বেশ কিছুদিন থাকলেই সেরে উঠবে।' পৃঃ ২৮।

৪ এর মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং আরো বলেছি মাতা ও পুত্র যান একই দিনে, এবং আশ্চর্য, দাদামশাই ও নাতি যান একই দিনে। (২২ শ্রাবণ)।

পরাজয়-স্বীকৃতি থেকে নিষ্কৃতি দেয় তবে অন্যলোকে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হবেন।

সহৃদয় পাঠক, তুমি সিনেমা দেখতে যাও। সেখানে যদি কোনো ছবিতে তোমার হীরোর জীবনে পর পর এতগুলো শোকাবহ ঘটনা ঘটতো তবে তুমি বলতে, 'এ যে বড্ড বাড়াবাড়ি। এ যে অত্যন্ত অবাস্তব, আন্‌রিয়ালিস্টিক।'

তাই বটে। যা জীবনে বাস্তব তা হয়ে যায় সিনেমায় অবাস্তব! আশ্চর্য! আমার কাছে আবার সিনেমাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকে।

তাই সিনেমাওয়ালাদের কাছেই রবীন্দ্র-জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর অধ্যায় তুলে ধরলুম। নইলে 'রবীন্দ্রনাথের শোক ও কাব্যে তার প্রতিচ্ছবি' এ জাতীয় ডক্টরেট থিসিস লেখবার বয়স আমার গেছে। আর তাই এ 'রম্যরচনাটি' আরম্ভ করেছি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। কারণ আমার জীবন আর তোমাদের পাঁচজনের জীবনের লেশমাত্র পার্থক্য নেই। তফাৎ যদি থাকে, তবে শুধু এইটুকু যে, তোমরা মনোবেদনা গুছিয়ে বলতে পার না ব'লে গুমরে গুমরে মরো বেশী। কিন্তু তোমাদের এই বলে সান্ত্বনা জানাই, যতদিন তোমার প্রিয়জন তোমার প্রতি সহৃদয় ততদিন তোমার না বলা সত্ত্বেও সে তোমার হৃদয়ের সব কথাই বোঝে। আর যেদিন তার হৃদয় বিমুখ হয়ে যায়, সেদিন যতই গুছিয়ে বলো না কেন, সে শুনবে না। কাজেই না-বলতে পারাটা তোমাকে গুছিয়ে-বলতে-পারার বিড়ম্বনা থেকে অন্তত বাঁচাবে॥

কত না অশ্রুজল

উৎসর্গ

স্নেহভাজন শ্রীমান ফণী দেব ও আমাদের উভয়ের সখা
শ্রীমান সাগরময় ঘোষের করকমলে—

এই পুস্তকের সব লেখাই "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বেরোয়। সে-সময় আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অগণিত চিঠি আমার কাছে আসে। তাদের অনেকগুলো "কত না অশ্রুজলে" ভরা ছিল। একাধিক মাতা, ভগ্নী আমাকে পুত্রের, ভ্রাতার শেষ পত্র পাঠান। বস্তুতঃ যখন "দেশ" পত্রিকায় অধমের "দেশে-বিদেশে" প্রকাশিত হয় তখনো এত পত্র আমি পাইনি।

সে-সব রচনা আমার বান্ধবী অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিরুপমা ও তাঁর সিঁথির সিঁদুর শ্রীমান্ পশুপতি অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে সঞ্চয় করে, কেটে-ছেঁটে পুস্তকরূপে প্রকাশ করলেন। ওঁদের প্রতি আমি কি সাধুবাদ জানাবো! প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে উত্তমোত্তম লেখকের সম্পাদনা করেন।

পরিশেষে শ্রীমান্ ব্রজকিশোরের কল্যাণ কামনা করি। শঙ্কর তাকে জয়যুক্ত করুন।

সৈয়দ মুজতবা আলী

কত না অশ্রুজল

॥ ১ ॥

একখানা অপূর্ব সংকলনগ্রন্থ অধীনের হাতে এসে পৌঁচেছে। পুনরায়, বারংবার বলছি অপূর্ব, অপূর্ব! এ-বইখানিতে আছে, মানুষের আপন মনের আপন হৃদয়ের গভীরতম আত্মপ্রকাশ। কারণ মৃত্যুর সম্মুখীন মানুষ অতি অল্প অবস্থাতেই মিথ্যা কয় বা সত্য গোপন করে। এবং একটি দেশের একজন মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী নয়; বহু দেশের বহুজনের। ফ্রান্স, জর্মনি, ভারতবর্ষ, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, ফিনল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, চীন, জাপান, কানাডা ইত্যাদি ইত্যাদি—বস্তুত হেন দেশ প্রায় নেই যার বহু লোকের বহু কণ্ঠস্বর এই গ্রন্থে নেই।

যুদ্ধের সময় সৈন্য তো জানে না কোন্ মুহূর্তে তার মৃত্যু আসবে। সে যখন ঐ সময় ট্রেন্‌চে বসে আপন মা, বউ, প্রিয়া বা বোনকে চিঠি বা তাঁদের জন্যে ডাইরি লেখে তখনও সে মিথ্যা কথা বলছে, এ সন্দেহ করার মত সিনিক বা ব্যঙ্গপ্রবণ অবিশ্বাসী আমি নই।

এ বইয়ে আছে গত বিশ্বযুদ্ধে যারা জড়িয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সৈনিকরূপে একে অন্যকে নিধন করতে হয়েছিল, তাদের শেষ চিঠি, ডাইরির শেষ পাতা। এ বিশ্বযুদ্ধ থেকে অল্প দেশই রেহাই পেয়েছিল সে কথা আমরা জানি। শান্তিকামী ভারত, এমন কি যুদ্ধে যোগদান না করেও নিরীহ এস্‌কিমোও এর থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

এবং শুধু তাদেরই লেখা নেওয়া হয়েছে যারা এ-যুদ্ধে নিহত হয় বা যুদ্ধে মারাত্মকরূপে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই মারা যায় কিংবা যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে শান্তিপূর্ণ দেশে বাস করার সময় যুদ্ধের বীভৎসতা, আত্মজন বিয়োগের শোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু এত দীর্ঘ অবতরণিকা করার কণামাত্র প্রয়োজন নেই। দু'একটি চিঠির অনুবাদ পড়ে সহৃদয় পাঠক বুঝে যাবেন, এ-অবতরণিকা কতখানি বেকার।

গত যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হলে পর জর্মন সৈন্যরা সেখানে কায়েম হয়ে দেশটাকে 'অকুপাই' করে। সঙ্গে সঙ্গে বহু ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গড়ে

তোলে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট'। তারা মোকা পেলে জর্মন সৈন্যকে গুলি করে মারে, রেল লাইন, তাদের বন্দুক-কামানের কারখানা ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং আরো কত কী! এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের আপন দেশেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অজানা নয়।

এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে একটি ষোল বছরের ফরাসী বালক জর্মনদের হাতে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে সে তার জনকজননীকে একখানি চিঠি লেখে। এবারে আমি সেটি অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"...আমার প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল, বিশেষ করে আমার আত্মীয় ও বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ো; তাদের বলো যে (মাতৃভূমি) ফ্রান্সের প্রতি আমার অনন্ত বিশ্বাস। আমার হয়ে ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কাকারা, মাসীরা ও ওদের মেয়ে—আমার বোনেদের—প্রগাঢ় আলিঙ্গন করো। আমার পাদ্রিসাহেবকে বলো আমি বিশেষ করে তাঁকে ও তাঁর আত্মজনকে স্মরণে রেখেছি; আমি মসেন্নোর (প্রধান পাদ্রি)-কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমাকে যে-ভাবে গৌরবান্বিত করেছেন, আশা করি, আমি যে তার উপযুক্ত পাত্র সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। মৃত্যুর সময় আমি আমার স্কুলের বন্ধুদেরও আদর-সম্ভাষণ জানাই। আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সঞ্চয়ন (লাইব্রেরিটি) পিয়েরকে,[১] আমার ইস্কুলের বই বাবাকে, আমার অন্যান্য সঞ্চয়ন আমার সব চেয়ে প্রিয় আমার মাকে দিয়ে গেলুম। আমার বাসনার ধন স্বাধীন ফরাসীভূমি এবং সুখী ফ্রান্সবাসী দম্ভী ফ্রান্স, পৃথিবীর সর্বাগ্রণী নেশন ফ্রান্স আমার কাম্য নয়; বরঞ্চ কর্মনিষ্ঠ ফ্রান্স,[২]—কর্মনিষ্ঠ এবং আত্মমর্যাদাশীল ফ্রান্স। আমি প্রার্থনা করি ফ্রান্সবাসী যেন সুখী

একাধিক পাঠক অনুযোগ করেছেন, অধমের রচনা ইদানীং বড্ডই টীকা কণ্টকাকীর্ণ। আমার নিবেদন, টীকা না পড়লে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। যাঁরা নিতান্ত একটু-আধটু আশকথা-পাশকথা জানতে চান কিংবা এই আক্রাগণ্ডার বাজারে 'বই' কিনেছেন বলে প্রতিটি পিঁপড়ে নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে গুড় বের করতে চান—এ টীকা শুধু তাঁদের জন্য।

১ পিয়ের খুব সম্ভব পত্রলেখক আঁরির (Henri = Henry) ছোট ভাই। তাই পিয়েরকে তার ছোটখাটো পুস্তক সঞ্চয়ন দিয়ে যাচ্ছে।

২ ফ্রান্সে যুদ্ধ হবার পর অনেকেই বিশ্বাস করতো, ফরাসীদের আলসেমিই তাদের ঐ পরাজয়ের কারণ।

হয়—সেইটেই সব চেয়ে বড় সত্য। তারা যেন শেখে জীবনে শিবম্‌কে আলিঙ্গন করতে।[৩]

আমার জন্য তোমরা কোনো চিন্তা করো না; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার সাহস ও সহজ রসবোধ (গুড হিউমার) বজায় রেখে যাবো; আমি যাবার সময় সেই 'সাঁব্‌র্‌-এ-ম্যজ্‌'[৪] গানটি গেয়ে যাব, যেটি তুমি, আমার আদরের মা আমাকে শিখিয়েছিলে।

পিয়েরকে[৫] শাসনে রেখো কিন্তু স্নেহের সঙ্গে। আর লেখাপড়ার কাজ চেক্‌ আপ্‌ করে নিয়ো এবং সে যেন ঠিকমতো খাটে[৬] তার উপর জোর দিয়ো। তাকে আলস্য-অবহেলা করতে দিয়ো না। আমি যেন তার শ্লাঘার পাত্র হই। সেপাইরা আসছে আমাকে নিয়ে যেতে। আমার হাতের লেখা হয়তো অল্প একটু কাঁপা-কাঁপা হয়ে গেল; তার কারণ পেনসিলটি বড্ড ছোট্ট; মৃত্যুভয় আমার আদৌ নেই; আমার আত্মা অত্যন্ত শান্ত।

বাবা, আমি তোমাকে অতিশয় অনুরোধ জানাই, প্রার্থনা করো। শুধু এই কথাটুকু বিবেচনা করো, এই যে আমি এখানে মরতে যাচ্ছি, সেটি আমাদের সক্কলের জন্য। এর চেয়ে শ্লাঘনীয় আমার কী মৃত্যু হতে পারতো? আমি স্বেচ্ছায় পিতৃভূমির জন্য মৃত্যুবরণ করছি; স্বর্গভূমিতে আমাদের চারজনাতে[৭] ফের দেখা হবে। প্রতিহিংসাকামীদের মৃত্যুর পরও তাদের অনুগামী পাবে। বিদায় বিদায়! মৃত্যু আমাকে ডাকছে। আমার চোখে ফেটা বেঁধে আমাকে গুলি করবে সে আমি চাই নে, আমাকে হাতে-পায়ে বাঁধতেও হবে না। আমি তোমাদের সবাইকে আলিঙ্গন করি। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বলি, বাধ্য হয়ে মরাটা

৩ 'শিবম্‌কে আলিঙ্গন'—এটা মনে হচ্ছে, জর্মন কবি গ্যোটে থেকে উদ্ধৃত। পত্রলেখক আঁরি জর্মনদের হাতে নিহত হচ্ছে, অথচ সে বিশ্বপ্রেমিক বলে বিশ্বকবি —জর্মন-গ্যোটেকে উদ্ধৃত করছে।

৪ সাঁব্‌র্‌ এবং ম্যজ ফ্রান্সের দুই নদী। আমাদের যে-রকম গঙ্গা-যমুনা। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' তুলনীয়।

৫ এক নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

৬ দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর দ্রষ্টব্য।

৭ স্বর্গে বাপ, মা, পিয়ের ও সে নিজে এই চারজন সম্মিলিত হবে আশা করছে।

কঠিন কাজ। সহস্র চুম্বন।

ফ্রান্স—জিন্দাবাদ!

ষোড়শ বৎসরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

এচ্ ফেরুতে

হাতের লেখা আর ভুলচুকের জন্য মাফ চাইছি; আবার পড়ার সময় নেই।

পত্র-প্রেরক: আঁরি ফেরুতে, স্বর্গলোক, কেয়ার অব ভগবান।[৮]

॥ ২ ॥

এবারে একজন জাপানীর চিঠি তুলে দিচ্ছি:

জিরুকু ইওয়াগায়া (Jiroku Iwagaya), শিক্ষক,

জন্ম ১৯২৩ সালে। ১৯৪৪ সালে ফিলিপাইন যাবার সময় যুদ্ধজাহাজ-ডুবিতে সলিলসমাধি।

শিজুয়োকা, ১২ জুন ১৯৪৩

বুগাঁভিস[১] দ্বীপের কাছে যে নৌযুদ্ধ হয়ে গেল তার খবর আজ কাগজে বেরিয়েছে। প্রকাশ, একখানা বিরাট সৈন্যবাহী জাহাজ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে ও একখানা জঙ্গী জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। এভাবে মানুষ কেন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে অতলে লীন হবে? জাপানীরা মারা গেলে শুধু জাপানীরাই, বিদেশীরা মারা গেলে শুধু বিদেশীরাই অশ্রুবর্ষণ করে কেন? মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে সম্মিলিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে না কেন, আনন্দের সময়

৮ কনটিনেণ্টে পত্রলেখককে তার ঠিকানা দিতে হয় (যেমন আমাদের ইনল্যাণ্ড-লেটার)। তাই আঁরি তার ঠিকানা দিয়েছে। এর থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, সে যে গর্ব করেছে জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি (তার) হিউমার বজায় রেখে যাবে, সেটা কিছুমাত্র মিথ্যা দম্ভ নয়। কারণ এই কটি শব্দই ইহ-জীবনে তার শেষ বাক্য।

যে-বই থেকে এই পত্রটি অনুবাদ করেছি তার নাম-ঠিকানা:

Die Stimme des Menschen Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt। 1939-1945 Gesam melt und herausg-egeben von Hans Walter Baenl Piper Verlag, 1961, Muenc-hen.

১ সলমন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ—অস্ট্রেলিয়ার অধীনে।

সম্মিলিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না কেন? এ তত্ত্বটি যে-কোনো শান্তিকামী জনের চিত্ত আলোড়িত করবে। যেহেতু একটা বিদেশী মরেছে অতএব জাপানীরা বেশ পরিতৃপ্ত। এটা আমার কাছে চিরকাল অবোধ্য থেকে যাবে। তিন দিন চার দিন ধরে একটা লোক সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষটায় অবসন্ন হয়ে জলে ডুবে গেল এটা কী নিদারুণ! মৃত্যুর সঙ্গে আমার যদি সমুদ্রে কখনো দেখা হয় তবে কি আমি তাকে সজ্ঞানে চিনতে পারবো?

৩ মার্চ ১৯৪৪

বিদায় নেবার পূর্বে আমি ক্লাসের ছেলেদের দিয়ে 'তাজিমামরি'[২] গানটি গাওয়ালুম। আমি জানি না কেন, এটি শুনে আমার বড় আনন্দ হল। এ গানটি আমি কখনই ভুলবো না; এটি আমাকে সব সময়ই স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমি শিক্ষক ছিলুম।

মার্চ ১৯৪৪

আমি যুদ্ধে চললুম, কিন্তু আমি যুদ্ধ চাইনি। হয়তো আমার এ কথাটা কেউই বুঝবে না। কিন্তু কোনো মানুষকে হত্যা করার জন্য আমি কোনো তাগিদ অনুভব করি না। আমার মনে হয়, আমাকে যেন একটা দ' টেনে নিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

একাধিক জাতের বিশ্বাস এবং তারা যুদ্ধের সময় প্রোপাগাণ্ডা করে যে, জাপানীমাত্রই যুদ্ধের জন্য হামেহাল মারমুখো। এ চিঠি পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ-ধরনের আরো চিঠি আছে। স্থানাভাবে তার অল্পাংশও তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন টাইপের চিঠি অনুবাদ মারফত বহুবিধ মানবের চিন্তাধারা, হৃদয়ানুভূতি— এবং তৎসত্ত্বেও সেগুলি সর্বজনীন—এগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

যুগোস্লাভিয়ার জনৈক নাম-না-জানা সৈনিক,
অজাত শিশুর প্রতি পত্র,

[যুদ্ধের সময়ে]

হে আমার সন্তান, এখনো তুমি অন্ধকারে ঘুমুচ্ছো এবং ভূমিষ্ঠ হবার জন্য

---

২ 'তাজিমামরি' গীতটি আমি যোগাড় করতে পারিনি। কোনো গুণিন পাঠক যদি সেটি সংগ্রহ করে অনুবাদসহ প্রকাশক মহাশয়কে পাঠান তবে লেখক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

শক্তি সঞ্চয় করছো ; আমি তোমার সর্বমঙ্গল কামনা করি। তুমি এখনো তোমার প্রকৃত রূপ (Gestalt) পাওনি ; তুমি এখনো শ্বাসগ্রহণ করছো না ; তুমি এখনো অন্ধ। তবু, যখন তোমার সে লগ্ন আসবে, তোমার এবং তোমার মাতার সে-লগ্ন আসবে (তোমার সে মাতাকে আমি সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবাসি) তখন তুমি বাতাস এবং আলো পাবার জন্য সংগ্রাম করার মতো শক্তিও পাবে। আলোকের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করার অধিকার তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। সেই কারণেই তুমি নারীদেহ থেকে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবে, অবশ্যই তুমি প্রকৃত কারণ না জেনেই জন্মগ্রহণ করবে।

বেঁচে থাকতে যে আনন্দ আছে সেটাকে তুমি রক্ষা করো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুভয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিও। এই যে জীবন—এটাকে ভালোবাসা উচিত, নইলে এটা বৃথাই নষ্ট হয়, কিন্তু এটাকে মাত্রাধিক ভালোবাসা উচিত নয়।

নূতন নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য হৃদয় সর্বদা উন্মুক্ত রেখো ; মিথ্যাকে ঘৃণা করার জন্য হৃদয় প্রস্তুত রেখো ; অশিবকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বর্জন করার মতো শক্তি সর্বথা হৃদয়ে ধারণ করো। আমি জানি, আমাকে এখন মরতে হবে, এবং তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং আমার যত সব ভুলক্রটির জঞ্জালের উপর তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আমাকে ক্ষমা করো। আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত যে তোমাকে এই অরাজক আরামহীন সংসারের পিছনে রেখে চলে যাচ্ছি। কিন্তু এ-ছাড়া তো কোনো গতি নেই। আমি কল্পনায় তোমার কপালে চুম্বন রাখছি —শেষবারের মতো তোমাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্য। গুড্‌নাইট, বাছা আমার —গুড্‌ মরনিং এবং শুভ প্রভাতে তুমি জাগ্রত হও।

মিসাক মান্নুচিয়ান, তুরস্ক।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি-ইয়মনে (তুর্কী—আরমেনিয়ায়) জন্ম ; ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এ প্যারিসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ [প্যারিস]

[আমার মৃত্যুর পর] যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরাই ধন্য, কারণ তাঁরা মধুর স্বাধীনতা উপভোগ করবেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে ফরাসী জাতি এবং অন্যান্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী আমাদের স্মৃতিকে যথোপযুক্ত সম্মান দেবে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমি জর্মন জাতের প্রতি কোনো ঘৃণা অনুভব করি না…প্রত্যেক মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী তিরস্কার পাবে। জর্মন ও অন্যান্য জাত যুদ্ধশেষে শান্তিতে, ভ্রাতৃভাবে জীবনধারণ করবে ; এ-যুদ্ধ শেষ হতে আর বিলম্ব নেই। বিশ্বজন সুখী হোক।

গভীর বেদনা অনুভব করি আমি যে, আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি। আমি চেয়েছিলুম, তুমি আমাকে একটি সন্তান দেবে, এবং তুমিও সব সময় তাই চেয়েছিলে। তোমার প্রতি তাই আমার অনুরোধ, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যুদ্ধের পর তুমি অতি অবশ্য পুনরায় পরিণয় করে সন্তান লাভ করবে।

আজ রোদ উঠেছে। এ রকম দৃশ্য আর সুন্দর প্রকৃতির পানে তাকিয়ে আমি তোমাকে নিত্যদিন কতই না ভালোবেসেছি। তাই বিদায় বিদায়! বিদায় নিচ্ছি এ জীবনের কাছ থেকে, তোমাদের সকলের কাছ থেকে, আমার প্রিয়াপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীর থেকে, এবং আমার ভালোবাসার বন্ধুজনের কাছ থেকে। আমি তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করছি, তোমার ছোট বোনকেও এবং দূরের এবং নিকটের পরিচিত সর্ব বন্ধুজনকে।

॥ ৩ ॥

এ-কথা অনেকের কাছেই অবিদিত নয় যে, প্রাচ্যে মাতার প্রতি বয়স্ক পুত্রের যতখানি টান থাকে, পশ্চিমে—বিশেষ করে ফ্রান্স জর্মনি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে—পুত্রের টান তার চেয়ে অনেক কম। এসব দেশের কবিরা মাতার উদ্দেশে কবিতা রচেছেন অত্যল্পই। তার একটা কারণ বোধহয় এরা বিয়ে করে মা'র সঙ্গে বাস করে না—বউ নিয়ে আলাদা সংসার পাতে। আমাদের বড় এবং মাঝারি শহরেও এ রীতি কিছুটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

তা সে যাই হোক, যুদ্ধের সময় অনেক সৈন্যই মাতাকে বার বার স্মরণ করে। হৃদয় খুলে তার সব কথা জানায়। তাই যুদ্ধের সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে লেখা চিঠিতে পাঠক মানব-হৃদয়ের নূতন নূতন মর্মস্পর্শী পরিচয় পাবেন।

যুদ্ধ তার রুদ্রতম নিকটতম বদন দেখায় সিভিল উয়োর বা ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় এবং আশ্চয সে সময় মানুষের করুণাধারাও যে কী রকম উছলে পড়ে সেটা বহু চিঠিতে বহুভাবে প্রকাশ পায়।

গত বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইতালিতে ভ্রাতৃযুদ্ধ চলেছে। এ চিঠিটি সে সময়কার।

রবের্তো নান্নি : ইতালি, বল্না স্কুলের ছাত্র।

জন্ম ১৯২৮। প্যারাশুট থেকে ভূপৃষ্ঠে সংঘর্ষে ২৮ মার্চ ১৯৪৫[১] সালে নিহত।

২১ জানুয়ারি, ১৯৪৫

(মাতাকে লিখিত)

আজ এই প্রথম য়ুনিফর্ম পরে গির্জের উপাসনায় আমি যোগ দিয়েছিলুম।[২] আর বিশ্বাস করো মা আমার হৃদয় কী অনুভূতিতেই না ভরে উঠেছিল। ছেলে-বেলায় তুমি যে আমাকে সঙ্গে করে গির্জেয় নিয়ে যেতে সে-সময়কার কথা ভাব-ছিলুম। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যত দিন যায় মানুষের বয়স বাড়ে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ের গভীরে সে ছেলেমানুষই থেকে যায়। আমরা সমবেত কণ্ঠে 'অসংখ্য জনের প্রার্থনা গীতি' গাইবার সময় যখন পুণ্যময়ী 'মাতা'র নাম এল তখন শুধু যে আমারই দু'চোখ জলে ভিজে গেল তাই নয় আমার বন্ধু-দেরও তাই হল। তোমার কাছ থেকে চিঠি পাবার যে সুযোগ সুবিধা ও আনন্দ পাবার অধিকার আমার আছে তার মূল্য আমি তখন বুঝতে পারলুম কারণ আমার বহু সাথীর পরিবারবর্গ শত্রু-অধিকৃত এলাকায় আছে বলে তারা কোনো চিঠি পায় না।

আমার বিশ্বাস যে-নাম মানুষ বিপদের মুখোমুখি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ডেকে ওঠে সে-নাম "মা"।

শত্রুপক্ষের যাকে আমি দু'বাহুতে করে ফার্স্ট এডের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম সে চেঁচিয়ে ডেকেছিল "মা"। যেতে যেতে তার মনের মধ্যে শুধু ছিল একটি মাত্র চিন্তা : তার মা। কাতর হয়ে আমাকে শুধোচ্ছিল, আমরা তার মাকে কিছু করিনি তো? আমি যতই 'না' বলছিলুম সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমাকে মিনতি জানাচ্ছিল আমি যেন সদা আমার মাকে অবশ্য স্মরণে রাখি, তোমার সম্বন্ধে খবর জানতে অনুরোধ করছিল, জিজ্ঞেস করছিল আমি তোমার কাছ থেকে চিঠি পাই কিনা, তোমার কোনো ফোটো আমার কাছে আছে

---

১ এর ঠিক এক মাস পরে ইতালিতে যুদ্ধের অবসান হয়। তাই ভাবলে দুঃখ হয় যে সতেরো বছরের ছেলেটির মা যখনই এ কথাটি ভাববে তখনই তার শোক কত না গভীর হবে।

২ জর্মন ইতালির ফ্যাসি সম্প্রদায় সৈন্যদের উর্দি পরে গির্জে যাওয়াটা পছন্দ করতো না। তারা গির্জেকে রাষ্ট্রের শত্রুভাবে দেখতো এবং উর্দি না পরে গির্জে যাওয়াটাও অতি কষ্টে বরদাস্ত করতো।

কিনা, কারণ তার আপন মায়ের কোনো ছবি তার কাছে ছিল না এবং তাই তোমার ফোটোতে সে তার আপন মায়ের ছবিও দেখতে চেয়েছিল।

৮ই সেপ্টেম্বর[৩] নিয়ে যারা অবহেলার সঙ্গে আলোচনা করে—কণামাত্র জানে না ঐ দিন আমাদের পিতৃভূমির জন্য কী দুর্ভাগ্য আর পরিপূর্ণ বিনাশ নিয়ে এসেছে—তারা যদি আমি যা এইমাত্র বর্ণনা করলুম সে দৃশ্যের সম্মুখে থাকত! কারণ, বুঝলে মা, যে লোকটাকে আমি গুলি করে আহত করতে বাধ্য হয়েছিলুম, যাতে করে সে আমার উপর আগেই গুলি না করতে পারে; সে আর আমি তো একই ভাষাতে কথা বলি, এবং "মা" বলে সে ডেকে উঠেছিল, এই এখন আমি তোমাকে যে নাম ধরে ডাকছি…

এবারে একটি কবিতার গদ্যানুবাদ।

আমির হামজা: মালয়, রাজপরিবারজাত কবি।

জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১, সুমাত্রায়। যুদ্ধাবসানের অরাজকতার সময় ১৯৪৬ সালে সুমাত্রায় নিহত।

(প্রিয়মিলন তৃষ্ণা)

কী মধুর! হে সমারোহময় মেঘরাশির শোভাযাত্রা
তুমি ঢেকে নিয়েছো সুনীল আকাশের নীলাঞ্জন।
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে এই কুটিরের 'পরে
দূরের প্রবাসী তিয়াসী এক পথিকের কুটিরের 'পরে—
এক লহমার তরে, এক পলকের তরে—
আমি তোমাকে শুধু শুধোতে চাই,
তোমাকে হে মেঘ তোমাকে শুধোতে চাই
তুমি কোন্ দিকে যাবে মনস্থির করেছ?
কোন্ দেশে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে?
হে মেঘ, আমার প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাও আমার বিরহ ব্যথা
তাকে কানে কানে বলো আমার বিরহ বেদনা
তার তরুণ সোনালী হাঁটু দুটিকে তুমি আলিঙ্গন ক'রো,
যেন আমি নিজে সে দুটিকে আলিঙ্গন করছি।

এ কবিতা তো আমাদের বহুদিনকার চেনা কবিতা!!

৩ ঐ দিনই প্রথম খবর প্রকাশ পায়, ইতালির রাজা তাঁর মিত্রশক্তি

॥ ৪ ॥

ইভান ভ্লাদ্‌কফ: বুলগারিয়া।

জন্ম দ্রিয়ানভো-তে ১লা জানুয়ারি ১৯১৫।

মৃত্যু ২২ নভেম্বর ১৯৪৩, বুলগারিয়ার পুলিস কর্তৃক নিহত।

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

যে একটি মাত্র বাসনা আমার আছে সেটি বেঁচে থাকার। তোমার শ্বাস চেপে ধরে বন্ধ করে দিল, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ধীরে ধীরে তোমার চৈতন্য লোপ পেল; গারদের কুটুরি আরো ছোট হয়ে গেল, এ-কুটুরিতে কখনো বাতাস ঢোকে না। তৎসত্ত্বেও বেঁচে থাকবার জন্য কী অদম্য স্পৃহা!

আর আমার ছোট ছেলেটি! এখন থেকেই সে আমার অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যে কথাগুলো সে আমায় বলেছিল সেগুলো এখনো আমার মনকে চঞ্চল করে তোলে: বাবা, তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমার জন্য একটা ট্রাম-লাইন কিনে দেবে আর ছোট একটি গাড়ি, আর এক জোড়া জুতো!

আমার পুত্র আমার অনুপস্থিতি অনুভব করে। আমার আদরসোহাগ সে কামনা করে, আমার কথা ভেবে সে ব্যাকুল হয়। আমি যখন তাকে বললুম, এরা আমাকে তোর কাছে যেতে দেয় না, তখন সে আমাকে বলল, 'তুমি যে আমার কাছে আসতে চাও না, তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না—না বাবা?' শিশুসন্তানের এ কী সরল ভালোবাসা, তার আত্মাটি কত না বিরাট ভালোবাসা ধরতে জানে!

কিন্তু এই এঁরা যাঁরা আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এঁদের কি তবে শিশুসন্তান নেই? এঁরা কি নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন না, অন্যের প্রতি কি এঁদের কোনো সমবেদনা নেই? অতি অবশ্যই সর্বদাই এঁরা কোনো কিছু দিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে জানেন। যখন তাঁদের উচিত আমাদের মৃত্যুর চরম দণ্ডাদেশ না দিয়ে লঘুতর দণ্ড দেওয়া—অন্য সর্ব কারণ বাদ দিয়ে হোক না সে শুধু আমাদের শিশুসন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে—তখন তাঁরা বলেন, শাসন-

জর্মনিকে ত্যাগ করে মার্কিন-ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছেন, ফলে দেশে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যে সৈন্য আহত হয় সে ছিল পার্টিজান দলের। (বর্তমান লেখকের ভেন্দেত্তা দ্রষ্টব্য)।

দণ্ডের আইন সে অনুমতি দেয় না। এ কী মূর্খতা! কিন্তু বোধ হয় এঁরা আপন শিশুসন্তানের প্রতি আমাদের মতো এ গভীর ভালোবাসা পোষণ করেননি। কারণ তাই যদি হত তবে তাঁদের আচরণ অন্য রকমের হত। আমার এখনো স্মরণে আসছে জেনারেল কচোস্টয়ানফের কথা—আমাকে কি বলেছিলেন: "বিচারকেরা সন্তানদের কথা স্মরণ রাখেন।" কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি নে, হয়তো কখনোই বুঝতে পারবো না, তাই যদি হবে, সন্তানদের কথা যদি তাঁরা স্মরণেই রাখেন তবে এ রকম দণ্ডাদেশ দেন কি প্রকারে?

'রাষ্ট্র শক্তিমান এবং রাষ্ট্র কাউকে পরোয়া করে না (ডিফাই)।' কিন্তু তাই যদি হবে তবে এরা আমাকে গুলি করে মারছে কেন?

২১ নভেম্বর ১৯৪৩

পুত্রকে—

আমি জানি পিতৃহীন হয়ে তোমার জীবনধারণ কঠিন হবে এবং তোমাকে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা সইতে হবে। কিন্তু যে-সমাজতন্ত্রের জন্যে আমি এ-জীবন আহুতি দিচ্ছি সে ব্যবস্থা আসবে[১] এবং তোমাদের জীবনযাপনের জন্য মহত্তর পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

তুমিও সংগ্রামী হও এবং ন্যায়ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। তোমার মাকে ভালোবাসবে, হে প্রিয়পুত্র! জীবনের বিপদ-আপদে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।

বুলগারিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি বড়ই জটিল। পাঁচশত বৎসর তুর্কদের কবলে পরাধীনতার পর বুলগারিয়া ১৮৭২-এ রুশদের সাহায্যে স্বাধীনতা পায়, কিন্তু গৃহ-যুদ্ধ লেগেই থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে বুলগারিয়ার জনসাধারণ ছিল রুশ-মিত্র, পক্ষান্তরে রাজা বরিস ও তাঁর ফৌজী অফিসাররা ছিলেন হিটলার-প্রেমী। কারণ এই রাজ্যবিস্তার-লোভী দলকে হিটলার অনেক লোভ দেখিয়ে হাত করেন এবং প্রকৃত-

---

১ কিন্তু পত্রলেখকের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এর ঠিক এক বৎসর পর বিজয়ী রুশ সেনা নাৎসিদের বিতাড়িত করে বুলগারিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সময় বিস্তর নাৎসিমিত্র নবীন রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আশা করি, পত্রলেখক যে কামনা করেছিলেন এবারে সেটা পূর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ নবীন রাষ্ট্র পত্রলেখকবৈরী-নাৎসিমিত্রদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পূর্বে তাদের শিশু-সন্তানদের কথা ভেবেছিল।

পক্ষে সেখানে তাঁরই চেলাচামুণ্ডারা বুলগার অফিসারদের সাহায্যে নৃশংসভাবে রাজত্ব চালাতো। পত্রলেখক স্পষ্টত নাৎসিবৈরী জনসাধারণের অন্যতম ও নাৎসি-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

জনৈক জর্মন সৈন্যদ্বারা লিখিত :
হেরবের্ট্ ডুকস্টাইন : জর্মনি।
জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ মাগডেবুর্গ্।
মৃত্যু ২ জুন, ১৯৪৪, যোআন্নিনা, গ্রীস-এ যুদ্ধে নিহত।

গ্রীষ্ম ৯৪৪

ভিটমার বা মণিকা—আমার অজাত সন্তান!

যাত্রা এখনো আরম্ভ হয়নি—তোমার যাত্রা আমার যাত্রা কারোরই না। সেই বিরাট ঘটনার প্রাক্কালে আমরা উভয়েই প্রতীক্ষমাণ, তুমি তোমার—তোমার জন্মগ্রহণ করার, আর আমি আমার—যুদ্ধ এবং কাল-ঘূর্ণাবর্ত আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে। সেই হেতু এ-পত্র প্রধানত তোমার মায়ের উদ্দেশে লেখা—যে মাতা তাঁর আপন দেহ দিয়ে তোমার আমার মধ্যে সংযোগ স্থাপনা করেছেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি—যতদিন তোমার হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন তোমাকে নিয়তি-নির্দিষ্ট যে-পথে যেতে হবে সে-পথ দেখিয়ে দিয়ে যায়।

আমার হৃদয় সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে, যতখানি শক্তি সে ধরে—কিন্তু হায়, সে-শক্তি বুঝিবা তার নেই যে তোমার বিরাট অভিযানের প্রথম পদক্ষেপগুলো দেখা যাবে—শুভেচ্ছা জানায় তোমার মাতাকে ইহসংসারে তোমার সর্বশ্রেয়া যিনি এবং তোমাকে—

—এখনো যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি, তোমার পিতা।

হ্স্যু হ্সিআও-হ্সিএ্যান, চীন।
১৯১৩-এ যুদ্ধে নিহত।

(একটি ক্ষুদ্র কবিতা)

শংখ-প্রাচীরের পিছনে
আমাদের বন্ধুত্ব হল নিবিড়তর।
আমরা বিরাট বিরাট যত সব প্ল্যান করলুম
আমাদের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা ছিল সুদূরব্যাপী…

কিন্তু বিদায়ের সময় শুধু নাড়লাম মাথা—
একটি মাত্র কথা না বলে—একে অন্যের দিকে।
কেন না সেনাবাহিনী তখন এসে দাঁড়িয়েছে
প্রাচীর দুর্গতোরণের সম্মুখে ॥

। ৫ ॥

যুদ্ধের সময় মাতারাই যে তাদের সন্তান হারিয়েছে তাই নয়, শিশুও মাকে হারিয়েছে —বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময়। তাই এ-যুদ্ধে মাকে লেখা মেয়ের চিঠিও আছে।

হিটলার গদীতে বসার আগে থেকেই তাঁর শত্রু কম্যুনিস্ট ও সোস্যালিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যাঁরা ধরা পড়েন তাঁদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিচারের নামে পরিহাস করা হত বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই বিনা-বিচারে কন্‌সানট্রেশন ক্যাম্‌পে বন্ধ করে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হত।

যুদ্ধ না লাগলে হয়তো হিটলার হিমলার এদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতেন না। কিন্তু হিটলার রুশ-রণাঙ্গনে যতই হারতে লাগলেন ততই তাঁর নিষ্ঠুরতা জিঘাংসা উত্তেজিত হতে লাগল—এই বিদ্রোহী পক্ষের প্রতি। হিটলার তখন স্ত্রী-পুরুষে আর কোনো পার্থক্য রাখলেন না। এমন কি নবজাত শিশুর মাতাও তাঁর বর্বরতা থেকে নিষ্কৃতি পেল না।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী হান্‌স্ কপ্‌পিসহ স্ত্রী হিল্‌ডে কপ্‌পি গ্রেপ্তার হন। এঁরা দুজনেই হিটলারের বিরুদ্ধে সক্রিয় সোস্যালিস্ট ছিলেন। কারাগারে হিল্‌ডে একটি শিশুপুত্রের জন্ম দেন। পিতার নামেই এই শিশুর নামকরণ করা হয় 'হান্‌স্'—এ রেওয়াজ পৃথিবীর বহু দেশে আছে। 'ছোট' হান্‌সের ভূমিষ্ঠ হওয়ার এক মাস পর পিতা 'বড়' হান্‌স্‌কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এবং মাতা হিল্‌ডেকে আট মাস পরে ১৯৪৩ সালের ৫ই আগস্ট। তখন তাঁর বয়স ৩৪।

মাতাকে লেখা কন্যার পত্র

আমার মা, গভীরতম ভালোবাসার মা-মণি,

সময় প্রায় এসে গিয়েছে যখন আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে। এর ভিতর কঠিনতম ছিল আমার ছোট হান্‌সের কাছ থেকে চিরবিদায় নেওয়া—সেটা হয়ে গিয়েছে। সে আমাকে কী আনন্দই না

দিয়েছে! আমি জানি, সে তোমার স্নেহনিষ্ঠ মাতৃহস্তে অতি উত্তম রক্ষণাবেক্ষণ পাবে এবং আমার তরে মা মণি—প্রতিজ্ঞা করো—তুমি সাহসে বুক বাঁধবে। আমি জানি, তোমার বুকে বাজছে, এই বুঝি তোমার হৃদয় ভেঙে পড়বে, কিন্তু তুমি নিজেকে শক্ত করে নিজের হাতে চেপে ধরো—খুব শক্ত করে। তুমি ঠিক পারবে—তুমি তো কঠিনতম বাধাবিঘ্নের সামনে সর্বদাই জয়ী হয়েছ—এবারেও পারবে না মা? তোমার কথা যতই ভাবি, তোমাকে যে নির্মম বেদনা আমি দিতে যাচ্ছি সেই কথা—এটাই আমার কাছে সব কিছুর চাইতে অসহনীয়—এই ভাবনা যে, জীবনের যে-বয়সে আমাকে দিয়ে তোমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তখনই আমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তোমাকে। তুমি কি কখনো—কোনো দিন—আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? তুমি তো জানো মা, আমার যখন বয়স কম ছিল—অনেক রাত্রে ঘুম আসতো না—তখন যে-চিন্তা আমার মনকে সজীব করে তুলতো সেটা—আমি যেন তোমার আগে ও-পারে যেতে পাই। এবং তার পরবর্তীকালে আমার মাত্র একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল; সে আকাঙ্ক্ষা দিবারাত্র, জানা-অজানায় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো—এ সংসারে একটি সন্তান না এনে কিছুতেই আমি মরবো না। তা হলে দেখো মা, আমার এই দুই মহান কামনা এবং তাই দিয়ে আমার জীবন পরিপূর্ণ সফলতা পেয়েছে। এখন আমি যাচ্ছি আমার বড় হান্সের মিলনে। ছোট হান্স্—আমি আশা ধরি—আমাদের দু'জনার ভিতর যা ছিল ভালো, সেইটে পেয়েছে। এবং যখনই তুমি তাকে তোমার বুকে চেপে ধরবে, তোমার এই শিশুটি সর্বদাই তোমাকে সঙ্গ দেবে—আমার চেয়ে বেশী, আমি তো আর কখনো তোমার অত কাছে আসতে পারবো না। ছোট হান্স্—আমার আশা—যেন সুদৃঢ় শক্তিশালী হয়, সে যেন মুক্তহৃদয় হয়, দরদী সেবাশীল হৃদয় ধরে এবং তার বাপের অকলঙ্ক ভদ্রচরিত্র পায়। আমরা একে অন্যকে নিবিড়, বড় নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলুম। প্রেমই আমাদের সর্বকর্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

> শক্তি দিয়ে যুঝে যেবা দেহ করে দান,
> প্রভু রাখে তার তরে মহান নির্বাণ॥

মা আমার, আমার অদ্বিতীয়া কল্যাণী মা, আর আমার ছোট হান্স্—আমার সর্ব ভালোবাসা সর্বকাল তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে; সাহস ধরো—আমি যে রকম সাহস রাখবো বলে দৃঢ়প্রত্যয়।

নিত্যকালের

তোমার মেয়ে হিল্ডে

মাতাকে নিহত করে যারা শিশুকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে তাদের কি নাম দিয়ে ডাকি? হিটলার সর্বদাই ইহুদি বেদের পরিচয় দিতেন তাদের Untermensch = Undermen নাম দিয়ে অর্থাৎ মানুষ যে স্তরে আছে ইহুদি বেদে তাদের নিচের স্তরে। তাই তাদের গ্যাসচেম্বারে পুরে মারা হয়। অথচ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তার থেকে বলতে পারি, এই দুই জাতই মাতা মাত্রকেই অবর্ণনীয় অসাধারণ প্রীতিস্নেহের চোখে দেখে। এইবারে পাঠক চিন্তা করুন Untermensch পদবী ধরার হক্ক সবচেয়ে বেশী কার?

মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে হিল্‌ডের যে দুটি চরম কামনা ছিল সে-দুটি পূর্ণ।

আর সান্ত্বনা দিই যে তাকে দীর্ঘকাল বৈধব্যশোক সইতে হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন ঐ কটি মাসই তার কি করে কেটেছিল? আর ঐ কটি মাসেই তার পিতা বড় হান্‌স্ কী গর্ব, কী বেদনাই না অনুভব করেছিল!

আর সান্ত্বনা দিই এই ভেবে যে মাত্র ন'মাসের শিশু মাতৃবিচ্ছেদের শোক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন, সে যে মাতৃদুগ্ধ না খেয়ে অন্য দুগ্ধ খাচ্ছে সেটা কি সে ইন্‌স্‌টিন্‌ক্ট দিয়ে (অনুভূতি-জাত সরাসরি জ্ঞান) বুঝতে পেরেছিল?

মনকে যতই চোখের ঠার মারি না কেন, যতই সান্ত্বনা খুঁজি না কেন এ-চিঠি গিলতে গিয়ে আমাদের সর্ব বুদ্ধি বিবেচনা সর্ব অনুভূতি চেতনা অসাড় হয়ে যায়।

এই পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয় কন্যা মৈত্রেয়ীর অনুজা। তিনি অমৃতের সন্ধানে ইহবৈভব ত্যাগ করেছিলেন (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহমং তেন কুর্যাম্)। ইনি মাতা ত্যাগ পুত্র ত্যাগ করলেন সত্যশিবের সন্ধানে।

এই অতিশয় অসাধারণ পত্রের পর অন্যের পত্র কি পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে? কি আমি তো কোনো ক্লাইম্যাক্স স্থষ্টি করার জন্য চিঠিগুলি বাছাই করে করে ফুলের তোড়া সাজাচ্ছি না। যেমন যেমন পড়ে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করছে সেগুলো অনুবাদ করে দিচ্ছি এবং আমি বাঙালী বলে আশা করছি বাঙালী হৃদয়ও এগুলো গ্রহণ করবে।

তাই চীন দেশের একটি কবিতা।

বাচ্চাটির বয়স যখন পাঁচ তখন তার বাপ যুদ্ধে মারা যায়। এবং তাকেও কৈশোরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যুদ্ধে যেতে হল। কবিতাটি ঈষৎ মডার্ন স্টাইলে ফ্লাশ-ব্যাক করে রচিত। মডার্নদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না; ভূমিকা

হিসেবে উপরের দুটি ছত্র লিখতে বাধ্য হলুম প্রাচীনপন্থী পাঠকদের জন্য।

য়েন য়ুই : চীন।

যুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আহত, তারই ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু।

(সমরাঙ্গনের পুরোভূমিতে তরুণ)

এ তো এক ফোঁটা ছেলেমাত্র—আর এরি মধ্যে যুদ্ধ।
হিম্মতে সে ভরপুর তবু হৃদয় থেকে যেন রক্ত ঝরছে।
তার বয়স তখন মাত্র পাঁচটি হেমন্ত – যখন বাপ যুদ্ধে মারা গেল।
বাড়ি দৈন্যে ঢাকা পড়লো, খাদ্য বস্ত্র খেলনা নেই।

ছেলেটির বয়স ক্রমে চোদ্দ হল, তাকেও যুদ্ধে নিয়ে গেল।
দুঃখ বেদনায় মাতৃহৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।
সমস্ত গ্রীষ্মকাল জুড়ে চললো রক্তপাত আর বহ্নি-দাহনের তাণ্ডব,
ছেলের সংবাদ—সে কোন সুদূরে মরে গেছে না জয়ী হবে ?

তখন—বিদায় নেবার সময় হায় রে নিষ্ঠুর নিয়তি—
ছেলেটি জামাকাপড় পরেছিল বাচ্চাদের মতন তখনো।
তারপর সে বাড়ি ফিরলো—বাপেরই মতো হয়েছে লম্বা
মায়ের চোখের দিকে তাঁকালো, মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়লো।

চোখের জল ঝরে পড়ে মায়ের কাপড় দিলে ভিজিয়ে
অতীত কি কেউ কখনো ভুলতে পারে ?
বাপ যা চেয়েছিল ছেলেকে সেটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হল
আবার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল— একটি কথাও বলে নি সে ॥

॥ ৬ ॥

জাঁদরেল থেকে জোয়ান—তা তিনি জর্মন হন বা ফিনই—বস্তুত যারাই রুশদের বিরুদ্ধে লড়েছে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে কষ্টসহিষ্ণুতা আর দার্ঢ্যে রুশ সৈন্যের জুড়ি নেই। যে অবস্থায় অন্য যে-কোনো দেশের সৈন্য ভেঙে পড়বে —বোধ হয় একমাত্র জাপানী ছাড়া—সেখানে রুশ জোয়ান খানিকক্ষণ ঘাড় চুলকোবে—কোনো কিছু ঠিক ঠিক ঠাহর করতে তার বেশ একটু সময় লাগে—

তারপর এক হাতের তেলোতে আর এক হাত দিয়ে যেন অদৃশ্য ধুলো ঝাড়ছে ঐ 'মুদ্রাটি' এঁকে বলবে 'নিচ্চিভো'। 'ইট ইজ নাথিং', 'ডাজ্‌নট ম্যাটার'-এর দূরের অনুবাদ। 'কুছ পরোয়া নহী' 'কৈ বাত নহী' তবু অনেক কাছের অনুবাদ।

কিন্তু দার্ঢ্য—ঐটেই আসল কথা। কিন্তু ঐটেই কি শেষ কথা?

(কবিতা)

সেমেন গোদসেন্‌কো : সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জন্ম ১৯২২। মে ১৯৪২এর যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে ১৯৫৩ সালে মৃত্যু।

কুড়িটি বচ্ছর আমাদের বয়স হল,
তারপর এই যুদ্ধের বৎসরে,
সর্বপ্রথম আমরা দেখলুম রক্ত, দেখলুম মৃত্যু—
সরল, সোজাসুজি, মানুষ যে রকম স্বপ্ন দেখে অক্লেশে।
আমার স্মৃতিপট থেকে কিছুই মুছে যাবে না ;
যুদ্ধে প্রথম মৃত জনের সঙ্গে দেখা,
বরফের উপর প্রথম রাত্রি যাপন, শীতে জমে গিয়ে
একে অন্যকে পিঠ দিয়ে ঘুমুলুম।
আমি আমার পুত্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব মৈত্রীর দিকে—
তাকে যেন ককখনো যুদ্ধ না করতে হয়—
সে যেন আমাদের মতো কাঁধে কাঁধ ছুঁইয়ে
মিত্রগণের সঙ্গে ধরণীর বুকে পা ফেলে চলে।
সে যেন শেখে : ন্যায্যভাবে
রুটির শেষ টুকরো ভাগাভাগি করতে।
...মস্‌কোর হেমন্ত, স্মলেনস্কের শীত ঋতু,
আমাদের অনেকেই মারা গিয়েছে।
কিন্তু সৈন্যবাহিনীর ঝঞ্ঝা, বসন্তের ঝঞ্ঝা
পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এই নব ফাল্গুন।
বিরাট যুদ্ধ এই করে
মানুষের বুকের পাটা ভরে দেয় সাহস দিয়ে।
মুষ্টি হয় দৃঢ়তর, বাক্য হয় গুরু-ভার।
এবং বহু কিছু তখন হয়ে যায় পরিষ্কার।
...কিন্তু এখনো তুমি বুঝতে পারো নি—
এই সব অভিজ্ঞতা সত্বেও আমি হয়েছি আগের চেয়ে কোমলতর।

অর্থাৎ বাইরের কার্যকলাপে, সংগ্রামে শাস্তিতে রুশজন যতই দার্ঢ্য ধরুক না কেন অন্তরে সে পুষে রাখে কোমলতা, করুণা, মৈত্রী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিশ্বাস ধরি।

আধুনিক রুশ সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। কাজেই বলতে পারবো না, কবি গোদসেন্‌কো রুশ দেশে কতখানি খ্যাতিপ্রতিপত্তি ধরেন। তবে তাঁর আর একটি কবিতা আমার বড় ভালো লেগেছে।

বাইরে যতই বড়ফট্টাই করুক না কেন, হিটলারের অনেক চেলাই যে ভিতরে ভিতরে গড্‌ড্যাম্ কাপুরুষ ছিল সেইটে কবি প্রকাশ করেছেন অতি অল্পতেই। ভল্‌গা-অঞ্চলের স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ তখন (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজন, এমন কি জর্মন জাঁদরেলরাও তখন জেনে গিয়েছেন যে জর্মনির জয়াশা আর নেই। জয়াশা ত্যাগ করে মুণ্ডহীন দেহে যত্রতত্র বিচরণ করাটা তখন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ছিল না। কবিতাটি স্তালিনগ্রাদে লেখা।

স্তালিনগ্রাদ, মে—নভেম্বর, ১৯৪৩

ফেব্রুয়ারি শেষ হল।
নীলাকাশ
দেওয়ালের ফুটোগুলোর ভিতর দিয়ে
যেন চিৎকার করছে।
প্রতি চৌরাস্তায় তীরের চিহ্ন—
জর্মন সৈন্যদের পথনির্দেশ করছে
কোথায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
এ তো ইতিহাস।
এ তো স্মরণের কাহিনী।
সংগ্রামের চিৎকার ভল্‌গা-অঞ্চল থেকে সরে গিয়েছে।
এখন, কিভাবে ইস্কুলগুলো ফের বানাতে হবে
তাই নিয়ে দিবারাত্তির মহকুমা-শহরে গভীর আলোচনা হচ্ছে
বাচ্চারা নিয়ে এল অতিশয় সযত্নে
একখানা বেঞ্চি—কোনো জখম-চোট লাগে নি
যেন কাঁচের তৈরি পলকা মাল,—মাটির নিচের ঘর থেকে।

…সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল
—হঠাৎ-আলোতে-অন্ধপ্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল
এক জর্মন সৈন্য।
ওঃ! কী কাঁপতে কাঁপতে সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।
তার ওভারকোট ছেঁড়া, টেনা টেনা—পা দুটো নড়বড়ে।
ঐ শেষ জর্মন সৈন্য স্তালিনগ্রাদে।
একদা বার্লিনে সে যে হামাগুড়ি দিতো হুবহু সেইভাবে।
(নাৎসি-প্রধানদের সম্মুখে—অনুবাদক)

এভাল্ট্ ফন্ ক্লাইস্ট-শ্মেনৎসিন।
জন্ম ২২ মার্চ ১৮৮৯।
ফাঁসিতে মৃত্যু ১৫ এপ্রিল ১৯৪৫।

জনৈক ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ক্রিশ্চানের পত্রাংশ। ইনি হিটলারের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন :

'ভগবানের দিকে যে জাত যতখানি নিয়োজিত করেছে, সেই দিয়ে তার মূল্য বিচার করতে হয়। একটা অ-ক্রিশ্চান জাতও ক্রিশ্চানদের তুলনায় (যেমন আমরা—অনুবাদক) ভগবানের অনেক নিকটতর হতে পারে। আজকের দিনের ক্রিশ্চানরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে।'

॥ ৭ ॥

কনসানট্রেশন ক্যাম্পের (ক. ক) কেলেঙ্কারি কেচ্ছা এতদিনে হটেনটটরাও শুনে গিয়ে থাকবে কিন্তু তার 'গৌরবময়' যুগে সে তার কীর্তিকলাপ এতই ঢেকে চেপে সারতে পেরেছিল যে সাধারণ নিরীহ জর্মন ক-ক'র ভিতরে কি হয় না-হয় সে সম্বন্ধে নানা রকম গুজব শুনতে পেতো বটে, পাকা খবর পাবার কোনো উপায় ছিল না। তদুপরি সুবুদ্ধিমান জর্মন মাত্রই জানতো, এ-বাবদে অত্যধিক কৌতূহল প্রকাশ করা আপন স্বাস্থ্যের জন্য প্রকৃষ্টতম পন্থা নয়। যেমন ১৯৪৫-এ যখন যুদ্ধ জয়ের কোনো আশাই ছিল না তখন হিটলার-হিমলার আইন জারী করেন যে, কেউ যদি বলে যে এ-যুদ্ধে জর্মনির জয়াশা নেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে ; ঐ সময় এক জর্মন তার বউকে গোপনে বলে, 'যুদ্ধে জয়লাভ করার ভরসাটা বরঞ্চ ভালো।

মৃত্যুহীন ধড় নিয়ে হেথাহোথা ছুটোছুটি করাটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদপেই ভালো নয়।'

গল্পটি সেই সময়কার।

ট্যানিস আর শ্মেল দুই নিরীহ, সদাশান্ত জর্মন। দু'জনাতে দোস্তী। পথিমধ্যে দেখা। ট্যানিস শুধোলে, 'হ্যা রে শ্মেল, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি বল তো!'

'হুঁ::!'

'সে কি রে? কথা কইছিস না কেন? আমি তো শুনলুম, তোকে কনসান-ট্রেশন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে তো নানান কথা শুনি! কি রকম ছিলি সেখানে?'

শ্মেল বললে, 'ফার্স্ট ক্লাস। উত্তম আহারাদি। পরিপাটি ব্যবস্থা। সকালে বেড্-টী। জামবাটি ভর্তি চা। একটি আপেল, দু'খানা খাস্তা বিস্কুট। তারপর আটটা-ন'টায় ব্রেকফাস্ট। ডাবরভরা সর-দুধ, করন্‌ফ্লেক, চাকতি চাকতি কলা, উত্তম মধু। সঙ্গে তো টোস্ট, মাখন, চীজ আছেই। তারপর দু'খানা অ্যাব্‌ড়া আস্ত মাছ ভাজা—ফ্রেশ মাথমে। তারপর দুটো ফুল-সাইজ পোচ, ডিম ভাজা বা মমলেট—যা তোর প্রাণ চায় - বেকন সহ, কিংবা হ্যামও নিতে পারিস। তারপর—'

ট্যানিস সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললে, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ন'সিকে খাঁটি কথা কইছি। ক-ক'র বাইরে বসে তোরা তো নিত্যি নিত্যি খাচ্ছিস lunch-এর নামে লাঞ্ছনা, supper-এর নামে suffer। আমরা খাচ্ছিলুম…' পুনরায় সসিজ, কটলেট, এস্‌পেরেগাস, চিকেন্ রোসটের সবিস্তর বর্ণনা।

ট্যানিস বললে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। হালে ম্যুলারের সঙ্গে দেখা। সেও মাস ছয় ক-ক'তে কাটিয়ে এসেছে। সে তো বললে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনী। সে বললে—'

বাধা দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে শ্মেল বললে, 'বলতে হবে না, সে আমি জানি। তাই তো বাবুকে ফের ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

শ্মেল আর ওখানে ফিরে যেতে চায় না। তাই ইংরিজিতে যাকে বলে সে তার বর্ণনা-টোস্টে প্রেমসে লাগাচ্ছে প্রয়োজনাতিরিক্ত গাদা গাদা মাখন।

কিন্তু শ্মেল-বর্ণিত ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছিল ক-ক'তে তবে ভিন্ন ভাবে। যাকে বলে—

উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম।
কালে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম॥

১৯৪৫-এর মে মাসে যুদ্ধশেষে বিজয়ী রুশ সেনা যেমন যেমন জর্মনির অন্তর্দেশে ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে ক-ক'র বন্দীদের খালাস ক'রে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করলো—কারণ এই বন্দীরা ছিল হিটলারবৈরী, জার্মানের দুশমন।

ঐ সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে চিঠি লিখছে এক চেকোস্লোভাক বন্দী। চিঠিখানি দীর্ঘ। আমি কাটছাঁট করে অনুবাদ দিচ্ছি:

য়ারোস্লাভ য়ান পাউলিক; চেকোস্লোভাকিয়া।
জন্ম ২০ ফেব্রুরারি, ১৮৯৫।
মৃত্যু ১৩ মে ১৯৪৫।

উত্তর জর্মনি, মে ১৯৪৫

ওলাফ ঝড়ের বেগে, যেন হোঁচট খেয়ে ঢুকলো আমার গারদে। রুপোলী চুলে মাথাভরা ওলাফ। খোঁড়া-পা ওলাফ, তার ক্রাচ ছুটিয়ে নিয়ে। তার সেই মধুর হাসি হেসে সে আমায় আলিঙ্গন করলে।

মুক্তি মুক্তি মুক্তি।

স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

আমরা সবাই এখন মুক্ত, স্বাধীন। এমন কি ডাকাত, খুনীরাও মুক্তি পেয়েছে। সবাই মিলে লেগে গেল আশপাশে ডাকাতি লুটতরাজ করতে। আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না। ঐ যে পেটুক ম্যূলার বলে, আমি ওসব ব্যাপারে একটা আস্ত বুদ্ধু। তদুপরি আমি ভুগে ভুগে অত্যন্ত দুর্বল; রোগে কাতর, সর্ব নড়নচড়নে অথর্ব। আর এই হট্টগোলের মাঝখানে এই প্রথম অনুভব করছি সেটা কতখানি। এদিকে আসছে বাসন বাসন ভর্তি আলু, রুটি, চিনি। অমুক (পত্রলেখক ইচ্ছে করেই নামটা ফাঁস করেন নি—অনুবাদক) একটা খাসা, বেড়ে স্যুটকেস লুট করেছে—ভেতরে আছে, শার্ট-কলার-গেঞ্জি-রুমাল এবং চিনি, কোকো, সিগার, মাখন, এক বোতল 'হৃদয়ভেদী' ব্র্যাণ্ডি, হেনেসি ব্র্যাণ্ডির চেয়েও উৎকৃষ্ট। তার সোওয়াদটা আমার জিভে এখনো লেগে আছে।

ওদিকে আঙ্গিনার উপর ডাঁই ডাঁই আলু। তন্দুরের ভিতর গাদা গাদা পাউরুটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তৈরি হয়ে উড়ে উড়ে বাইরে চলে আসছে। পেপে আমাকে একটা ছেঁড়া স্যুয়েটার, একটা ছোরা আর এক জোড়া জুতো

দিয়েছে (ক-ক'র বন্দীরা দুরন্ত শীতে খড়, ন্যাকড়া দিয়ে পা বাঁধতো—অনু-বাদক)। সত্যিকার জুতো! যতই চেয়ে দেখি প্রাণটা কী যে আনন্দে ভরে আসে!

রুশ সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক, মোটরগাড়ি, বাইসিকল আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 'নমস্কার, নমস্কার! কি রকম আছেন?' (জ্‌ড্রাসভুইয়েতে, কাক্ পজিভাইয়িতে?) বলছে তারা। তারা তাদের গাড়ি থেকে আমাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলছে সিগরেট, রুপোলী-মোড়কে প্যাঁচানো ৫০ গ্রামের তামাক, মিষ্টি, মাখন-চর্বি, টিনের যাবতীয় খাদ্য, প্যাঁজ, টুথ-পেস্ট, দুধের গুঁড়ো, সিরাপ।

সকালবেলা খেলুম; আণ্ডাবেকন, জামবাটি ভর্তি পরিজ, সঙ্গে বিস্তর মার্মালেড, রুটি মাখন প্যাঁজ, সত্যিকার কফি, চিনিসহ।

(দ্বিতীয় চিঠি)

হয়েছে। আমার একটি অনবদ্য, পুরো পাকা আমাশা হয়েছে। ফরাসী পাচকরা কালকের দিনে যা রেঁধেছিল (ঐ সময়ে একাধিক ফরাসী পাচকও ক-ক'তে বন্দী ছিল ও দ্রব্যাদি তথা মালমসলা পেয়ে বহুদিন পর মুখরোচক জিনিস তৈরি করছিল—অনুবাদক)—কলিজা-ভাজা তার সঙ্গে সরে-দুধে মাখানো আলুভাতে, তাবত বস্তু প্যাঁজ-ফোঁড়নে, ওঃ সে কী সুন্দর, কী মধুর!

এখন আমাকে কি করতে হচ্ছে, ঐ সবের সামনে দাঁড়িয়ে?

দুধ আর আঙুর রস! ঐ আমার পথ্যি।

দুপুরের খাবার সময় হয়ে এসেছে।

হায় আমার খিদে নেই, রুচি নেই।

আমার প্রিয়া, আমার ছোট্ট বউটি এখন কি করছে, কি ভাবছে?

কাল তাকে পাবার জন্য আমার বুক যা আকুলি-বিকুলি করছিল।

মনে হচ্ছে, এইবারেই নাক-বরাবর ওরই দিকে ছুটে যাবো।

হায়, যুদ্ধশেষের পাঁচদিন পরই হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

॥ ৮ ॥

ভিন্ন ভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে।

জর্মনির দুই নম্বরের মোড়ল হারমান গ্যোরিঙ যখন বন্দী অবস্থায় ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় আসামী তখন জেলের গারদে যে সব মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে নিতেন। এক মোকায় তিনি বলেন,

'তোমরা মার্কিন। ইয়োরোপীয় জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য বুঝবে কি প্রকারে? শোনো:

একজন ইংরেজ—শিকারী (স্পোর্টস্‌ম্যান)

দুজন ইংরেজ—একটা ক্লাব স্থাপনা,

তিনজন ইংরেজ—হার ম্যাজেস্‌টি কুইনের জন্য একটা কলোনি জয়।' তারপর হেসে বলতেন,

'একজন ইতালীয়—গাইয়ে,

দুজন ইতালীয়—ডুয়েট গাইয়ে,

তিনজন ইতালীয়—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন!' হাঃ হাঃ হাঃ।

'এবারে শুনুন,

একজন জর্মন—পণ্ডিত,

দুজন জর্মন—একটি নূতন পলিটিকাল পার্টি স্থাপনা (এ-বাবদে অবশ্য আমরা, বাঙালীরা এখন হেসে খেলে জর্মনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি)।

তিনজন জর্মন? হাঃ হাঃ—বিশ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা!' তারপর ফিসফিস করে বলতেন, 'আর জাপানীরা?

একজন জাপানী—রহস্যময়!

দুজন জাপানী—সেও রহস্যময়!

তিনজন জাপানী?' এখানে এসে গোয়েরিঙ 'রহস্য'পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকাতেন, তারপর বলতেন,

'তিনজন জাপানী—সেও রহস্যময়।' বলেই ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য করতেন —সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাল্লুকী থাবা দুটো দিয়ে তাঁর বিশাল উরুতে থাবড়াতেন—যে উরুর একটা দিয়ে অক্লেশে যে-কোনো বঙ্গসন্তানের দুটো কোমর হোতে পারে।

আমার এবং আমার বন্ধুজনেরও ঐ ধারণা। যেন অনুভূতির কোনো বালাই-ই জাপানীদের আদৌ নেই। কিন্তু পরের পৃষ্ঠায় চিঠিটি পড়ুন:

গরু কিকিয়ু

জন্ম : ১৯১০

মৃত্যু : ফিলিপিনের যুদ্ধে, ২০ আগস্ট, ১৯৫৪

স্ত্রী য়াকোকে লেখা :

মানচুরিয়া

বেশীদিন তো হয়নি তোমার সঙ্গে ছিলুম অথচ ইতিমধ্যেই তোমার সঙ্গ পাবার জন্য আবার আমার কী দুরন্ত আকুলি-বিকুলি। আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি অল্পকালই, তবু তোমার সে-সময়কার চলাফেরা ওঠাবসার কত না ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আর সব চেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠো তুমি, যেখানে তুমি কোমল, মৃদু। আমাদের উভয়ের শিশুসন্তানটি জন্ম দেবার পর থেকে তুমি আরো সুন্দর হয়ে উঠেছো। তোমার সৌন্দর্যে যেটুকু শুষ্কতা ছিল সেটা রসঘন হয়ে গিয়েছে, তুমি পেয়ে গেলে এক নবীন পবিত্র সৌন্দর্য—মাতৃত্বের সৌন্দর্য। আমার স্মরণে আছে সেদিনকার ছবি, যেদিন আমি টোকিও ছেড়ে চলে এলুম—সামান্য একটু প্রসাধন করে তুমি তখন বসে আছো খাটের উপর।

তখন কী সরল হাসিটি তোমার! অথচ যখন তুমি আমার কল্যাণ কামনা করে বিদায় নিতে এলে আমাদের আঙ্গিনায়, তখন, এই বুঝি, এই বুঝি তুমি কান্নায় ভেঙে পড়বে। নিতান্ত সেই নীরবতা ভাঙবার জন্য আমি তোমাকে বললুম, 'সাবধানে থেকো।' তারপর আমি ইজুমি আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লুম। আমি তখন মনে মনে আমাদের বাড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার ভাবনাচিন্তা তখন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করছিলুম, আমার মাতৃভূমির সব-কিছু যেন সেই সময়েই অন্তর্হিত হল। আমার এই অনুভূতিটি তোমার পক্ষে বোঝাটা হয়তো কঠিন হবে কিন্তু তুমি আমার হয়ে একবার আমার এই অবস্থাটি কল্পনায় বুঝতে চেষ্টা করো। আকার মনে হয়েছিল, ঐ বিদায় মুহূর্তে যেন আমার দেহ উর্ধ্বপানে ধেয়ে গিয়ে অনন্তে চলে গেল।

কিন্তু এখন? আজ রবিবারের এই সকালে আমার সর্ব দেহমন ধেয়ে চলেছে তোমা পানে।

বুঝিয়ে বলি; আমার হৃদয় কামনা করছে, তোমার অক্ষিপল্লব মৃদু মৃদু স্পর্শ করতে, তোমাকে শান্ত আলিঙ্গনে ভরে নিতে। তুমি যখন স্মিতহাস্য করো তখন তুমি বড় সুন্দর এবং সবচেয়ে সুন্দর তোমার দন্তপঙ্‌ক্তি। হ্যাঁ, তোমার বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র নয়, কিন্তু মানতেই হবে, সে বর্ণ পরিপক্ক গোধূম বর্ণ—তোমার চর্ম

সম্পূর্ণ অকুঞ্চিত—কোমল। তোমার বক্ষ পূর্ণস্তন—মাতৃত্বের স্ফীতবক্ষ। এবং বর্ণ সেখানে প্রায় স্বচ্ছ শুভ্র। আমি তোমার বুকের উপর শিশুটির মতো ঘুমিয়ে পড়তে চাই। বহুবার কামনা করেছি, তোমার সুডৌল গোল বাহুতে মাথা রেখে আরাম লাভ করতে। তোমার সুন্দর সুবিন্যস্ত ওষ্ঠাধরে চুম্বন দিতে দিতে আমি মৃদু হাস্য করি আর তুমি প্রত্যুত্তরে মোহনীয়া মৃদুহাস্য দিয়ে আমাকে জাদু করছো। এরকম ধারা যত আমার কামনা এগিয়ে যায় ততই তোমাকে কাছে পাবার বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে। না—এরকম ধরনে আমি আর লিখতে পারবো না। এ লাইনটি পড়ে তুমি হয়তো হেসে উঠবে, কারণ এটা আমার স্বভাবের বিপরীত। কিংবা হয়তো তুমি আশ্চর্য হচ্ছো, তোমার কাছে আমার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে—নয় কি? কিংবা হয়তো ভাবছো, আমি শিশু—'বুড়ো খোকা' এবং তাই আমাকে সোহাগ করতে চাইছো—না?

এ-সব নির্মল স্মৃতি আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে ওঠে আর সে-সময়কার কথা বার বার মনে পড়ে।

তোমার পূর্ণ বক্ষ আমার চোখের সামনে মায়াময় কায়া ধরে ফুটে ওঠে। আমার ইচ্ছে যায় সে নিটোল বক্ষে হাত বুলোই—ধীরে অতি ধীরে—তোমার মধুর নাসিকা, তোমার মুখ চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিই। তুমি তখন মধুর হাসি হেসে উঠবে, আমাকে আদর সোহাগ করবে। বলো দেখি, অন্য কোথা; কোথায় আছে এই বিশ্বভুবনে, এরকম হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য?

সুস্থ শরীর-মনে থেকো। তোমার চিত্তটিকে সৌন্দর্যময়, প্রেমময় করে রেখো। এরকম যে-মা তার কাছে আমি ফিরে আসছি শিগগিরই।

আমাকে আলিঙ্গন করো, তোমার পূর্ণ বক্ষ, উষ্ণ স্তন দিয়ে।

একটুখানি ধৈর্য ধরে থাকো—বাস, ঐটুকু শুধু।

হায়! বহু যুগ পূর্বে শ্রীরাধার সখী তাঁকে বলেছিলেন, 'ধৈর্যং কুরু, ধৈর্যং কুরু গচ্ছং মম মথুরাবে' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসেননি।

পূর্বে নিবেদন করেছি জাপানীরা রহস্যময়। কিন্তু এ চিঠি তো আদৌ রহস্যময় নয়। এ তো সেই রামগিরির বিরহী যক্ষ, মালয়ের কবি আমির হামজার মতো উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে!

আর এ-পত্রে প্রেম ও কামের কী অনবদ্য সমন্বয়।

•

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে ফ্রান্সে সৈন্য অবতরণ করে জর্মনি জয়ের জন্য ইংলণ্ড

তার তাবৎ কমনওয়েলথের এবং অন্যান্য সৈন্য সেখানে জমায়েৎ করেছিল। তারা এসেছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আরো মেলা দেশ, এবং প্রধানত, সবচেয়ে বেশী আমেরিকা থেকে।

ঐ সময়ে জনৈক ক্যানাডাবাসীর পত্র—তার বউকে।

ডনাল্ড্ আলবেরট ডানকান, কানাডা।

১৯৪৪ সালে, জুলাই মাসের শেষের দিকে, ফ্রান্সে সৈন্যাবতরণের সময় নিহত।

ইংল্যাণ্ড ১৪ মে, ১৯৪৪

...ইংল্যাণ্ড এখন আর ইংরেজের (জমিদারী) নয়। এ-দেশটা এখন সম্পূর্ণ দখল করেছে মার্কিনরা। একই সঙ্গে চার-চারটে বেস্ বল খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে হাইড পার্কে। ইংরেজরা অবশ্যই অনেকখানি সহিষ্ণু, কিন্তু একথা নিশ্চিত মনে বলা যেতে পারে, তারা মার্কিনদের সঙ্গে গভীর পীরিতি-সায়রে নিমজ্জমান হয়নি! মার্কিনদের কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি! তদুপরি কেড়ে নিয়েছে ছুঁড়ীদের, বাসা বেঁধেছে সেরা সেরা হোটেলে। (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংরেজও কড়ির তাগদে প্যারিসে তাই করেছিল। এই কলকাতাতেই আমরা মার্কিনদের সে রোওয়াব দেখেছি!) কিন্তু ইংরেজ করবে কি? ফ্রান্সে নেমে জর্মনিকে পরাজিত করতে হলে যে ইয়াংকিদের প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ড, ২৪ জুন, ১৯৪৪

...এসব তো হল, ওলো, প্রাচীন প্রিয়া (ওল্ড গারল)! বাচ্চাদের আমার হয়ে আদর দিয়ে বলো, আমি ইউরোপ থেকে ওদের জন্য সুন্দর টুকিটাকি নিয়ে ফিরে আসবো—যখন নিষ্প্রদীপ বিশ্ব আবার আলোকোজ্জ্বল হবে।

ফেরেনি। এক মাস পরে রণাঙ্গনে তার মৃত্যু।

॥ ৯ ॥

আডাম ফন্ ট্রটৎসু (Zu) জল্ৎসু, জর্মন।

জন্ম : ১৯০৯

মৃত্যু : ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪

হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বার্লিনের প্লোৎসেন্জে কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

ইহলোক থেকে মাতার কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ-পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে ২৬ আগস্ট, ১৯৪৪

সবচেয়ে আদরের মা!

তবু ভালো, তোমাকে সামান্য কয়টি ক্ষুদ্র ছত্র লেখার সুযোগ শেষটায় আমি পেয়েছি—তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; তুমি সব সময়ই আমার কাছে ছিলে, এবং এখনও আছ—আরও নিবিড় হয়ে কাছে আছ। তুমি আমি যে অনন্ত অনন্তকালীন যোগসূত্রে বাঁধা, আমি সেটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জোর আঁকড়ে ধরে আছি। এ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঈশ্বর আমাকে তাঁর দাক্ষিণ্য দিয়ে ভরে রেখেছেন এবং সব—প্রায় সব কিছুর জন্য—আমাকে আনন্দময় সরল-স্বচ্ছ শক্তি দিয়েছেন। এবং তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এ-জীবনে আমি কিভাবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে কৃতকার্য হতে সক্ষম হই নি। কিন্তু এ-সবের চেয়েও সবচেয়ে বড় কথা: এই যে তোমাকে কঠিন শোক পেতে হবে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, এবং বৃদ্ধ বয়সে তুমি যে আমার উপর নির্ভর করতে, সেই নির্ভর থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

তোমায় আমায় আবার মিলন হওয়ার পূর্বে একটি শেষ চুম্বন—কৃতজ্ঞতা আর স্নেহে ভরা।

তোমার পুত্র তোমাকে যে বড্ড ভালোবাসে।

—আডাম

"তোমার পূত আত্মায়, হে প্রভু আমি নিজেকে সমর্পণ করি..."

ইহলোক থেকে পত্নীর কাছে বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্বে লেখা শেষ পত্র।

বার্লিন-প্লোৎসেনজে, ২৬ আগস্ট ১৯৪৪

প্রিয়া কণিকা ক্লারিটা,

দুঃখের বিষয়, সম্ভবত এই আমার শেষ চিঠি। আশা করি ইতিপূর্বে লেখা আমার দীর্ঘতর পত্রগুলো তোমার কাছে পৌঁচেছে।

আর কিছু বলার পূর্বে এবং সর্বোপরি আমি যা বলতে চাই: নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে তোমাকে যে গভীর শোক দিতে হল, তার জন্য আমি মাফ চাইছি।

আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, আমি চিন্ময়রূপে পূর্বেরই মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, এবং দৃঢ়তম প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করছি।

আকাশ আজ নির্মল, ঘন নীল (পীকক্ ব্লু) এবং গাছে গাছে মর্মরধ্বনি। আমাদের আদর-সোহাগের মিষ্টি মিষ্টি কথা বাচ্চা দুটোকে শিখিয়ো, তারা যেন

পরমেশ্বরের এ-প্রতীকগুলো বুঝতে পারে এবং তাদেরও গভীরে যে-প্রতীকগুলো আছে, সেগুলোও চিনতে শেখে।—কৃতজ্ঞতা সহ, কিন্তু গ্রহণ করার সময় যেন থাকে সক্রিয় বীর্যবান সাহস।

আমি তোমাকে বড় ভালোবাসি।

তার পরও অনেক অনেক কিছু বলার রইল। কিন্তু তার জন্য আর সময় নেই।

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন (আমাদের 'ঈশ্বর রক্ষতু'—অনুবাদক) আমি জানি, তুমি কক্ষনো পরাজয় স্বীকার করবে না। আমি জানি, তুমি জীবন-সংগ্রামে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে, এবং যদিও সে-সংগ্রামে তোমার মনে হয় তুমি একা, তবু জেনো, আমার অদেহী স্বরূপ অহরহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি প্রার্থনা করছি, তুমি যেন শক্তিলাভ করো, তুমিও আমার জন্য সেই প্রার্থনা করো। এই শেষের ক'দিনে পুরগাতোরিয়ো এবং মেরি স্টুয়ার্ট পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল।…এ-ছাড়া পড়বার মতো এ ধরনের বিশেষ কিছু আমার ছিল না—কিন্তু মনের ভিতর অনেক-কিছু উল্টে-পাল্টে দেখেছি এবং শান্তচিত্তে সেগুলো পরিষ্কার করে বুঝে নিয়েছি। তাই বলছি, আমার জন্য অত্যধিক শোক করো না—কারণ তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, সব কিছুই অত্যন্ত সরল, পরিষ্কার, যদিও সেগুলো গভীর বেদনাদায়ক।

আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে, এই যা সব ঘটলো, তার ফলে তোমাদের জীবনযাত্রায় কোনো পরিবর্তন হল কি না? তুমি কি রাইনবেক্ যাবে, না যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে? অবশ্যই তাঁরা সকলে তোমাকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন—আমার প্রিয়া, ছোট্ট বউটি আমার! আমার পূর্বের পত্রগুলোতে তোমাকে বলেছিলুম আমার যে বহু বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে—এটা আমার অন্তরতম কামনা। তুমি ওদের সকলের সঙ্গে সুপরিচিত; তাই আমার সাহায্য ছাড়াও তুমি আমার শুভেচ্ছা ঠিকমতো তাঁদের জানাতে পারবে।

আমি সর্ব হৃদয় দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করছি, অনুভব করছি তুমি আমার সঙ্গে আছ।

ভগবান তোমাকে ও বাচ্চাদের আশীর্বাদ করুন।

তোমার প্রতি অবিচল প্রেমনিষ্ঠ,

—আডাম

এ চিঠি দুটি অন্যান্য চিঠির তুলনায় অসাধারণ বলে নাও মনে হতে পারে।

কিন্তু আডাম ছিলেন অতিশয় অসাধারণ পুরুষ। অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন তিনি ছেলেবেলা থেকেই এবং হিটলার তাঁর অভিযান আরম্ভ করার সময় থেকেই তিনি বুঝে যান, এই সব নীতি-বিবর্জিত অখ্রীষ্টান আন্দোলন জর্মনি তথা তাবৎ ইয়োরোপকে মহতী বিনষ্টির পথে নিয়ে যাবে। আপন দেশে লেখাপড়া করার পর তিনি অক্সফোর্ডে রোড্‌স্ স্কলাররূপে বেলিয়েল কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। খোলাদিল সাদা মনের মানুষ ছিলেন বলে সে-সময় তিনি একাধিক ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। যুদ্ধের পর যখন তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা হচ্ছিল তখন তাঁর অক্সফোর্ডের বন্ধু শ্রীযুত হুমায়ুন কবীরকেও মাল-মসলা দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হয়।

হিটলারকে সরাবার জন্য গ্রাফ ফন্ স্টাউনফেনবের্গ তাঁর পায়ের কাছে, টেবিলের তলায়, পোর্টফোলিওর ভিতর একটি মারাত্মক টাইম বম্ রেখে বাইরে চলে যান। কিন্তু কিস্মৎ হিটলারকে বাঁচিয়ে দিল। যদ্যপি সেই কনফারেন্স-রুমের একাধিক লোক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন, হিটলারের বিশেষ কিছুই হল না।

ক্রোধোন্মত্ত হিটলার এই চক্রান্তকারীদের উপর দাদ নেবার জন্য দোষী নির্দোষী প্রায় পাঁচ হাজার জনকে ফাঁসি দেন। আডাম ছিলেন স্টাউফেন-বের্গের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁকে এই কর্মে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরও ফাঁসি হয়।

অসাধারণ দৃঢ়-চরিত্র ধরতেন বলেই আডাম তাঁর মা বউকে শেষ চিঠি লেখার সময় সজ্ঞানে যতখানি পারেন অনুভূতি চেপে রেখেছিলেন—পাছে ওঁদের মনে আরো না লাগে। অথচ তিনি লিখতে পারতেন বড় সুন্দর মরমিয়া জর্মন।

ঐ সময়ের অল্প পূর্বে একদল ছাত্র ম্যুনিকে প্রথমত গোপনে, পরে অর্ধ-প্রকাশ্যে হিটলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। তারই একজন ধরা পড়ে ফাঁসি যাওয়ার পূর্বে তার মাকে লেখে—

'মা মণি,

তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে, আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি যখন আদ্যন্ত চিন্তা করে দেখি তখন মনে হয় আমার সমস্ত জীবন একই রাস্তা ধরে চলেছিল যার অন্তে আছেন—স্বয়ং ভগবান। এখন কিন্তু শোক করো না, যে, রাস্তার শেষাংশটুকু আমাকে এক লম্ফে পেরুতে হল। শিগ্‌গিরই আমি এ জীবনে তোমার যত না কাছে ছিলুম, তার চেয়ে অনেক বেশী কাছে চলে আসব।

ইতিমধ্যে তোমাদের সকলের জন্য একটি রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করছি!'

মৃত্যুর প্রাক্কালেও এ-রকম চিঠি! এতখানি রসবোধ! ফাঁসিতে 'লম্ফ' দিতে হয় বই কি, আর স্বর্গপুরীতে মায়ের জন্য রাজসিক অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবে সে।

॥ ১০ ॥

শিশুকন্যাকে লেখা মায়ের চিঠি।

রোজে (গোলাপ) শ্লোএজিন্‌গারের জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। নাৎসীবিরোধী আন্দোলন চালানোর সময় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ তিনি বন্দী হন এবং ৫ই আগস্ট ১৯৪৩-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর স্বামী বোডো শ্লোএজিন্‌গার ছিলেন জর্মন মিলিটারি পুলিসে দোভাষী। তাঁর স্ত্রীর প্রাণদণ্ড হয়েছে, এ খবর পেয়ে তিনি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

"আমার সোহাগের ক্ষুদে, দড়[1] মারিয়াননে

অনুমান করতে পারছি নে তুমি কবে এ চিঠি পড়তে পারবে। তাই এটি তোমার ঠাকুরমা বা বাবার কাছে রেখে যাচ্ছি, যাতে করে তুমি বড় হয়ে এটি পড়তে পারো। এখন তোমার কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, কারণ খুব সম্ভব আমরা একে-অন্যকে আর দেখতে পাবো না।

তা সে যাই হোক না কেন, তুমি যেন স্বাস্থ্যবতী, সুখী এবং সবলা হয়ে বড় হয়ে ওঠো। আমি আশা করছি, পৃথিবী তার যে-সব সুন্দরতম জিনিস দিতে পারে সেগুলো তুমি উপভোগ করবে—আমি যে রকম উপভোগ করেছি—এবং তোমাকে যেন সে-সব দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়ে না যেতে হয়—যেগুলোর ভিতর দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা: তোমাকে কর্মদক্ষ ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। এ দু'টি থাকলে বাকী সব আনন্দ-সুখ আপনার থেকেই আসে।

১ মূলে আছে ক্লাইন গ্রোস (ইংরিজীতে হবে লিট্‌ল্ বিগ) স্পষ্টত পরস্পর-বিরোধী। তবে জর্মনরা আদর করার সময় অনেক ক্ষেত্রে এরকমধারা বলে। কিংবা হয়তো মেয়েটি বয়সে শিশু হলেও গঠনে দার্ঢ্য ধরতো, যার থেকে মা অনুমান করে যে, কালে সে তন্বঙ্গী না হয়ে পূর্ণাঙ্গী হবে।

তোমার স্নেহ-ভালোবাসা মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দিয়ো না। এ সংসারে তোমার বাবার মতো কম লোকই আছে যারা তাঁর মতো সৎ এবং প্রেমে নির্মল। তাই সমস্ত প্রেম উজাড় করে দেবার আগে একটু ধৈর্য ধরতে শেখো। তা হলে প্রেমে ধোঁকা খাওয়ার যন্ত্রণা থেকে তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু এমন একজন যেদিন আসবে, যে তোমাকে এতই গভীর ভালোবাসে যে, তোমার সর্ব যন্ত্রণা সেও সঙ্গে সঙ্গে সইবে—এবং যার জন্য তুমিও সইতে প্রস্তুত—এ-রকম পুরুষকে তুমি তোমার প্রেম নিবেদন করতে পারো। আমি প্রত্যয় দিচ্ছি, তাকে পেয়ে তার সঙ্গে যে আনন্দ তৃপ্তি তুমি উপভোগ করবে তার থেকে তুমি বুঝতে পারবে, তার প্রতীক্ষায় তুমি যে ধৈর্য ধরেছিলে, সেটা নিষ্ফল হয়নি।

তোমার জন্যে আমি বহু বৎসরের আনন্দ প্রার্থনা করছি ; আমার কপাল মন্দ, আমি পেয়েছি অল্প কয়েক বৎসরই। এবং তোমাকে সন্তানের জন্ম দিয়ে মা হতে হবে : যখন তোমার নবজাত শিশুটিকে তোমার বুকের ওপর রাখবে তখন হয়ত আমার কথা তোমার স্মরণে আসবে। তোমাকে যখন আমি প্রথম বারের মতো দু' বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম সেটি আমার জীবনের চরম মুহূর্ত—তুমি তখন মাত্র একটি গোলাপী পুঁটুলি।

তার পরে স্মরণে আন, আমরা রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে জীবনের কত না গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি—আমি চেষ্টা করছিলুম তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে। আবার স্মরণে আন, আমরা যে সমুদ্রপারে তিন হপ্তা কাটিয়েছিলুম—তিন মধুর সপ্তাহ। সেখানকার সূর্যোদয় এবং তোমাতে আমাতে খালি পায়ে বেলাভূমি বেয়ে বেয়ে বানসিন থেকে উকেরিৎস্ গিয়েছিলুম ; তারপর জলে রবারের দোলনাতে তোমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলুম ; তারপর আমরা দুজনাতে এক সঙ্গে বই পড়তুম। বাছা, তোমাতে আমাতে কতই না সৌন্দর্য উপভোগ করেছি এবং এগুলো তোমাকে নতুন করে উপভোগ করতে হবে, এবং তারও বাড়া অনেক কিছু বেশী।

হ্যাঁ, তোমাকে আরও একটি কথা বলতে চাই, মৃত্যুবরণ করার সময় আমাদের মনে বড় বেদনা লাগে যে আমাদের প্রিয়জনকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি ; আমরা যদি দীর্ঘতর দিন বেঁচে থাকতে পারতুম তা হলে আমরা সেটা স্মরণে এনে নিজেদের অনেক বেশী সংযত করতে পারতুম। হয়ত আমার এ কথাটি তুমি স্মরণে রাখবে তাতে করে তোমার জীবন—এবং সর্বশেষে তোমার মৃত্যু—তুমি নিজের জন্যে এবং অন্যদের জন্যেও সহজতর করে তুলতে পারবে।

এবং যতবার পার সুখী হও আনন্দে থাক—প্রত্যেকটি দিন মহামূল্যবান!

যে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা দুঃখে কাটাই তার জন্য হাহাকার!

আমার স্নেহ তোমার সমস্ত জীবনভর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—আমি তোমাকে চুমু খাচ্ছি—এবং যারা সব্বাই তোমাকে ভালোবাসে। বিদায়! বিদায়!! ও আমার সোহাগের ধন—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমারই কথা আমার গভীর-তম স্নেহের সঙ্গে হৃদয়ে রেখে,

তোমার মা

॥ ১১ ॥

য়োরমা হাইসকানেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড

জন্ম: ৩১ জুলাই ১৯১৪

মৃত্যু: জুন ১৯৪১

সোভিয়েৎ-ফিন্ সংগ্রামে সীমান্তে নিহত সৈনিকের রোজ-নামচা থেকে উদ্‌ধৃত।

ডিসেম্বর ১৯৩৯ (ফিনিশ সীমান্তে) যুদ্ধের প্রথম দিনই আমি সুভিলাহতির গির্জা-চুড়োয় উঠলুম; সেখান থেকে আবার পর্যবেক্ষণ করবো সীমান্তে যেখানে সংগ্রাম চলচে…এখান থেকে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির শব্দ; অকস্মাৎ একটা চিন্তা আমাকে যেন ঝাঁকুনি দিল: ঐ যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদেরই একজন নিহত হতে পারে। তখন লক্ষ্য করলুম গির্জা-চুড়োতে আমি একা নই।

প্রতিরক্ষার জন্য রাখা একটা বালুর বস্তায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নাবালক বাচ্চা—বয়স এই এগারো-বারো। পরনে চামড়ার কোট, হাতে একটা দূরবীন। ঐটে দিয়ে সে দক্ষিণ পানে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল—সেখান থেকে যুদ্ধের ক্ষীণ কোলাহল-ধ্বনি আসছিল। আমি তো অবাক—এ রকম অকুস্থলে তো ওর মতো ছোট্ট একটা বাচ্চার থাকার কথা নয়। বনের গাছ-গুলো ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছে এই গির্জা-চুড়ো; যে-কোনো মুহূর্তে শত্রুপক্ষের কামানের গোলা এটাকে হানতে পারে।

'এখানে তুমি কি করচো?'

বড় সুন্দর তাজা গলায় উত্তর এল: 'কেন? আমাকে তো জঙ্গী হাওয়াই জাহাজের গতিবিধি পাহারা দেবার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে।'

'তোমার বাড়ি কোথায় ?'

শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'হাউটাভারা-য়।'

আমি তাড়াতাড়ি শুধোলুম, 'তোমার বাপ মা··· ?'

অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, যেন এ নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না —'বাড়িতে বই কি !'

বাচ্চাটি আমার দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকালে—দূরবীন দিয়ে তদারকী কর্ম সে তখনকার মতো ক্ষান্ত দিয়েছে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি আর কোনো প্রশ্ন শুধোতে পারছি নে। বাচ্চাটি কি জানে তার বসতগ্রাম হাউটাভারা শব্দার্থে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ? ঐ তো সীমান্তের শেষ গ্রাম। এটাতে কোনো সেনা-সেনানী নেই। কিন্তু ওরই উপর সকাল থেকে শত্রুপক্ষ সব কামান এক জোট করে গোলা হেনেছে। এ-গ্রাম তো সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেখানেই তো তার বাড়ি—সে বাড়ি কি আর আছে ? তার বাপ-মা পরিবারের আর পাঁচজন ? তাদের সঙ্গে এর কি আর কখনো দেখা হবে ?

কিন্তু সে কি জানে এ সব ? না, না, আমি এ-প্রশ্ন ওকে শুধোতে পারবো না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের আগুন আরো জোরে জলে উঠেছে।

'তুই কি এখানেই থাকবি না অন্য কোথাও যেতে চাস ?'

'কেন ? এখানেই তো আমার থাকবার কথা—নয় কি ? তোর আমাকে দিয়ে আর কোনো দরকার নেই ?' (অর্থাৎ সে চলে যেতে চায়নি—অনুবাদক)

বহুকাল ধরে তার এই শেষ কথাগুলো আমার কানে বেজে যেতে লাগলো— বহুকাল ধরে, তার কাছ থেকে, সেখানে থেকে বিদায় নেবার পরও।

জানেন শুধু ভগবান, এই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন শিশু যুদ্ধের তাড়নায় কোথায় ঘুরে মরেছিল—ফিনল্যাণ্ডের ডিসেম্বরের দারুণ শীতে—প্রভুই জানেন, সে অন্তত আশ্রয়টুকু পেয়েছিল কি না।

জেল থেকে বোনেদের প্রতি লেখা বোনের শেষ পত্র—কবিতায়।

···আটদিন ধরে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ

আমার এ অবস্থা কি কখনো ভুলতে পারবো ?

শেকলগুলো আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আমাকে নির্জন কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছে। হে প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করছো কেন ?…(খ্রীষ্ট নাকি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এই হাহাকার করেছিলেন —অনুবাদক)

আমার বোনেরা—মিমি, মিনা—তোমরা কি এখনো তোমাদের বোন লোরেনস্‌কে স্মরণে আনো,

সে তোমাদের ভালোবাসে।

দুঃখবেদনা আমাদের সম্মিলিত করে একই পথে চালাবে,

এই তো ছিল আমাদের শপথ এবং একই অনুভূতি আমরা ভাগাভাগি করে নেব।

আমাকে তারা শিকল দিয়ে বেঁধেছে, কিন্তু আমার হৃদয়টাকে নয়।

আমি আশা রাখি, আমি বিশ্বাস রাখি, আলোকে আলোকে আলোকিত সূর্যরশ্মিময় ভবিষ্যৎ।

কাল যদি আমার মৃত্যু হয় !

তবে কীই বা হবে ?

শুধু আমি মুক্তি পাবো আমার পায়ের শৃঙ্খল থেকে !

এই মেয়েটির নাম লোরেনস্—বোনেদের নাম মিমি মিনা। কিন্তু পারিবারিক নাম চিঠিতে নেই বলে এঁদের কাউকেই সনাক্ত করা যায়নি। যেটুকু জানা গিয়েছে তা এই :

ফ্রান্স জয় করার পর জর্মনি তার বৃহদংশে আপন রাজত্ব চালায়। তখন সে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড সংগ্রাম চলে মাদমোয়াজেল লোরেনস্ তারই একজন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য মৃত্যু আসন্ন জেনে এই তার শেষ পত্র।

॥ ১২ ॥

রণদামামা বাজিয়ে সগর্বে যখন ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন তখন তিনি বার্লিনের প্রধানতম রাজপথের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হলেন। তাঁর মনে পড়ল ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সূচনার কথা। তখন কী

উৎসাহ-উত্তেজনার সঙ্গে কাইজারের সেই 'যুদ্ধং দেহি' আহ্বানে জর্মনির জনগণ সাড়া দিয়েছিল।[১] তারা যে এবারে—তাঁর এবং গ্যোবেল্‌স-এর কর্ণপটহবিদারক শত প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও—এরকম জড়ভরতের মতো চোখেমুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য মেখে পোলাণ্ডগামী যুযুধানদের দিকে শুধুমাত্র তাকিয়েই থাকবে—ঘন ঘন সাধু-বাদ, করতালি, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম-সঙ্গীত, প্রজ্বলিত মশালসহ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে 'কদম কদম বাড়িয়ে' তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানানো, সৈন্যদের ধরে ধরে পথমধ্যে তরুণী যুবতীদের যদৃচ্ছা চুম্বনালিঙ্গন—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সব ঝুট সব ঝুট—; হিটলার ও ইয়ার গ্যোবেল্‌স তো রীতিমতো মুষড়ে পড়েছিলেন।

আসলে জনগণ সংগ্রাম চায়নি; তারা চেয়েছিল শান্তি। বিশেষ করে হিটলার তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি-প্রসাদাৎ, বছর তিনেক পূর্বে দেশকে যে আর্থিক সাচ্ছল্য এনে দিয়েছিলেন তারা চেয়েছিল নির্বিঘ্নে শান্তিতে সেটি দীর্ঘকালব্যাপী উপভোগ করতে। আর ভবিষ্যতে সুখভোগের জন্য হিটলার যে সব গণ্ডায় গণ্ডায় অঙ্গীকার করে বসে আছেন, সেগুলোর তো কথাই নেই। তার অন্যতম: বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি জর্মনির চাষী মজুর প্রত্যেক পরিবারকে এক-একখানি সরেস 'ফক্সভাগেন' (Volkswagen = folk-car = জনগণরথ) দেবেন—বস্তুত তখন থেকেই অনেকে আগাম কিস্তি-আমানত দিতে শুরু করেছে। মোটরগাড়ি তা হলে শিকেয় উঠলো!

বললে প্রত্যয় যাবে না, সুশীল পাঠক, এই যে জর্মনির প্রাশান অফিসার-গোষ্ঠীকে বহু বহু যুগ ধরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রণবিশারদ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তাদেরও অধিকাংশই এ সংগ্রাম চাননি। এঁদের একাধিক জন সংগ্রাম আসন্ন জেনে, এরই এক বৎসর পূর্বে, হিটলারের সম্মুখে তীব্র প্রতিবাদ তুলে নিরাশ হয়ে আপন আপন পদে ইস্তফা দেন। আর অর্থনৈতিকদের তো কথাই নেই। শাখ্‌ট্‌-এর মতো 'অর্থনৈতিক জাদুকর'ও যখন দেখলেন হিটলার তাঁর সাবধান-বাণী শুনলেন না তখন তিনিও অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল হিটলার ক্ষুদ্র রাজ্য পোলাণ্ডকে আক্রমণ করে যদি আশা করেন যুদ্ধ সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে তবে সেটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক দুরাশা। সেই খণ্ড-যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত

১ হিটলার স্বয়ং সেই জনতায় ছিলেন। অধুনা এই মহানগরীতে প্রদর্শিত একটি 'হিটলার-ছবি'তে সেটি দেখানো হয়েছে। আসলে যে ফোটো থেকে এ অংশ তোলা হয়েছে সেটি পাঠক পাবেন, ফটোগ্রাফার হফমান রচিত 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড' পুস্তকে।

হবেই হবে। এবং সেই সুদূরপ্রসারী দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বসংগ্রাম চালাবার মতো কাঁচা মাল-মেটিরিয়েল জর্মনির নেই। (এবং শেষটায় প্রধানত এই কারণেই হিটলারের পতন হয়, এবং তিনি ক্রোধোন্মত্ত স্যামসনের ন্যায় সমস্ত 'গাজা'— এস্থলে তাবৎ ইয়োরোপ—তাঁর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে রসাতলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।)

শুনেছি, যেখানে হোক, যে-কোনো প্রকারেই হোক একটা লড়াই বাধিয়ে দেবার জন্য হামেহাল তেরিয়া হয়ে থাকে একটি গোদা দল—অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণকারী বিরাট বিরাট কারখানার মালিকগণ। শুনেছি এরা নাকি গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে অনুন্নত দেশে সিভিল উয়োর লাগিয়ে দিয়ে পরে হরষিত হৃদয়ে উভয় পক্ষকেই বন্দুক কামান বোমা বিক্রি করে খরচার হাজার গুণ মুনাফা তুলে নেয়। (শকুনির যদি এ প্রকারের 'সুবুদ্ধি' থাকতো তবে সে নিশ্চয়ই গো-কুলে মড়ক লাগাত।)

এ স্থলে কিন্তু শুনেছি, সমরাস্ত্র-নির্মাণকারী জর্মনরাও হিটলারের যুদ্ধ কামনা করেননি। এঁদের অধিকাংশই জানতেন, এ যুদ্ধে জয়াশা নেই। ফলে মুনাফা তো যাবেই যাবে, তদুপরি শত্রুপক্ষ দেশ দখল করে এস্তেক কারখানাগুলোর সমূচা যন্ত্রপাতি—লক্ স্টক্ ব্যারেল—আপন আপন দেশে চালান দেবে।

তাঁরা অবশ্য তখন জানতেন না, ধন তো যাবেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি লাগবে।

এবং তাও হয়েছিল—ইতিপূর্বে যা কখনো হয়নি—যুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ এইসব ডাঙর ডাঙর অস্ত্রপতিদের বিরুদ্ধে জোর মকদ্দমা চালায়; রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদিকে ফাঁসি দেবার পর। জেল তো এঁদের অনেকেরই হয়েছিল—ফাঁসি হয়েছিল কি না, আমার মনে নেই। (অবশ্য শুনেছি, এখন ফের তাঁরা, অথবা তাঁদের বংশধররা—বন্দুক কামান তৈরি করে খনে বেচেন মিশরকে খনে ইজরাএলকে!)

এবং পাঠক আরও প্রত্যয় যাবেন না, হিটলারের আপন খাস চেলা-চামুণ্ডাদের অনেকেই এ-যুদ্ধ চাননি!—মায় তাঁর দু'নম্বরী ইয়ার বিমান-বহরাধিপতি গ্যোরিং। এঁরা মোকা পেয়ে কলাকৌশলে তখন এতই ধনদৌলত জমিয়েছেন যে বার্লিনের কুট্টি সম্প্রদায় এঁদের চপ-বেচপের ঢাউস ঢাউস মেরৎসেডেজ মোটর দেখতে পেলে কখনো চেঁচিয়ে, কখনো আপসে মৃদুস্বরে বলতো 'মহারাট্শা!'— মহারাজা শব্দের জর্মন উচ্চারণ। গ্যোবেল্‌স তো একবার উচ্চ কণ্ঠেই বললেন, 'এদের যদি এখন "জ্যুস্ প্রিমে নক্টিস্" দেওয়া হয় তবেই এরা সর্বার্থে মধ্যযুগের

। ১৩ ।

ব্যক্তিগত কথা বলতে আমার বাধে। কিন্তু প্রাগুক্ত মহিলা তাঁর শোক সংবরণ করে তাঁর সম-দুখে-দুখী হৃদয়ের প্রকাশ দেওয়াতে আমিও কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে আপন অভিজ্ঞতা নিবেদন করি।

আমি বার্লিন যাই ১৯২৯-এ। হিটলার তখন ম্যুনিকের স্থানীয় উষ্ণমস্তিষ্ক রাজনৈতিক পাণ্ডা মাত্র। ১৯৩০-এ আমি রাইনল্যাণ্ডের বন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। সেখানে হিটলারের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না বললেই চলে।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয় আমার এক সতীর্থ পাউল (Paul) হরস্টারের সঙ্গে। সে পড়তো আইন শাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী ও আরবী—ইচ্ছা ছিল ডক্টরেট নেবার পর ফরেন আপিসে ঢুকবে। আমারও অপ্-শনাল ছিল আরবী। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয় ও অত্যল্পকালের মধ্যেই গভীর সখ্য…। পাউলের বাপ-মা বাস করতেন নিকটবর্তী ড্যুস্ল্‌ডর্ফ শহরে। এক উইক-এণ্ডে সে আমায় নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। মা কখনো ইণ্ডিয়ান দেখেন নি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মন স্থির করতে পারছেন না, আমার জন্য কোন্ কোন্ বস্তু রান্না করবেন। আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে—কোন্ একটা কথাচ্ছলে পাউল বললে যে আমার মা সুদূর ভারতে প্রতিদিন আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছে। শোনা মাত্র পাউলের মা তাঁর দু'হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে দ্রুতপদে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এসে ফের রান্নায় মন দিলেন।

সন্ধ্যেবেলা ড্রইংরুমে কফি আর গৃহনির্মিত অতুলনীয় ক্রীমবান্ (পাটিসাপটার অতি দূর সম্পর্কের ভাই) খাচ্ছি এমন সময় একটি অতিশয় সুপুরুষ যুবক এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একটি সুন্দরী। কিন্তু এ-যুবক যত্রতত্র সর্বত্র যে রকম পুরুষ-নারী উভয়ের বিমোহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সঙ্গের যুবতীটি ততখানি না। পরস্পরের পরিচয়াদির লৌকিকতা অবহেলে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সোজাসুজি আমার কাছে এসে হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বললে, 'আমি আপনাকে চিনি ; পাউলের বন্ধু। আর আমি ঐ রাসকেলটার দাদা কার্ল। এবং এই রমণীটি আমার শিরঃপীড়া, অর্থাৎ আমার ভামিনী।'

আমি ঘন ঘন হাত ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললুম, 'আমার কাছে শিরঃপীড়ার

অত্যুত্তম ভারতীয় হেকিমী দাওয়াই আছে। দেব আপনাকে? কিন্তু ডাক্তারের ফীজ দিতে হবে। শিরঃপীড়াটি দূরীভূত হলে সেটি—অপরাধ নেবেন না, স্যর—সেটি কি আমি পেতে পারি?'

কার্ল তো তার পাঁজরের দু-পাশ দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে, কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে দুলে দুলে গমগম করে হাসে আর বার বার বললে, 'আমার তো ধারণা ছিল, পুরবীয়ারা (প্রাচ্য দেশীরা) রসিকতা করতে জানে না। সর্বক্ষণ মোক্ষ, নির্বাণ, স্যাল্‌ভেশনের চিন্তায় মশগুল!—তা, ব্রাদার, কিছু মনে করো না। আমার 'শিরঃপীড়া'র একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছেন—এক্কেবারে কামানের গোলা। গেল বছরে মিস্ রাইনল্যাণ্ড হয়েছেন। নেবে সেটি?'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম কার্লের বউ লজ্জায় একেবারে পাকা টমাটো।

ঝপ করে একটা সোফাতে বসে বললে, 'কিন্তু তোমাতে আমাতে আর "আপনি" চলবে না। বুঝলে? তারপর, হ্যাঁ, কি যেন বলতে এসেছিলুম। আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে পার্টি। পাউল তোমাকে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে তো!'

আমি বললুম, 'অতি অবশ্যই। প্লেজার অনার! কিন্তু সেই যে আরেকটি শিরঃপীড়ার কথা বলছিলেন, তিনিও আসবেন কি?'

তারপর আর কার্লকে পায় কে? তার হাসি আর কিছুতেই থামতে চায় না।

শেষটায় কার্ল তার বউকে আমার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'মায়ের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নি।' তারপর বউকে ফিসফিস করে শুধোলে, 'ওকে তো ডাকা হয়নি। লাস্ট মোমেণ্টে আসতে পারবে কি? তুমি দেখো তো।'

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সোজা গিয়ে মায়ের কোলে দুম্ করে বসে পড়ল—ট্যারচা হয়ে। বাঁ হাত দিয়ে মায়ের বাঁ বাহু চেপে ধরে, ডান হাত দিয়ে মায়ের ঘাড় পেঁচিয়ে নিয়ে মায়ের গালে ঘন ঘন চুম্বন।

স্পষ্ট শুনতে পেলুম, মা বলছেন, 'ওরে গরিল্লা, ওঠ, ওঠ, আমার লাগছে!'

আমি জানতুম, তখন সে-ঘরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জন আমি—যদ্যপি আমি কোনো পীর প্যাকম্বর্ নই—নিতান্ত বিদেশী এবং তারো বাড়া ভারতীয় বলে। তাই আমি অক্লেশে বুঝতে পারলাম, কার্ল আমাকে ছেড়ে তার মায়ের কাছে চলে গেল কেন। সামান্য ড্রইংরুমে 'কে কার পাশে বসে, তাতে কিবা যায় আসে!' কিন্তু সে তার মা'কে বোঝাতে চেয়েছিল, যে-ই আসুক যে-ই থাক, তার কাছে তার মা-ই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

কার্লের বউ ক্লারা আমাকে বললে, 'আমার বোন নিশ্চয়ই আসবে। তার অন্য

এনগেজমেন্ট থাক আর না-ই থাক।'

আমি বললুম, 'তার অন্য এনগেজমেন্ট হয়তো তার লাভার, তার ইয়ংম্যানের সঙ্গে। তাকে নিরাশ করাটা কি উচিত হবে, এই আনন্দের দিনে? তাকেও ডাকুন না—অবশ্য যদি আপনাদের অন্য কোনো অসুবিধা না থাকে।'

ক্লারা আমার দিকে বিস্মিত নয়নে তাকালে।

আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ঘাবড়াচ্ছেন যে আমাতে আর আপনার বোনের লাভারেতে খুনোখুনি হবে—না? নিশ্চিন্ত থাকুন, কিচ্ছুটি হবে না। সে কি আপনার বোনকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেড়েছিল?'

'এ যাবৎ করেনি। কেমন যেন গড়িমসি করছে?'

দৃঢ় কণ্ঠে আমি বললুম, 'আজ রাত্রেই সে প্রস্তাব পাড়বে।'

'???'

'আমি আপনার বোনের সঙ্গে একটুখানি ভাবসাব করতেই সে রেগে, চটে, হিংসায় জর্জর হয়ে, আমাকে ডিঙ দেবার জন্য আজ রাতদুপুরেই সে প্রস্তাব পাড়বে। হল?'

সে সন্ধ্যায় কার্লের বাড়িতে জব্বর পার্টি হল। আমার তিনটি জিনিস মনে আছে।

কার্ল যখন আমাদের নাচের জন্য পিয়ানো বাজাচ্ছিল তখন আমার নজর গেল তার হাত দু'খানির দিকে। সেই হাতের আঙুলগুলি তন্বঙ্গী দীর্ঘ, অথচ সেগুলির তুলনায় বাকি হাত আরো ছোটো। এতে যেন কোনো প্রোপরশন নেই। কিন্তু কী সুন্দর! এ-রকম হাতের বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। বার বার আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো আমার মায়ের হাত দুটি।

গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি।

এমন সময় কে যেন আমার খাটের বাজুতে এসে বসলো। আধো ঘুমে শুধালুম, 'কে?'

'আমি পাউলের মা। আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, এই যে আমার পাউল, সে সপ্তাহের ছ'দিন থাকে বন শহরে, প্রতি শনিবার ছুটে আসে আমার কাছে। আর বন তো এখান থেকে দূরে নয়। ডাকগাড়িতে আধ ঘণ্টার পথ মাত্র। তবু আমি এই ছ'দিন কী ছটফটই না করি।

'আর তোমার মা? তিনি থাকেন কত সমুদ্রের ওপারে।

'তাঁর দিন কাটে কি করে ?

'তুমি খুব তাড়াতাড়ি পাস দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

তারপর আমার কপালে চুমো দিলেন। আমার মনে হল, এ তো আমারই মায়ের চুমো।

।১৪॥

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে হিটলারের দল জর্মন পার্লিমেনটে এত অধিক সংখ্যক আসন পেয়ে গেল যে তার গুরুত্ব জর্মনির বাইরে তো বটেই, ভিতরে অল্প লোকই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল। কম্যুনিস্টরা ঠিক-ঠিকই বুঝেছিলেন কিন্তু স্তালিন তখন আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত এবং বিশ্বভুবনজোড়া প্রলেতারিয়া রাজ্য স্থাপনের সদিচ্ছা তিনি তখন প্রায় ত্যাগ করেছেন। জর্মন কম্যুনিস্টরা বাতুশকা স্তালিনের কাছ থেকে সাহায্য পেল অত্যল্পই।

পাঠক হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, আমার সতীর্থ পাউল হর্স্টারের অগ্রজ কার্ল কিন্তু ঠিক-ঠিক বুঝে গিয়েছিল, দেয়ালে কি লিখন লেখা হয়ে গেল—

'আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি কোন্ অভিশাপ গেল লিখি।'

১৯৩২-এর বড়দিনের পরবে গেলুম ড্যুস্‌ল্‌ডর্ফ।

রান্নাঘরে বসে কার্ল-পাউলের মা'র সঙ্গে রসালাপ করছি।

এমন সময় কার্ল এসে ঘরে ঢুকল। প্রথম মাকে গণ্ডা দুই চুমো খেয়ে আমাকে দিলে গণ্ডা খানেক। কুশলাদির লৌকিকতা বর্জন করে সরাসরি শুধালো—

'হেই, ভাইয়া, জর্মন পলিটিক্স কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছিস ?—এক বছর তো হয়ে গেল এই লক্ষ্মীছাড়া দেশে এসেছিস!'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'পফুই (অর্থাৎ ছিঃ!), এমন কথা বলতে নেই। মুখে ঘা ('কুষ্ঠ' ঘা-টা আর বললুম না) হবে। জর্মনি কান্ট-গ্যোটে, বেটোফেন-ড্যুরারের দেশ। কিন্তু, বাওয়া, তোমাদের পলিটিক্সের জট ছাড়ানো আমাদের গান্ধীরও কম্ম নয়। হালে একখানা চটি বই কিনেছি। জর্মনির ছাব্বিশ না আঠাশখানা পার্টির (বাপ্‌স!) ঠিকুজি-কুলজি দপে দপে তাতে বয়ান আছে। পড়েছিলুম কবে! এখনো মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করছে।'

পরম অবহেলা ভরে বললো, 'ছোঃ! তোদের না থ্রী হান্‌ড্রেড মিলিয়ান গডেসেস্ আছে! হিসেব রাখিস কি করে? তোদের আবার 'লাকি' দেশ—কার্ড ইনডেক্‌সিঙের গব্বযন্তনা সেখানে এখনো পৌঁছয়নি। তা সে-সব কথা

যাক্। ইতিমধ্যে তোকে একটি মহামূল্যবান সদুপদেশ দিচ্ছি—তোর সেই রাম-আহাম্মুখীর সাক্ষাৎ ডক্টরেট্-সার্টিফিকেট ঐ পার্টি পঞ্চটি সিকি দরে বিক্রি করে দে—তোর চেয়েও প্রাইজ-ইম্বেসাইল এ-দেশে রাইন নদের সামোন মাছের মতো আবজাব করছে। নইলে শিকের হাঁড়িতে (ওদের ভাষায় মাটির নিচের সেলারের কয়লা গুদোমে) তুলে রেখে দে। দরকার মাফিক ওরই পাতা ছিঁড়ে ঘরের স্টোভে আগুন ধরাবি। কিন্তু সে-কথাও থাক। আসল তত্ত্ব কথাটা শোন্।'

তারপর সত্যি অত্যন্ত সিরিয়স মুখে বলল—কার্লকে এই প্রথম আমি গম্ভীর হতে দেখলুম—'বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। জানিস, হিটলার রাইখস্টাগে অনেকগুলো সীট পেয়ে গিয়েছে?'

আমি হেসে উঠলুম। এ-যেন পর্বতের মূষিকপ্রসব!

ইতিমধ্যে পাউল রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। লক্ষ্য করলুম, আমার হাসির সঙ্গে হামদরদী দেখিয়ে দোহারের মতো স্মিত হাস্য সে করলো না—যা সে আকছারই করে থাকে। মায়ের মুখে কোনো ভাবের খেলা নেই।

কার্ল কোনো দিকে খেয়াল না করে আমাকে সরাসরি শুধোলে, 'তুই হিটলারের "মাইন কাম্‌ফফ্" (বাঙলাতে মোটামুটি আমার সংগ্রাম) পড়েছিস?'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'রক্ষে দাও বাবা! ও-বই আদ্যন্ত পড়া আমার কর্ম নয়। একে তো তোমাদের এই জর্মন ভাষাটি এমনই প্যাঁচানো-জড়ানো, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড, এবং নিদেন বিশ-ত্রিশটি লাইনের ন্যাজ না খেলিয়ে তোমাদের একটা সেন্‌টেন্স সম্পূর্ণ হয় না, তদুপরি তোমাদের ঐ হিটলার বাবু যেন মাথায় গামছা বেঁধে বেল্ট টাইট করে, মোজা উপর বাগে টেনে নিয়ে, গণ্ডারের চবির টনিক খেয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছেন, সরল জিনিস কি কৌশলে দুরূহ করা যায়—অবশ্য আমার জর্মন জ্ঞান যা, সেটা তো "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট"! তবে, হ্যাঁ, বিস্তর হোঁচট খেয়ে চোট-জখম-হজম করে খাবলা মেরে মেরে মোদ্দা কথা কটি ধরে নিয়েছি।'

কার্ল "মাইন কাম্‌পফ্"-এর ভাষা বাবদ সায় দিয়ে বলল, 'তোর জর্মন ভাষা-জ্ঞানের কথা উঠছে না। ঐ আকাট ব্যাটা হিটলার তো আসলে কথা কয় পশ্চিম-অষ্ট্রিয়ার অতিশয় চোতা জর্মন ডাইলেক্টে। তদুপরি তার গায়ে রয়েছে চেক রক্ত, কেউ বা বলে দু-চার ফোঁটা ভ্যাগাবণ্ড জিপসি "নাপাক" খুনও তাতে মেশানো রয়েছে। এ রকম দু'আশলা, সাড়ে তিন আশলা লোক, তদুপরি "উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে"—সে আবার লিখবে জর্মন! তা তার

লেখার ধরন যত না মারাত্মক, তার চেয়ে তার প্রোগ্রামটা ঢের ঢের বেশী মারাত্মক। ইহুদি জাতটাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, ফ্রান্স দেশটাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে এবং সর্বশেষে রাশার বৃহদংশ দখল করে সেখানকার চাষাভুষোদের রীতি-মতো গোলাম বানিয়ে, যাকে বলে স্লেভ লেবার, জর্মনদের জন্য ফোকটে দেদার দেদার রুটি মাখন আণ্ডা বেকন লুট করতে হবে। সেও না হয় বুঝি, এই বিরাট দুনিয়ায় কত না তরো-বেতরো গুণ্ডা-গ্যাংগস্টার হয়—অতি অবশ্য আমার ধর্ম-বুদ্ধি এতে একদম সায় দেয় না, কিন্তু যে করাল বিভীষিকা আমি চোখের সামনে দেখছি সেটা এই যে, হিটলারের এই শয়তানী স্বপ্ন সফল তো হবেই না, মাঝখান থেকে লক্ষ লক্ষ জর্মন যুদ্ধে মারা যাবে, তাবৎ জর্মন দেশটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এই যে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ব্রাদার কার্ল, এসবের অধিকাংশ ভোট পাবার জন্য পোলিটিক্যাল প্রোপাগ্যাণ্ডা। আমাদের রাজা ইংরেজ বলে, তাদের খেদমৎ করলে খুব শীগগিরই আমরা সবাই রাজা হয়ে যাবো, কংগ্রেস বলে, ইংরেজকে তাড়িয়ে দিলে আমরা রাজা না, মহারাজা হয়ে যাবো। আমি অবশ্য জিনিসটা বড্ড ক্রুড ভাষায় বলছি। কম্যুনিস্টরা বলে—'

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, কার্লের মুখের উপর দিয়ে যেন একটা উড়ো মেঘের ছায়া পড়ে মিলিয়ে গেল। আমি শুধালুম, 'কার্ল, তুমি কি কম্যুনিস্ট ?'

'এককালে ছিলুম। বছর দুই হল পার্টি মেম্বারশিপ রিজাইন দিয়েছি। ঐ সময় থেকে চাঁদাও আর দিইনি।'

'কেন ?'

'সে কথা আরেক দিন হবে।'

গোটা ১৯৩১টা আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে আমি এমনই ব্যস্ত ছিলুম যে, ড্যুসল্-ডর্ফ যেতে পারিনি। এমন কি ১৯৩১-এর বড়দিনটাতেও ফুরসত করে উঠতে পারলুম না।

১৯৩২ পরীক্ষা পাস করে জর্মনি ত্যাগ করার পূর্বে একদিনের তরে ড্যুসল্-ডর্ফ গেলুম হরস্টার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য। আমার কপাল মন্দ, কার্ল শহরে ছিল না। বড় বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, বন হয়ে ইতালিতে এসে জাহাজ ধরলুম।

১৯৩২ কেটে গেল। পাউলের চিঠিপত্র পাই।

১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসে হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর বা কর্ণধার হলেন।

তার দু'মাস পরে পাউলের একখানা অতি ক্ষুদ্র চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। কার্লকে জর্মনির 'গোপন পুলিস' অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে নির্জন কারাবাসে রেখেছে। বেল পাওয়ার কোনোই আশা নেই। তার বিরুদ্ধে গোপন বা প্রকাশ্য কোনো আদালতে যে মকদ্দমা উঠবে তার সম্ভাবনাও অতিশয় ক্ষীণ।

॥ ১৫ ॥

১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফেরার পর ৩৩-এর সম্পূর্ণ বছরটি কাটাই দেশের ছোট শহরে মায়ের সঙ্গে। সুদীর্ঘ, প্রায় তিন বৎসরের পর ফের মায়ের কাছে ফিরে এসেছি। এর পূর্বেও, অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত আমি মায়ের কাছে এসেছি পুজো আর গরমের ছুটিতে, মাত্র কয়েকদিনের, কয়েক সপ্তাহের জন্য। আমি পেয়েছি মায়ের সঙ্গ-সুখ, মাও পেয়েছে আমার সঙ্গ-সুখ—ফের আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, সেই আসন্ন বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ তলওয়ার সূক্ষ্ম একটি চুলে ঝুলছে অবশ্য অহরহ মায়ের মাথার ওপর। কে বেশী আনন্দ পেয়েছিল সেটির মীমাংসা আমি নিজে করবার হক্ক ধরি নে। আমার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যে-সব মাতা ও সন্তান আছেন তাঁদের হাতেই শেষ রায়ের জিম্মেদারী ছেড়ে দিলুম। আর যে-সব সন্তানের মা তাদের অল্প বয়সে স্বর্গলোকে চলে গেছেন সে-সব দুঃখীদের কথা আমি মোটেই ভাবতে চাই নে।

আমি জানি, আমার যে-সব পাঠিকা মা, তাঁরা আমাকে একটা মূর্খ ধরে নিয়ে (এবং আমি সে 'ধরে-নেওয়াটা'-র বিরুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ আপত্তি মুহূর্তেক তরে তুলবো না, কারণ আমার পিঠপিঠ দাদা এখনো আমাকে নিত্যনিয়ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ 'পদ্মভূষণে'র পরিবর্তে 'গণ্ডমূর্খ' 'অলিম্পিক ইডিয়েট' খেতাব দেয়) বলবেন, 'অতি অবশ্যই মাতা পুত্রের সঙ্গ-সুখ পুত্রের তুলনায় বহু গুণে, বহু উৎকর্ষে, বহুতর আনন্দ-ঘন চরমা তৃপ্তি পরমারাম পায়। শুধু তাই নয়, পুত্রের জন্যও সে সঙ্গে সঙ্গে এক মহামিলনের মহানন্দময় মহোৎসবের সৃষ্টি করে—কারণ মা তার স্বভাবজনিত নিঃস্বার্থপরায়ণতায় চায়, সন্তানও যেন তারই মতো—এমন কি তারও বেশী পরিপূর্ণানন্দ লাভ করে। কিন্তু সন্তান কি সেটা পারে ? পুত্র যুবা। সে চায়, মায়ের ভালোবাসার বাইরেও অনেক-কিছু—খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থবৈভব ; তদুপরি সে কামনা করে অন্য রমণীর যৌবন-মদিরাভরা প্রণয়—এও কি তখন সম্ভবে, যে, সে তখন শিশুকালে যে-রকম একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মাতৃস্তন শোষণ করেছিল আজও সেই রকম তার মাতৃস্নেহসিক্ত সঙ্গসুজাত

আনন্দযজ্ঞ থেকে সেই প্রকারেই একাগ্রচিত্তে বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রতিটি মধুকণার সৌরভঘন আনন্দরস নিঃশেষে শোষণ করবে? সেই শিশু জন্মলাভের পরই মায়ের বামস্তন ওষ্ঠাধর দ্বারা অবিরত নিষ্পিষ্ট করে যেন মাতৃদেহের শেষ রক্তবিন্দু লুণ্ঠন করে নিয়েছে, তার বামহস্ত মাতার দক্ষিণ স্তনের উপর রেখে সেই ক্ষুদ্র হস্তাঙ্গুলির কোমল পরশ ছুঁইয়ে আরো দুগ্ধ আরো অমৃতের আহ্বান জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যে মধ্যে মধ্যে তার অতি হ্রস্ব, অতিশয় স্ফীত বাম পদ দিয়ে মাতার দেহে মধুর মধুর পদাঘাত করছে।

সুশীল পাঠক! তুমি হয়তো ভাবছো, আমি যশোদানন্দন শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণের কাব্যচ্ছন্দে বাঁধা মাতৃদুগ্ধ পান এতশত যুগ পরে কেন গদ্যময় নিরস ভাষায় পুনরায় পরিবেশন করছি! (কিন্তু আমি জানি, প্রকৃত বৈষ্ণব জন বিশেষ করে আমার মুরব্বী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ, আমার এ অনধিকার চর্চা অবহেলে এবং সস্নেহে ক্ষমা করবেন।) নিবেদন, আমার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

এই যে আমি আমার মাকে অনেকখানি হতাশ-নিরাশ করলুম (অবশ্য সব মা-ই সেটা মাফ করে দেয়), তার তুলনায় আমার মা কি করলে?

আমার বয়স যখন চৌত্রিশ তখন আমার মা ১৯৩৮ সালে আমাকে ছেড়ে ওপারে চলে গেল। সেই বিচ্ছেদের পর আমি আরও চৌত্রিশ বৎসর ধরে এ-সংসারে সেই মায়ের বিরহযন্ত্রণা কতখানি নিতে পারি, তারই চেষ্টা করছি।

এইবারে আমি পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্য খুলে বলছি—

যে-মা আমার ছ' মাস এক বৎসর এবং সর্বাধিক, পৌনে তিন বৎসরের বিচ্ছেদ সইতে পারতো না বলে দিনে দিনে ফরিয়াদ করতো, সে-ই মা-ই আমার জন্য রেখে গেল চৌত্রিশ বৎসরের বিচ্ছেদ-বেদনা।

করজোড়ে স্বীকার করছি আমার মা আমাকে যতখানি ভালোবেসেছিল তার তুলনায় আমার ভালোবাসা নগণ্য। কিন্তু মাকে দিয়েছিলুম মাত্র পৌনে তিন বৎসরের বেদনা। তার বদলে মা আমাকে দিলে চৌত্রিশ বৎসরের বিরহ। আমি কোনো ফরিয়াদ, কোনো নালিশ করছি নে। আল্লা আমার মায়ের পূতাত্মা তাঁর পদপ্রান্তে নিয়ে মাকে তাঁর বহু দুঃখ বহু বিরহযন্ত্রণা থেকে শাশ্বত নিষ্কৃতি দিয়ে তাঁকে সর্বানন্দাতীত চরমানন্দ দিয়েছেন।

স্পর্শকাতরতাহীন পাঠক শুধোবেন, কার্লের কথা কও। তোমার মায়ের কথা এস্থলে টেনে আনছো কেন?

কার্লকে জেলে নিয়ে যায় ১৯৩৩-এর বসন্তে। তারপর এল ইস্টারের পরব।

ঐ সময় আমি পাউলের সঙ্গে প্রতি বছর ড্যুসল্‌ডর্ফ গিয়ে সপরিবারে কার্ল এবং পাউল পরিবারের সঙ্গে পরব পালন করতুম। ঐ সময়ে প্রভু যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন এবং সপ্তাহান্তে তিনি পুনরুত্থান করেন।

১৯৩২-এর এই পরবের সময় আমি দেশে। কার্ল পাউল আমাকে রঙিন কার্ড পাঠায় ; সঙ্গে দীর্ঘ আবোল-তাবোল-ভরা নানা প্রকারের কেচ্ছা-কাহিনী।

১৯৩৩, কার্ল জেলে। কিন্তু মানুষ কি অসম্ভবের আশা ত্যাগ করতে পারে ? আমার ছিল দুরাশা, হয়তো হিটলার-রাজ এই সময়ে একটা মহানুভব ব্যত্যয় করে কার্লকে চিঠি লিখতে দেবে।

না। এমন কি পাউলও চিঠি লেখেনি। শুধু কার্ল পাউলের পিতা আমাকে একটি পিকচার কার্ড পাঠিয়েছে। তার উপরে বৃদ্ধ পিতার কম্পিত হস্তে, কোনো-গতিকে লেখা আমার প্রতি আশীর্বচন।

ইতিমধ্যে প্রতি সপ্তাহে প্রতি চিঠিতে বার বার পাউলকে শুধোই (তখন অ্যারমেল হয়নি), 'কালের খবর কি ? কার্লের খবর জানাও।'

পাউল উত্তরে আমার মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। তার বাপ মা, কার্লের বউ বাচ্চা সম্বন্ধে অনেক-কিছু লেখে।

তার পর একটা চিঠিতে লিখলো, 'ড্যুসল্‌ডর্ফের জেলে সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে নিভৃতে বলেছে, আমি যেন আমার দাদার অত-খানি তত্ত্বতাবাশ না করি। নইলে আমাকেও তারা জেলে পুরতে বাধ্য হবে। আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি।'

তখনো নাৎসি পার্টি পরবর্তী যুগের চরমতম পৈশাচিক বর্বরতায় পৌঁছয়নি। তাই জেলের কর্তা পাউলকে এই সহানুভূতির উপদেশ দিয়েছিল।

এ-চিঠি পেয়ে আমি দুর্ভাবনা দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়লুম।

তারপর দু'মাস ধরে, পূর্ণ দু'মাস ধরে পাউল সম্পূর্ণ নীরব। আমার তখন কি অবস্থা সেটা বোঝাই কি প্রকারে ?

আমার মা আমার মনমরা ভাব বেশ লক্ষ্য করেছে। একদিন শুধোলে, 'হ্যাঁরে তোর কি হয়েছে ! বিদিশি চিঠি পেলেই তুই শুয়ে পড়িস কেন ?'

আমি সব কথা খুলে বললুম।

কার্লের মাও মা, আমার মাও মা।

আমার মা বললে, সে কার্লের জন্যে দোওয়া মেঙে তার জন্য নফল নমাজ পড়বে।

ততদিনে বড়দিন এসে গেছে। বড়দিন শেষ হল।

কিন্তু পাউল কিংবা তার বাপ মা কারো কোনো চিঠি নেই।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে পাউলের চিঠি এল।

সংক্ষেপে লিখেছে :

'ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় দাদা আত্মহত্যা করেছে। কোনো এক সদাশয় জেল-গার্ড দাদাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেয়—গোপনে। দেশলাই পুড়িয়ে পুড়িয়ে সিগারেটের খোলে সে লিখে গিয়েছে, "মাকে সান্ত্বনা দিয়ো।" গার্ডটিই আমাকে সেটা পৌঁছিয়ে দেয়।'

চিঠি যখন পড়ছি আমার মা তখন সম্মুখে ছিল। শুধোল, 'হ্যাঁরে কি খবর পেলি? তোর বন্ধু ভালো আছে তো?'

আমি সত্য গোপন করিনি।

মা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেমাজের ঘরের দিকে চলে গেল।

॥ ১৬ ॥

কার্ল-এর কথা শেষ হয়েছে। তথাপি বিবেচনা করি কোনো কোনো সহানুভূতি-শীল তথা কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা জানতে চাইবেন যে কি-সব দুর্দৈব কোন্ সব নিপীড়নের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একদিন কারাগারের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করে কার্লের কাছে দিব্য-জ্যোতি উদ্ভাসিত হল যে এ-জীবন নিরর্থক; কিংবা হয়তো কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা প্রকাশ করে বললেন, কার্ল অংশতঃ মতিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বেচ্ছায় এ-সংসার থেকে বিদায় নেয়—কার্ল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় কি কখনো তার সে মায়ের কাছে থেকে চিরবিদায় নিতে পারতো, যে-মাকে সে এতখানি প্রাণঢালা সোহাগ করতো, তার জায়া তার শিশু-কন্যাকে সে প্রাণাধিক ভালোবাসত? কবি বলেছেন—

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'

এরই কাছাকাছি একটি অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, কার্লেরই সমগোত্রীয় হিটলারবিরোধী এক শহীদ। ইনি জর্মনিতে কার্লের মতো অজানা অচেনা জন নন। উলরিব ফন্ হাসেল ছিলেন ইতালিতে জর্মন রাজ্যের মহামান্য রাষ্ট্রদূত। বিদগ্ধ পণ্ডিতরূপে তিনি ইংলণ্ড থেকে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া পর্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুদেশে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর আমন্ত্রণে বহু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। হিটলারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া মাত্রই তিনি সেই সম্মানিত রাষ্ট্র-দূতের পদত্যাগ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারকে নিধন করার যে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল

হয় তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। অর্থাৎ কার্লের আত্মহত্যার এগারো বৎসর পর।

ফন্ হাসেল কিন্তু এক হিসাবে কার্লের চেয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন। নির্জন কারাগারে তিনি কাগজ-কলম পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর 'আত্মচিন্তা'র কিছুটা লিখে যাবার সুযোগ পান।

সেই 'আত্মচিন্তা' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে আসন্ন মৃত্যু অনিবার্য জেনে তিনি মাত্র তিনটি ছন্দে গাঁথা ছত্রে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আশাভরা অনুভূতি প্রকাশ করেন :

'তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো মৃত্যুদ্বার দিয়ে
আমরা তখন যেন স্বপ্ন-সম্মোহিত
এবং অকস্মাৎ আমাদের করে দিলে মুক্ত।'[১]

সেই রবীন্দ্রনাথের 'এই দুয়ারটুকু'। এটি 'পার হতে' কার্ল, ফন্ হাসেল কারো কোনো সংশয় ছিল না।

১৯৩৩-এর বড়দিনে কার্ল ওপারে চলে যায়।

১৯৬৪-এর গ্রীষ্মে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ফের জর্মনি যাই।

বন শহরের আমার এক প্রাক্তন অধ্যাপকের সঙ্গে বাস করছি। পাউলকে চিঠি লিখলুম। সে জানালে, ইতিমধ্যে তার মা কার্লের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তার বাপ পেনশন পেয়েছেন। পাউল লিখেছে, 'না পেলেই ভালো হত; বুড়ো একটা কিছু নিয়ে থাকতে পারতো। এখন সে তার জাগ্রতাবস্থার অধিকাংশ সময় কাটায় রান্নাঘরের সেই ভাঙা কৌচটার উপর যেখানে বসে বসে মাকে সঙ্গ দিত; পূর্বেরই মতো—কিন্তু এখন একা একা, এবং প্রায় সমস্ত দিনরাত্রি—আগে অন্ততঃ ন'ঘণ্টাটাক আপিসে কাজকর্ম করতো। আর সমস্তক্ষণ আগেরই মতো সিগার ফোঁকে। তবে, আগে ফুঁকতো তামাম দিনে গোটা ছয় মোলায়েম সিগার; এখন গোটা আঠারো এবং এ-দেশের সবচেয়ে কড়া সিগার। আমি অনুরোধ করাতে মাসি এসেছে। মাসি মায়েরই মতো ভালো রাঁধতে পারে। আগে বাবাই সে-কথা বার বার স্বীকার করেছে। এখন শুধু খুঁত-খুঁত করে।' লক্ষ্য করলুম, পূর্বের প্রথামতো পাউল যথারীতি আমাকে ড্যুসলডর্ফ যাবার নিমন্ত্রণ জানায়নি॥

১ অধুনা অনেকেই জর্মন শিখছেন, তাই মূল পাঠ তুলে দিলুম ;—
"Du kannst uns durch des Todes Nueren
Trtaumend fuehren
Und machest uns Uns auf einmal frel."

বেদনা পাওয়ার কথা ছিল ; আমি পেলুম শান্তি স্বস্তি।

পাউল বন-শহরে এসে আমাদের ছাত্রাবস্থার পাব-এ রঁাদেভু স্থির করল।

কুশল আলিঙ্গনাদির পর পূর্বের প্রথামতো সে আধ লিটার বিয়ার অর্ডার দিয়ে গেলাসটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেষটায় একচুমুকে আধ গেলাস শেষ করে বললে, 'কীই বা তোকে বলি, যা তুই শুনতে চাস।' কার্ল ধরা পড়ার এক মাস পর এল ঈস্টার পরব। কর্মে তার বিশেষ মতিগতি ছিল না কিন্তু ধর্মের পরব, লৌকিকতা নিয়ে সে হই-হুল্লোড় করতে বড় ভালবাসতো। নানা রঙের কাগজে ডিম মুড়ে সেগুলোকে চিত্র-বিচিত্র করা থেকে শুরু করে, নিতান্ত বাচ্চাদের মতো সেগুলোকে কল্পনাতীত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় লুকনো, তারপর আমাদের সব্বাইকে নিয়ে বিকট চিৎকার লাফালাফি দাপাদাপি করে সেগুলো খোঁজা, তার বউ যেগুলো লুকিয়েছিল সেগুলো খুঁজে পাওয়াতে রেড্-ইণ্ডিয়ান স্টাইলে তার তাণ্ডব নৃত্য, তার উৎকট উদ্দাম জয়োল্লাস —এসব কথা সে নিশ্চয়ই জেলে বসে বসে ভেবেছিল।

আমার চোখে জল এল। বললুম, 'পাউল, তোর মনে আছে '৩২-এর পরবে কার্ল তোর মারফত আমাকে এক ডজন রঙিন ডিম পাঠিয়েছিল ?'

পাউল মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বললে, 'তুই তো সর্ব ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করিস তোর অজানা নয়, অনেক ক্যাথলিক ঈস্টারকে বড়দিনের চেয়ে বেশী সম্মান দেয়। ঐ সময় প্রভু যীশু মৃত্যুবরণ করার সময়েও তাঁর নিপীড়নকারীদের ক্ষমা করে যান। এই ঈস্টার সপ্তাহটি ক্ষমা, দয়া, মৈত্রীর সপ্তাহ। আমার সর্ব নৈরাশ্য তখন দুরাশা দিয়ে চেপে ধরে ঈস্টার ফ্রাইডে থেকে ঈস্টার মানডে অবধি চার দিন রোজ গিয়েছি জেলখানায়, যদি এই ক্ষমাদয়ার সপ্তাহে ওরা একটু নরম হয়। মাকে না জানিয়ে।' পাউল থামলো।

আমি বললুম, 'বুঝেছি, তুই বলে যা। আমি দেশে থাকতে সব শুনতে চেয়েছিলুম। এখন আর না। তুই সংক্ষেপে সার।'

পাউল বললে, 'তার দু'মাস পরে এল তার মেয়ের নামকরণ দিবস।[১]

কার্ল ঐদিনই করতো তার বাড়ির সবচেয়ে জব্বর পরব। মেয়েকে সাজাতো

১ ক্যাথলিকরা জন্মদিন পালন করে না। ঠাট্টা করে বলে, শ্যাল কুকুরেরও তো জন্মদিন আছে। তারা পালন করে যে সন্তের নামে বাচ্চার নাম দেওয়া হয়েছে (যেমন পাউল, মারিয়া = মেরি, ইত্যাদি) তাঁর সেণ্ট পদবি প্রাপ্তির দিন। এটাকে বলে, নামেন্সটাখ্।

শুভ্রাতিশুভ্র সাদা রেশমী জামা-কাপড়ে আর হল্যাণ্ড থেকে কেনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লেস্ ঝালরে।

কার্ল জেলে। হয়তো ভাবছে মা কি করে বাচ্চাটিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে আজ সে রকম পরব হচ্ছে না কেন?

তার পর এল কার্লের বাৎসরিক বিবাহোৎসব।

এ সব কটা পরব পড়ে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাসে। শুধু তার বউ আর আমাদের মা'র নামকরণ দিবস পড়ে জানুয়ারি থেকে মার্চে।

এ সব কটা দিনে কার্ল কারাগারে কী বেদনা অনুভব করেছিল তার খানিকটা কল্পনা আমি করতে পারি। আর সেই দরদী গার্ড আমাকে তার শেষ মেসেজ দিয়েছিল সে আমাকে কিছুটা বলেছিল। কার্ল নাকি তাকে তার পরিবারের প্রতি পর্বদিন ওকে ঐ সম্বন্ধে একটু-আধটু বলতো।

তার পর বড়দিন এল। সে আর যে সইতে পারলো না। সে কথা তোকে তো চিঠিতে লিখেছিলুম।'

তার দু'একদিন পর আমি একটু সুযোগ পেয়ে পাউলকে শুধালুম, 'আচ্ছা পাউল, কার্ল তো হিটলার জর্মনির সর্বেশ্বর হওয়ার দু'বৎসর পূর্বে পার্টি ছেড়ে দেয়. চাঁদা বন্ধ করে! তবে ওকে ধরলো কেন?'

পাউল ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'কিন্তু পার্টি কি ছাড়ে (আমাদের ভাষায় কমলী নহী ছোড়তী)? কার্ল ছিল পার্টির সব চেয়ে সেরা যুক্তিতর্কসিদ্ধ মেম্বার এবং উত্তম বক্তা। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পর যে-সব মাতব্বর কম্যুনিস্ট-দের গ্রেফতার করা হয় তাঁদের প্রায় সক্কলেরই নোটবুকে কার্লের নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। আমি ওদের দোষ দিই নে; কিন্তু নাৎসিরা স্বভাবতই ধরে নিল এ-রকম একজন সর্ব-কম্যুনিস্ট-মান্য লোককে বন্ধ করে রাখাই সেফার।'

পাঠক হয় তো শুধোবেন 'কত না অশ্রুজল'-এ আমি কার্লের শেষ চিঠিকে যথাযথ মূল্য দিয়ে গোড়ার দিকেই ছাপালুম না কেন? কিন্তু যেখানে আমি অত্যুৎকৃষ্ট শেষ বিদায়ের চিঠিগুলো অনুবাদ করছি, সেখানে মাকে সান্ত্বনা জানিয়ে তিনটি মাত্র শব্দ, সেগুলোর কী অধিকার ওদের সঙ্গে সমাসনে বসার?

আন্ ফ্রাঙ্ক

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, নাৎসি পার্টির কি কোনো গুণ ছিল না, তারা কি সুদ্দুমাত্র পাপাচারই করেছে ? এর উত্তরে একটি ক্ল্যাসিক্যাল নীতিবাক্য সম্বলিত ছোট্ট কাহিনী মনে আসে। এক দরিদ্র গ্রাম্য পাদ্রী গিয়েছেন শহরে—বিশপের সঙ্গে দেখা করতে, সকালবেলা বিশপ তাঁর চেহারা দেখেই বুঝে গেলেন, বেচারির পেটে তখনো কিছু পড়েনি। বাটলারকে হুকুম দিলে সে রুটি মাখন আর একটি ডিম-সেদ্ধ নিয়ে এল। পাদ্রী মৃদু আপত্তি জানিয়ে খেতে আরম্ভ করলে হঠাৎ বিশপের নাকে গেল পচা ডিমের গন্ধ। চশমার উপর দিকে অর্ধোন্মুক্ত পচা ডিম ও পাদ্রীর দিকে যুগপৎ তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আপনাকে একটা পচা ডিম দিয়েছে !' পাদ্রী সাহেব তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বললেন, 'না হুজুর না, ইট্ ইজ অলরাইট—' তারপর একটু থেমে বললেন, '—অ্যাট প্লেসেস্'—অর্থাৎ কোনো কোনো জায়গায়।

তাই 'পাদ্রী সাহেবের ডিম' বলতে বোঝায়, পৃথিবীতে কি এমন কোনো পচা ডিম পাওয়া যাবে, যার সর্বশেষ অণুটুকুও পচে গিয়েছে ? তেমন করে খুঁজলে অন্তত দু-একটি পরমাণু পাওয়া যাবে, যেগুলো সম্পূর্ণ পচে যায়নি।

নির্গলিতার্থ : ইহভুবনে এমন কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যার ভিতর 'নেই কোনো গুণ, শুধু কপালে আগুন'।

বস্তুত হিটলার তথা নাৎসি পার্টির অনেক গুণই ছিল, এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, গত বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত শ্মশান-মশানে পরিণত জর্মনি যে বছর পাঁচেকের ভিতর আপন পায়ে দাঁড়াতে পারলো, তার জন্য কিছুটা ধন্যবাদ পাবেন হিটলার ও তাঁর নাৎসি পার্টি। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কঠোর তপস্যা দ্বারা কি প্রকারে একটা দেউলে দেশকে (১৯৩৩-এর জর্মনি) মাত্র পাঁচটি বৎসরের ভিতর পরিপূর্ণ শক্তিমান বিত্তবান করা যায় (১৯৩৮-এর জর্মনি) সেই ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিলেন স্বয়ং হিটলার। সেই সঙ্ঘবদ্ধ তপস্যালব্ধ চরিত্রবল বহুলাংশে প্রয়োগ করে যুদ্ধশেষের বিধ্বংসিত-জর্মনি পুনরায় শ্রী-সমৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না, নাৎসিরা পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদীকে নিহত করে।

আবার তারপর এটা ভুলে গেলে আরও একটা মারাত্মক ভ্রম করা হবে যে, হিটলারের দৃষ্টান্ত থেকে বিশ্বমানবের মোক্ষম শিক্ষালাভ হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। বস্তুত ন্যুরনবের্গের মোকদ্দমার সময় যে-সেরা

মার্কিন মনঃসমীক্ষণবিদ্, ডাক্তার কেলি প্রধান প্রধান আসামী গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপ, কাইটেল ইত্যাদির মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-অ্যানালেসিস) দীর্ঘকাল ধরে করেন, হিটলার সম্বন্ধে নানা দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্য এঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন (আসামীদের সকলেই হিটলারকে বহু বৎসর ধরে অব্যবহিত অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন) এই ডাক্তার কেলি আপন 'সোনার দেশ', ইহলোকে 'গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ' মার্কিন মুল্লুকে ফিরে গিয়ে প্রামাণিক পুস্তক মারফত বলেন, এই মার্কিন মুল্লুকেই যে-কোনো দিন এক নয়া-হিটলার নয়া-তাণ্ডব নৃত্য নাচাতে পারে, নাচতে পারে।

কেলি তাঁর পুস্তক প্রকাশ করেন সম্ভবত ১৯৪৭-৪৮-এ। তারপর দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে, খবরের কাগজে পড়লুম, এক গণ্যমান্য মার্কিন অধ্যাপক অস্ট্রেলিয়াতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, (কাটিং রাখিনি, মোদ্দাটা সাদামাটা ভাষায় বলছি) এখনো বিস্তর হিটলার রয়েছে ; তারা সুযোগ পেলেই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

এই মোক্ষম হক্ক বাক্যটি আমরা যেন কখনো না ভুলি।

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, হিটলার কি শুধু ইহুদী এবং তাঁর জর্মন-বৈরীদেরই (যেমন আমার সখা কার্ল, তথা কবীর-সখা ট্রটৎসু জল্‌ৎস্) নির্যাতন করেছেন ? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, শুধু তাই নয়। পোলিশ, চেকস্লোভাক-বুদ্ধিজীবী, যুদ্ধে বন্দী রাশান অফিসার আরও বহুবিধ লোক তাঁর দীর্ঘ হস্ত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এমন কি, কয়েক হাজার নিতান্ত নিরীহ বেদের পালও কনসানট্রেশন ক্যাম্পে, গ্যাস-চেম্বারে প্রাণ দেয় ; কি এক অজ্ঞাত অখ্যাত ককেশাস না কোন্ এক অঞ্চলে ধৃত এক অতিশয় ক্ষুদ্র উপজাতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তারা স্লাভ না 'আর্য' ? জর্মন তথা বিশ্বের সর্ব বিশ্বকোষ এদের সম্বন্ধে কোনো খবর দেয় না। শেষটায় হিটলারের খাস-প্যারা হিমলার-চিত্রগুপ্ত—যিনি কনসানট্রেশন-নরকের কার্ড ইনডেক্‌সিং-এর চীফ সেক্রেটারি—তিনি রায় দিলেন, আল্লায় মালুম কোন্ দলিলদস্তাবেজ 'বিদ্যাবুদ্ধি'র উপর নির্ভর করে—যে, এরা স্লাভ, অর্থাৎ নাৎসি-'ধর্মানুযায়ী', বেকসুর বধ্য। ওরা মরে। যুদ্ধশেষে তাবৎ খবর পাওয়ার পর বিশ্বপণ্ডিতরা নাকি ফতোয়া দিয়েছেন এরা আর্যদেরই কোন্ এক নাম-না-জানা উপজাতি। এবং কেউ কেউ বলেন, এই উপজাতি সমূলে নির্বংশ হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, না, দু-একটা উটকো হেথা-হোথা বেঁচে আছে এবং বংশরক্ষার জন্য বধূ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি সঠিক জানি নে।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহুদীরাই—শুদ্ধমাত্র ইহুদী পরিবারে

জন্ম নেবার 'অপরাধ'-এর ফলেই—প্রাণ দিয়ে খেসারত দেয় সর্বাধিক।

এ বাবদে অন্যতম উৎকৃষ্ট দলিল সৌভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষাতেই উৎকৃষ্টরূপে অনূদিত হয়েছে। একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ইহুদী মেয়ের ডাইরি বা রোজ-নামচা। যুদ্ধের সময় লেখা। বাংলাতে বইখানির নাম 'আন্ ফ্রাঙ্কের ডায়ারী', অনুবাদক শ্রীঅরুণকুমার সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমি মেয়েটির রোজনামচা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি; পরে সুযোগ পেলে সবিস্তার আলোচনা হবে। ডাইরিকে উদ্দেশ করে মেয়েটি লিখছে—

'শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৪২

আজ তোমাকে কেবল খারাপ খবর শোনাবো। আমাদের ইহুদী বন্ধুদের দলে দলে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এইসব হতভাগ্য ইহুদীদের সাথে গেস্টাপো পুলিস যে কি নির্দয় ব্যবহার করছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এদের গরু-ছাগলের গাড়িতে বোঝাই করে ড্রেণ্টের (Drente) ওয়েস্টারবর্ক (Wester-bark) বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়েস্টারবর্কের নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একশো লোকের জন্য মাত্র একটি হাত-মুখ ধোবার কল। পায়খানা নেই বললেই চলে। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের একই জায়গায় শোবার ব্যবস্থা। এর ফলে, ব্যাপকভাবে নরনারীর চরিত্রস্খলন হচ্ছে। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, এমন কি অল্পবয়সী মেয়েরাও গর্ভবতী হয়ে পড়ছে।

বন্দিশালা থেকে পালানো অসম্ভব। বন্দিশালার অধিবাসীর মার্কা হিসাবে এদের সকলের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে। খাস হল্যাণ্ডেই যখন এই অবস্থা তখন দূরদেশে স্থানান্তরিত করে এদের উপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস যে, তাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ রেডিও থেকে বলা হচ্ছে যে, তাদের গ্যাস দিয়ে মারা হচ্ছে।

বোধ করি, এইটিই হত্যা করার সব-চেয়ে সহজ পন্থা। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। মিয়েপের মুখে এইসব ভয়ঙ্কর গল্প শোনবার সময়, আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল, অথচ না শুনেও পারছিলাম না।

সম্প্রতি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তার বাড়ির দরজার সামনে বসে ছিল। হঠাৎ পুলিসের গাড়ি তার বাড়ির সামনে এসে থামল, আর গাড়ি থেকে গেস্টাপো পুলিস নেমে তাকে হুকুম করল, 'গাড়িতে উঠে এসো'। পঙ্গু হতভাগিনী চলতে পারে না, কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িতে উঠতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে গেল। জর্মনরা তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলল।

জর্মনদের আর একরকম অত্যাচারের নাম হল প্রতিশোধমূলক হত্যা। ব্যাপারটা এই রকম—নিরীহ নাগরিকদের জামিনস্বরূপ জেলে পুরে রাখা হয়। যখনই হল্যাণ্ডের কোথাও জর্মনদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তার প্রতিশোধস্বরূপ, নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে জেল থেকে টেনে বের করে গুলি করা হয়। তারপর তাদের মৃত্যু-সংবাদ কাগজে ছাপানো হয়। এই হল হিটলারতন্ত্রের আসল রূপ। এরা আবার নিজেদের আর্য বলে গর্ব করে।

তোমারই আন'

ভরা ডুবি (আন ফ্রাঙ্ক)

আজকালের মধ্যেই তো ৬ই জুন। শুধু ইয়োরোপের না, বিশ্বের ইতিহাসেও এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন। আজ থেকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে ঐ দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্যে জাহাজ ভর্তি করে ফ্রান্সের নরর্মাদি উপকূলে মার্কিন-ইংরেজ অবতরণ করে। এরকম বিরাট নৌবহর নিয়ে এ-আকারের একটা অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সারা বিশ্বে এটা 'ডী ডে' নামে পরিচিত এবং স্রেফমাত্র কূলে অবতরণের ঐ একটি দিবস নিয়েই এত কেতাব লেখা হয়েছে যে একটা মানুষ দশ বছরেও সেগুলো পড়ে শেষ করতে পারবে না। এবং নূতন নূতন বই লেখা হচ্ছে। এর বুঝি শেষ নেই। তাই বোধ হয় এটাকে 'দীর্ঘতম দিবসও' বলা হয়, যদ্যপি জ্যোতিষ অনুযায়ী এটি দীর্ঘতম দিবস নয়।

ফিল্মও হয়েছে। তারই বদৌলত যাঁদের যুদ্ধ বাবদে কৌতূহল সীমাবদ্ধ তাঁরাও অনেকখানি ওয়াকিফ-হাল হয়ে গিয়েছেন। যদ্যপি ফিল্মটি বড্ডই একপেশে ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সুশীল পাঠক তোমাকে অভয় দিচ্ছি, আমি এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবো না—যে-সব মহারথীরা এ-বিষয়ে বিরাট বিরাট ভলুম ভলুম কেতাব লিখেছেন পার্কার শীফার মঁ ব্লাঁ ফাউনটেন পেন দিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেবে আমার ভোঁতা কঞ্চির কলম!

আমার বর্তমান উদ্দেশ্য ভিন্ন।

ঐ ১৯৪৪ সালের মার্কিনিংরেজ অভিযানের প্রায় দেড়-দুই বৎসর পূর্বের থেকেই সারা ইয়োরোপময়—এমন কি প্রাচ্যেও—জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল ওরা জর্মনিকে হুড়ো দেবার জন্য ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে জর্মন নির্মিত আটলানটিক উয়োলে হানা দেবে কবে, কোন্ জায়গায়? এই জল্পনা-কল্পনা সর্বাপেক্ষা

উৎকণ্ঠ আকণ্ঠ আগ্রহে, আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ইয়োরোপের সর্বত্র লুক্কায়িত কিংবা কনসানট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী ইহুদীরাই ছিল প্রধানতম।

আন্ ফ্রাঙ্ক তার ডাইরিতে মার্চ মাসে অর্থাৎ 'ডী ডে'র তিন মাস পূর্বে লিখছে: 'সেটা ছিল রবিবার, রাত্রি ন'টা। উইনস্টন চার্চিল সেদিন বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সে বক্তৃতার মধ্যে সত্যিকারের আশার আলো দেখতে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছিল না—ছিল হিটলার-নিপীড়িত অগণিত নরনারীর প্রতি আশ্বাসের বাণী। সেই সময়টা মনে হয়েছিল যে আমাদের এই গোপন-আবাসে আমরা অসহায় ও নিঃসঙ্গ নই। এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলছে।'

কিন্তু আন্ সরলা হলেও এ-বাবদে রীতিমতো বুদ্ধিমতী। ঐ গোপন আবাসে যে আটটি প্রাণী প্রতিদিন জল্পনা-কল্পনা করছে তার নীর সরিয়ে ক্ষীরটুকু সযত্নে সংগ্রহ করে তার ডাইরিতে লিখে রাখছে, এদের ভিতর বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সেই আন্। আর খাসা রসিয়ে রসিয়ে—

একজন হয়তো বললে, কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর জন সবজান্তার মতো বলল, তা কি হবে? ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে আক্রমণ করা কি এতই সোজা! আবার একজন বললে, 'একবার ফ্রান্সে নামতে পারলে, এক মাসের মধ্যে বার্লিন পৌঁছে যাবে।' আর একজন রণবিশারদ্ বলে উঠলেন, 'এক বৎসরের কম কিছুতেই বার্লিন পৌঁছতে পারবে না।' আন্ এর অভিমত দিয়ে এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছে। এবং এর কথা আখেরে ফলেছিল। 'ডী ডে' হয় ৬ই জুন; তার এগারো মাস পরে ৮ই মে জর্মনি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন, ইংরিজিতে নাকি সিক্সেস্ অ্যাণ্ড সেভেনস, ফার্সীতে শশ্ (ষষ্ঠ) ও পন্‌জ (পঞ্চ) বলে—অবশ্য অল্প ভিন্নার্থে। মোদ্দা: এগারো মাস যা, বারো মাস তা।

কিন্তু এইমাত্র বলেছি, আন্ সুচতুরা বালা।

কারণ যদ্যপি সে বলেছে, 'এক বিশাল দুনিয়া জুড়ে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য তোড়জোড় চলেছে', তথাপি সে অন্তরে অন্তরে জানে মার্কিনিংরেজ বাবুরা নিছক খয়রাতি কর্ম করার জন্য, দু-হাতে চ্যারিটেবল হসপিটাল ছড়াতে ছড়াতে 'ডী ডে'-তে ফ্রান্সে নামবেন না। তাই ঐ দিবসের এক মাস পূর্বে লিখছে, 'আমাদের এখানে সকলেই এখন আশা করছে যে মিত্রপক্ষের (অর্থাৎ মার্কিনিং-রেজ) অভিযান খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হবে; কারণ রাশিয়া সমস্ত ইউরোপ দখল করে নেবে, এ তারা কিছুতেই হতে দেবে না।'

অতিশয় হক্ কথা। আন্ ঐ বয়সেই বাবুদের 'সচ্চরিত্রে'র কিছুটা চিনে গিয়েছে, নিছক ঈশ্বরপ্রসাদাৎ! আমরা ইংরেজকে বিলক্ষণ চিনি, চোখের জলে নাকের জলে হাড়ে হাড়ে।

কিন্তু মুক্তি পাবার আশা উৎকণ্ঠা উত্তেজনার মাঝখানেও দেখুন, এই কুমারীটি কি রকম শান্তভাবে উভয় পক্ষের দায়িত্ব ওজন করে দেখছে। 'ডী ডে'র ঠিক এক পক্ষ পূর্বে সে লিখছে: '…আশা এবং উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছে গেছে। কেন এখনো আক্রমণ হচ্ছে না, ইংরেজরা কেন এত দেরি করছে, তারা কি কেবল তাদের নিজের দেশের জন্য লড়ছে, হল্যাণ্ডের প্রতি কি তাদের কোনো দায়িত্ব নেই? কিন্তু ইংরেজদের আমাদের প্রতি কীই বা দায়িত্ব আছে? আমরা আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছি? জর্মন অধিকৃত দেশগুলোর মধ্যে কবার কটা বিদ্রোহ হয়েছে? নিজের মুক্তি নিজেরই অর্জন করতে হয়— অন্য দেশের কি মাথাব্যথা পড়েছে যে কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে সৈন্যসামন্ত পাঠাবে? আক্রমণ একদিন হবেই, কিন্তু তা আমরা চাইছি বলে নয়, ইংরেজ এবং আমেরিকার নিজেদের স্বার্থে।'

এই চরম দ্বন্দ্বের মাঝখানে মেয়েটির ভগবানে বিশ্বাস, অন্তিমে সত্যের সর্বজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রত্যয় এবং সর্বোপরি তমসাচ্ছন্ন পাশ্চাত্ত্যে নবীন উষার উদয়, নবীন জীবনের অভ্যুদয় সম্বন্ধে এ বালাটির পরিপূর্ণ আশাবাদ—তার পরিচয় আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কিছুতেই প্রকাশ পাবে না।

তবু মাঝে মাঝে মেয়েটি কিন্তু ভেঙে পড়তো।

একদিন লিখছে, 'প্রিয় কিটি, এক নিদারুণ হতাশা এবং অবসাদ আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখন মনে হচ্ছে যে এ যুদ্ধ বুঝি আর কখনও শেষ হবে না। যুদ্ধ মিটে যাওয়া যেন বহু দূরের রূপকথার রাজ্যের ব্যাপার বলে এখন মনে হচ্ছে।' তার দেড় মাস পরে বলছে, 'আবার আমার অবস্থা ভেঙে পড়বার মতো হয়েছে। এই গোপন আবাসে এখন সবই বিষাদময়।…হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু— দুটোর যে-কোনো একটা তাড়াতাড়ি ঘটুক। ভগবান এই আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা থেকে আমাদের রেহাই দাও।

তোমারই আন্'

কিন্তু এর মাত্র এগার দিন পরেই—

কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

'মঙ্গলবার, ৬ই জুন, ১৯৪৪ (অর্থাৎ ডী ডে—লেখক)

প্রিয় কিটি,

আজ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অবশেষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল। ফরাসী উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল অবতরণ করছে।...

জর্মনির খবরেও স্বীকার করা হয়েছে যে ফরাসী উপকূলে ব্রিটিশ প্যারাশুট বাহিনী অবতরণ করেছে।...

আমাদের গোপন আবাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি যা এতদিন আমাদের কাছে ছিল সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মতো, তা কি সত্যিই আমাদের কাছে এল? সত্যিই কি ১৯৪৪ সালের মধ্যে বিজয়লাভ করব?

হতাশার অন্ধকার ছিন্ন করে আবার আশার আলোক জেগেছে।'

কিন্তু পাঠক, এর পর দিনের পর দিন, মিত্রশক্তি যেমন যেমন ফ্রান্স জয় করে এগিয়ে আসতে লাগলো, আর আন্ সোল্লাসে তার ডাইরিতে সেগুলো লিপিবদ্ধ করলো তার উদ্ধৃতি আমি দেব না। আপনারা ডাইরিখানা পড়ে দেখবেন। সে প্রতিদিন আশা করছে মিত্রশক্তি হল্যাণ্ড জয় করে তাদের মুক্তিদান করবে। এবং এইটুকু বলবো, এ-যুদ্ধের শেষাঙ্ক সম্বন্ধে যে-সব বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে আন্ ফ্রাঙ্কের ডাইরি সর্বপ্রথম সর্বপ্রধান পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু হায়! হায়!' শেষরক্ষা হল না।

২১ জুলাই আন্ বেতারে শুনলো, হিটলারকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, আর হিটলার হন্যে হয়ে দোষী-নির্দোষী হাজার হাজার জর্মনকে ফাঁসী দিচ্ছেন। আন লিখছে, 'এই রকম করে হতভাগারা যদি নিজেরা মারামারি করে মরে, তাহলে ইংরেজ-আমেরিকা আর রুশদের কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। আমাকে কি বড় খুশী মনে হচ্ছে? সত্যি, আমি যে আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে এই অক্টোবর মাসেই আবার আমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।

একে তুমি আকাশ-কুসুম কল্পনা বলছ? বার্লিনের দিকে ধাবমান সৈন্যদের পদধ্বনি বলছে, না এ আকাশ-কুসুম নয়। এ সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।'

কিন্তু হায়, পাড়ে এসে ভরাডুবি হল। এর কয়েকদিন পরেই জর্মন পুলিস আন্দের গুপ্তাবাস আবিষ্কার করে সবাইকে গ্রেপ্তার করে কনসানট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাল। তারপর কি হয়েছিল সেটা, কঠোর পাঠক, দয়া করে আমাকে পুনরাবৃত্তি করার হুকুম দিয়ো না।

আন্ ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে আমার হয়তো আরো অধিক-কিছু লেখাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কারণ ইতিমধ্যেই হাতে-কলমে সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, একাধিক দরদী পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আন্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শুধ্ তাই নয়, এ বাবদে আমার মতো নগণ্য লেখক একজন প্রখ্যাত বাঙালী লেখকের সহৃদয় একখানি চিঠি পেয়েছে। তিনি লিখেছেন:

সম্প্রতি এর্নাকুলাম থেকে একটি মহিলা (ইনি আমার '—'এর মালায়ালাম অনুবাদ প্রকাশ করেছেন) জানতে চেয়েছেন—আন্ ফ্রাঙ্কের লেখা The Diary of a Young Girl বইখানার বাংলা অনুবাদ কে করেছেন, তাঁর ঠিকানা কি এবং প্রকাশক কারা। এখানে বসে কি করে খবরটা সংগ্রহ করা যায় যখন ভাবছি, 'দেশ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় আপনার 'পঞ্চতন্ত্রে' এ বিষয়ে অনুবাদ-কের নাম পেয়ে গেলাম। এঁদের ঠিকানা কি আপনি জানেন?—ইত্যাদি।

আন্ সম্বন্ধে যখন সেই সুদূর কেরালায়ও এতখানি কৌতূহল রয়েছে তখন আমার পক্ষে হয়তো এ-নিয়ে আর অত্যধিক বাগ্‌বিন্যাস করা উচিৎ হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো কাঁচা লেখক একটি বিষয়েই এমনি মজে যান যে সে দ' থেকে আর সহজে বেরুতে পারেন না। আমার হয়েছে তাই। কিংবা বলতে পারেন, 'একে তো ছিল নাচপাগলী বুড়ী, তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।' কিংবা তারো বাড়া:

কী কল পাতাইছো তুমি
বিনা বাইদ্দে (বাদ্যে) নাচি আমি !!

অতএব বরদাস্তশীল পাঠকের সামনে আন্-এর আরো একটু সামান্য পরিচয় নিবেদন করি।

আন্-এর রসিকতাবোধ ছিল অসাধারণ। তার তেরো বৎসর বয়সে ক্লাস টিচার আদেশ দিয়েছেন 'বাচালতা' সম্বন্ধে রচনা লিখতে। আন্-এর 'বাচালতা'র শাস্তিস্বরূপ!

'ফাউন্টেন পেনের ডগা কামড়াতে কামড়াতে ভাবতে লাগলাম—কি লেখা যায়? হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বরাদ্দ তিন পাতা লিখে ফেলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। আমার যুক্তি হল, বক বক করা নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। যদিও বাচালতাকে সংযত করার চেষ্টা করা উচিত, তবুও এই দোষ থেকে আমার একেবারে মুক্ত হওয়া উচিত হবে না, কারণ আমার মা, আমারই মতো এবং সময় সময় আমার চেয়েও বেশী কথা বলেন। সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাব-

ধর্ম কি করে ত্যাগ করতে পারি ? আমার যুক্তি শুনে মিঃ কেপ্টরকে (শিক্ষককে) হাসতে হল।'

আমরাও হাসছি। কিন্তু আন্-এর শেষ দুর্গতির কথা স্মরণে আছে বলে চোখের জলের ফাঁকে ফাঁকে। সেই প্রাচীন দিনের এক হতভাগ্যের গান,

'I am dancing with tears in my eyes'.

সবেমাত্র চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আন্ তাদেরই সঙ্গে লুক্কায়িত একটি ইহুদি ছোকরার প্রেমে পড়ে। তখন লিখছে—আমি কেটে-ছেঁটে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

'রবিবার ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

কালকের দিনটা আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন। প্রথম চুম্বন। প্রত্যেক মেয়ের জীবনেই এক স্মরণীয় ঘটনা এবং সেই জন্যেই কালকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। কাল সন্ধ্যাবেলা পিটারের ঘরে আমরা দু'জনা চৌকির ওপর বসে ছিলাম। খানিকক্ষণ পরে ও আমার কাঁধের উপর হাত রাখল। আমিও ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ও তখন আমাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। এর আগেও আমরা অনেকবার এই রকম পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বসেছি, কিন্তু এবার আমাদের সান্নিধ্য অনেক নিবিড় ও উষ্ণ। আমার বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছিল।...ঐ সময় আমার যে কি আনন্দ হচ্ছিল, তা লিখে বোঝাতে পারব না...তার পরের মুহূর্তগুলো আমার ঠিক মনে নেই। নিচের দিকে যাবার জন্য যখন পা বাড়িয়েছি, ও তখন হঠাৎ আমায় চেপে ধরে আমার কপালে, গালে, গলায় এবং বুকে বার বার চুমু খেতে লাগল। আমি কোনো রকমে ওর হাত ছাড়িয়ে ছুটে নিচে পালিয়ে এলাম।

আজকের আবার ঐ মুহূর্তগুলির জন্য প্রতীক্ষা করছি।

তোমারই আন্।'

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র সাড়ে সতেরো। মনে হচ্ছে, এটি নিষ্পাপ কিশোর-কিশোরীর প্রথম প্রণয়।

এর পূর্বে আন্ অতিশয় সরলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে তার 'দেহের বহির্ভাগে বিস্ময়কর যা ঘটেছে', কিন্তু বলছে : 'দেহের অভ্যন্তরে যা ঘটেছে তা আরো রহস্যঘন বিস্ময়। ইতিমধ্যে আমি তিন বার ঋতুমতী হয়েছি।...এখন আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত সব কামনা জাগছে। কোনো কোনো দিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে নিজের স্তন দুটোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়। এ

বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।...'

এ স্থলে উদ্ধৃতিটি অসম্পূর্ণ রেখে বলি, ধন্য ধন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র। তিনি কী করে জানলেন বালিকা যখন কিশোরী হয় তখন তার দেহানুভূতি হৃদয়ানুভূতি!

ওগো তুমি পঞ্চদশী,
পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে॥
ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী
তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।
প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে॥
যেন অরণ্যমর্মর
গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর।
অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,
ছলো ছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে॥'

এই যে "যেন অরণ্যমর্মর / গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষে থরথর" ঠিক সেই অনুভূতিই তো আন্‌ প্রকাশ করছে যখন সে বলছে 'এ-বক্ষের ছন্দোময় স্পন্দন শোনবার জন্য আমি কান পেতে থাকি।'

ততোধিক আশ্চর্য, ঠিক ঐ সময়েই প্রেমবোধের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মবোধও জাগ্রত হয়েছে। তার দয়িত পিটারের কথা ভাবতে ভাবতে বলছে,

'এর উপর আরো বিপদ, ও ধর্ম ও ভগবান মানে। ধর্ম মানুষের এক বিরাট অবলম্বন—স্বর্গীয় বিধানের উপর ক'জন লোক পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারে?

(রবীন্দ্রনাথের 'আমার গুরুর আসন কাছে / সুবোধ ছেলে ক'জন আছে?' —লেখক) কিন্তু যারা পারে, তারা সত্যিই সুখী। আর নিজের বিবেক যখন ধর্মের বিধানের সঙ্গে যোগ খেয়ে যায় তখন যে শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই!'

এ-অধম স্তম্ভিত। 'ধর্মের বিধানে'র সঙ্গে যে প্রায়ই বিবেকের দ্বন্দ্ব লাগে সেটা সে ঐ অতি অল্প বয়সে হৃদয়ঙ্গম করলো কী করে!

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয় ইহুদিদের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল রাইন নদীর পারের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর। এরই এক পরিবারে আন্‌ ফ্রাঙ্কের জন্ম ১২ই জুন, ১৯২৯-এ[১]। ১৯৩৩-এ হিটলার গদিনশীন হলে পর আন্‌-এর পিতা

১ আন্‌ তিন-তিনবার তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন তাঁর জন্মদিন ১২ জুন।

সপরিবার হল্যাণ্ডের আম্‌স্‌টের্ডাম চলে যান। (আইনস্টাইনও ঐ বৎসরে আমেরিকা যান)।

স্বয়ং আন্ লিখছেন (তখন তাঁর বয়স তেরো): 'আমাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা জর্মনিতে রয়ে গেলেন তাঁরা নাৎসিদের হাতে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। তখন আমার দু'-মামা আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। তাঁদের জন্য আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতাম। ১৯৩৮ সালে যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা লাগানো শুরু হল, তখন আমার বুড়ী দিদিমা আমাদের কাছে চলে এলেন। তাঁর বয়স তখন ৭৩।'

১৯৪০-এর মে মাস থেকে আরম্ভ হল হল্যাণ্ডবাসী তাবৎ ইহুদিদের বিপর্যয়। হিটলার হল্যাণ্ড দখল করে এমন সব আইন পাস করলেন যাতে করে ইহুদিদের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো।

হিটলার হল্যাণ্ড বিজয়ের দুই বৎসর পরও আন্ লিখছেন:

'হাজার রকম বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন কাটতে লাগল। আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছুই রইল না। তবুও তখন অবস্থাটা একেবারে অসহ্য হয়নি।'

বেচারী আন্—আন্ কেন, কজন ঐ ১৯৪২-এ জানতো যে হিটলার ১৯৩৯ সালেই মনস্থির করে গোপনে হুকুম দিয়েছেন, নির্যাতন উৎপীড়ন দিয়ে আরম্ভ করে শেষটায় ইহুদিদের সবংশে ও সমূলে নিধন করতে হবে। বিশেষ করে হল্যাণ্ড দেশটিতে যেন একটি ইহুদিও জীবন্ত না থাকে।

কিন্তু আন্-এর পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। ৫ই জুলাই ১৯৪২ সালে আন্ লিখেছেন,

'একদিন বাবার সঙ্গে পার্কে বেড়াচ্ছিলাম, বাবা হঠাৎ আমাকে বললেন "শোন আন্, এখন যত পারো আনন্দ করে নাও, কেন না খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে চলে গিয়ে কোনো নতুন জায়গায় লুকোতে হবে।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন বাবা, এখান থেকে কোথায় যাব? লুকোতেই বা হবে কেন?" তিনি বললেন, "জর্মনরা এসে আমাদের ধরবার আগেই আমরা

অথচ প্রামাণিক জর্মন্ বিশ্বকোষ ড্যার গ্রসে ব্রহহাউস (১৯৫০, অ্যারগান্‌ৎ-স্থংসবান্ট, পৃ ১৫৭) লিখছেন ১৪ই জুন। জর্মন-প্রবাসী কোনো বঙ্গসন্তান যদি অনুসন্ধান করে পাকা খবর জানান তবে উপকৃত হই। তবে কি ইহুদি ক্যালেন্-ডারের সঙ্গে চালু ক্যালেন্‌ডারের কোনো ফেরফার আছে?

লুকিয়ে পড়ব।" ব্যাপারটা তখনও ভাল করে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।'

এর পাঁচ-সাত দিন পরই ফ্রাঙ্ক পরিবারকে তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শহরের অন্যপ্রান্তে চারতলার পিছনের দিকে গুটিকয়েক কুঠুরিতে গোপন আশ্রয় নিতে হল। এদের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ইহুদি পরিবারও আশ্রয় নেয়। সবসুদ্ধ আটটি প্রাণী। প্রায় দুই বৎসর এখানে লুকিয়ে থাকার পর এদের সকলেই ধরা পড়ে। এর পরের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

এই দুই বৎসর ধরে আন্ তাঁর ডাইরিটি লিখে যান। যখন ডাইরিটিতে লিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স তেরো, যখন ধরা পড়েন তখন তাঁর বয়স পনরো বৎসর। ষোল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আন্ জর্মন কনসানট্রেশন ক্যাম্পে টাইফাস জ্বরে অসহ্য যন্ত্রণা ভুগে মারা যান। তাঁর আঠেরো বছরের দিদি মারগট (মারগারেট)-এরও টাইফাস হয়েছিল এবং ক্যাম্পের একই কামরায় রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উপরের বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। ঐ একই সময়ে এঁদের মা-ও ক্যাম্পে মারা যান। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। পরিবারের মাত্র একজন, পিতা অটো দৈববলে অবলীলাক্রমে বেঁচে যান।

এই ডাইরিখানার বৈশিষ্ট্য কি ?

যুদ্ধশেষে, মোটামুটি ১৯৪৯ সালে ডাইরিখানা ডাচ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে বইখানি জর্মনে অনূদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপ আমেরিকাতে প্রচুরতম খ্যাতিলাভ করে। কয়েক বছরের ভিতরই বইখানা ন্যূনাধিক ত্রিশ-চল্লিশটি ভাষায় অনূদিত হয়। অনবদ্য বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীঅরুণ সরকার ও শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে ডাইরিটি অবলম্বন করে যে নাটকটি রচিত হয়—সেই জর্মন বিশ্বকোষের ভাষায়—বিশ্বের সর্বমঞ্চে অভিনীত হয়েছে (য়ুবার ডী বুনেন ড্যার ভেল্ট্)। ফিল্ম জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কম, তবে শুনেছি এর ফিল্ম নাকি এদেশেও এসেছিল।

ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের লেখা একটি রোজনামচা কী করে এতখানি খ্যাতি অর্জন করলো। এ যেন সেই 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কী গো বিস্ময় !'

বইখানা যতবার পড়ি ততবার মনে হয় এর পাতার পর পাতা তুলে দিয়ে 'কত না অশ্রুজল' পর্যায়ের সমাপ্তি টানি। কিন্তু স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে সেটা

সম্ভবপর নয়। তবে আন্-এর কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয় দেবার জন্য অত্যল্প তুলে দিচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে তুলে দি আন্ কিভাবে রোজনামচা লেখা শুরু করেন।

শনিবার, ২০ জুন ১৯৪২ (জর্মনি কর্তৃক হল্যাণ্ড দখলের দুই বৎসর পরে—লেখক)

'আমার ডায়েরি লেখার খেয়াল একটু অদ্ভুত। আমার বয়সী কোনো মেয়ে ডাইরি লেখে বলে তো আমি শুনিনি। আর তেরো বছরের মেয়ের মনের কথা জানবার কারই বা মাথাব্যথা পড়েছে? কিন্তু তবুও আমি লিখছি। আমার মনের গহনে যে সব ভাব রয়েছে, সেগুলোকে আমি প্রকাশ করতে চাই।

একটি প্রবাদ আছে : "মানুষের থেকে কাগজ অনেক বেশী সহিষ্ণু"। একদিন নিরানন্দ আলস্যের মধ্যে গালে হাত দিয়ে যখন ভাবছিলাম, কি করে সময় কাটানো যায়, সেই সময় এই কথাটা আমার মনে এল।

এখন আমার সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই।'

এরপর আন্ বলছেন তাঁর বাপ, মা, বোন এবং প্রায় ত্রিশজন বন্ধু আছেন। এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে আমাদেরই মতো 'গুষ্টিসুখ' অনুভব করতে খুবই ভালোবাসে।

তবু আন্ বলেছেন, 'কিন্তু তবু আমি নিঃসঙ্গ। সুতরাং এই নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আমি এই ডাইরি লিখছি; কিন্তু এই ডাইরি আমি চিঠির আকারে লিখব। আমি এক কাল্পনিক বন্ধু ঠিক করেছি—তার নাম কিটি (ইংরেজিতেও কিটি, ক্যাৎরীন—লেখক), আমার এই ডায়েরি কিটিকে লেখা চিঠির আকারে লিপিবদ্ধ হবে।'

পাঠকের মনে এস্থলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্ কি জানতেন তাঁর এ-রোজনামচা একদিন প্রকাশিত হবে?

আন্‌কেই বলতে দিন :

'বুধবার ২৯শে মার্চ, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

বলকেস্টাইন নামে একজন মন্ত্রী লণ্ডন থেকে একদিন বেতার-বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল—হল্যাণ্ডের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন—জর্মন অধিকৃত অঞ্চলের লোকেদের ডায়েরি যোগাড় করতে হবে; তা যদি হয়, তা হলে আমার এই ডায়েরির খুব কদর হবে। ভাবতে কী মজাই না লাগছে! বাস্তবিক দশ বছরে পরে আমার এই ডায়েরি যদি লোক পড়ে (প্রকৃত প্রস্তাবে দশ নয় পাঁচ বছর পরেই বিশ্বজন এই

বইখানিকে হৃদয়ে টেনে নিয়ে তার প্রভূততম 'কদর' দিয়েছে—লেখক) তা হলে আমরা এখানে কি অবস্থায় কাটিয়েছি, তা জেনে তারা অবাক হবে।'

এর দেড় মাস পর আন্ আবার কিটিকে জানাচ্ছেন :

'কিন্তু জীবনের চরম লক্ষ্য সাংবাদিক ও বড় লেখিকা হওয়া—সে কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলি না। আমার এই অলীক আশা কোনোদিন সফল হবে কিনা, তা ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু আমার ডায়েরি যুদ্ধ শেষ হলে আমি ছাপিয়ে বার করব—এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

তোমারই অ্যান্'

বস্তুত লেখিকা হতে হলে যে কটি গুণের প্রয়োজন আন্-এর সব কটিই ছিল, কিন্তু বিধাতা তাঁর জন্য রেখেছিলেন অকালমৃত্যু।

জানি না, আমার দরদী পাঠক এর থেকে কোনো সান্ত্বনা পাবেন কিনা। যে আন্-এর মৃত্যুর জন্য হিটলার হিমলার দায়ী, তাদের দুজনকেই আত্মহত্যা করতে হয় আন্-এর মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যে।

যে নাৎসি নেতা সাইস-ইন্‌কুভারট ফ্রাঙ্ক পরিবার গ্রেফতার হওয়ার সময় হল্যাণ্ডের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি প্রধানত হল্যাণ্ডে কৃত তাঁর কুকীর্তির জন্য ন্যুরন্‌বের্গ মোকদ্দমার বিচারের পর—আন্-এর মৃত্যুর দেড় বৎসর পর—ঝোলেন ফাঁসি কাঠে। গেস্তাপো নেতা কালটেন ব্রুনারও ঐদিন একই পন্থায় ও-পারে যান এবং তাঁর সহকর্মী আইকমানকে ফাঁসি দেয় ইহুদিরা কয়েক বৎসর পরে—ইজরায়েলে।

ধন্য অবাঙালী !

ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কতকগুলো ধারণা করে বসে আছে। যেমন স্কচ্ কিপ্টে, ফরাসী দুশ্চরিত্র, জর্মন ভোঁতা, ইংরেজ অবিশ্বাসী, এমন কি প্রখ্যাত ফরাসী সাংবাদিকা মাদাম তাবুই-এর একখানা বই আছে যার শিরোনামা 'লা পেরফিড আলবিয়োঁ' (বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ) দিয়ে আরম্ভ। (অবশ্য তিনি তাঁর পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা দিয়েছেন যে এ 'কুসংস্কারে'র জন্য ইংরেজ সম্পূর্ণ দায়ী নয়, ফরাসীও অনেকখানি)।

এরকম ঢালাও 'জাতিবিচার' থেকে ঐ যে ধারকর্জ দেনেওলা আমাদের নিরীহ কলকাত্তাই পাঠানও (চলতি ভাষায় কাবুলীওয়ালা) মুক্ত নয়। আমাদের

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসতো দুই ঈদের দিনে এক পাঠান। একবার কথায় কথায় বললে, 'আপকা কলকাত্তা শহরমে বহুৎ আচ্ছা আলু' চান্না হোতা হৈ।' আমরা তো অবাক—কলকাতা শহরের রাস্তার উপর যত লক্ষ লক্ষ গভীর গর্ত থাক না কেন কোনোটাতেই তো আজ অবধি আলু বা চানা ফলতে দেখিনি—সরকারের 'অধিক ফসল ফলাও' কান ঝালাপালা-করা প্রপাগাণ্ডা সত্ত্বেও! পাঠান ফের বললে, 'ঘর ঘর মেঁ।' আমরা তো আরো সাত হাত পানীমেঁ। শেষটায় বোঝা গেল পাঠান 'আলু চান্না' বলতে 'আলোচনা' বোঝাতে চেয়েছিল।

পাঠানের এই ঢালাও জাতিবিচার কিন্তু এ-স্থলে ভুল নয়। রকবাজি আড্ডা-বাজিতে কলকাত্তাইয়া এখনো অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল ধারণ করে। এই যে হালে আমরা নিউজীল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্রিকেট "খেললুম" ঠিক তার উল্টোটি। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হলে আমাদের রক-আড্ডাবাজির টিমে আছেন চারটে রণজী, তিনটে ব্রাডম্যান, দুটো লারউড, একটা নিসার আর গুগ্‌লির জন্য ঐ একটা বসান্‌কে। তা সে-কথা থাক। পাঠান বাস করে খাঁটি বাঙালী পাড়ায়—সাম্‌-বাজারে। রাস্তার পর রাস্তা পেরুতে পেরুতে সুবোশাম নিত্যি নিত্যি দু-পাশে দেখে রকের পর রক—মহাসভা, কানে যায় আলু চান্না।

কিন্তু পাঠানের দ্বিতীয় জাতবিচারটা একদম ভুল বেরুলো। বললে, '‘কলকত্তেমে বহুৎ অচ্ছী ফার্সী বোলী জাতী—হর্‌ রাস্তে পর।' বলে কী? আলু আর চানা তবু না হয় বুঝি; হয়তো বা পাঠান কলকাতার মুদীর দোকানে ঐ দুই বস্তু অত্যুত্তম সরেস জাতের পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় "অচ্ছী ফার্সী" বলা হয় এটা কেমনতর? পাঠান বোঝালে, দিনে অন্তত একশ' বার সে শুনতে পায় বহু কণ্ঠে, কিন্তু সর্বদাই অনবদ্য ফার্সী উচ্চারণে "ব্‌-তালাশে বক্রী"। এ-স্থলে বাঙালী পাঠককে বোঝাই "ব্‌" = with এবং for (যেমন ব্‌ কলমে-বকলমে শেখ ফিরোজ, বা ব্‌হাল = বহাল তবিয়ৎ, ব্‌মল = বমাল গ্রেফতার) "তালাশ" = তল্লাসী; এবং "বক্রী" = ছাগল। অর্থাৎ কোনো লোক বক্রীর তল্লাসীতে (for বক্রী) বেরিয়েছে।

এ কি কথা! আমরা তো কখনো শুনিনি।

এমন সময় বাইরে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা গেল। পাঠান লম্ফ দিয়ে সোল্লাসে বললে, ঐ তো বলছে ব্‌-তালাশে বক্রী।"

ওমা! ইয়াল্লা! ও হরি! ফেরিওলা চেঁচাচ্ছে "বোতল আছে বিক্রি!"

তাই বলছিলুম, এস্থলে পাঠানের জাতবিচারে ভুল হয়ে গেল।

এগুলোর নিষ্পত্তি তো সহজেই হয়ে গেল কিন্তু অন্যগুলোর বেলা? যেমন মনে করুন, লোকে বলে ফ্রান্সের লোক অসচ্চরিত্র। এবং সেই সূত্রে বহু বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে। তারই একটি:

এক ফরাসী নিমন্ত্রিত হয়েছে এক মার্কিন পরিবারে। বিস্তর হইহুল্লোড়। ফরাসী সঠিক বুঝতে পারেনি পরবটা কিসের। পাশে বসেছিল এক মার্কিন। তাকে কানে কানে শুধোলো, 'ব্যাপারটা কি?' মার্কিন বুঝিয়ে বললে, 'ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো-বুড়ী—এঁরা পঞ্চাশ বৎসর সুখে সহবাস করার পর আজ তাঁদের "বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী" পালন করছেন।' ফরাসী বললে, 'অ বুঝেছি। এঁরা পঞ্চাশ বছর সহবাস করার পর এই এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।' তারপর খানেকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললো, 'তা—তা ঐ নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড কেন? আমরা তো আকছারই করে থাকি।'

পাঠানের গল্প যে-রকম "জাতিবিচারে"র ব্যাপারে পরখ করা গেল, এখানে তো তা করা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যিই হুদো হুদো ফরাসী ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর সহবাস করার পর বিয়ে করে? প্রধানত জারজ সন্তানদের আইনত সন্তানরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে?

কিন্তু এ-বিষয়ে ফরাসীদের নিয়েই এ-গল্পটা তৈরী হল কেন?

আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি, এবং সেটা অস্ট্রিয়া দেশের ব্যাপার।

জনৈক অস্ট্রিয়ার লোক, য়োহান গেওর্গ হিটলার যখন একটি 'কুমারী'কে বিয়ে করলেন, তখন সেই 'কুমারী'র একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলে ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর পর ঐ মহিলার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে য়োহান হিটলার অস্ট্রিয়া থেকে অন্তর্ধান করলেন। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর তিনি আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে এবং একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষীর সামনে শপথ নিয়ে বললেন, তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পূর্বে ঐ যে সন্তান জন্মেছিল সে তাঁরই ঔরসের সন্তান।

এই লোকটিই জর্মনীর ফুরার আডলফ হিটলারের পিতা।*

এতক্ষণ ধরে আমি শুধু পটভূমি নির্মাণ করেছিলুম। এইবারে দেখি, সেয়ানা পাঠক, তোমার পেটে এলেম কতখানি।

মার্কিনরা চাঁদে গেছে শুনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মানবোধ

*W. Shirer; Aufsteg unid Fall in S. W. পৃষ্ঠা ৭।

হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'ভারতীয়েরাও যাবে।' কিন্তু শ্রীযুত সত্যেন বসু এ-বাবদে উদাসীন। তাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, 'চাঁদে যাঁরা যেতে চান তাঁরা আবেদন করুন।' বিস্তর দরখাস্ত এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে ইণ্টারভ্যুর জন্য ডাকা হল, একজন বাঙালী, বাকি দু'জন ভিন্ন প্রদেশের।

যে-কর্তা ইণ্টারভ্যু নিচ্ছিলেন তিনি প্রথম ডেকে পাঠালেন বাঙালীকে। শুধোলেন, 'চাঁদে যাওয়ার জন্য কত টাকা চান?'

'পাঁচ লাখ।'

'অত কেন?'

'এজ্ঞে, বুড়ো মা বাপ রয়েছেন। বোনটির বিয়ে দিতে হবে। দু'টো ছোট ভাই ইস্কুলে যায়। বিধবা পিসিও রয়েছেন। চাঁদ থেকে ফিরে না আসতে পারলে ঐ টাকাতেই তাদের চলে যাবে।'

কর্তা: 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

তার পর ডাকা হল দ্বিতীয় জনকে। সে-প্রদেশের লোক একটু ফুর্তিফার্তি করতে ভালোবাসে। বললে, 'দশ লাখ।'

কর্তা: 'অত কেন?'

'হানজী পাঁচ লাখ দিয়ে মদ্যপানাদি, কাবারে গমন, হেঁ হেঁ—রমণীসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিরে তো নাও আসতে পারি; তাই সর্বশেষ শখটখ। বাকি পাঁচ লাখ রেখে যাবো বুড়ো মা, বাপ, অবিবাহিত, ভগ্নী, দুই ভাই, বিধবা পিসির জন্য!'

কর্তা: 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

এরপর এলেন তৃতীয় এক প্রদেশের লোক। ইনি চাইলেন পনেরো লাখ।

কর্তা তাজ্জব মেনে বললেন, 'অত বেশী কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ডাইনে-বাঁয়ে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললে—

"বাবুজী, পনেরো লাখের পাঁচ লাখ তো তোমার। পাঁচ লাখ আমার। আর বাকি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ঐ ব্যাটা বাঙালীকে চাঁদে পাঠিয়ে দেব।"

এই বারে পাঠক, বের করো তো, দোসরা আর তেসরা ওমেদার কোন্ কোন্ প্রদেশের লোক? কিন্তু সাবধান! "প্রকাশককে" এ-বাবদে চিঠি দেবে না। তিনি ছাপাবেন না। আমাকেও লিখবে না। আম্মো উত্তর দেব না।

নট গিল্‌টি

সর্বপ্রথম যেদিন আমার লেখা ছাপাতে বেরুলো তার কয়েক দিন পরই 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মহাশয় আমাকে একখানি চিঠি রিডাইরেক্ট করে পাঠালেন। চিঠিখানা আমার উদ্দেশে লেখা। পত্রলেখক আমার ঠিকানা জানেন না বলে সেটি সম্পাদকের C/o করে লিখেছেন। এইটেই বিচক্ষণের লক্ষণ। এবং বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে, যে-সব স্পর্শকাতর পাঠকপাঠিকা কারো কোনো লেখা পড়ে মুগ্ধ হন, বিরক্ত হন বা বিচলিত হন তাঁরা যেন তাঁদের মানসিক, হার্দিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের মারফতে লেখকের কাছে পাঠান। এবারে বাকিটা বলছি।

প্রথম গোটা পাঁচেক চিঠি তো আমাকে অভিনন্দন জানালে। তার ধরন অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো পত্রলেখক আমাকে সবিনয়, সসম্মান, সশ্রদ্ধ আনন্দাভিবাদন জানালে, আর কোনো কোনো লেখক আমার পিঠ চাপড়ে মুরুব্বীয়ানা মোগলাই কণ্ঠে বললেন, 'বেশ লিখেছিস ছোঁড়া, খাসা লিখেছিস। লেগে থাক্। আখেরে টু পাইস্ কামাতেও পারবি।'

দ্বিতীয় পক্ষের মুরুব্বীয়ানা আমাকে ঈষৎ বিরক্ত করেছিল, সে-কথা আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু সেটা ক্ষণতরে। কারণ, আমি কাগজে লেখা আরম্ভ করি, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। ততদিনে বাস্তব জীবনে নানা প্রকারের চড়-চাপাটি খেয়ে খেয়ে আমার দেহে তখন দিব্য একখানা গণ্ডারের চামড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিস্তর মুরুব্বী এতদিন ধরে, আমার কর্মজীবনে আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে এন্তের সদুপদেশ দিয়েছেন। কই? আমি তো তখন চটিনি। অবশ্য এনারা উপদেশ দিয়েছিলেন বাচনিক; উপস্থিত যে-সব ঐ-জাতীয় মুরুব্বীয়ানার চিঠি আসছে সেগুলো 'লেখনিক'।

তাতে কীই বা যায় আসে!

কিন্তু আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগলো, এ-সব তাবৎ ব্যক্তিগত চিঠির প্রত্যেকটির উত্তর আমাকে স্বহস্তে লিখতে হবে কি না?

তা হলেই তো হয়েছে! কতখানি সময়, শক্তিক্ষয়, ডাকটিকিটের ব্যয়, কে জানে?

আমার টাইপরাইটার আছে। আমি অবশ্যই আধ ঘণ্টার ভিতর খান তিরিশেক কার্বন কপি তৈরি করতে পারি। তার বক্তব্য হবে 'Many

thanks for your good wishes.'

উঁহু। হল না।

যাঁরা চিঠি লিখেছেন তাঁরা সাহিত্যরসিক-রসিকা। তাঁরা চান, সাহিত্যিক উত্তর। লন্ড্রির চিঠিতে প্রশ্ন, 'আপনার অত অত নম্বরের জামাকাপড় ছাড়াচ্ছেন না কেন?' আপনি তখন ঐ গদ্যময় বেরসিক ভাষায়ই উত্তর দেবেন। কিন্তু এনারা তো সাহিত্যিক উত্তর চান।

ইতিমধ্যে আরেকখানি মোলায়েম চিঠি। তার বক্তব্য, মোটামুটি যা মনে আসছে, কারণ চিঠিখানা আমার বউ পুড়িয়ে ফেলেছেন:

'মহাশয়, আমার মনের গভীরতম কথাটি আপনি কী মরমিয়া ভাষায়ই না প্রকাশ করেছেন!' ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় তিন পাতা জুড়ে। পড়ে আমিও রোমাঞ্চিত হলুম। লেখিকাকে মনে মনে শুকরিয়া জানালুম।

কিন্তু ইয়াল্লা! আমি খেজুর গাছের শেষ আড়াই হাতের দিকে আদৌ খেয়াল করিনি। কিংবা বলতে পারেন, বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে বসে আছি।

চিঠির সর্বশেষে আছে, 'আমি পঞ্চদশী। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে স্বহস্তে দিতেই হবে!' এবং তার পরেই, সর্বশেষে মোক্ষম কথা: "এখন থেকে আমি পিওনের পদধ্বনি প্রতীক্ষায় প্রহর গুনব।'

সর্বনাশ, এ-স্থলে আপনি কি করবেন? আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে: 'অল-ইন্‌তিজারু আশাদ্দু মিনাল্ মউৎ।' অর্থাৎ 'প্রতীক্ষা করাটা (ইন্‌তিজার) মৃত্যু চেয়েও কঠোরতর।

অনেক ভেবেচিন্তে একটি হ্রস্ব চিঠি লিখে পত্রলেখিকাকে ধন্যবাদ জানালুম এবং সর্বশেষে একটা অতি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিলুম যে, আমার বয়স বাড়তির দিকে, শক্তি কমতির দিকে, অতএব চিঠিচাপাটি লেখা বাবদে আমাকে যেন একটু সদয় নিষ্কৃতি দেওয়া হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর কি হল? আমি আশা করেছিলুম, এখানেই শেষ। মূর্খ আমি, জানতুম না, এইখানেই আরম্ভ।

দিন পনেরো পর ঐ 'পঞ্চদশী'র পাড়া থেকে এল আরো পাঁচখানা চিঠি! সব ক'টা চিঠি যে একই পাড়া থেকে, সেটা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাকে ব্যোমকেশ-হোম্‌স্ হতে হয়নি। মসজিদবাড়ি পাড়া, কলকাতা-৬ আমার বিলক্ষণ চেনা।

স্পষ্ট বোঝা গেল, পঞ্চদশীটি আমার চিঠিখানা তাঁর পাড়ার তাবৎ বান্ধবীকে দেখিয়েছেন।

এ-স্থলে পাঠকদের কাছে আমার একটি অতিশয় ক্ষুদ্র আরজী আছে। এবং সেটি যদি তাঁরা মঞ্জুর না করেন তবে আমি সত্য সত্যই মর্মাহত হব। এটা কথার কথা নয়, হৃদয়ের কথা। আমি জানি, আমি মোকা-বেমোকায় ঠাট্টা-মস্করা করি, কিন্তু আমার এ-আরজী মোটেই মস্করা-রসিকতা নয়—সিরিয়াস। আমার নিবেদন :

এই যে এতক্ষণ ধরে আমি আমাকে লেখা চিঠিপত্র নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটা আমার মূল্য বাড়াবার জন্য নয়।

আমি আল্লা মানি। আল্লার কসম খেয়ে এ-কথা বলছি।

আপনারা তারাশঙ্করাদি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের শুধোন—মিথ্যা বিনয় নয়, আমি তো ওঁদের অনেক পিছনে—তাঁরা কত না কত রঙের কত ঢঙের, কত না কল্পনাতীত জায়গা থেকে, কত না অবিশ্বাস্য ধরনের চিঠি পান।

ওঁরা যত চিঠি পান, তার শতাংশের একাংশও আমি পাই না।

এখানে এসে আমাকে আরেকটি কথা বেশ জোর গলায় বলতে হবে।

অদ্যাবধি কী দেশে, কী বিদেশে আমি একটি লেখকও পাইনি যিনি অপরিচিত পাঠকের স্বতঃপ্রবৃত্ত পত্র পেয়ে আনন্দিত হন না। এমন কি কড়া চিঠি পেয়েও লেখকরা খুব একটা বিমুখ হন না। তবে এ ধরনের চিঠি আসে কমই। কারণ স্বয়ং কবিগুরু বলেছেন,

"আমার মতে জগৎটাতে
ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ
ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।"

তবে লেখককুল 'তিন-চল্লিশ'-খানা 'মন্দ' চিঠি পান না, পান তার চেয়ে ঢের ঢের কম। তবে অন্য 'মন্দ' চিঠিগুলো যায় কোথায়? সেগুলো যায় সোজা সম্পাদক মহাশয়ের নামে। সেগুলোতে থাকে নানা প্রকারের প্রতিবাদ, মন্দ-মধুর সমালোচনা বা তীব্র কঠোর মন্তব্য। সম্পাদক আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন বলে কোনোটা ছাপান, কোনোটা ছাপান না।

এই ব্যবস্থাই উত্তম। বুঝিয়ে বলি :

আপনি আমাকে সরাসুরি চিঠি লিখলেন (সম্পাদক মহাশয়কে না), 'মহাশয়, আপনার শহর্-ইয়ার নিতান্তই কাল্পনিক রচনা। এ-রকম মুসলমান মেয়ে বাঙলা-দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব।' তারপর আপনি সুচারুরূপে আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত সম্পদ যুক্তিযুক্তভাবে প্রকাশ করলেন।

এ-স্থলে আমি করি কি ?

আপনি এ-স্থলে বলেছেন, 'তুমি, আলী, অপরাধী !'

এ-স্থলে চিন্তা করুন তো, কোন্ অপরাধী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমি অপরাধী, স্যর !—গিল্‌টি, মিলাট্ (মাই লর্ড) !'

ব্যাপার যদি এতই সরল হবে তবে তো আদালতের শতকরা নব্বুইটি মোকদ্দমা সঙ্গে সঙ্গে ফৈসালা হয়ে যেত।

কিন্তু আমি "নট্ গিলটি" বললেই তো অনুযোগকারী পত্রলেখক (প্রসিকিউশন, ফরিয়াদী) সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে নেবেন না।

তাই পুনরায় প্রশ্ন, এ-স্থলে আমি করি কি ?

এইবারে আমি আমার মোদ্দা কথাতে এসে গিয়েছি।

পত্রলেখক যদি তাঁর অনুযোগ আমাকে সরাসরি না লিখে সম্পাদক মশাইকে জানাতেন, তবে আমি বেঁচে যেতুম। সম্পাদক মশাই না ছাপালে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। অর্থাৎ মোকদ্দমা আদৌ আদালতে উঠলো না।

কিন্তু তিনি ছাপালেও আমি খুশী। কারণ, তখন যাঁরা এ-বাবদে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁরা আমার পক্ষ নিয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ভূরি ভূরি প্রমাণ পেশ করবেন যে, শহ্‌র্-ইয়ার আদৌ কাল্পনিক নয়।

আমার মনে হয়, এই পন্থাই (প্রসিডিয়র) সর্বোত্তম।

এ-বাবদ ভবিষ্যতেও লেখার আশা পোষণ করি।

ইতিমধ্যে, দোহাই পাঠক, তুমি আদৌ ভেবো না, আমি সরাসরি চিঠি পেতে আদপেই পছন্দ করি না। খুব পছন্দ করি, বিলক্ষণ পছন্দ করি।

কিন্তু সেগুলোর উত্তর দেওয়াটা যে বড়—॥

ব্রেন-ড্রেন

যাঁরা এদেশে গবেষণা করার সুযোগ পান না, তাঁদের অনেকেই ইংলণ্ডে চলে যান। আবার বিলিতি খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন, সেখানেও ওই একই ব্যাপার ; মেধাবী বৈজ্ঞানিক তার জুতো থেকে ইংলণ্ডের ধুলো ঝেড়ে ফেলে মার্কিন মুলুকে চলে যায়। সেখানে বেশী মাইনে তো পাবেই, এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে গবেষণা করার জন্য পাবে আশাতিরিক্ত অর্থানুকূল্য। অধুনা

'গৌরীসেন' মার্কিন সিটিজেন্‌শিপ গ্রহণ করে সেখানেই ডলার ঢালেন।...জর্মন কাগজেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই, ওদের তরুণ বৈজ্ঞানিকদেরও কিছু কিছু মার্কিন-মক্কায় চলে যাচ্ছে।

থাকি মফস্বলে। কলকাতায় পৌঁছলুম ল্যাটে। তবু দেখি, পাড়ায় ঝাণ্ডুতম রক খুরানা সায়েবের মার্কিন নাগরিকতা গ্রহণ নিয়ে সরগরম, মালুম হল, মতভেদ ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। রকের খলিফে-বেঞ্চ বলছেন, যে-যেখানে কাজের সুযোগ পাবে, সে সেখানে যাবে—বাংলা কথা। পক্ষান্তরে তালেবর-বেঞ্চ যুক্তিতর্ক সহ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, 'খুরানা মহাশয়ের উচিত ছিল দেশে থেকে দেশের সেবা করা। এবং উচিত-অনুচিতের কথাই যখন উঠলো তখন বলতে হবে এদেশের কর্তৃপক্ষই পয়লা নম্বরের আসামী। নিজেরা তো কিছু করবেনই না, যারা করতে চায় তাদেরও কিছু করতে দেবেন না। একেবারে ডগ অ্যানড দি ম্যানেজার—'

তালেবর পক্ষেরই এক ব্যাক-বেঞ্চার ক্ষীণকণ্ঠে শুধোলো, প্রবাদটা কি 'ডগ অ্যানড দি মেইনজার—' নয়?

'আলবৎ নয়। এখন এঁরা সব ম্যানেজার!'

এরপর কর্তাদের নিয়ে আরম্ভ হল কটুকাটব্য। আমি প্রাচীন যুগের লোক —ডাইনে বাঁয়ে চট করে একবার তাকিয়ে নিলুম। টেগার্ট সায়েবের প্রেতাত্মা আবার কোথাও পঞ্চভূত ধারণ করেননি তো!

খলিফে পক্ষের এক চাঁই মাথা দুলোতে দুলোতে বললেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। কাজ করতেও দেবে না। তবে শোনো, আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নীতি—যদিও সেটা তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেন না—ভিন্ন রাষ্ট্রের কাউকে আপন রাষ্ট্রে চাকরি দেবেন না। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক সাবজেক্টে ঝাড়া বিশটি বছর ধরে কেউ মাস্টার্স ডিগ্রীতে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। বুড়ো-হাবড়া অধ্যাপকরা রিটায়ার করতে চান না। ওদিকে পোস্ট গ্রাজুয়েটে কাউকে লেকচারার তক নেবেন না—যদি ফার্স্ট ক্লাসের 'হরিনাম' তার সর্বাঙ্গে ছাপা না থাকে। এদিকে চন্দনের বাটিটি বিশটি বচ্ছর ধরে তাঁরা ঝুলিতে লুকিয়ে রেখেছেন সযত্নে। শুধোলে অবশ্য বলেন, 'ঘোর কলিকাল মোশয়, ঘোর কলি-কাল। পাষণ্ড, পাষণ্ড, পাষণ্ডের পাল। অধ্যয়নে কি এঁদের কোনো প্রকারের আসক্তি আছে? পড়েননি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থানের প্রতিবেদন?—স্পষ্টাক্ষরে প্রকা-শিত হয়েছে "ছাত্রসমাজে, বিশেষ করে ছাত্রসমাজে, মদ্যাদি সেবন দ্রুতগতিতে শনৈঃ শনৈঃ বর্ধমান!"—এদের গায়ে কাটবো হরিনামের ছাপ! মাথা খারাপ!'

খলিফে পক্ষের আরেক 'খাজা' বললেন, 'বিলক্ষণ! ভাল্লুকের সব্বাঙ্গে লোম। এম-এর তেড়ি কাটবে কোথা?'

প্রথম চাঁই সোল্লাসে বললেন, 'বিলকুল! যে দেশের মেস্টার পুত্রবৎ ছাত্রকে স্নাতকোত্তর করতে চায় না, সে দেবে তাকে রিসার্চ করতে। ঐ আনন্দেই থাকো।'

খলিফের খাজা বললেন, 'যথা, পিতার প্রেতাত্মা দাবড়ে বেড়াবেন বিশ্বময়, কিন্তু পুত্রকে দেবেন না—এস্তেক পিণ্ড-দাদনখানে—পিণ্ড দিয়ে অশৌচ সমাপ্তি করতে।'

তালেবর বেঞ্চ চিড্ খেয়ে যাবার খাবি খাচ্ছে দেখে তাদের এক ঝানু তখন 'ফীলিঙে'র শরণাপন্ন হলেন।

এস্থলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হয়। দরদ, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহব্যথা, হৃদয়বেদনা এ-শব্দগুলো বড্ডই মোলায়েম মরমিয়া। অপিচ 'ফীলিঙ' কথাটার 'ফ' হরফে কট্টর জোর দিয়ে (অবশ্যই ইংরাজী 'F'-এর মতো উচ্চারণ না করে) শব্দটা বললে তবেই না গভীর ভাবানুভূতির খানিকটে প্রকাশ পায়![1]

সেই 'ফ' উচ্চারণ করে ঝানু-তালেবর ভাবাবেগে বললেন, 'pfi-লিঙ নেই, pfi-লিঙ নেই, সব ফলানা ফলানা খুরানাদের কারোরই ফীলিঙ নেই দেশের প্রতি। দেশে বসে কি রিসার্চ করা যায়—'

কথা শেষ না হতেই খলিফে পক্ষের আরেক গুণীন্ মিনমিনিয়ে বললেন, 'নৌকোতে বসে কি গুণ টানা যায় না!'

ওই পক্ষের আরেক জাঁহাবাজ বললেন, 'কিংবা মাতৃগর্ভে শুয়ে শুয়ে দেশভ্রমণ!'

এইবারে রকের বারোয়ারি 'মামা' মুখ খুললেন। ইনি আমাদের রকের প্রেসিডেণ্ট! এঁরই রকে আমরা দু-দণ্ড রসালাপ করি। কিন্তু ইনি থাকেন প্রাচীন দিনের একটি সোফাতে শুয়ে ঘরের ভিতরে। অনেকটা কবিগুরুর 'রাজা' নাটকের রাজার মতো। অবরে-সবরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' একটি লবজো ছাড়েন।

বললেন, 'সে রকম নিষ্ঠা থাকলে কি দেশে থেকেই রিসার্চ করা যায় না? সেইটেই হচ্ছে মোদ্দা কথা।[2]

১ অর্থাৎ 'প্রফুল্ল' শব্দ আমরা যে-ভাবে উচ্চারণ করি সে-ভাবে নয় মারওয়াড়িরা যে-ভাবে 'পর-ফু (pf)-ল্ল' উচ্চারণ করেন তারই 'ফ'।

বিজ্ঞানের বেলা অর্থাৎ এপ্লায়েড সায়েন্সের বেলা, আজকাল বিস্তর যন্ত্রপাতি, মালমসলার প্রয়োজন। তার জন্য প্রচুর আয়োজন; প্রচুরতর অর্থ না থাকলে এসব হয় না। অবশ্য, এ-কথাও সত্য জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কনি এবং আরো মেলা লোক এসব না থাকা সত্ত্বেও এন্তের কেরামতি দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব দিন হয়তো গেছে। আজকের দিনে স্বয়ং লেওনারদো দা ভিন্‌চিও সরকারী গৌরীসেনের সাহায্য ছাড়া এটম্ বম্ বানাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু পিওর সায়েন্স? পিওর ফিজিক্স, ম্যাথ্‌মিটিক্স,—আরো বিস্তর বিষয়-বস্তু আছে যার জন্যে কোনোই যন্ত্রপাতি টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় না—সে-গুলোর বেলা কি? তা হলে শোন, একটা গল্প বলি, সত্যি-মিথ্যে জানি নে, বাবা! একদা কালিফর্নিয়ায় এক বিরাট ইন্‌স্টিটুটে বিরাটতর টেলিস্কোপ লাগানো উপলক্ষে মাদাম আইনস্টাইনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সরলা মাদাম সেই দানবপ্রমাণ যন্ত্রটা দেখে তো একেবারে স্তম্ভিত।

'যেহোভার দোহাই!' প্রায় চীৎকার করে উঠলেন মাদাম: 'এ যন্তরটা লাগে কোন্ কাজে?'

বড় কর্তা হাত কচলাতে কচলাতে খুশিতে ফাটোফাটো হয়ে বললেন, 'মাদাম, এই যে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তার পরিপূর্ণ স্বরূপ (Gestalt) হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এটি অপরিহার্য। এ বাবদে আপনার স্বামী, আমাদের গুরুর অবদানও তো হেঁ, হেঁ—।'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাদাম বললেন, 'সে কি! আমার কর্তা তো ওয়েস্ট পেপার বাসকেট থেকে একটা পুরোনো খাম তুলে নিয়ে তার উল্টো পিঠে এসব করে থাকেন।'

'তবেই দেখো, হয়ও অনেক কিছুই যন্ত্রপাতি ছাড়াও।'

কিন্তু এসব বাদ দাও এবং চিন্তা করো, দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস, প্রাচ্যতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অলঙ্কার, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এন্তের এন্তের সবজেক্ট রয়েছে যার জন্য কোনো ক্ষুদে গৌরীসেনেরও প্রয়োজন হয় না।

মামা দম নিয়ে বললেন, 'এবারে বাবারা বলো, তোমরা তো অনেক সবজেক্টে অনেক পাস দিয়েছ; গত তিরিশ বছরে এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে কোন্ কোন্ মহাপ্রভুর দর্শন ইত্যাদি সবজেক্ট গবেষণার বিশল্যকরণী সমেত গন্ধমাদন উত্তোলন করে ভুবন "ভির্খাতো" হয়েছেন? বাঙলাদেশের কথা বিশেষ করে বলুন, কারণ একদা এদেশ হিন্দুস্থানের লীডার ছিল।'

মামার চোখে-মুখে ব্যঙ্গভরা বেদনা।

এইবারে আমি মুখ খোলার একটু মোকা পেয়ে বললুম, 'তা মামু-সায়েব— রিসার্চের জন্য কড়ি লাগুক আর নাই লাগুক, যে লোকটা রিসার্চ করবে তার পেটে, তার সমাজের আর পাঁচজনের পেটে যদি দুমুঠো অন্ন না থাকে তবে কি রিসার্চ হয় ? আজ এই কলকাতা শহরে আর সকলের পেটেই অন্ন আছে—নেই শুধু বাঙালীর।

মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যেন আপন মনে বিড়বিড় করে—'১৮২০ থেকে ১৯২০। ঐ সময়টায় কলকাতায় বাঙালী সচ্ছল ছিল। যা-কিছু করেছে ঐ সময়েই করেছে। আজকের দিনে দু-পাঁচটা প্রফেসরের দু-মুঠো অন্ন জোটে, এ-কথা সত্যি। কিন্তু তার আর পাঁচটা ভাইবেরাদর, মোদ্দা কথা তার গোটা সমাজ (Gestalt) যদি নিরন্ন হয় তবে এই দু-পাঁচটা প্রফেসরও কোনো কিছু দেখাবার মতো করে উঠতে পারে না। সী-লেভেল থেকে আচমকা এভারেস্ট মাথা উঁচু করে খাড়া হয় না ; তবে লেভেল অর্থাৎ তার সমাজ অনেকখানি উঁচু না হলে সে আকাশচুম্বী হবে কী করে ?'

আস্তে আস্তে মামা চোখ খুললেন। কড়া গলায় বললেন, '১৮২০ থেকে ১৯০০ কিংবা ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য—আর ঐটেই তো সমাজের সচ্ছলতা আনে—কাদের হাত থেকে কাদের হাতে গেল সেইটে একটু খুঁজে দেখ তো।' হেসে বললেন, 'ঐ নিয়ে একটা রিসার্চ কর না।'

বনে ভূত না মনে ভূত

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, দেশ-বিদেশে তো অনেক ঘুরলেন, বয়সও হয়েছে, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি ? সোজা বাংলায় ভূত, প্রেত, মামদো (মানুষ মরে ভূত হয় এটা ইসলাম অস্বীকার করে কিন্তু কোনো কোনো হিন্দুর বিশ্বাস "অয়, অয় Zিনতি পারো না। মুহম্মদী মানুষ—অর্থাৎ মুসলমান—মরে গিয়ে মামদো হয়—মুহম্মদী শব্দ গ্রাম্য বাংলায় হয়ে গিয়েছে "মামদো"। এস্থলে Zিনতি কথাটা ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হয়েছে—কারণ মামদো বলুন, ভূত বলুন, এনাদের তো চট করে চোখে দেখা যায় না—অতএব এনারা আছেন, ওনারাও আছেন, শুধু আমরা Zিনতি পারি না) এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতবেজাতের ভূতের কোনো একটা আমি দেখেছি কি না ?

জর্মন ভাষার দুটি শব্দ বাংলায় বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। একটা "কিণ্ডার-গার্টেন" আরেকটা—যদিও অতখানি চালু না—"রিণ্ডারপেস্ট", পশুচিকিৎসক মাত্রই চেনেন। আরেকটি শব্দ প্রচলিত হওয়ার বড়ই প্রয়োজন—"পল্‌টারগাইস্ট"। ভূতুড়ে বাড়িতে যে দমাদ্দম ইঁটপাটকেল এবং মাঝে-মধ্যে কচুপাতায় মোড়া নোংরা বস্তুও বর্ষিত হয় সেটি করেন পল্‌টারগাইস্ট। "পল্‌টারন্" ক্রিয়ার অর্থ দুদ্দাড় দুমদাম শব্দ করা আর গাইস্ট = ইংরিজি গোস্ট (ghost)।

এর থেকে আরেকটা তত্ত্ব সুস্পষ্ট হয়। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের যেখান থেকেই হোক না কেন, কোনো গুজব, জনরব—একুনে গুজোরব—পৌঁছনো মাত্রই সরল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই নয়া ভূতকে অবিচারে জাতে তুলে নেয়। ইংরেজের মতো অবিশ্বাসী (অনবিলীভিং টমাস) জাতও তাই তার দুশমন জর্মন জাতের পল্‌টারগাইস্টকে আলিঙ্গন করে আপন ভাষায় স্থান দিয়েছে। বিশ্বাস না হয়, যে কোনো ইংরিজি দিকসুন্দরীর (যে সুন্দরী নারী দিক দেখিয়ে দেন, অর্থাৎ ডিক্‌শনারী) আশ্রয় গ্রহণ করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন। প্রেতসিদ্ধ কোনো কোনো গুণিন নাকি ভূতপ্রেতকে দিয়ে অনেক কিছু কাজকর্ম করিয়ে নেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্‌শাতে এঁদের সম্বন্ধে সবিস্তার তাজ্জব বয়ান দিয়েছেন। কোনো কোনো পীর সাহেবও নাকি এখনো এই অলৌকিক তিলিসমাৎ দেখাতে পারেন। শীতকালে বোম্বাই আম, যে-কোনো কালে কাবুলী মেওয়া পয়দা করতে পারেন।

দুঃখের বিষয় মহাকবি গ্যোটের সেই সুন্দর কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছি। যদ্দূর মনে পড়ছে তাতে এক চেলা পরিপূর্ণ ভূতসিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই উচাটন মন্ত্রে ভূতকে আবাহন জানায়। তারপর কি একটা হুকুম করে—খুব সম্ভব জল আনতে—তারপর ভূত জল আনছে তো আনছেই, জলে জলে ছয়লাপ। ওদিকে বিপদ হয়েছে কি, চেলা কিন্তু গুরুর কাছ থেকে শেষ উচাটন মন্ত্রটি যেটি দিয়ে ভূতকে ঠেকাবে, সেটি শেখার পূর্বেই চলে এসেছে। এখন বন্যার জলে ডুবে মরে আর কি !···শেষটায় কাতরকণ্ঠে সে গুরুকে স্মরণ করলো। গুরু এসে এই ভূতকে অন্য হুকুম দিলেন, 'আমি এসব চ্যাংড়াদের গুরু। প্রথমে আমার মোক্ষম হুকুম শোনো। তারপর অন্য কাজ।' এই বলে তিনি ভূতকে অন্য হুকুম দিয়ে বন্যা বন্ধ করলেন।

কিন্তু এ-বাবদে আমাদের দেশে প্রচলিত গল্পটি এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

সে-গল্পের গোড়াপত্তন ঐ একই। আমাদের গল্পেও গুরুর কাছ থেকে

সম্পূর্ণ বিদ্যা আয়ত্ত করার পূর্বেই চেলা তার ভূতকে আবাহন করেছে। ভূতের সঙ্গে তার কিন্তু একটা শর্ত ছিল। ভূতকে সর্বক্ষণ কোনো-কিছু একটা কাজ দিতে হবে। সে বেকার থাকতে পারে না। কাজ না দিতে পারলে সে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

অস্মদ্দেশীয় কাহিনীতে চেলা ভূতকে ডেকে বললে, 'আমার জন্য একটা রাজ-প্রাসাদ তৈরি করে দাও।' দু-মিনিট যেতে না যেতেই রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে তৈরি। ভূত বললে, 'তার পরের হুকুম?' চেলা তো তাজ্জব। তাড়াতাড়ি বললে, 'গোটা দশেক সুন্দরী রমণী।' ভূত কটমটিয়ে তাকিয়ে বললে, 'সে তো প্রাসাদে অলরেডি রয়েছে। বুদ্দু! হেরেম ভিন্ন প্রাসাদ হয় নাকি?' চেলা বললে, 'তা হলে প্রাসাদের সামনে একটা হ্রদ তৈরি করে দাও।' এক মিনিটে তৈরি। ভূত শুধোলে, 'তার পরের কাজ?' চেলা তখন আরো মেলাই অর্ডার দিলে। সেগুলোও ঝটপট হয়ে গেল। আর প্রতিবারেই ভূত তার কাছে এসে কটমটিয়ে তাকায়। ভাবখানা সুস্পষ্ট। কাজ না দিতে পারলে শর্তানুযায়ী তোমার ঘাডটা মটাস করে ভাঙব। চেলা তখন পড়েছে মহাসঙ্কটে। নূতন অর্ডার আর খুঁজে পায় না। কবি গ্যোটের চেলার মতোই সে ভূত বিদায় দিতে জানে না। তখন হন্নে হয়ে, না পেরে, কবি গ্যোটেরই চেলার মতো সে তার গুরুকে স্মরণ করলে।

এইখানেই আমাদের কাহিনী গ্যোটের কাহিনীর চেয়ে ঢের সরেস।

আমাদের গুরু তাঁর প্রাচীনতার, ফার্স্ট প্রেফারেন্সের দোহাই পাড়লেন না। চেলাকে বললেন, 'ভূতকে হুকুম দাও একটা বাঁশ পুঁততে।' সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। গুরু চেলাকে বললেন, 'এবারে ভূতকে হুকুম দাও, সে যেন ঐ বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠে। এবং উপরে ওঠা মাত্রই যেন নিচে বেয়ে নামে। ফের উপর। ফের নিচে। ফের উপর। ফের নিচ।'

গুরু চেলাকে কানে কানে বললেন, 'ঐ করুক, ব্যাটা অন্তত কাল অবধি। অবশ্য যখন তোমার অন্য-কিছুর প্রয়োজন হয় তখন তাকে ওঠানামা ক্ষণতরে ক্ষান্ত দিয়ে সে-কাজ করতে বলবে। তারপর ফের হুকুম দেবে, ওঠো নামো, ওঠো নামো।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

এ-গল্পের একটা গভীর অর্থ আছে।

মানুষের মন ঐ ভূতের মতো। তাকে সর্বক্ষণ কোনো কর্মে নিয়োজিত না করতে পারলে সে তোমার ঘাড় মটকাবে। ইংরাজিতে তাই প্রবাদ "অলস

মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" অতএব যখন যা দরকার মনকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়ে ফের তাকে একটা বাঁশে ওঠানামার মতো মেকানিকাল কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। মানুষ সর্বক্ষণ মনের জন্য নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি করতে পারে না।

এইবারে, সর্বশেষে, আমি শান্তনু পাঠকের হাতে খাবো কিল।

মহাত্মাজী চরকা কাটতেন।

রবীন্দ্রনাথ আপন লেখার কপি করতেন। গোরার মতো বিরাট গ্রন্থ তিনি তিন-তিনবার কপি করেছেন। যদিও ঐ মেকানিকাল কর্ম করার জন্য আশ্রমে লোকাভাব ছিল না।

আইনস্টাইন ব্যালা বাজাতেন।

স্পাই

আশ্চর্য !

মানুষ কত সহজে বিশ্বকুখ্যাত লোককে ভুলে যায়—বিশ্ববিখ্যাত লোককে ভোলাটা মানুষের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিক।

মাতা হারিকে সচরাচর পৃথিবীর লোকে পয়লা নম্বরী স্পাই খেতাব দিয়েছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সে-খ্যাতির চৌদ্দ আনা পরিমাণ গুজোব আর কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করছে। বাকি দু-আনাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা বলা সুকঠিন।

কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের স্পাইদের রাজার রাজা রিষার্ট জরুগে সম্বন্ধে অনেক কিছু পাকা খবর জানা গিয়েছে। অবশ্য এ-সত্য প্রতিভাসিত যে, যে-কোনো স্পাই সম্বন্ধে সব খবর কোনোদিনই পাওয়া যায় না। স্পাই ধরা পড়ার পর তার সম্বন্ধে সব খবর যদি খুঁড়ে বের করা যায় তবে সে ওঁচা স্পাই।

কিন্তু তার পূর্বে আরেকটি কথা বলে নেই। গুপ্তচরবৃত্তি বা এসপিয়োনাজের প্রথম অলিখিত আইন, গুপ্তচর যদি বিদেশে ধরা পড়ে তবে যে-দেশের হয়ে সে কাজ করছিল সে-দেশ কিছুতেই স্বীকার করে না যে ঐ-লোক তাদের গুপ্তচর। তার কারণ, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে এক দেশ অন্য দেশে সরকারীভাবে গুপ্তচর রাখতে পারে না—অথচ আশ্চর্য, প্রায় সব-দেশই সেটা করে থাকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে জরুগে একমাত্র ব্যত্যয়। রুশের হয়ে ইনি জাপানে

সুদীর্ঘ দশ বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে স্পাইগিরি করে ১৯৪১-এ ধরা পড়েন এবং ১৯৪৪-এ তাঁর ফাঁসি হয়। যুদ্ধশেষে যখন তাঁর কর্মকীর্তির অনেকখানি প্রকাশ পেল তখন তাবৎ ইয়োরোপে হইচই পড়ে গেল এবং বহু ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তর সিরিয়াল রগরগে কেতাব, সিনেমা, নাট্য ইত্যাদি তাবৎ পূর্ব-পশ্চিমকে রোমাঞ্চিত করে তুললো। বিশেষ করে জাপানকে। কারণ এইমাত্র বলেছি তার শেষ কর্মভূমি ছিল জাপান।

এবং এই ডামাডোলের মধ্যিখানে কোথায় না রুশ তার গোরস্তানের নৈস্তব্ধ্য বজায় রেখে "নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়"—সাইলেন্‌স্ ইজ গোল্ডেন—নীতি পুনরায় সপ্রমাণ করবে, উল্টে পৃথিবীর সর্ব রাজনৈতিক-ঐতিহ্য ধুলিসাৎ করে সগর্বে সদম্ভে সরকারীভাবে স্পাই জরূগের স্মৃতির উদ্দেশে বলশেভিক রুশ দেশের সর্বাধিপতি সর্বোচ্চ সম্মান মেডেল ইত্যাদি অর্পণ করলেন—এ-মেডেল রুশ দেশের যুদ্ধকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদেরই দেওয়া হয় মাত্র। যতদূর মনে পড়ছে তার ছবিসহ স্ট্যাম্পও বেরিয়েছিল।[১] কিন্তু হায়, সে মেডেল গ্রহণ করার জন্য জরূগের দারাপুত্র পরিবার কেউ ছিল না। তাঁর স্ত্রীকে তিনি বহু পূর্বেই তালাক দিয়েছিলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগ করার জন্য। অনেকটা হিটলারের মতো। তিনিও ঐ একই কারণে আদৌ বিয়ে করেননি—করলেন, যখন তাঁর রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চের বৃহৎ কৃষ্ণ যবনিকা নটগুরু মহাকাল কামান গর্জনের অট্ট করতালির মাঝখানে নামিয়ে দিলেন, এবং সে-বিবাহ সেই কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে। আত্মহত্যার পিস্তল ধ্বনি সে-বিবাহের আতশবাজীর বোমা। স্ত্রীও নাট্যমঞ্চের জুলিয়েতের মতো বিষপান করলেন।···মার্কিন খবরের কাগজের নেকড়েরা এড়ি (পূর্ব বাঙলার মুসলমানী ভাষায় তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে এড়ি—ডিভোর্সে—এবং বিধবাকে রাড়ি বলে) জরূগেকে খুঁজে বের করলো। রমণী স্বল্প- তথা সত্য-ভাষিণী। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ন'সিকে খাঁটি স্পাইদের মতো জরূগে তাঁর স্ত্রীকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে দেননি তিনি কি নিয়ে দিবারাত্র লিপ্ত থাকেন।

জরূগের জীবন এমনই বৈচিত্র্যময় এবং ঘটনাবহুল যে শুদ্ধমাত্র তার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা মিনি সাইজের মহাভারত লিখতে হয়।···আমি গুপ্তচর জরূগেকে নিয়ে "গুপ্ত" পদ্ধতিতে দিব্য একখানা রগরগে সিরিয়াল লিখতে পারি—যত কাঁচা ভাষা ততোধিক বেঢপ শৈলীতে লিখলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য-

১ কোনো ফিলাটেলিস্ট পাকা খবর জানালে বাধিত হব

বশত সেটা উৎরে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়স হয়েছে। আমার জীবনদুর্গে প্রাচীরের বাইরে, গভীর রাত্রে যমদূতের পদধ্বনি প্রায়ই শুনতে পাই। মাঝে মাঝে—এদানীং ক্রমেই টেম্পো বেড়ে যাচ্ছে—প্রাচীরের উপর সাহেবী কায়দায় নক্‌ও করে। এহেন অবস্থায় সিরিয়াল অসম্পূর্ণ রেখে উল্টোরথহীন রথযাত্রায় বেরুতে চাই নে—মমেকসদয় সম্পাদকমণ্ডলীকে ক্ষিপ্ত পাঠক সম্প্রদায়ের অভি-সম্পাতকুণ্ডে নিমজ্জিত করে। কাজেই সম্ভাব্য ক্ষিপ্ত পাঠকমণ্ডলীর জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ দিচ্ছি—সাতিশয় সংক্ষিপ্ত।[১]

দুই কারণে সোভিয়েত দেশ জর্‌গের কাছে চিরঋণী। অবশ্য রুশের আরো বহু সেবা তিনি করেছেন।

প্রথম : হিটলার রুশদের আক্রমণ করার বেশ কয়েক মাস অর্থাৎ পর্যাপ্তকাল পূর্বে জর্‌গে জাপান থেকে গোপন বেতারযোগে (বেতার যন্ত্রটি চালাতেন তাঁর এক সহ-স্পাই) স্তালিনকে খবর পাঠান, হিটলার চুক্তিভঙ্গ করে রুশ আক্রমণ করবে। শুধু তাই নয়, কোন্ মাসে, কোন্ সপ্তাহে সে খবরও পাকাপাকিভাবে জানান। আশ্চর্য, যখন খুদ জর্মনির মাত্র গুটিকয়েক ডাঙর ডাঙর জাঁদরেল জানতেন যে হিটলার রুশ আক্রমণ করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছেন এবং তাঁরাও জানতেন না, কবে কোন্ মাসে হিটলার সে হামলা শুরু করবেন, তখন জর্মনি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের জাপানে বসে জর্‌গে এই পাকা খবরটি পেলেন কি করে? মনে রাখা উচিত, ১৯৩৯-এ যুদ্ধারম্ভের পর থেকে জাপান এবং জর্মনির মধ্যে কোনো যাতায়াত পথ ছিল না। (সুভাষচন্দ্র যে কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় তুলে জর্মনি থেকে জাপান পাড়ি দিয়েছিলেন সে-কথা সবাই জানেন।) সুইজারল্যাণ্ড থেকে গোপন বেতারেও—যেমন মনে করুন—খবরটা প্রথম জর্মনি থেকে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে গুপ্তচর মারফৎ গেল—সেটা পাঠানো প্রায় অসম্ভব ছিল। ওরকম বেআইনী জোরদার বেতার ট্রান্সমিটার সুইস সরকার ধরে ফেলতই ফেলত। এস্থলে আরো বলি, হিটলার তাঁর যুদ্ধের প্ল্যান তাঁর দূর-মিত্র জাপানকে তো বলতেনই না, তাঁর অতিশয় নিকট-মিত্র—ভৌগোলিক ও

১ শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী-লেখকের উপকারার্থে মসলা নিবেদন। একখানা বৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করার কয়েক বৎসর পর তিনি তারই একখানি 'সংক্ষিপ্ত' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে পর দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "এটা হল 'সংক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ; আগেরটা ছিল 'ক্ষিপ্ত' ব্যাকরণ।"

হার্দিক উভয়ার্থে—মুসোলিনীকেও আগেভাগে জানাতেন না। এবং জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসও আর-পঞ্চাশটা দেশে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের মতোই যে এ-ব্যাপারের কিছুই জানতো না সে তো বহুবার বহু ক্ষেত্রে সপ্রমাণ হয়ে গেছে। হিটলার যে তাঁর ফরেন আপিস এবং তাঁর রাজদূতদের অবিশ্বাস করতেন তাই নয়, এদের রীতিমত ঘৃণা করতেন। এবং এ তত্ত্বটি হিটলার কোনোদিন গোপন রাখার কণামাত্র প্রয়োজনও বোধ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র তাঁর আপন খাস প্যারা ফরেন মিনিস্টার রিবেনট্রপকে। ইনি জাতে শুঁড়ি। কূটনীতিতে তাঁর কোনো শিক্ষাদীক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তৎসত্ত্বেও হিটলার গদীনশীন হওয়ার সামান্য কয়েক বৎসর পর তাঁর পার্টি, ফরেন আপিস, এমন কি তাঁর দক্ষিণ হস্ত গ্যোরিঙ, বাম হস্ত গ্যোবেলস সক্কলের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রিবেনট্রপকে তুম করে বসিয়ে দিলেন ফরেন আপিসের মাথার উপর মহামান্য পররাষ্ট্র সচিবরূপে।

জর্গের দ্বিতীয় অবদান : যে-রাত্রে জাপানী মন্ত্রিসভা এক অতিশয় গোপন বৈঠকে স্থির করলেন—হিটলার রুশ আক্রমণ করার পর জাপানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, তারা যেন রুশের পূর্বসীমান্ত আক্রমণ করে—যে তাঁরা কোনো অবস্থাতেই রুশ দেশ আক্রমণ করবেন না, তার পরদিন ভোর বেলা জর্গে সেই সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গোপনতম সিদ্ধান্তটির খবর পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে পূর্ব পদ্ধতিতে সংবাদটি জানান। স্তালিনের বুকের উপর থেকে জগদ্দল "জগরনট" নেমে গেল। জাপানী আক্রমণের ভয়ে পূর্ব সীমান্তে তাঁর যে-সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল সেটাকে তদ্দণ্ডেই পশ্চিম সীমান্তে এনে হানলেন হিটলারের উপর মোক্ষম হামলা। দুই সীমান্তে একই সঙ্গে কে লড়তে চায়? ঐ করে সর্বনাশ হল কাইজারের। হিটলারেরও আখেরে সেই গতিই হয়েছিল। রুশ বেঁচে গেল।

পত্রান্তরে বেরিয়েছে : গত ৬ই নভেম্বর পূর্ব জর্মনির পূর্ব বার্লিনের একটি রাস্তার উপর প্রাক্তন রুশ স্পাইদের একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠান হয়—প্রকাশ্যে। রয়টার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন : স্পাইদের সম্মেলন—তাও প্রকাশ্যে।

এঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের গুরুর গুরু জর্গের স্মরণে।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ব কম্যুনিজমের জন্য টোকিয়োতে প্রাণ দেন।

যে রাস্তাতে তাঁরা সমবেত হন সেখানে সেনাবাহিনীর ব্রাস্ ব্যাণ্ডের সঙ্গীত সহ রাস্তাটির নূতন নামকরণ হয়।

"রিষার্ট জর্গে স্ট্রাসে"।

রিষার্ট জর্গে খাঁটি জর্মন নাম। রিষার্টের পিতা ছিলেন খাঁটি জর্মন, মা রুশ। জর্গের জন্ম রুশদেশে। জাপানে থাকাকালীন জর্গে সর্বজনসমক্ষে বলতে কসুর করতেন না যে রুশের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। তৎসত্ত্বে কেউ কখনো সন্দেহ করেননি যে তিনি রুশের স্পাই, অতখানি কি করে হয়। ওদিকে তাঁর মূল কর্ম ছিল জাপান সম্বন্ধে স্তালিনকে খবর দেওয়া এবং দ্বিতীয় সেই সুদূর জাপান থেকে জর্মনির আভ্যন্তরীণ গুপ্ত খবরও সংগ্রহ করে তাঁকে জানানো—কি করে তিনি সংগ্রহ করতেন সেটা প্লাঁশাটে (প্ল্যানচেটে) শার্লক হোমসকে আবাহন জানালে হয়তো জানা যেতে পারে। জর্গে ধরা পড়ার পর জাপানে প্রবাসী জর্মন-অজর্মন সবাই এক বাক্যে বলেছেন, জর্গে কস্মিন-কালেও তাদের কাছ থেকে জর্মনি সম্বন্ধে কোনো খবরাখবর পাম্প তো করতেনই না, উল্টে নয়া নয়া খবর দিয়ে তাদের পিলে চমকে দিতেন ; পরে সেগুলো কনফারমড হত।

জর্গের চেহারাটি ছিল সুন্দর এবং পুরুষত্বব্যঞ্জক। দীর্ঘ বলীয়ান দেহ। নাক চোখ ঠোঁট যেন পাথরে খোদাই অতি তীক্ষ্ণ। তাঁকে দেখে মনে হত যেন চ্যাম্পিয়ন বক্সার বিরাট কোনো মেলাতে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে লড়তে রাজী আছে কি না—

বলেছেন এরিষ কর্ট্, জাপানে অবস্থিত জর্মন রাজ-দূতাবাসের দুই নম্বরের কর্মচারী। অবশ্য টোকিয়োতে তিনি সবাইকে চ্যালেঞ্জ করতেন তর্কযুদ্ধে এবং জিততেন হামেশাই। কারণ তাঁর তূণীর ভর্তি থাকতো তথ্যের লেটেস্ট ইন-টেলিজেন্সের শরগুচ্ছে। অর্থাৎ নেকেড্ ফ্যাক্টস।

সেই যে গল্প আছে, গ্রামাঞ্চলের দুই ইরাকী জমিদার মোকদ্দমা লড়তে লড়তে আপিল করেছেন বাগদাদের শেষ আদালতে অর্থাৎ স্বয়ং খলীফা হারুন-উর-রশীদ এর শেষ ফাইনাল বিচার করবেন। এক জমিদার বাগদাদে এসে উঠলেন তাঁর সখা বাদশার প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদে। প্রতিবাদী উঠলেন তাঁর বাল্যের বান্ধবী বাদশার খাস প্যারা রক্ষিতার বাড়িতে। বাদী মোকদ্দমা হেরে গ্রামে ফিরলে পর সবাই বিস্ময় মেনে শুধোলে, 'প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে উঠেও আপনি মোকদ্দমার সুরাহা করতে পারলেন না?' তিনি বিজ্ঞজনোচিত কণ্ঠে বললেন, 'তাঁরা যে উঠে-ছিলেন রাজরক্ষিতার বাড়িতে। আমার কোনো যুক্তি কোনো নজীর দাঁড়াতে পারে "উলঙ্গ" যুক্তির বিরুদ্ধে, এগেনস্ট নেকেড আরগুমেন্ট !'

জর্গের বেশভূষা ছিল অপরিপাটি ; তিনি বাস করতেন টোকিওর সবচেয়ে

খাঁটির খাঁটি ঘিঞ্জি জাপানী মহল্লায় এবং বাড়িটা চোখে পড়ার মতো নোংরা। কিন্তু জাপানীদের আকর্ষণ করার মতো কেমন যেন একটা চুম্বকের শক্তি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হত। তারা তাঁকে পূজো করতো বললে কমই বলা হয় ওদিকে তাঁর চালচলন ছিল ভ্যাগাবণ্ড, বেদে বা বোহেমিয়ান ধরনের। রমণী-বাজী করতেন প্রচুর এবং মদ্যপান করতেন বেহদ্দ। তিনটে বোতল হুইস্কি ঘণ্টা কয়েকের ভিতর সাবড়ে দিতেন তিনি অক্লেশে—চোখের পাতাটি না কাঁপিয়ে এবং তাঁর চোখের সেই তীক্ষ্ণ জ্যোতিটির উপর সামান্যতম ঘোলাটে পোঁছ পড়তো না।

অর্থাভাব তাঁর লেগেই থাকতো। ধরা পড়ার পর অনুসন্ধান করে জানা যায়, তাঁর আমদানি যে কোনো মাঝারি রাজ-দূতাবাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মতো অতি সাধারণ। পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কখনো তাঁর স্পাইবৃত্তি এক্সপ্লয়েট করেননি। তিনি স্পাই হয়েছিলেন কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আদর্শবাদে প্রবুদ্ধ হয়ে।

জরুগে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রুশ এবং জর্মনি উভয় দেশে। তাঁর স্বর্গত ঠাকুর্দা ছিলেন কার্ল মার্কসের সেক্রেটারি। শিক্ষা সমাপনান্তে, প্রথম যৌবনে, এ শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি পশ্চিম জর্মনিতে একটি কম্যুনিস্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তাঁকে তৃতীয় ইণ্টারনেশনালের বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগে কর্ম দিয়ে স্কানডিনেভিয়া ও পরে তুর্কীতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পাঠানো হয়। তুর্কীরা এসব বাবদে অসাধারণ চালাক। গন্ধ পেয়ে যায় অচিরায়। জরুগে কিয়ৎকাল জেল খাটলেন—তাঁর গুপ্তচরবৃত্তিতে এই একটি মাত্র কলঙ্ক; সর্বসাধারণ অবশ্য যুদ্ধশেষের অনেক পরে এসব জানতে পায়। ১৯৩০ সালে রুশ সরকারের আদেশে তাঁকে পাঠানো হয় সাংহাইয়ে। এখান থেকে আরম্ভ হয় তাঁর কৃতিত্বময় জীবন। ...জরুগেকে যে জাপানী কোর্ট মারশালের সামনে দাঁড়াতে হয় সে মোকদ্দমার নথিপত্র মার্কিনরা জাপান অধিকার করার পর হস্তগত করে। তার থেকে জানা যায়, জরুগে সাংহাইয়ে যেসব দেশী-বিদেশী কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অন্যতম হজুমি ওসাকি নামের জনৈক জাপানী। এর পর এঁরা মস্কোর আদেশে টোকিও চলে আসেন।

প্রকাশ্যে তাঁর পেশা ছিল নাৎসি-নির্দেশচালিত (অবশ্য তখন তাবৎ জর্মন প্রেসই গ্যোবেলসের কব্জাতে) ফ্রাঙ্কফুর্টের আলগে-মাইনে ৎসাইটুঙের সংবাদদাতারূপে। তবে তাঁর অনেক প্রবন্ধই ছাপাবার মতো সাহস সম্পাদক-মণ্ডলীর ছিল না। তাঁরা সেগুলো না ছেপে চেপে যেতেন। সহকর্মীরূপে তাঁকে ক্লাউজেন নামক আরেক জর্মন গুপ্তচর দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে

তাঁর ব্যবসা ছিল মোটর মেরামতি। ওদিকে ছিলেন সেরার সেরা রেডিয়োর ওস্তাদ। অবশ্য জাপান থেকে রুশের পূর্বতম সীমান্তে রেডিয়োবার্তা পাঠাতে জোরদার ট্রান্সমিটারের দরকার হয় না—ধরা পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ক্লাউজেনও ধরা পড়েছিল কিন্তু তাঁকে জাপানীরা ফাঁসি দেয়নি ; যুদ্ধশেষে রুশ দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়।

জর্গে যখন ধরা পড়লেন এবং সামান্যমাত্র অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে তিনি বাঘা স্পাই, তখনই জাপান মন্ত্রিমণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক্। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য! এইমাত্র যে জাপানী হজুমি ওসাকির নাম বললুম সে লোকটি কি করে হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্স কনোয়ের সাতিশয় বিশ্বাসভাজন সহকর্মী। এই কনোয়েটি যে-সে ব্যক্তি নন। একে তো জাপানের তিন-চারটি খানদানীতম ঘরের একটির প্রিন্স ডিউক, তদুপরি তিনি তিন-তিনবার জাপানের প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন—এঁর আদেশেই জাপান ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়, হিটলার ও মুসসোলিনীর সঙ্গে এবং এঁরই রাজত্বকালে পাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে—যদিও ঘোষণা করা হয় তাঁর পদত্যাগের পরে। এবারে পাঠক তারিখগুলো লক্ষ্য করবেন। ১৯৪০-এর জুলাই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত (ক্যাবিনেট পুনর্গঠনের জন্য মাত্র দুটি দিন বাদ দিয়ে) কনোয়ে ছিলেন জাপানের সর্বময় কর্তা এবং হজুমি ওসাকি ছিলেন তাঁর পরম বিশ্বাসী অন্তরঙ্গজন। বলা বাহুল্য গোপন মন্ত্রণাসভার আলোচনা-সিদ্ধান্ত ওসাকি কনোয়ের কাছে পেয়ে কমরেড জর্গেকে গরম-গরম সরবরাহ করতেন এবং এই চোদ্দ মাসেই জাপানের এ যুগের ইতিহাসে সবচেয়ে মোক্ষম-মোক্ষম মরণ-বাঁচন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (হিটলারের সঙ্গে দোস্তী, মার্কিনের সঙ্গে লড়াই)। একেবারে গাঁজাখুরি অবিশ্বাস্য ঠেকে যে, হিটলার-সখা কনোয়ের পরম বিশ্বাসী সহচর ছিলেন হিটলারবৈরী রুশের গুপ্তচর এবং তিনি জাপানের গোপনতম সিদ্ধান্ত স্তালিনকে পাঠাচ্ছেন হিটলারের বিনাশসাধনের জন্য। এবং হিটলার বিনষ্ট হলে যে আপন মাতৃভূমি জাপানেরও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সে তত্ত্বটি বোঝায় মতো এলেম নিশ্চয়ই এই ঝানু গুপ্তচরের পেটে ছিল। তিনি নাকি গুপ্তচরবৃত্তিতে তালিম পেয়েছিলেন জর্গের কাছ থেকে। জর্গে যে স্পাইদের গুরুর গুরু সে কথা তো পূর্বেই বলেছি।

১৭ অক্টোবর ১৯৪১-এ জর্গে গ্রেফতার হন। ঠিক তার ৩২ দিন পূর্বে কনোয়ে মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দেন। এ দুটোতে কোনো যোগসূত্র আছে কি না—আমার কাগজপত্র কেতাবাদি সে সম্বন্ধে নীরব। আমার মনে হয় পুলিস কোনো

গুপ্তচর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করে না। বেশ কিছু দিন তাকে অবাধে চলা-ফেরা করতে দেয়। তার সহকর্মী চরদের চিনে নেয়। তার পর এক "শুভ প্রভাতে" বিরাট খেয়াজাল ফেলে সব ক'টা মাছ ধরে। ইতিমধ্যে কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান কনোয়েকে অবশ্যই জানানো হয়েছে যে, তাঁর বিশ্বাসী ওসাকিই অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী / তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী।

এত বড় কেলেঙ্কারির পর প্রধানমন্ত্রী থাকা যায় না। কনোয়ের রাজনৈতিক জীবন এখানেই চিরতরে খতম। ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন। কনোয়ে ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি খানদানী উচ্চকর্মচারীকে, জর্গের নির্দেশে ওসাকি পারদর্শিতার সঙ্গে দিনের পর দিন পাম্প করেছিলেন।

সামসনের মতো জর্গে পুরো এমারৎ ধূলিসাৎ না করতে পারলেও জাপান রাষ্ট্রের ভিতে যে ফাটল ফাটিয়ে যান সেটা কখনো মেরামত হয়নি।

আধুনিকের আত্মহত্যা

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে যত যুবক ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ, খ্রীষ্টধর্মের ব্যর্থতা এবং স্ব স্ব আদর্শবাদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, কেন জানি নে, তার দশমাংশও করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন নগর, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করে বক্তৃতা দেন তখন বিশেষ করে মুগ্ধ হন তাঁরাই, যাঁরা একদা খ্রীষ্টধর্মে গভীর বিশ্বাস ধরতেন কিন্তু যুদ্ধের কল্পনাতীত বর্বরতা দেখে সে ধর্মের কার্যকারিতা অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম ইয়োরোপের খ্রীষ্টানগণকে ভদ্র মানুষে পরিবর্তিত করতে পারবে কি না, সে-বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই নৈরাশ্যবশত সাতিশয় বিরক্তিসহ চার্চে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন কি তাঁদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি পর্যন্ত যেন তাঁদের পায়ের তলা থেকে ক্রমেই শিথিল হয়ে সরে যাচ্ছিল। শুধু যুবক সম্প্রদায়ই নয়, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতরা পর্যন্ত ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন—ভিক্টোরীয় যুগে তাঁদের যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্য-জাতি, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গগণ সভ্য থেকে সভ্যতার পর্যায়ে উঠছে এবং ফলে একদিন আর এ-সংসারে দুঃখদৈন্য অনাচার-উৎপীড়ন থাকবে না সেটি লোপ পেল। বিশেষ করে যাঁরা ইতিহাসের দর্শন নিয়ে হেগেলের যুগ থেকে প্রশ্ন

করছেন যে, ইতিহাসে আমরা শুধু অসংলগ্ন, চৈতন্যহীন মূঢ় কতকগুলো ঘটনা-সমষ্টি পাই, না এর পিছনে কোনো সচেতন সত্তা ঘটনাপরম্পরাগত ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শুধু যে মানুষকে উন্নততর এবং সভ্যতর পন্থায় নিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, নিজেকেও সপ্রকাশ করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেকেই দ্বিতীয় সমাধানটি অগ্রাহ্য করলেন, এবং অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-দর্শনের সুপণ্ডিত অসভাল্ট স্পেঙলার তাই লিখলেন, 'য়ুরোপের সূর্যাস্ত' (ড্যার উন্টেরগাঙ ডেস্ আবেন্ট-লাণ্ডের)। বইখানার খ্যাতি সে যুগে পঞ্চমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আমি যুবকদের কথা বলছিলুম। তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মাধ্যমে অনুভব করলো যে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস না করেও শাশ্বত সত্য ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরবিশ্বাসের উচ্চতম পর্যায়ে ওঠা যায়, এঁদের একাধিক জন তখন প্রাচ্যভূমিতে এসে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করতে উদ্‌গ্রীব হন।

এঁদেরই একজন মসিয়ো ফের্না বেনওয়া। রবীন্দ্রনাথ যে ক'জন ইয়োরোপীয়কে বিশ্বভারতীতে—কয়েকজনকে অন্তত সাময়িকভাবে—শিক্ষাদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন তাঁদের সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন: যেমন লেভি, ভিন্‌টারনিৎস, তুচ্চি ইত্যাদি। খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন একমাত্র অধ্যাপক বেনওয়া এবং তিনি ফ্রান্সেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই, যখন মনীষী রমাঁ রলাঁ তাঁর জীবনের ষষ্টিতম বৎসরে পদার্পণ করার শুভলগ্নে বিশ্ববাসী গুণীজ্ঞানীগণ একখানা পুস্তক তাঁকে উৎসর্গ করেন। বইখানার নাম তাঁরা দেন লাতিনে 'লীবার আমিকরুম্'—অর্থাৎ 'সখাগণপ্রদত্ত (উৎসর্গিত) পুস্তক।' এদেশ থেকে লেখেন মহাত্মা গান্ধী, জগদীশচন্দ্র বসু ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রায় সর্ব সভ্যদেশ থেকে কেউ না কেউ ঐ শুভলগ্নে রলাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। আমার এখনো মনে আছে এক আরব রলাঁকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, 'তুমি লৌহসম্মার্জনী দ্বারা ইয়োরোপের কুসংস্কারজঞ্জাল দূর করেছ।' বলা বাহুল্য ঐ লেখনী সঞ্চয়নে আপন রচনা দিয়ে শ্লাঘাপ্রাপ্তির জন্য যখন সর্ব বিশ্বের সহস্র সহস্র গুণীজ্ঞানী উদ্‌গ্রীব, তখন প্যারিস থেকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হল অধ্যাপক বেনওয়াকে, তাঁর রচনার জন্য। তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ আশ্রমের কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু ঐ 'লীবার আমিকরুম্' যখন আমাদের লাইব্রেরিতে পৌঁছল তখন আমরা সেটিতে আমাদেরই অধ্যাপকের রচনা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হই। তিনিও আবার তাঁর প্রবন্ধে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেননি—আমরা ঠিক সেই সময়ে তাঁর ক্লাসে রলাঁর এক স্বল্পখ্যাত পুস্তিকা 'পিয়ের এ ল্যুস'—

'পীটার ও লুসি' পড়ছিলুম। চটি বই। বিরাট জ্যাঁ ক্রিস্তফ লেখার পর রলাঁ দুই তরুণ-তরুণীর একটি বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী লিখে জ্যাঁ ক্রিস্তফের মতো বিরাট পুস্তকের কঠিন কঠিন সমস্যা, ইয়োরোপীয় সভ্যতা নিয়ে আলোড়ন-বিলোড়ন থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। বেনওয়া তাঁর প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'শান্তিনিকেতনে পিয়ের এ ল্যুস'—যতদূর মনে পড়ছে, এই শিরোনামা দিয়ে, এবং 'পিয়ের এ ল্যুস' পড়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার সবিস্তার বর্ণনা দেন। রলাঁকে উৎসর্গিত 'লীবার আমিকরুম্' পুস্তকের কোনো কোনো অংশ সে সময়ে কালিদাস নাগ অনুবাদ করে এদেশে প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক বেনওয়ার গত হওয়ার দিবস বিস্ময়সূচক। যে গুরুর কাছ থেকে তিনি অকৃপণ স্নেহ ও সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরই জন্মশতবার্ষিকীর দিনে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

এস্থলে আমি অধ্যাপক বেনওয়ার জীবনী লিখতে যাচ্ছি নে। বস্তুত ১৯২১ থেকে এবং সঠিক বলতে গেলে যবে থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী, প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় থেকে ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত যে সব গুণীজ্ঞানীরা এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছিলেন তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ভার আমার স্কন্ধে নয়। কার, সেটা বলা বাহুল্য। বছর দশেক পূর্বে লাইপৎসিক্ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রভবনকে লেখে, তাঁরা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের জীবনী প্রকাশ করছেন, জনৈক মার্ক কলিন্স সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের কেউ কিছু জানে কিনা? (কলিন্স এখানে অধ্যাপনা করেছিলেন।) অন্যরা তাদের ছাত্রদের সম্বন্ধে লেখে আর আমরা আমাদের অধ্যাপকদের—'বৃথা বাক্য থাক'! (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন)[১]

সেই বেনওয়া সাহেব কয়েকদিন ফরাসী ক্লাস নেওয়ার পর বললেন, 'তোমরা যে মলিয়ের, ফ্লবের, য়্যুগো (Hugo), জিদ, ফ্রাঁস পড়তে চাও সে তো খুব ভালো কথা। কারণ আজকালকার ইয়োরোপীয় ছাত্রছাত্রীদের এসব লেখকের বই পড়ানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা লাতিন গ্রীক তো শিখতেই চায় না,

১ এইসব অধ্যাপকদের সম্বন্ধে যেটুকু সামান্য বিবরণ পাঠক পাবেন সেটুকু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীতে। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছিল বলে, বাধ্য হয়ে অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন সংক্ষিপ্তরূপে।

তার অনুবাদেও বিরাগ, এমন কি, এই একটু আগে যাঁদের নাম করলুম, তাঁদের লেখার প্রতিও কোনো উৎসাহ নেই, তাদের কারণ তাঁরা লেখেন ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে। তার অন্যতম মূল সূত্র, 'যে জিনিস স্বচ্ছ (ক্লিয়ার, পরিষ্কার যার অর্থ অতি সহজেই বোঝা যায়) নয়, সে জিনিস ফরাসী নয়' (স্ কি নে পা ক্ল্যার নে পা ফ্রাঁসে!) আর এ যুগের পাঠকরা চায় আধা-আলো-অন্ধকার। তাদের বক্তব্য, 'তোমরা জীবনটাকে যতখানি সহজ সরল স্বচ্ছ ধরে নিয়েছো এবং ফলে স্বচ্ছ সরল পদ্ধতিতে প্রকাশ করো জীবনটাকে—বাস্তবে সে তা নয়, জীবন ওরকম হয় না। সর্ব মানবজীবনেই আছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব—তাই তার প্রকাশও পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে না। আমরা আজ যা লিখছি সেটা পুরনো স্টাইলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে, এবং তোমরা যারা প্রাচীন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত—তারা তো এটাকে দুর্বোধ্য, অবোধ্য এমন কি অর্থহীন প্রলাপ বললেও বলতে পারো, কিন্তু আমরা তার কোনোই পরোয়া করি নে। আমরা আমাদের "অপক্ষে" এগিয়ে যাবো, এবং এই করেই নূতন পথ বানাবো।'

এতদিন পরে কি আর সব কথা মনে থাকে! এটা হচ্ছে ১৯২১।২২।২৩-এর কাহিনী। তখনো এদেশে মডার্ন কবিতা জন্ম নেয়নি, (পরবর্তী যুগে যখন নিল, তখন হিসেব নিয়ে দেখা গেল, এসব মডার্ন কবিতাতে যে শব্দটি বার বার, এমন কি বলা যায় সর্বাধিক বার আসে সেটি 'ধূসর'। তখন মনে পড়লো, ফ্রান্সের মডার্নদের সম্বন্ধে অধ্যাপক বেনওয়ার প্রাচীন দিনের বিবৃতি—সেখানে মূল কথা ছিল 'অস্পষ্ট' 'দ্বন্দ্বমুখর' এবং সর্বোপরি 'আধা-আলো-অন্ধকার'। সেই বস্তুই এদেশে এসে পরেছে 'ধূসর' আলখাল্লা! তা হবেই বা না কেন? এ দেশটা তো বৈরাগ্যের গেরুয়া বসনধারী, আর গেরুয়া যা ধূসরও তা!) তবে মোটামুটি যা বলেছিলেন, সেটা মনে আছে—এবং চোখের জলে নাকের জলে মনে আছে!

কারণ সর্বশেষে সাহেব বললেন, 'অতএব এই নূতন ফ্রান্সকেও তোমাদের চেনা উচিত; বিশেষ করে তার কাব্যপ্রচেষ্টাকে।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফ্রান্স থেকে আনালেন—তখনকার দিনে জাহাজ-রেলে প্রায় ছ সপ্তাহ লাগতো—বেশ মোটা মোটা দু-ভলুমে সম্পূর্ণ মডার্ন কবিতার চয়নিকা। শিরোনাম, 'পোয়েৎ দ' জুরদুাই', 'পোয়েটস্ অব্ টুডে';—'হালের কবি', 'আজকের কবি' যেটা আপনার প্যারা লাগে বাংলাতে সেইটেই বেছে নিন।

বলছিলুম না, 'চোখের জলে নাকের জলে'? পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি, কোনো হদিস আর পাই নে। ক্লাসের পড়া তৈরি করতে আগে আমার লাগতো

তিন পো ঘণ্টাটাক, এখন দু-ঘণ্টা তিন-ঘণ্টা অভিধান ঘেঁটেও কোনো হদিস পাই নে। একটা তুলনা দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করি। আপনি কোনো বিষয়বস্তু পড়ছেন যেটা সরল, এবং লেখকের উদ্দেশ্যও সরল। সেখানে মনে করুন হঠাৎ এল একটা শব্দ যার অর্থ আপনি জানেন না, যেমন ধরুন 'কর'। অভিধান খুলে মানে পেলেন 'করা ধাতুর রূপ বিশেষ', 'খাজনা' 'হাত' 'কিরণ' 'হাতির শুঁড়' 'হিন্দুর উপাধি বিশেষ'। এতক্ষণ ধরে লেখকের সব কথাই আপনার কাছে পরিষ্কার ছিল বলে, পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিবেচনা করে আপনি চট্ করে বুঝে গেলেন কোন্ অর্থটা লাগবে, লেগেও গেল ক্লিক্ করে। তাই বোধ হয় অভিধানকে কুঞ্চিকাও বলা হয়। সেখানে আপনি পাবেন চাবি—এটা প্রয়োগ করে আপনি যে অচেনা শব্দরূপ তালা খুলতে চান, সেটি খুলতে পারেন। এর পরে তুলনাটা হয়তো টায়-টায় মিলবে না, কিন্তু আমার বক্তব্য কিঞ্চিৎ খোলসা করবে। আপনার নিজের যে তালা আপনি নিত্যি নিত্যি খোলেন তার চাবি যদি হারিয়ে যায়, আর কেউ এসে এক গুচ্ছ জাত-বেজাতের চাবি দেয়, তাহলে কোন্ চাবিটি দিয়ে আপনার তালাটি খোলা যাবে সেটা চট করে বেছে নেবেন—জোর, নিতান্ত একাকার হলে, দু-তিনটে ট্রায়েল নিয়েই কর্মসিদ্ধি।

আর এখানে, অর্থাৎ এই মডার্ন কবিতা নিয়ে হালটা কি ? যেন তালাটিই দেখতে পাচ্ছি নে ভালো করে,—আদৌ আছে কি না সো ভী কসম খেয়ে বলতে পারবো না, অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাতেই গয়লৎ (গলৎ)—কেমন যেন আবছা-আবছা গোছ, ঐ যে সায়েব অধ্যাপক স্বয়ং বলেছিলেন কেমন যেন আধা-আলো-অন্ধকার, ফরাসীতে বলে 'ক্রেপ্যুস্ক্যুল' (ইংরেজিতে বিশেষ্যটা চলে না বটে, কিন্তু বিশেষণটা—crepuscular—মাঝে মাঝে পাওয়া যায়) এদেশের পরবর্তী যুগের 'ধূসর'! এদিকে তালাটাই দেখতে পাচ্ছি নে ভালো করে, ওদিকে অভিধান আমার হাতে তুলে দিলেন চারটে চাবি—এখন লাগাই কোন্‌টা ? এমন কি 'রাজাকে হাতির শুঁড় (কর) দিলুম' অর্থও যদি 'রাজাকে খাজনা (কর) দিলুম' -এর বদলে বেরোয় তাতেও আমি খুশী! কথায় বলে 'হাতের একটা পাখি কানা মামার চেয়ে ভালো'—ঐক্, যা, দুটো প্রবাদে গোবলেট করে ফেললুম নাকি ? তা সঙ্গগুণে সবই হয়। অর্থাৎ সে যুগের ফরাসী মডার্ন কবিতা শব্দ, অর্থ, অনুপ্রাস, এমন কি বানান নিয়েও, এক্ষুনি আমি যা গোবলেট পাকালুম, তার চেয়ে কোটি গুণে (ইনফিনিটি সিম্বলটি দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সেটি বোধ হয় ছাপাখানায় নেই) ওস্তাদ ছিল—গোবলেট পাকাতে!

বেশ কয়েকদিন গলদঘর্ম পরিশ্রম করার পর আমি স্থিরনিশ্চয় হলুম, আমার

মনে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রইল না, এ বস্তু কাব্য নয়, এটা নিশ্চয়ই দর্শন। কারণ দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শোপেনহাওয়ার বলেছেন (আমি অনুবাদের খাতিরে একটুখানি কনস্থরা লাগাচ্ছি) :

দর্শন হল গিয়ে, 'অমানিশার অন্ধকার অঙ্গনে অন্ধের অনুপস্থিত অসিত অশ্ব অণ্ডের অনুসন্ধান।'

কিন্তু এ তত্ত্বে পৌঁছনোর পরও আমি অত সহজে হাল ছাড়িনি—তার জন্য বয়সটাই দায়ী ; ওটা জেদীর বয়স।

কারণ আমার মনে পড়লো, ছেলেবেলায় কাকার কাছে শোনা একটি তত্ত্বোপ-দেশমূলক কাহিনী। এক রাজার ছিল একটি অতি বিরল মহামূল্যবান সাদা হাতি। সে দিন দিন কেন শুকিয়ে যাচ্ছে তার অনুসন্ধান করার ফলে পড়লো যে, তার মাহুত শত সাবধান বাণী সত্ত্বেও অতি সঙ্গোপনে হাতির দানা চুরি করছে। রাজা ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। মাহুত যখন দেখল এ-হুকুম কিছুতেই রদ হবে না, রাজার সামনে নিবেদন করলে, তাকে যদি এক বছরের সময় দেওয়া হয় তবে, একমাত্র তারই জানা গোপন কৌশল প্রয়োগ করে ঐ সাদা হাতিটাকে দিয়ে মানুষের মতো কথা বলাতে পারবে। রাজা সম্মত হলেন। মাহুতের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যখন তাকে শুধালো হাতিকে দিয়ে সে কথা বলাবে কি করে, তখন সে বললে, 'ভাইরা সব, এক বছরের ভিতর কত কিছুই না ঘটতে পারে। এক বছরের ভিতর রাজা মারা যেতে পারেন, কিংবা হাতি মারা যেতে পারে, কিংবা আমি মারা যেতে পারি—এবং কে জানে, কিংবা হয়তো হাতিটা শেষমেষ কথাই বলে ফেলতে পারে!'

আমিও সেই আশাতেই রইলুম, কে জানে এ সব কবিতার মানে একদিন হয়তো বেরিয়ে গেলে যেতেও পারে। যদিও অকপট চিত্তে স্বীকার করছি, আমার তখন মনে হয়েছিল, এবং আজও মনে হয়, আচম্বিতে হাতির মানুষের মতো কথা বলতে পারাটার সম্ভাবনা এসব কবিতার অর্থ বোঝার সম্ভাবনার চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

সত্যের অপলাপ হবে বলে স্বীকার করছি, সাহেব আমাদের বলেও ছিলেন, প্রাচীন যুগের ল্য কঁৎ দ্য লিল্ বা য়্যুগোর কবিতার অর্থ যে-রকম বর্ণে বর্ণে বোঝা যায়, এসব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'—'হালের কবি'দের কাছে থেকে সেটা যেন প্রত্যাশা না করি—এর নাকি অনেকখানি সরাসরি, সোজাসুজি অনুভূতির যোগে চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। কি প্রকারে সে 'যোগ' করতে হয় সেটা অধ্যাপককে শুধিয়ে তাঁকে বৃথা হয়রান করতে চাইনি—কারণ যেখানে অনুভূতির কারবার

সেখানে সে রসে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া তো আর সিলজিজ্‌ম্ দিয়ে বাৎলানো যায় না। যেমন মাকে কি করে ভালোবাসতে হয় এটা তো আর কাউকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে শেখানো যায় না—যেরকম বিস্কুটের টিনের উপরে ছাপা নির্দেশানুযায়ী-প্রক্রিয়ায় টিনটি পরিপাটিরূপে খোলা যায়।

পাঠক শুধোবেন, 'তা হলে ক্লাসে কি অধ্যাপক সেগুলো বুঝিয়ে দিতেন না? এবারে ফেললেন মুশকিলে। সায়েব মোটামুটি একটা ইংরিজি অনুবাদ খাড়া করে দিতেন—কারণ ইংরিজি ও ফরাসীর শব্দসম্পদ—বিশেষ করে চিন্তা ও অনুভূতি সংশ্লিষ্ট বিমূর্ত শব্দ একই ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয় বলে বহু কবিতার শতকরা ষাটটি শব্দ দুই ভাষাতেই এক। অনুবাদ করা কঠিন নয়। কিন্তু তাই বলেই কি জিনিসটা সরল হয়ে যাবে? মডার্ন বাংলা কবিতার শব্দগুলো তো আপনি চেনেন, তাই বলে কি অর্থ বোধগম্য হয়? তার উপর সর্বক্ষণ ভয়, এখনো তো মামুলী ফরাসীটাই ঠিকমতো রপ্ত হয়নি, হয়তো গাড়োলের মতো এমন প্রশ্ন শুধিয়ে বসবো যেটা বাঙলায় প্রকাশ করতে হলে বলি, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে—ইত্যাদি।'

তবে দুটো জিনিস লক্ষ্য করলুম। 'শোল্‌ডার শ্রাগ্' করা বা কাঁধ উঠিয়ে নামিয়ে নিজের অসহায়তা প্রকাশ করার অভ্যাস সর্ব ইয়োরোপীয়েরই আছে, কিন্তু এর সব চাইতে বেশী কনজাম্‌শন্ ফ্রান্সে—শ্যাম্পেন বা ব্র্যাণ্ডির চেয়েও ঢের ঢের বেশী; এ সব কবিতা 'বোঝাবার' সময় বেনওয়া সাহেব যা 'শোল্‌ডার শ্রাগ্' করলেন তার থেকে আমার মনে হল, যে আগামী দশ বৎসরের রেশন তিনি ঐ 'হালের কবি'দের পাল্লায় পড়ে তিন মাসেই খতম করে দিচ্ছেন। এবং ঐ শ্রাগ্ করার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তেলো দুটো এমনভাবে চিত করতেন যে আমরা স্পষ্ট বুঝতুম, ইংরেজিতে যাকে বলে, ঘোড়াকে জলের যথেষ্ট কাছে আনা হয়েছে, এখন সে যদি না খায়—

দ্বিতীয়ত, সনাতন লেখকদের বেলা তিনি মাঝে মাঝে আমাদের অনুবাদ করতে বলতেন। কিন্তু এই মডার্ন কবিদের হাতে নিরীহ বঙ্গসন্তানদের বে-পনাহ্ অর্থাৎ একান্ত অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে তিনি সাহস পেতেন না। নরখাদক না হলেও, যারা তাঁদের কবিতা বোঝবার চেষ্টা করে, তাদের মগজ যে কিরকম কুরে কুরে খেতে পারেন, সে তত্ত্বটি সায়েবের অজানা ছিল না। এবং ঐ সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি ছেলে পাগল হয়ে গেলে যে গুজোব রটেছিল, তার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি আজ বলছি, 'সর্বৈব মিথ্যা; সে ছোকরা একদা ফরাসী ক্লাসে আসতো বটে, কিন্তু ঐ সব 'পোয়েৎ দ' জুরদ্যুই'দের প্রথম

দর্শন পাওয়া মাত্রই সে 'বাপ্পো বাপ্পো' রব ছেড়ে অধ্যাপক মিশ্রজীর পাণিনি ক্লাসে চলে যায়—যে ক্লাসটাকে আমরা বাঘের চেয়েও বেশী ডরাতাম—এবং পরে মুক্তকণ্ঠে বলে, এসব হালের ফরাসিস 'কবি'দের মাল বোঝার চেয়ে পাণিনির সূত্র বোঝা ও কণ্ঠস্থ করা ঢের ঢের সহজ।'

একে মডার্ন, তায় ফরাসিস, তদুপরি কোনো কোনো 'কবি' খাস প্যারিসিয়ান—উপস্থিত আবার বাঙলাদেশে একটা বিশেষ 'রস' বা ঐ ধরনের 'একটা-কিছু নিয়ে' জোর আন্দোলন চলছে—কাজেই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়, এসব কবিরা কাব্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করতেন কি না? আমার তো শেষ ভরসা ছিল ঐটেই। এত যে মেহন্নৎ করছি, তার ফলে আখেরে যদি এমন কিছু জুটে যায় যার প্রসাদাৎ সংস্কৃত-পড়নেওলাদের ঢিট দিতে পারি। 'ধ্যত্তর তোর "চৌরপঞ্চাশিকা" আর "কুট্টনীমতম্"! আসল মাল এ্যাদ্দিনে, বাবা, এদেশে এসে পৌঁছেছে, নাক বরাবর প্যারিস থেকে। আয়, শুনে যা।' কারণ এদের কেউ কেউ অল্পবিস্তর মপার্সাঁ পড়েছে, অবশ্য ইংরিজি অনুবাদে,[২] তাই (ঐ বয়সে) আমার সরস আহ্বান শুনে যে আমার সামনে করজোড়ে আসন নিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হায়, অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং বহু বৎসর প্যারিসে কাটিয়েছিলেন বলে এ-বিষয়ে সাবধান হতে জানতেন। ক্লাসে দুটি মেয়ে ছিল বলে তিনি প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন, কোন্ কোন্ কবিতা ক্লাসে পড়ানো হবে।

আমার নিজের কেমন জানি একটা অন্ধ বিশ্বাস সে সময় জন্মেছিল যে অধ্যাপক বেনওয়া স্বয়ং এই নূতন 'একোল' 'স্কুল' বা 'রীতিটা' পছন্দ করতেন না, বিশেষ রসও পেতেন না। তিনি আমাদের সঙ্গে মডার্ন ফ্রান্সের নবীন কাব্য-আন্দোলনের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মাত্র—অনেকটা যেন কর্তব্য পালনের জন্য।

তবু এই সুবাদে একটি তত্ত্বকথা বলে রাখা ভালো। এসব মডার্ন কবিদের সাধনা ছিল সত্যই বিস্ময়জনক। কারো কারো ছন্দহীন, লয়বিহীন, মিলবর্জিত—বস্তুত সর্ব অলঙ্কারশূন্য—এলোপাতাড়ি আবোল-তাবোল শব্দসমষ্টি দেখে যখন

২ সব জিনিস মূল ভাষাতে পড়তে হবে এ উন্নাসিকতার কোনো অর্থ হয় না। আমার আপন অভিজ্ঞতা বলে, বহুক্ষেত্রে অনুবাদ মূলের চেয়ে ঢের সরেস হয়েছে। তারি একাধিক কারণ আছে, কিন্তু সে-আলোচনা এস্থানে অবান্তর এবং সংক্ষেপে সারবার উপায় নেই।

আমরা উদ্‌ভ্রান্ত তখন বেনওয়া সায়েব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাব্য থেকে পড়ে শোনাতেন এঁদেরই আগেকার দিনের, প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত কবিতা—মডার্ন আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বে রচিত।

এবং সেগুলো শুনে, পরে পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। অনবদ্য এক-একটি কবিতা! কতখানি পরিশ্রম, কতখানি সাধনার প্রয়োজন এ রকম অত্যুত্তম কবিতা রচনা করতে! অর্থাৎ, এঁরা 'ব্লাফ্-মাস্টার' নন। প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করার টেকনীক্, স্কিল, কৌশল সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর এঁরা যে-কোনো কারণেই হোক—খুব সম্ভব নিজের সৃষ্টিতে ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি না পেয়ে—ধরেছেন অন্য টেকনীক্, বা বলা যেতে পারে, চেষ্টা করছেন নূতন এক টেকনীক্ আবিষ্কার করার। সেজানের ছবি দেখে অজ্ঞজন মনে করে, এরকম 'এলোপাতাড়ি তুলির বাড়ি ধাপ্‌প্যাস-ধুপ্‌প্যাস মারা' তো যে-কোনো পাঁচ বছরের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেজান যখন প্রাচীন 'একাডেমিক' টেকনীকে আঁকতেন তখনকার ছবি দেখলে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। তখনকার দিনের 'একাডেমিক' যে কোনো চিত্রকরের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারতেন, কারণ একে তো ছিল তাঁর বিধিদত্ত অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ ও স্পর্শকাতরতা, তদুপরি তাঁর আঙুলগুলি যেন শুধু ছবি আঁকার জন্যই বিধাতা নির্মাণ করেছিলেন, এবং সর্বোপরি তাঁর বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত সাধনা, ঐ প্রাচীন একাডেমিক টেকনীক্ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য। এ দেশে তাই যখন দেখি, মাত্র দু'টি বছর রেওয়াজ—কবিতা, গান, নাচ যাই হোক না কেন—করেছে কি না, তার আগেই সে লেগে যায় 'কম্পোজ' করতে, এবং অন্যকে বিজ্ঞভাবে 'নবীন পন্থা' বাৎলাতে, তখন—থাক্ গে।

ইতিমধ্যে আবার জর্মন ভাষার অধ্যাপক ছুটিতে চলে যাওয়ার দরুন বেনওয়া সায়েবের ঘাড়েই পড়লো জর্মন শেখাবার ভার, এবং তিনিও ফরাসী মডার্ন কবিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলেন জর্মন মডার্ন কবিদের মডার্নতম রাইনের মারিয়া রিল্‌কে! সে আরেক নিদারুণ অভিজ্ঞতা, সুকুমার রায়ের ভাষায় 'ভুক্তভোগী জানে তাহা, অপরে বুঝিবে কিসে?'—সে-কাহিনী আরেক দিনের জন্য মুলতবী রইল। শুধু এইটুকু নিবেদন, চেষ্টা দিয়েছিলুম, স্যর, সেই সতরো-আঠেরো বছর বয়সেই চেষ্টা দিয়েছিলুম এই গবিতা নামক জিনিসটির রসাস্বাদন করার। আর যে দোষ দেবেন দিন, শুধু এইটুকু বলবেন না যে, বুড়ো-হাবড়া হয়ে যাবার পর মডার্ন কবিতার প্রেম কামনা করে হতাশ-প্রেমিকরূপে পরিবর্তিত হয়েছি।

তারপর এল সেই শুভলগ্ন যেদিন মডার্ন কবিতার সঙ্গে আমাদের তালাকটি বেনওয়া সাহেব মঞ্জুর করলেন। আমরা সোল্লাসে ফিরে গেলুম দোদে, ফ্লবেরের কাছে। শুনেছি, স্পেনের লোক নাকি বছরের প্রথম দিন এক গেলাস জল নিয়ে তাতে কড়ে আঙুলের ডগাটি ডুবিয়ে সেই আঙুল জিভে লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে সভয়ে চাটার পর আঁতকে উঠে বলে, 'ঐ সেই প্রাচীন দিনের পুরনো বিস্বাদ বস্তু; চ, ভাই, ফিরে যাই আমাদের মদের গেলাসেই! কেন যে পাদ্রী সায়েব মদ কমাতে আর বেশী জল খেতে বলেন বোঝা ভার।' আমরাও স্পানিয়ার্ডদের মতো ফিরে গেলুম আমাদের ক্লাসিক্স-মঞ্চে।

আমাদের মুখের ভাব দেখে বেনওয়া সায়েব হেসে বললেন, 'তবু তো আমরা আছি ভালো, কারণ আমরা চর্চা করি সাহিত্যের। সেখানে উৎকৃষ্টে-নিকৃষ্টে পার্থক্য করা তেমন কিছু অসম্ভব কঠিন নয়! সেখানে রুচিবোধের অনেকখানি স্থিরতা আছে। কিন্তু হত যদি আমাদের বিষয়বস্তু চিত্র? তাহলে খানিকটে আভাস পেতে সে-ক্ষেত্রে রুচির কী আকাশ-পাতাল পরিবর্তন হয় রাতারাতি। আজ যাঁর ছবি খোলা নিলামে বিক্রি হল লক্ষ ডলারে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই ছবিই বিক্রি হল হাজার ডলারে। আজ যাঁকে বলা হচ্ছে 'গ্রাঁ মেৎর্' গ্র্যাণ্ড মাস্টার বা মেস্ৎরো (ওস্তাদের ওস্তাদ) তিন বছর যেতে না যেতে তাঁর ছবি হয়ে গেলো বিল্‌জ্, পিফ্‌ল্ (রদ্দী, চোতা)!—আর এ সব ছবিই কিন্তু একাডেমিক স্টাইলে আঁকা; কোনো নূতন এক্সপেরিমেন্টের কথা উঠছে না।

তবেই ধারণা করতে পারবে 'মডার্ন পেন্টিং' নিয়ে কী অসম্ভব রুচি পরিবর্তন, রীতিমত খুনোখুন মারামারি। আর সে ছবিগুলোতে আছে কি? ধোঁয়াটে, তামাটে, বিৎকুটে কি যেন কি,—জানেন শুধু আর্টিস্টই, বা হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ সখামণ্ডলী, এতে আছে কি, আর্টিস্টের উদ্দেশ্য কি—নিচে লেখা 'বসন্ত'। আর, এজ্ ফার্ এজ্ আই এম্ কনসার্নড্ সেখানে 'বসন্ত' না লিখে অভিধানের ভিতরের বা বাইরের যে-কোনো শব্দ লিখলেও আমার তাতে সুবিধা অসুবিধা কিছুই হয় না। অধিকাংশ আর্টিস্টই আবার তাঁদের ছবির কোনো নামই দেন না। বলেন, তাঁরা নাকি ডিক্সনারি ইলাস্‌ট্রেট করার জন্য ছবি আঁকেন না।'

বেনওয়া সাহেব সেদিন আরো অনেক খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছিলেন। কারণ খাস ফরাসিসের মতো তাঁর কৌতূহল ও উৎসাহ ছিল—কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা রসের নানা প্রকাশে, নানা বিকাশে। সর্বশেষ তিনি ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম, সুররিয়ালিজ্‌ম, ক্যুবিজ্‌ম, দাদাইজ্‌ম ইত্যাদি বহুবিধ 'ইজ্‌ম'-এর ইতিহাস শোনানোর পর শেষ করলেন 'বানরালে'র কীর্তিকাহিনী শুনিয়ে।

কাহিনীটি আমার চোখের সামনে আজো জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় 'নাটকে'র যিনি 'হীরো' তাঁর নামটি ভুলে গিয়েছি। বানরালে-বানরালে গোছ কি যেন এক বিজাতীয় নাম,—এ নামটা অনায়াসে আমারও হতে পারতো,—তবে এটুকু মনে আছে যে নামের মধ্যিখানে 'আন্' কথাটি ছিল। অবশ্য এ নাট্যের আদ্যন্ত আজো অতি সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভবে, সামান্য কয়েক মাস কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই (এ ব্যাপারে বোম্বাই কোন্ পুণ্যবলে তীর্থভূমিতে পরিণত হলেন সে রহস্য পূতভূমির পাণ্ডারাও জানেন না) মাকু মারার পর নিরাশ হয়ে, শেষটায় ভিটেমাটি বেচে, কালোবাজারে ফরেন এক্সচেঞ্জ কিনে যদি প্যারিস চলে যান (ভুলবেন না, ফেরার সময় মঁ পল্লিয়ে থেকে একটা ডিলিট নিয়ে আসবেন; এদেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধ হয় সনদ বিক্রি হয়, নইলে হয়তো দু-একদিন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বাস করে, রেডিমেড্ থীসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে···ডট করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপসই দিতে যেন ত্রুটি না হয়···) তবে অত্রকার বঙ্গসন্তান মাত্রই আনন্দিত হবে যে, কালোবাজার সেখানে নেই—(সব খোলাখুলি, সামনাসামনি)।

প্যারিসের লোক সে কাহিনী এখনো ভোলেনি। আপনাকে নূতন করে বলার সুযোগ পেয়ে বড্ডই উৎসাহের সঙ্গে সেটি কীর্তন করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন মডার্ন আর্ট প্যারিসের অন্য সব প্রাচীন অর্বাচীন কলাসৃষ্টিকে ঝেঁটিয়ে মহানগরী থেকে বের করে দিয়েছে তখন হঠাৎ একদিন উদয় হলেন গট্গট্ করে, সূর্যোদয়ের গৌরব নিয়ে এই চিত্রকর—চিত্রকর বললে অত্যল্পই বলা হয়—যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। এতদিন নাকি নির্জনে চিত্রসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন বলে কোনো প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাননি। কিন্তু এইবারে তাঁর সময় হয়েছে। কারণ মডার্ন আর্ট তার নূতন পথ খুঁজে পেয়েছে, তার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছে গেছে এঁরই চিত্রকলায়।

একই সঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত—শুধু কলাবিভাগের নয়, অসাধারণ জ্ঞাতব্য সংবাদ রূপে কাগজের উত্তমাঙ্গেও প্রকাশিত—প্যারিসবাসী এবং দু-তিন দিনের ভিতর তাবৎ ফরাসিস জাতি এই নব অরুণোদয়ের সংবাদ পেয়ে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হল। ক্রমে ক্রমে সর্ব আর্টজর্নলে, বিশেষ করে সেই সব আলট্রা-মডার্ন-আর্টজর্নলে, যেগুলো খবরটা সর্বপ্রথমে পরিবেশন করতে পারেনি বলে ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিল, সর্বত্রই এই নবীন আর্টিস্ট সম্বন্ধে কলামের পর কলাম, পাতার পর পাতা জুড়ে নানা

প্রকারের বিশ্লেষণ তথা তাঁর প্রথম চিত্রের জন্ম থেকে শেষ চিত্র অবধি তার ক্রমবিকাশের সুনিপুণ ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত হল। শেষটায় কিন্তু এঁকে লুফে নিলেন আলট্রা-মডার্ন আর্টের ক্রিটিকদের চাঁইরাই। এঁরা একাডেমিক আর্টের জন্মশত্রু, কসম্-খাওয়া-খুনী-দুশ্‌মন। অন্যপক্ষে প্রথমটায় কিঞ্চিৎ গাঁইগুঁই না-রাম-না-গঙ্গা ধরনের দু-একটা মন্তব্য করার পর আলট্রা-মডার্নদের হাতে ঘোল খেয়ে চুপসে রঙ্গভূমি—বা জঙ্গভূমি, যাই বলুন,—পরিত্যাগ করলেন। ওদিকে সেই চিত্রকরের ছবি দেখবার জন্য যা ভিড়, সেটা সামলাতে গিয়ে প্যারিস পুলিসের মতো সহিষ্ণু প্রতিষ্ঠানও হিমসিম খেয়ে গেল। ওঁর ছবি না দেখা থাকলে তো প্যারিসের শিক্ (chic) সমাজে মুখ দেখানো যায় না, ওঁর সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে কথা বলাটাই তখন দ্যনিয়ে ক্রী—dernier cri—শব্দে শব্দে অনুবাদ করলে 'শেষ চিৎকার' কিন্তু তার থেকে আসল অর্থ ওৎরায় না, বরঞ্চ 'আখেরী কালাম্' বললে ওরই গা ঘেঁষে যায়। আর্টের ব্যাপারে ফরাসী হনুকরণ (to ape)-কারী ইংরেজ ও ঐ দ্যনিয়ে ক্রী-ই আপন ভাষাতে ব্যবহার করে, অর্থ uttermost refinement- ও রকম দুটো শব্দ কিছুতেই অনুবাদ করা যায় না বলে।

এমন সময় সিন্দবাদের সেই সুদর্শন, নিটোল, নিখুঁত সী-মোরগের আণ্ডাটি গেল ফেটে, কিংবা কেউ দিলে ফাটিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বেরুলো উৎকট পচা দুর্গন্ধ। প্যারিসে তিষ্ঠনো কি সোজা ব্যাপার ?

সেই যে বলেছিলুম 'একই সঙ্গে প্যারিসের তিনখানা প্রখ্যাততম পত্রিকা মারফত' এই নবীন রবির প্রথম সংবাদ বেরোয়, এবং পরে সকলের অলক্ষ্যে এঁরা কেটে পড়েন—সেই তিন 'সংবাদদাতা' বা জালিয়াৎ আণ্ডাটি ফাটালেন—সর্বজনসমক্ষে ফোটোগ্রাফ সহ।

আসলে বানরালে নামে কোনো আর্টিস্টই নেই। এই তিন মিত্র একটা গাধাকে শক্ত করে বেঁধে নেন একটা খুঁটিতে। লম্বা ন্যাজে মাখিয়ে দেন সযত্নে, আর্টিস্টরা—বরঞ্চ বলা উচিত আলট্রামডার্ন আর্টিস্টরা—যে রঙ, অয়েল কালার ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, সেই সব রঙ। তার ন্যাজের কাছে, পিছনে, আর্টিস্টদের তেপায়া স্ট্যাণ্ড বা ইজ্‌লের উপর ক্যানভাস। তার পর সেই গাধাটাকে দে, বেধড়ক মার! সে বেচারী পিছনের ঠ্যাং দুটো তুলে যত লাফায়, ততই তার নানা-রঙে-রাঙা ন্যাজ থাবড়া মারে ক্যানভাসের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আঁকা হয়ে যায় মোস্ট আলট্রামডার্ন 'ছবি'! ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ভিন্ন ভিন্ন ক্যানভাস নিয়ে, গাধার ন্যাজ কখনো বিনুনির মতো ভাগ করে, কখনো গোচ্ছা

গোচ্ছা করে বেঁধে—যার যথা অভিরুচি—রঙের ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ করে 'আঁকা' হল 'ছবি'র পর 'ছবি'। এবং পাছে লোকে অবিশ্বাস করে তাই 'ছবি'র প্রতি স্টেজে তার ফোটো, গাধার লম্ফঝম্পের ফোটো, গর্দভের পুচ্ছাংশসহ চিত্রাংশের ফোটো—এক কথায় শব্দার্থে ডকুমেণ্টারি ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে অপর্যাপ্ত।

তিন জালিয়াত—বলা বাহুল্য, এঁরা তৎকালীন তথাকথিত মডার্ন আর্টিস্টদের গোঠ বেঁধে, দল পাকিয়ে চিৎকার ও একাডেমিক আর্টের উদ্দেশে তাদের অশ্রাব্য কটুবাক্য শুনতে শুনতে হন্যে হয়ে গিয়ে শেষটায় উপযুক্ত 'সৎকার'টি করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলেন 'বানরালে' নামটার মধ্যখানে ane—ফরাসীতে যার অর্থ গর্দভ—শব্দটি গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গাধাটিই এসব ছবির প্রকৃত আর্টিস্ট।

তস্য বিগলিতার্থ, মোস্ট-আলট্রা-মডার্ন-আর্টিস্ট তথা তাঁদের মুখপাত্র আর্ট-ক্রিটিকরা এ্যাদ্দিন ধরে যাকে তাঁদের শিরোমণি করে, তাঁদের হীরো বানিয়ে বিনা বাদ্যে নেচেছেন ('কি কল পাতাইছো তুমি! বিনা বাইদ্যে নাচি আমি॥'—লেখকের মাতৃভূমির প্রবাদ) তিনি একটি গর্দভ!

এ-জাতীয় ঘটনা আরো ঘটেছে। তার ফিরিস্তি দিতে যাবে কে? আর উপরের উল্লিখিত ঘটনাটির পিছনে রয়েছে নষ্টামী। কিন্তু যেখানে কোনো প্রকারের কুমতলব নেই, সেখানেও যে এ রকমের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেটা বছর পাঁচেক পূর্বে সপ্রমাণ করে সুইডেনের মতো ঠাণ্ডা দেশ।

সুইডেনের অন্যতম প্রখ্যাত অতি আধুনিক চিত্রকর ফালস্ট্রোম ছবি আঁকার সময় একখানা ম্যাসোনাইটের টুকরোয় মাঝে মাঝে তুলি পুঁছে নিতেন। কাজেই সেটাতে হরেক রকম রঙ লেগে থাকার কথা। ঐ সময় সুইডেনের ললিতকলা আকাদেমী এক বিরাট মহতী চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—'স্বতঃস্ফূর্ত কলা (Spontaneous art বা স্পণ্টানিস্‌মুস্ এর নাম এবং এটাকেই তখন সর্বাধুনিক কলাপদ্ধতি বলা হত) ও তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ' এই নাম দিয়ে সেই চিত্রপ্রদর্শনীতে থাকবে সুইডেন তথা অন্যান্য দেশের স্পণ্টানিস্‌মুস্ কলার উত্তম উত্তম নিদর্শন। এখন হয়েছে কি, চিত্রকর ফালস্ট্রোম তাঁর অন্য ছবি যাতে ডাকে যাবার সময় জখম না হয় সেই উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লিখিত তুলি পোঁছার রঙবেরঙের ম্যাসোনাইটের টুকরোখানা তাঁর অন্য দুখানা ছবির উপর রেখে প্যাক করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দেন—এস্থলে বলা উচিত ফাল্‌স্ট্রোম ছবি ক্যানভাসের উপর না এঁকে আঁকতেন ম্যাসোনাইটের উপর। আকাদেমীর বড় কর্তারা ভাবলেন এটাও মহৎ আর্টিস্টের

এক নবীন কলানিদর্শন, এবং পরম শ্রদ্ধাভরে সেই তুলি পোঁছার টুকরোটির নিচে আর্টিস্টের স্বনামধন্য নাম লিখে ঝুলিয়ে দিলেন তাঁর অন্য ছবির পাশে।

কেলেঙ্কারিটা কি করে বেরিয়ে পড়ে সে অন্য কাহিনী, কিন্তু যখন পড়ল তখন উঠলো কাগজে কাগজে হৈহৈ রব। শেষটায় খুদ আকাদেমির প্রেসিডেণ্ট খুদাতাল্লার হাতে সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে বলেই ফেললেন, 'কি করি মশাইরা, বলুন। কে জানত শেষটায় এ-রকম-ধারা হবে? আজকাল নিত্যি নিত্যি এত সব নয়া নয়া এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে যে, কোন্‌টা যে এক্সপেরিমেণ্ট আর কোন্‌টা যে এ্যাক্সি-ডেণ্ট কি করে ঠাওরাই? আমরা ভেবেছি গুণী ফালস্ট্র্যাম আর্টের ক্ষেত্রে একটা অভিনব নবীন পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং সেই ভেবে ঐ ছবিটাও প্রদর্শনীর অন্যান্য ছবির সঙ্গে টাঙিয়ে দিয়েছি—'

'রাস্তার লোক' সব শুনে বললে, 'এতদিন যা শুধু সরস্বতীর বরপুত্ররাই বহু সাধনার পর, বহু তপস্যার ফলে সৃষ্টি করতে পারতেন, এখন দেখছি এ্যাক্সিডেণ্টও (আকস্মিক যোগাযোগ) সেটা করতে পারে!'

এর বহু পূর্বেই সংস্কৃতেও নাকি বলা হয়ে গিয়েছে, কোটি কোটি বৎসর ধরে উইপোকা কাঠ খেয়ে খেয়ে হিজিবিজি যে নক্সা কাটছে, তার ভিতর হয়তো একদিন পূর্ণ প্রণব মন্ত্রটিই খোদাই হয়ে বেরিয়ে আসবে।

পাঠক আদৌ ভাববেন না, আমি মডার্ন কবিতা বা আর্টের দুশ্‌মন্। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ ও অন্যায় অবিচার আমার প্রতি আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, প্রকৃত শিল্পী প্রতিদিন সেই চেষ্টাতেই থাকবে, কি করে নূতন ভঙ্গীতে নবীন পদ্ধতিতে তার মহত্তম চিন্তা নিবিড়তম অভিজ্ঞতা মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। নইলে তো আমরা প্রলয় পর্যন্ত 'পাখীসবে'র সঙ্গে সেই একই 'রব' গেয়েও কূল পাবো না।

কিন্তু গেল ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। পাব্‌লো পিকাস্‌সোর নাম শুনলে আজকের দিনে শতকরা নিরানব্বই জন—কি প্রাচীন কি অর্বাচীন সবাই—অজ্ঞান। সেই পিকাস্‌সো গেল ফেব্রুয়ারি মাসের কাছাকাছি একটি বিবৃতি দেন। বোম্বায়ের Alvi Book Bulletin-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেটি বেরিয়েছে। উপস্থিত আমি কোনো মন্তব্য করছি না। শুধু সেটি তুলে দিচ্ছি। বাংলায় অনুবাদও করবো না, কারণ যাঁরা ইংরিজি জানেন না তাঁরা অযথা সন্তাপ থেকে বেঁচে যাবেন, আর যাঁরা জানেন, তাঁদের জন্য অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আসল প্রধান কারণ অবশ্য, এটির সুষ্ঠু অনুবাদ আমার শক্তির বাইরে।

তবে উভয় পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার জন্য মোটামুটি একটি ব্যাখ্যা দেব।

'Pablo Picasso, 83 years old Spanish-born father-figure of the modernist cult in art, has now made a sensational "confession" that he was simply amusing himself at the expense of his intellectual admirers with his bizarre creations.' Says he :

'The people no longer seek consolation and inspiration in art. But the refined people, the rich, the idle, seek the new, the extraordinary, the original, the extravagant, the scandalous. And myself, since the epoch of Cubism, have contended these people with all the bizarre things that have come into my head. And the less they understood it the more they admired it.

By amusing myself with all these games, all this nonsense, all these picture puzzles andarabesques, I became famous, and very rapidly. And celebrity, for a painter. means sales, profits, a fortune. Today, as you know, I am famous and very rich.

But when I am alone with myself I have not the courage to consider myself as an artist in the great sense of the word, as in the days of Giotto, Titian, Rembrandt, and Goya. I am only a public entertainer who has understood his time.'

পিকাস্সোর উক্তির বিগলিতার্থ—আজকের দিনের মানুষ কলাসৃষ্টির দ্বারস্থ হয় না সান্ত্বনা বা অনুপ্রেরণার জন্য ; আজকের দিনের নিষ্কর্মা, তথাকথিত বিদগ্ধ ধনীরা চায়, নূতন, মৌলিক, অসাধারণ, বাড়াবাড়ির চরম, কেলেঙ্কারির কলা আর তিনি সেই ক্যুবিজেম্-এর[৩] আমল থেকে তাঁর মাথায় যত সব আবোল-তাবোল হযবরল (bizarre)[৪] এসেছে, সেগুলো দিয়ে ঐ সব ধনীদের

৩ এদেশে গগনেন্দ্রনাথ সত্যই ছবি এঁকেছিলেন ঐ ক্যুবিজম্ পদ্ধতিতে।

৪ মডার্ন মাথামুণ্ডুহীন ছবির জন্যই যেন এই মোক্ষম bizarre শব্দটি

সন্তুষ্ট করেছেন। এবং তাঁর ঐ সব 'বিজার' ছবি তারা যত কম বুঝতে পেরেছে, সেই অনুপাতে মুগ্ধ প্রশংসা করেছে ততই উচ্চমাত্রায়। আর তিনিও ফুর্তি পেলেন ঐ ধরনের, ওদেরই প্রার্থিত খেলা খেলতে,—আঁকলেন অর্থহীন যা-তা (ননসেন্স), ছবির ধাঁধা, জ্যামিতিক ডিজাইন এবং তারই ফলে হয়ে গেলেন বিখ্যাত। আর আর্টিস্টের পক্ষে বিখ্যাত হওয়ার অর্থই, প্রচুর ছবি বিক্রির ফলে প্রচুরতর অর্থলাভ। এবং সবাই এখন জানেন, পিকাস্‌সো বলছেন, তিনি এখন বিখ্যাত এবং খুবই সম্পদশালী।

কিন্তু তার পরই বলছেন, কিন্তু তিনি যখন একা বসে আত্মচিন্তা করেন, তখন আর তাঁর সাহস হয় না, নিজেকে সেই মহান অর্থে শিল্পী আখ্যা দিতে, যে অর্থে শিল্পী বোঝাতো জিত্তো, তিৎসিয়ান, রেমব্রাণ্ট, গোইয়া-র যুগে। তিনি শুধু দিয়েছেন সবাইকে ফুর্তি (পাব্‌লিক্ এন্টারটেনার—তার রূঢ়তম অর্থ 'ভাঁড়', 'সার্কেসের ক্লাউন', 'সং') কারণ তিনি 'যেমন কলি, তেমন্ চলি' তত্ত্বটি বুঝতেন।

নির্মিত হয়েছিল। ইংরেজ আভিধানিক এর প্রকৃত অর্থ বোঝাতে গিয়ে যেন দিশা না পেয়ে অনেকগুলো কাছে পিঠের শব্দ ও তাদের সমন্বয় করেছেন: eccentric, fantastic, grotesque, mixed in style, half barbaric. কিন্তু এদেশের সুকুমার রায় 'বিজার' শব্দটির প্রকৃত অর্থ একটি কবিতার মারফতে যা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেটি বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। আমি কয়েক ছত্র তুলে দিচ্ছি:

'কেউ কি জানে সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা ?
রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা ?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা ?
কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগ্‌বাজি খায় লোকে ?
জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে ?
ওস্তাদেরা লেপমুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে ?
টাকের 'পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে ?
সভায় কেন চেঁচায় রাজা "হুক্কা হুয়া" ব'লে ?
মন্ত্রী কেন কল্‌সী বাজায় ব'সে রাজার কোলে ?
সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি ?
কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি ?' ইত্যাদি।

এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর পিকাস্‌সোর 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেটা আমার চোখে পড়েনি। তবে আমার কাছে পূর্বের অবোধ্য একটি সমস্যা সরল হয়ে গেল।

পিকাস্‌সো বৃদ্ধবয়সে এক তরুণীকে বিয়ে করেন।[১] কয়েক বছর পর তরুণী তাঁকে ত্যাগ করে তালাক নেন (কিংবা হয়তো পিকাস্‌সোই এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করেন যে তালাক ভিন্ন অন্য গতি ছিল না—কারণ তিনি 'গ্রেট্ আর্টিস্ট' হন আর নাই হন এ তত্ত্বটি কিন্তু অনস্বীকার্য, 'গ্রেট আর্টিস্ট'দের যে-খামখেয়ালির বাতিক থাকে, মাথায় যে-ছিট থাকে সেটা তিনি পেয়েছেন ন'সিকে!) এবং পিকাস্‌সোর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিকাস্‌সো নাকি সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করে বিফল হন। সেই জীবনীটি যখন ধারাবাহিকভাবে কন্টিনেন্টের একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয় তখন তার প্রায় সব কটা কিস্তিই আমি পড়ি, এবং আমার মনে সব চেয়ে বেশী বিস্ময় সৃষ্টি করলো —আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম বললেও অত্যুক্তি হয় না—যে, সে পুস্তিকায় পিকাস্‌সো তাঁর তরুণী স্ত্রীকে আর্ট বলতে কি বোঝায় এবং ঐ বিষয় নিয়ে যে সব আলোচনা তাঁর সঙ্গে করেন সেগুলো সব প্রাচীন যুগের কথা; অর্থাৎ সেই মাইকেল এঞ্জেলোর আমল থেকে প্রায় একশ' বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আলঙ্কারিক, কলারসিকরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর্ট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে-সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, পিকাস্‌সো মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র!

আমি তখন চিন্তা করে বিহ্বল হয়েছি, এই যদি আর্ট সম্বন্ধে পিকাস্‌সোর ধারণা হয় তবে তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে এ ধারণার কোনো সামঞ্জস্যই তো খুঁজে পাচ্ছি নে! একদিকে লোকটি আর্ট সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল, একাডেমিক ধারণা পোষণ করেন, আর অন্যদিকে তিনি এঁকে যাচ্ছেন—তাঁর ভাষাতেই বলি— 'বিজার' 'গ্রোটেস্ক' যত সব মাল!

এ যেন, আপনি নামতা শিখেছেন ঠিকই, কিন্তু অঙ্ক কষার বেলা করছেন ৩ × ৪ = ৮২, ৭ + ৫ = ২!

পিকাস্‌সোর এই বিবৃতিটি পড়ে আমার মনের ধন্দ গেল। তাঁর আদর্শ ছিলেন জিত্তো রেমব্রাণ্টই, কিন্তু তিনি জানতেন প্রথমত, ওঁদের স্তরে আদৌ পৌঁছতে পারবেন কি না, দ্বিতীয়ত, পৌঁছতে পারলেও বাজারে সেই 'প্রাচীন ঢঙে'র ছবির চাহিদা আজ আর আদপেই নেই, তৃতীয়ত, তাঁরও খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সর্বশেষে, সেই অর্থের জন্যই যখন

ছবি আঁকবো আপন আদর্শ বেহায়া বিসর্জন দিয়ে—তবে সেইটাই করি পূর্ণমাত্রায় ইংরিজিতে যাকে বলে 'উইথ্ এ ভেন্‌জেন্‌স', উর্দুতে বলে, 'পক্‌ড়ে তলওয়ার দামন্‌কে সম্ভালে কোই ?'—তলওয়ার যখন ধরেইছি তখন রক্তের ছিঁটে পড়বে বলে কুর্তার দামন (প্রান্ত, অঞ্চল) অন্য হাত দিয়ে সামলানোটা বিলকুল বেকার।

অবশ্য এসব তর্কবিতর্কের অর্থ হয়, যদি আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিই যে পিকাস্‌সো এ-বিবৃতিতে প্রাণের কথা খোলাখুলিই বলেছেন, সজ্ঞানে সত্যভাষণই করেছেন। নইলে কাল যদি আরো পয়সা কামানোর জন্য, বা বিনা কারণেই আরেকটা নয়া ফয়তা ঝেড়ে বলেন, 'না না, ওটা আমার সত্য বিবৃতি নয়। আমি শুধু রগড় দেখবার জন্য এই মস্করাটা করেছিলুম—আমার অন্ধ স্তাবক, এবং ঐ সব মূর্খ ধনীরা যারা নৃত্য করতে করতে আমার ছবি কিনেছে হুজুগে মেতে, ন্যায্য মূল্যের শতগুণ বেশী টাকা ঢেলে, তারা তখন কি বলে ?—সোজা ইংরিজিতে 'আই উয়োজ পুলিং দেয়ার লেগ্ !'—তখন আজ যে-সব প্রাচীনপন্থীরা এই হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভাঙাটা দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠেছেন, তাঁরা লুকোবেন কোন্ ইঁদুরের গর্তে !

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কর্তাভজাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা বলবেন, 'আজ যদি শেক্সপীয়রের স্বহস্তে লিখিত একখানা গোপন ডাইরি বেরোয় যাতে তিনি লিখেছেন, "আমি হতে চেয়েছিলুম হোমার, ভার্জিলের মতো কবি, কিন্তু যখন দেখলুম এযুগে সে সব কবিদের চাহিদা নেই তখন হয়ে গেলুম, পাব্‌লিক এণ্টার-টেনার—ভাঁড়" তা হলেই কি আমরা সেটা মেনে নেব, অর্থাৎ বলবে', শেক্সপীয়র গ্রেট পোয়েট নন !'

মুসলমানদের ভিতর একাধিক সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস করেন, তাঁদের সপ্তম ইমাম (পৃথিবীতে আল্লার প্রতিভূ) অদৃশ্য হয়ে যান, তিনি সত্যি সত্যি মারা যাননি,—সময় হলেই তিনি অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে মাহ্‌দী (কল্কি) রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। অন্য সম্প্রদায় বলেন, 'সপ্তম ইমাম না, অদৃশ্য হন দ্বাদশ ইমাম, তিনিই মাহ্‌দীরূপে ইত্যাদি।' তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন, 'দ্বাদশ না, চতু-র্বিংশতি ইত্যাদি।'

এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেনের আন্দালুশ প্রদেশের মৌলানা ইব্‌ন হাজম যেন এঁদের বাবদে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে বলছেন, 'অলৌকিক এদের অন্ধবিশ্বাসের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে থাকবার ক্ষমতা ! কারো ইমাম অদৃশ্য হয়েছেন অষ্টম শতাব্দীতে, কারো নবম, কারো বা দশমে। যে জিনিস হারিয়ে গেছে (অদৃশ্য হয়েছে) দু'শ তিনশ চারশ বছর

আগে, এরা এখনো সেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ বা আবার বলে, অদৃশ্য ইমাম আছেন একটা মেঘের আড়ালে! আহা, যদি জানতুম কোন্ মেঘটা! চীৎকারে চীৎকারে তাঁকে অতিষ্ঠ করে বলতুম, "সশরীরে নেমে এসে কুল্লে বখেড়ার ফৈসালা করে দাও না, বাবা!" তাজ্জব, তাজ্জব!'

পিকাস্সোর আগের বিবৃতি যদি সত্য হয় তবে আমাদের বলতে হবে, ভক্তজনের যে উপাস্য পিকাস্সো তিনি আত্মহত্যা করলেন। আর ভক্তজন বলবেন, তিনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন।

আর যে-সব সরলজন বিশ্বাস করে ঐ সব 'বিজারের' বাজার বিলকুল ঝুটা, মস্করা করে ছবির ধাঁধা বানিয়ে আর আরাবেস্ক এঁকে প্রকৃত কলাসৃষ্টি হয় না, তার জন্য প্রচুর অক্লান্ত তপস্যার প্রয়োজন তাদের জন্য নিম্নের উদ্ধৃতিটি তুলে দিলুম; কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলুম না,—আমার চোখে পড়েছে এই আজ: কিছুদিন আগে কোনো একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আলাউদ্দিন সাহেব এবং গোলাম আলি সাহেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অভিনন্দনের উত্তরে আলাউদ্দিন সাহেব বললেন—"নব্বই বছর ধরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর দর্শনের আশায় সাধনা করে আসছি। একটি মাত্র আশায় দিনের পর দিন সাধনা করে আসছি—একদিন-না-একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অমরা-বতীর-সঙ্গীত মন্দিরে ঢোকবারে অনুমতি দেবেন। আজও আমার সাধনার শেষ নেই। এতদিন সাধনার ফলে দূর থেকে শুধু মন্দিরের আবছায়া ছায়াটা যেন একটু একটু নজরে আসছে।"

এর পর গোলাম আলি সাহেব অভিনন্দনের উত্তরে বললেন—"আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব মহাভাগ্যবান ব্যক্তি। দেবী সরস্বতী তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্দিরের ছায়া দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি হতভাগ্য এতদিন সাধনা করার পরেও সঙ্গীত-মন্দিরের ছায়া দেখতে পাওয়া দূরে থাক—উপরে ওঠবার সিঁড়ি-টুকুও এখনো শেষ করতে পারিনি। জানি না কত সহস্র বছর আরো কঠিন কঠোর সাধনায় দেবী প্রসন্ন হবেন।"

দর্পণ

বছর পনেরো পূর্বে সেই সোনার বাঙলা মেতে উঠেছিল রম্যরচনা মারফত রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করতে। তারপর সে হুজুগ কেটে যায়—তার কারণ বর্ণন উপস্থিত মুলতুবী রাখলুম। বছর পাঁচ-সাত পূর্বে দেখলুম, কেষ্টবিষ্টু তো বটেনই, পাঁচু-পেঁচি তক্ ছেড়ে কথা কইছেন না—সবাই লেগে গেছেন, আত্মজীবনী প্রকাশ করতে। সে-মোকায় আমারও মনে বাসনা যায় একখানি সরেস আত্মজীবনী ছেড়ে আর পাঁচজনকে ঘায়েল করে দি, কিন্তু বিধি বাম। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে 'ম্যান প্রোপোজেস, গড্ ডিস্‌পোজেস'—মানুষ প্রস্তাব পাড়ে (কোন কিছুর কামনা করে) আর ভগবান সমাধান করেন, তাঁর ইচ্ছে মতো। এটা ইংরেজ আমাদের শিখিয়েছে আর পাঁচটা ভুল জিনিস শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে। আপনারা সরল চিত্ত ধরেন, আর ভাবেন, ইংরেজ আমাদের ইংরিজি শিখিয়েছে। বিলকুল ভুল। ইংরেজ নিজে শেখে 'কিংস্ ঈংলিশ', তার অর্থ, তাদের রাজা—উপস্থিত রানী—যে ইংরিজি ব্যবহার করেন। আর আমাদের শিখিয়েছে 'ব্যাবু ইংলিশ' বা 'বাবু ইংলিশ'! আসলে প্রবাদটা 'ম্যান প্রোপোজেস, উম্যান ডিজপোজেস' অর্থাৎ পুরুষ প্রস্তাব করে, স্ত্রীলোক ফৈসালা করে। প্রবাদে ভেজাল কর্ম কিছু নূতন নয়; স্মরণ করুন বেদনিষ্ঠ সদাচারী ব্রাহ্মণসন্তান দ্রোণাচার্য তাঁর শিশুতনয়কে দুধের পরিবর্তে কি দিয়েছিলেন! কিংবা সদাশয় সরকার—থাক গে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই নে।

শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই নে! হেন বাঙালী আছে কি যে শ্বশুরবাড়ি যেতে চায় না? অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্—দেবভাষায় আপ্তবাক্য। ঐ তো করলেন ব্যাকরণে ভুল!

আত্মজীবনী লিখি-লিখছি লিখি-লিখছি করছি এমন সময় এক রমণীর পাল্লায় পড়ে আমাকে কয়েক বছর জেলে কাটাতে হয়।

শুনেছি, জরাসন্ধ নাকি চৌদ্দ বছর আলীপুর জেলে কাটান। তার কয়েক বৎসর পর একদা বাস-এ করে ঐ জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর বালকপুত্র চিৎকার করে সোল্লাসে তাঁকে শুধোয়, 'বাবা, ঐখেনে তুমি চোদ্দ বছর ছিলে? না?'

বাস-সুদ্ধ লোক তাঁর পানে কটমটিয়ে তাকায়। যদ্যপি গাঁটকাটার চোদ্দ বছর জেল হয় না, তবু সবাই অচেতন মনে আপন আপন পকেটে হাত দিয়ে

মনিব্যাগ পাকড়ে ধরে। তা ধরুক। কিন্তু বেচারী জরাসন্ধ বাস-সুদ্ধ লোককে বোঝান কি প্রকারে যে, তিনি জেলে চোদ্দ বছর সুপারিনটেন্‌ডেনটের কর্ম করেছেন। বুঝুন ঠ্যালাটা! তাই তো ঋষি বলেছেন, 'দারা পুত্র পরিবার কে তোমার তুমি কার?' পুত্র না হয়ে আর কেউ হলে শান্তস্বভাব তিতিক্ষু 'জরাসন্ধ' বসিয়ে দিতেন নাকে মোক্ষম এক ঘুঁষি!

না। আমি জেলে যাই, আইনত, খাস জজসাহেবের হুকুমে। সে কথা যথাসময়ে হবে।

জেলে একজন আরবের সঙ্গে আলাপ হয়—আমি পোরট্ সঈদের একটা গোপন নাইট-ক্লাবে চাকরি করার সময় কিছুটা আরবি শিখে যাই, ঐ ভাষায় কটুকাটব্য করতে ততোধিক।

আরবটি বেশ লেখাপড়ি করেছে। তবু যে কেন জেলে এল তার কারণ একটি সরেস্ ফার্সী কবিতাতে আছে।

এক বৃদ্ধ বাজীকর তার ছেলেকে বলছে, 'ঢ্যাখ ব্যাটা, এই বয়সেই তুই আমার মতো হুনুরীর কাছে সব এলেম রপ্ত করে নে। কি করে পাঁচটা বল নিয়ে লুফোলুফি করতে হয়, টুপির ভিতর থেকে জ্যান্ত খরগোশ বের করতে হয়, হাত-পা-বেঁধে বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দিলে বেরিয়ে আসতে হয়।

শুনবি না বুড়ো বাপের কথা? তা হলে আল্লার কসম, খুদার কিরে কেটে বলছি, তোকে পাঠাবো পাটশালে, তার পর ইস্কুলে, তারপর কলেজে। এম-এ, পি-এইচ-ডি করে বেরনোর পর যখন দোরে দোরে ভিক্ষে মাগবি, লাথি-ঝ্যাঁটা খাবি তখন বুঝবি রে, ব্যাটা, তখন বুঝবি, বুড়ো বাপ হক্ক কথা বলেছিল কি, না।'

আরবের বেলাও বোধ হয় তাই হয়েছিল। কলেজের বিদ্যেতে যখন পেট ভরলো না তখন শিখতে গেল বড় বিদ্যে—ল্যাটে গেল, ল্যাটে গেল! বুড়ো বয়সে বিয়ে করা আর বড় বিদ্যে শিখতে যাওয়া একই আহাম্মুখী!

পীরসাহেব সেজে আরবিস্থান থেকে সোনা পাচার করতে গিয়ে শ্রীঘর।

সে কথা থাক। তার কাছে কিন্তু একখানা বই ছিল। সেটি পবিত্র কুরান-শরীফ বলাতে জেল-কর্তৃপক্ষ সেটিকে তার কাছে হামেহাল রাখবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতখানি আরবী বিদ্যে আমার নেই যে, স্বচ্ছন্দে কেতাবখানা পড়ি। তাই আরব বাবাজীই আমাকে পড়ে শোনাতো। লেখকের নামটা আমার এখনো মনে আছে। এরকম দেড়-গজী নাম ইহসংসারে বিরল বলে সেইটে বহু তকলীফ

বরদাস্ত করে মুখস্থ করে নিয়েছিলুম: আবু উস্‌মান্ আম্‌র ইব্‌ন্ বহ্‌র্ উল্ জাহিজ্—ধানাই-পানাই বাদ দিলে তার বিগলিতার্থ দাঁড়ায় 'প্রলম্বিত চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট'। এই জাহিজ লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী।

এ-দেশে যে আরব্যরজনী খুবই প্রচলিত সে-তথ্য আরব জানতো না। আমি সে আরব্যরজনীর কথা বলছি নে যেটি আপনারা কলেজ স্ট্রীটে পান—কেটেছেঁটে সেটিকে করা হয়েছে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতো পূতপবিত্র। আমি বটতলা সংস্করণের কথা বলছি। অশ্লীলতায় মূল আরব্যরজনী—ঐ যে কি বলে, লেডি চ্যাটারলি না কি—তেনাকে টিড-ডুয়ো দিতে পারে, হেসে-খেলে। পারলে সত্য গোপন করতুম, কিন্তু সুচতুর পাঠক বহু পূর্বেই ধরে ফেলেছেন ঐ কারণেই বইখানা আমাকে ছেলেবেলায়ই আকৃষ্ট করেছিল। আহা, ঐ যে নিগ্রো ছোকরা গোলাম আর সুন্দরী প্রভুকন্যার কেচ্ছা--না, থাক্ আবার আলীপুর যেতে চাই নে।

আরব বলছিল, জাহিজ্ নাকি আরব্যরজনীর খলীফা হারুন-অর্-রশীদের নাতি না কে যেন, সেই খলীফার উজীরের নেক্-নজরের আস্কারা পেয়ে আপন বউকে পর্যন্ত ডরাতেন না। ব্যস্, ঐ এক কথাই কাফী। কথায় বলে, বাঘের এক বাচ্চাই ব্যস্।

আত্মজীবনী আরম্ভ করার গোড়াতেই মনে পড়ল, জাহিজ্ যে অবতরণিকা দিয়ে তাঁর জীবনী আরম্ভ করেছেন সেইটে দিয়ে আমিও আরম্ভ করলে আমারও যাত্রা হবে নিরাপদ—

> 'যেমতি মূষিক ভ্রমে সাগরে বন্দরে
> নৃপতরী আরোহিয়া—'

এমন সময় খটকা লাগল। জাহিজের কিঞ্চিৎ পরিচয় তো দিতে হয়। নিদেন তাঁর জন্মকাল লীলাভূমি তো বাৎলাতে হয়।

অধমের বাসভবনে যাঁরাই পায়ের ধূলি দিয়েছেন, তাঁরাই জানেন সেখানে আর যা থাক, না-থাক, বই সেখানে একখানাও নেই। শুনেছি এক 'বিদ্যেসাগর' নেটিভ মহারাজা ভাইসরয়ের সামনে আপন কিস্মৎ বাড়াবার জন্য একটি কলেজ খোলেন। প্রিন্সিপল নিযুক্ত হয়ে দেখেন, কলেজ লাইব্রেরি নামক কোনো কিছু সেখানে নেই। তিনি টাকা চাইতেই মহারাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো হারামীকো অভী স্টেটসে। লেখাপড়া শিখে আসেনি; এখন বুঝি বই পড়ে কলেজে পড়াবে! আমাকে কি উল্লু পেয়েছে নাকি?'

এর থেকে আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য নতমস্তকে বারংবার স্বীকার করবো, একখানা বইয়ের সন্ধানে আমি সংবরণের মতো পত্নীবর কামনা করে—

—তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত—

করেছি। কি সে বই? ধর্মগ্রন্থ, আয়ুর্বেদ, কামশাস্ত্র—?

এসব কিছু না। একখানা চেক্ বই। সে দুঃখের কথা আর তুলবো না।

কিন্তু পুলিসের হুলিয়ার হুড়ো খেয়ে উপস্থিত যেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছি সেই এলাকায় এক অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করেন। তদুপরি তিনি অতিশয় অমায়িক। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলুম, 'স্যর, জাহিজ্ নামক আরবী লেখক কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?'

চট করে একখানা বই টেনে নিলেন। ঠিক ঐ ঢপের আরো খান পঁচিশেক ভলুম শেলফে বিরাজ করছিল। বই থেকে পড়ে বললেন, 'মৃত্যু হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে—'

আমার কেমন যেন ধোঁকা লাগলো। বললুম, '১৮৬৯? হারুন-রশীদের নাতির আমলের লোক তিনি—এই কথাই তো শুনেছি।'

'ঠিকই তো! দেখি, হারুনের নাতি'—বলে আরেক ভলুম পাড়লেন—'হ্যাঁ, অল-ওয়াসিক—৮৪২ থেকে ৮৪৭।' একটু চিন্তা করে বললেন, 'অহ্ হো, বুঝিছি। ১৮৬৯-এর প্রথম ১টা বাদ দিতে হবে! ওয়াসিকের মৃত্যুর পর আরো বাইশ বছর বেঁচেছিলেন আর কি।' তা থাকুন আর নাই থাকুন। মোদ্দা কথা, কিন্তু ইনি নবম শতাব্দীর লোক, আর এই পণ্ডিতদের বেদ বলো, কুরান বলো, পরম পূজনীয় এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বেচারীকে টেনে নিয়ে এলেন উনবিংশ শতাব্দীতে! তোবা! তোবা!! নির্জলা পূর্ণ এক হাজার বছরের ডিফ্রেনস্।

যে রকম সরলভাবে তিনি আমাকে স্ক্যাণ্ডালটা বুঝিয়ে বললেন যে মনে হয়, কলকাতার ডিটেকটিভ পর্যন্ত সেখানে থাকলে বুঝে যেত।

জাহিজ্ অবতরণিকায় বলেছেন, 'চতুর্দিকে আমার দুশমন আর দুশমন—দুশমনে দুশমনে আবজাব করছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার মুরুব্বী; কেউ ডরের মারে আমার রাজহাঁসটাকে পর্যন্ত বূ করতে সাহস পায় না। কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আমার দেহাস্থি গোরস্তানে প্রোথিত আমার পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষগণের জীর্ণাস্থির সঙ্গে শুভযোগে সম্মিলিত হওয়ার পূর্বেই (মেহেরবান

খুদা সে শুভমিলন আসন্ন করুন !) আমার দুশমন-গুষ্টি অশেষ তৎপরতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যাবে আমি এবং আমার উর্ধ্বতন তথা অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের পূতিগন্ধময় নিন্দাবাদ করতে—এবং তার শতকরা ন'সিকে কপোলকল্পিত, আকাশ-পুরীষ-চয়িত বেহদ্দ গুলগপ্পিকার ঝুটমুট।

যেমন, আমি জানি, আর পাঁচটা নিন্দাবাদের মাঝখানে, অতি কুচতুরতা সহ তারা কীর্তন করবে—আমি নাকি অতিশয় প্রিয়দর্শন সুপুরুষ ছিলুম, সাক্ষাৎ ইউ-সুফ-পারা হেন দেবদুর্লভ চেহারা নাকি কামনা করেন স্বয়ং বেহেস্তের ফেরেস্তারা।

ক্রোধান্ধ হয়ে জাহিজ্ এ স্থলে হুঙ্কার ছাড়ছেন, 'মিথ্যা, মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমার প্রতি অন্যায় অবিচার! আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি, যে এ-অপবাদ রটাবে তার পিতা নির্বংশ হবে। আমি আদৌ সুশ্রী নই। বস্তুত টেকো মর্কটটার চেহারা পেলে আমি বর্তে যাই। আমার মুখমণ্ডল নামক বদ্‌নাবদন চেহারার বিভীষিকা দেখে অসংখ্য শিশু ভিরমি গেছে। আমার—'

সরল পাঠক! অধম অবগত আছে তুমি জাহিজের এই আত্মকথন শুনে ধন্ধে পড়ে গ্রীব' কণ্ডুয়নে লিপ্ত হয়েছ! তোমার মনে হচ্ছে, 'এ তো বিচিত্র ব্যাপার! কেউ যদি জাহিজ্‌কে প্রিয়দর্শন বলে মন্তব্য করে তবে সেটা নিন্দা হতে যাবে কেন, আর যে মন্তব্যটা করেছে সে-ই বা দুশমন হতে যাবে কেন? আর জাহিজ্ যদি কুৎসিতই হন তাতেই বা কি? তাঁর গোর হয়ে যাওয়ার পর কে আর মিলিয়ে দেখতে পারবে তিনি সুরূপ না কদ্রূপ ছিলেন। কথায় বলে, "মড়ার উপর এক মণও মাটি শ' মণও মাটি।" তবে কি জাহিজ্ নিরতিশয় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কেউ মিথ্যে বলুক, এটা তিনি সইতে পারতেন না?—তা ও সে মিথ্যে প্রিয়ই হোক্, আর অপ্রিয়ই হোক্।

এসবের উত্তর আমি দেব কি প্রকারে? বেলা গড়িয়ে গেল, আর তুমি এখনো বুঝতে পারোনি, আমার পেটে সে-এলেম নেই! বিশেষত আমার সেই মুরুব্বী পণ্ডিত—যিনি দশটি ভাষায় ত্রিশ-ভলুমী সাইক্লোপীডিয়া নিয়ে কারবার করেন এবং যাঁর বাড়তিপড়তি মাল ভাঙিয়ে আমি হাঁড়ি চড়াই, তিনি গায়েব। তবে শেষ দেখার সময় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বলেন, 'রেনেসাঁসের পূর্বেই এই লোকটা লিখল আত্মজীবনী! আশ্চর্য আশ্চর্য! রেনেসাঁসের পূর্বে তো শুধু রাজরাজড়া আর ডাঙর ডাঙর সাধুসন্ত। সাধারণ মানুষেরও যে একটা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে সেটা আবিষ্কৃত হল রেনেসাঁসের সময়। সাধারণ লোকের আত্মজীবনী তো প্রথম লেখেন আবেলরাড দ্বাদশ শতাব্দীতে, তার পর দান্‌তে 'নবজীবন' (ভিটা নুওভা) লেখেন ত্রয়োদশ

শতাব্দীর শেষে। আর তোমার ঐ জাহিজ্ না কে লিখে ফেললে নবম শতাব্দীতে? বড়ই বিস্ময়জনক, প্রায় অবিশ্বাস্য!'

সরল পাঠক, তোমার কুটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একটা ভরসা তোমাকে দিতে পারি। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে—এক্সট্রিম্‌স মীট—দুই অন্তিম প্রান্ত একত্র হয়ে যায়। যেমন দেখতে পাবে গ্রাম্য গাড়ল (ভিলেজ ইডিয়ট) দাওয়ায় বসে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দেয় একটা শুকনো খুঁটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে, আর যোগীশ্রেষ্ঠও তাবৎ দিবসটা কাটিয়ে দেন একাসনে বসে বসে। উভয়েই কর্মস্পৃহা জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমি এক প্রান্তে, জাহিজ্ অন্য প্রান্তে—উভয়ের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

অতএব আমার আত্মজীবনী যদি অবহিত চিত্তে পাঠ করো তবে হয়তো তোমার প্রশ্নগুলোর কিছুটা সদুত্তর পেয়ে যাবে।

জাহিজ্ তাঁর কেতাব আরম্ভ করেছেন এই বলে যে তাঁর দুশমনের অভাব নেই। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার হুবহু মিল। বাকিটা সবিস্তার নিবেদন করি।

আত্মজীবনী-লেখক মাত্রই আপন বাল্যকাল নিয়ে রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। এবং সেই সুবাদে সকলেই আপন আপন বংশ-পরিচয় দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যতটা পারেন, পরিবারের মান-ইজ্জৎ বাড়িয়েই বলেন। এ নিয়ে বাক্যব্যয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশ, স্বজাতি, মাতৃভাষা নিয়ে অযথা অহেতুক বড়াই করে না, এমন মানুষ বিরল।

আমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে। তার কারণ এ নয় যে, আমি হীন পরিবারের লোক। সত্য কারণটা পাঠক একটু ধৈর্য ধরলেই বুঝতে পারবেন।

বস্তুত, পরিবার আমাদের খানদানী। আমাদের পূর্বপুরুষ শাহ্ আহ্মদের (শাহ্ এ স্থলে বাদশা নয়—'সৈয়দ'কে মধ্যযুগে 'শাহ' বলা হত) দরগা এখনো তরপ পরগনাতে আমাদের ভদ্রাসনে বিরাজিত—সেখানে প্রতি বৎসর উর্স্ হয়। তারই অল্প দূরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয়—মাতা শচী দেবীর জন্ম সেখানেই। আমাদের বংশ 'পীরের বংশ'—এঁরা কিন্তু যজমানগৃহে অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। আমার পিতামহ, মাতামহ, আমার অগ্রজদ্বয় সুপণ্ডিত। আমার অগ্রজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করে সম্প্রতি 'চর্যাপদে'র একখানি নূতন টীকা রচনা করেছেন। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ফকীরী, মারিফতী গীত ঢাকা বেতারে শুনতে পাবেন।

কিন্তু থাক, আর না। এ বিষয়টাই আমার কাছে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক।

কুলমর্যাদার প্রস্তাব উঠলেই আমার পিতা বলতেন, 'বাপ-ঠাকুর্দার শুকনো হাড় চিবিয়ে কি আর পেট ভরবে ?' আমিও চিবোইনি। চিবোনো দূরে থাক, আমাদের পিতৃপুরুষ যে গোরস্তানে শুয়ে আছেন তার পাশ দিয়ে যেতে হলে আমি মাথা হেঁট করি।

আমি এই গোষ্ঠীর একমাত্র ব্ল্যাকশীপ—কালা ম্যাড়া।

শব্দার্থে আমার বর্ণ ঘোরতর কৃষ্ণ তো বটেই—বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা আর দেব না। তবে এইটুকুন বলতে পারি পরবর্তীকালে 'উচ্চ-শিক্ষা'র অজুহাত দেখিয়ে জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতা তুই গুরুর কিল কানমলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যখন শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিই তখন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর শ্রীযুত রামকিঙ্কর বায়েজ আমাকে দেখা মাত্রই সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন, 'হুর্‌রে হুর্‌রে। কেল্লা মার দিয়া। কিষ্কিন্ধ্যার মহারাজ সুগ্রীবের বংশধর শ্রীযুত আহ্লাদী কুঞ্চিতপদম্ আমাকে বায়না দিয়েছেন শয়তানের একটি মূর্তি গড়ে দেবার জন্য। মানসসরোবর থেকে কন্যাকুমারী, হিংলাজ থেকে পরশুরাম কুণ্ডু অবধি খুঁজে খুঁজে হায়রান—মডেল আর পাই নে। গুরুদেবের কৃপায় আজ তুই হেথায় এসে গেছিস। আয় ভাই আয়। চ' কলাভবনে।'

ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহভের বেহেশতে শয়তানের প্রবেশ নিষেধ। সেখান থেকে যদি শয়তানের মূর্তি গড়ার ফরমায়েশ আসতো সেটাও না হয় বুঝতুম কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা থেকে! সেখানকার মেয়েমদ্দা তুই-ই বুঝি দারুণ খাবসুরৎ হয়!

পরবর্তীকালে কিষ্কিন্ধ্যা গিয়েছিলুম। দ্রাবিড় অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রমণীরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—'কামের প্রলোভন থেকে আমাদের রক্ষা করো।' তাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করে ভগবান কিষ্কিন্ধ্যার পুরুষ সৃষ্টি করেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে দেখি, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। আসছে রবিবারে যমের পূজা উপলক্ষে অলিম্পিকের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় টাউন হলে একটি টুর্নামেণ্ট হবে। যে সব চেয়ে বেশী বিকট মুখ-ভেংচি কাটতে পারবে সে পাবে হাজার টাকার পুরস্কার।

আমি কম্পীট করিনি। নিরীহ দর্শক হিসাবে ছিলুম মাত্র। অবশ্য বিকট বিকট গরিল্লাপারা নরদানবরাই ঐ ভেংচি প্রদর্শনীতে হিস্সে নিয়েছিলেন—কার্তিক যতই ভেংচি কাটুন না কেন তাঁকে তো আর মর্কটের মতো দেখাবে না!

সে কী ভেংচির বহর! এক-একটা দেখি আর আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যায়। আর সে কী দুর্দান্ত নেক্-টু-নেক্ রেস! কোথায় লাগে তার কাছে নিক্‌সন-হামফ্রের ঘোড়দৌড়!

পালা সাঙ্গ হল। হঠাৎ দেখি তিনজন জজই মল্লদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দর্শকদের গ্যালারি পানে এগিয়ে আসছেন। তার পর ওমা, দেখি, ঠিক আমারই সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার গলায় জবাফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যদ্যপি আপনি এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেননি তবু আপনাকে প্রথম স্থান না দিলে অবিচার হবে। ভেংচি না কেটেও আপনার মুখে বিধিদত্ত যে ভেংচি সদাই বিরাজ করছে সেটা অনবদ্য, দেব—না, না—যমদুর্লভ। তবে আপনি এই কম্পিটিশনে পার্ট নেননি বলে আইনত টাকাটা দেওয়া যায় না—সেটা যমপূজায় ব্যয় হবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ—পত্রপুষ্পাদি ভগবান শ্রিকৃষ্ণে পৌছায়, বিকটের পূজো মাত্রই আপনাকে পৌছবে।' এ বাবদে শেষ কথা। আমি আজও কেন আই-বুড়ো আছি, সেটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবে না।

পাঠক! এ লেখন প্রধানত তোমার অখণ্ড-সৌভাগ্যবান বংশধরদের জন্য। তারা যদি প্রত্যয় না যায় তবে যেন একবার কলাভবনে সন্ধান নেয়। ঐ মূর্তির একটি ফোটো তুলে রেখেছিলেন—আশ্চর্য, লেন্সটা কেন চৌচির হল না—ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রামকিঙ্কর। ছবিটা তিনি দেখালেও দেখাতে পারেন। তবে তারা যেন গ্যাসমাস্ক তথা ধুঁয়ো মাখানো কাঁচ সঙ্গে নিয়ে যায়। মূর্তিটা গায়েব হয়েছে। গুজোরব শিল্পী রদাঁর প্রেতাত্মা সেটি সরিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য।

পাড়ার ভটচার্য মহাশয়ের কাছে শুনেছি, বিয়ের সময় বনে নাকি বরের রূপ কামনা করে (আমার রূপের বর্ণনা দিলুম), বন্ধুবান্ধব বরের উত্তম কুল কামনা করে (সেটাও হল), পিতা সুশিক্ষিত বর চায়—এইবারে আমরা এলুম ইংরিজিতে যাকে বলে 'থিক্ অব দি ব্যাটল্' বা রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

ডাক্তার অবশ্য পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'স্লো বাট স্টেডি উইন্‌স দি রেস'—বিলম্বিত চালেই চলুক না, সেই চাল যদি সদা বজায় রাখে তবে সে জিতবে। অর্থাৎ হোক না গর্দভ, সে যদি গর্দভী চাল বজায় রেখে চলে তবে আখেরে ডার্বি ঘোড়ার রেস জিতবে।

জীবনের অষ্টম বর্ষাবধি আমি শুধু একটানা 'ভাত খাবো, ভাত খাবো' বলেছি। একদম স্টেডি সুরে। ডাক্তারের স্তোকবাক্যে আত্মজন পরিতৃপ্ত না হয়ে মেনে নিলেন যে আমি স্লোউইটেড জড়ভরত। অষ্টম বর্ষে (চাণক্যকে টিট দিয়ে পঞ্চমে নয়) আমাকে পাঠানো হল পাঠশালে।

হাতেখড়ির প্রথম দিবসান্তে গুরুমশাই যে-শ্লোকটি আবৃত্তি করেন সেটি

মমাগ্রজ লিখে নেন :—

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তসময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

কাক কোকিল দুইই কালো, কিন্তু মাইকেল মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন 'পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে', আর আমার কণ্ঠস্বর শুনেই গুরু বুঝে গেলেন এটা একেবারে জাত দাঁড়কাকের। সবিস্ময়ে দাদাকে শুধোলেন, 'এটা তোর ভাই ?'

তারপর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'কস্মিনকালেও শুনিনি, কাক কোকিলের বাসায় ডিম পাড়লো। এইবারে একটা ব্যত্যয় দেখলুম—হরি হে, তুমিই সত্য।'

এস্থলে তড়িঘড়ি আমি একটি সম্ভাব্য 'ভ্রম সংশোধন' করে রাখি। আমার দাদারা ফর্সা। আর আমি বিটকেল কৃষ্ণবর্ণ। অথচ আমরা একই বর্ণের, অর্থাৎ একই কুলের, অন্তত এই আমার বিশ্বাস ছিল বহুদিন ধরে।

কাকের সঙ্গে আমার আরো একটা জবরদস্ত দোস্তী দেখা গেল অচিরাৎ। আমি নিরবচ্ছিন্ন সেল্‌ফ পর্ট্রেট আঁকলুম ঝাড়া তিনটি বছর ধরে। অর্থাৎ পাততাড়িতে বছরের পর বছর কাগের ছা বগের ছা লিখে গেলুম।

আমার বিস্ময় লাগে, শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেনের জন্মনগরী করিমগঞ্জ আমারও তদ্বৎ। তাঁর আমার জন্ম একই বৎসরে। আজ তিনি তাবৎ দেশের শিক্ষাদীক্ষা তরণীর কর্ণধার, আর আমি সুর করে একটানা গেয়ে যাচ্ছি—'এক বাঁও মেলে না, দু বাঁও মেলে না—'

আমি যে শিক্ষা-দীক্ষায় নিরঙ্কুশ 'ডডনং' হয়ে রইলুম তার জন্য কবিগুরু গুরুদেবও খানিকটা দায়ী। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার ভক্তি আমৃত্যু অচলা থাকবে। কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

কবিগুরু বাঙালী তথা ভারতবাসীর সম্মুখে উত্তম উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন, কিন্তু যে-আদর্শ 'এলেন আমার দ্বারে/ডাক দিলেন অন্ধকারে' এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুল্লেখার মতো আমার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করে দিল সেটি এই :

'নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোসাঁই।
আমি তো, মা, চাইনে হতে
পণ্ডিতমশাই।

নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।'

পুনরায় :—

'যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান
শুনে আমি পণ করি যে
মুর্খু হব বলে।'

আমাকে অবশ্য কোনো উচাটন মন্ত্রোচ্চারণ করে কোনো প্রকারেই পণ করতে হয়নি। সর্বেশ্বর প্রসাদাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার লগ্ন থেকেই আমি কর্মমুক্ত। গোড়ায় ভেবেছিলুম, এটা বুঝি জড়ত্বের লক্ষণ। পরে শুনি দক্ষিণ ভারতের মহর্ষি ছন্দে গেঁথে বলেছেন, 'কর্ম কিং পরং। কর্ম তজ্জড়ম্॥' 'কর্ম তো স্বতন্ত্র নয়, কর্ম সে তো জড়!' তবে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কর্মাতে কর্মাতে অম্বিকে গোসাঁই হয়ে গিয়ে কোন্ তুর্কীস্থানের বাখারার আজব মেওয়া আলু-বুখারা লাভ হবে ?

অবশ্য নতমস্তকে স্বীকার করবো, আমি পাঠশালা পাস করেছিলুম।

শুনেছি, নাৎসি যুগে এমনও চৌকশ স্পাই ছিল যে বিশ গজ দূরের থেকে শুধুমাত্র ঠোঁট নাড়া দেখে দুজনের ফিসফিসিনিতে কি কথাবার্তা হচ্ছে আদ্যন্ত বুঝে যেত এবং পকেটে হাত গুঁজে প্যাডের উপর সেটা আগাপাস্তলা শর্টহ্যাণ্ডে তুলে নিতে পারতো। আমি কিন্তু সে লাইনে কাজ করিনি। শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে আমরা সে ব্যক্তিকে বলি 'সেয়ানা'। আমি সেই দৃষ্টিশক্তির আনুকুল্যে দশ হাত দূরের ব্রিলিয়ান্ট বয়ের খাতা থেকে টুকলি করে তবু তবু

করে পেরিয়ে গেলুম পাঠশালার ভব-নদী।

বুদ্ধিমান জন আপন বুদ্ধির জোরে তরে যায় বলে ভাগ্যবিধাতা মূর্খকে সাহায্য করেন, নইলে তিনিও বিলকুল বেকার হয়ে পড়বেন যে! মৌলা আলীকে শিরনি চড়াবে কে, কালীঘাটে মানত মানবে কোন্ মূর্খ—আর বুদ্ধিমান যে করে না, সে তো জানা কথা।

পাঠশালা পাস করার পর করলুম জীবনের চরম মূর্খমো! কলকাতার 'বেম্মো'-সমাজের বাবু-বিবিরা সে-যুগে পাড়াগাঁয়ে আসতেন আমাদের পেট্রনাইজ করার জন্য। তাঁদের চোখে কত না ঢঙ-বেঢঙের রঙ-বেরঙের চশমা। আমারও শখ গেল অপ-টু-ডেট হওয়ার। ভান করতে লাগলুম আমি ব্ল্যাক বোর্ড দেখতে পাই নে। ডাক্তারকে পর্যন্ত ঘায়েল করলুম—কিংবা সে ছিল ঝটপট দু'পয়সা কামাবার তালে।

সেই বেকার চশমা ব্যবহার করে গেল আমার শ্যেনদৃষ্টি। ফল ওৎরালো বিষময়। একই ইস্টিশানে—যেমন আগ্রা সিটি, আগ্রা ফোর্ট, আগ্রা জংশন—গাড়ি দাঁড়াতে লাগল তিন তিন বার করে। শ্যেন দৃষ্টি গেছে, টুকলি করতে পারিনি—একই ক্লাসে কাটাই তিন-তিনটি বছর কবে।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমি দিব্য অকালপক্ক 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব' লাভ করেছি—তারই একটি উদাহরণ দি। ফেল মেরে দু'কান কাটার মতো শহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় এক গুরুজন, মরালিটি প্রচারে নিরেট পাদরী সাহেব, আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ফেল মেরেছিস? লজ্জাশরম নেই? তোর দাদারা, তোদের বংশ—'

একগাল হেসে বললুম, 'কি যে বলেন, স্যার! এ্যাসন ফাস্ট ক্লাস অ্যানসার লিখেছিলুম যে এগজামিনার মুগ্ধ হয়ে খাতায় লিখলে "এনকোর এনকোর!" তাইতেই তো ফের পরীক্ষা দিচ্ছি!'

সম্পর্কে তিনি আমার জ্যাঠা। কিন্তু আমার পক্ক-নিতম্ব 'জ্যাঠামো' শুনে তিনি থ মেরে গেলেন—আমাদের স্টেট বাস যেরকম আকছারই যত্রতত্র থ মারে —বুঝে গেলেন এ-পেল্লাদকে ঘায়েল করার মতো পাষাণে, সমুদ্রে নিক্ষেপ পদ্ধতি তাঁর শস্ত্রাগারে নেই। গত যুদ্ধের ফ্লেম থ্রোয়ারের মতো একবার আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এ ছেলে বাঁচলে হয়!'

গুরুজনের আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হয়! দিব্যপুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেল। হঠাৎ উপলব্ধি করলুম বয়স ষোল। ওদিকে

ক্লাস ফাইভের যোগাসন আর পরিবর্তিত হচ্ছে না। দুনিয়ার যত ডানপিটেমি নষ্টামির মামদো উপযুক্ত পীঠস্থান পেয়ে আমার স্কন্ধে কায়েমী আসন গেড়েছে। আমার তথাকথিত অপকর্মের বয়ান আমি দফে-দফে দেব না! তবে এইটুকু বলতে পারি, পরীক্ষার হলে বেঞ্চি-ডেসকো ভাঙা, ট্রামবাস পোড়ানোর কথা শুনলে আমার ঠা ঠা করে উচ্চহাস্য হাসতে ইচ্ছে যায়। আরেকটি কথা বলতে পারি, আজ যে শ্রীহট্ট বার-এর আসামী পক্ষের উকিলরূপে সর্ববিখ্যাত মৌলভী সইফুল আলম খান—তিনি বাল্য বয়সেই কোথায় পেলেন তাঁর প্রথম তালিম? আমার 'অপকর্ম' পদ্ধতি (মডুস অপারেনডি) অপকর্ম গোপন করার কায়দা যে নব-নব রূপে দেখা দিত সেগুলো কি তিনি আমার সহপাঠী 'কনফিডেন্ট' রূপে আগাপাস্তলা নিরীক্ষণ করে তারই ফলস্বরূপ আজ উকিল সভায় স্বর্ণাসনে বসেননি!

তবু যদি পেত্যয় না যান তবে তৎকালীন আসামের আই. জি. অসরপ্রাপ্ত শ্রীযুত—দত্তকে শুধোবেন। স্পুটনিক আর কতখানি উঁচুতে গিয়েছিল? তাঁর দফতরে মৎ-বাবৎ যে ফাইল উঁচু হয়েছিল তার সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারে? এবং সানন্দে আপনাদের জানাচ্ছি প্রত্যেকটি ফাইলের উপর মোটা লাল উড-পেন্সিলে লেখা 'প্রমাণাভাব প্রমাণাভাব।' বেনিফিট অব্ ডাউট নামক প্রতিষ্ঠানটি যে মহাজন আবিষ্কার করেছিলেন তাঁকে বার বার নমস্কার।

কিন্তু দুস্তর সন্তাপের বিষয়, ইহসংসারের হেডমাস্টারকুল এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথোচিত সম্মান শ্রদ্ধা করেন না। সে সৎসাহস তাঁদের নেই। থাকলে আমার সোনার মাতৃভূমি শিক্ষাদীক্ষায় আজ এতখানি পশ্চাৎপদ কেন? আমার নাম দু-দু'বার 'ব্ল্যাক বুক'-এ উঠলো পর্যাপ্ত প্রমাণাভাব সত্ত্বেও। হেডমাস্টার নাকি মরালি সারটন হয়ে—যে-কোনো চার-আনী বটতলার মোকতারও বলবে, এটা ঘোর 'ইলিগালি অনসারটন'—আমার নাম কালো কেতাবে তুলেছেন। আরেকটা ঘটনা নাকি তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এটা যে কি রকম সংবিধান-বিরোধী 'উলট্‌রা ভিরেস' (গাড়ল ইংরেজের উচ্চারণে 'আলট্‌রা ভাইয়ারীজ')—বেআইনী স্বেচ্ছাচারিতা, সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না: হেডমাস্টার তো সেখানে সাক্ষী, তিনি সেখানে বিচারক হন কোন্ আইনে? এ স্বতঃসিদ্ধটা তো স্কুল-বয়ও জানে। জানেন না শুধু হেডমাস্টার? তাই বিবেচনা করি, যে স্কুল-বয় এ তত্ত্বটা জানে না সে-ই আখেরে হেডমাস্টার হয়।

তৃতীয়বার কোনো অপকর্ম করলে 'কালো কেতাবে' নাম ওঠে না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে সুর্মা নদীর কালো (চোখের সুর্মা-কালো) জলে ভাসিয়ে দেওয়া

হয়। সোজা বাংলায় তাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যদি সেটা শব্দার্থে নেওয়া হয়। রাস্টিকেট শব্দের প্রকৃত অর্থ, গ্রামের ছেলে শহরের স্কুলে এসে গ্রাম্য অভদ্র আচরণ করেছিল বলে তাকে ফের গ্রামে পাঠানো হল, তাকে 'রাস্টিকিট' করে দেওয়া হল, তাকে কান্ট্রিফাই করে দেওয়া হল। আমি চাঁদপানা মুখ করে সুর্মার ওপারে গ্রামে বাস করে ইস্কুলে আসতে রাজী আছি। বিস্তর ছেলে ওপার থেকে খেয়া পেরিয়ে সরকারী ইস্কুলে পড়তে আসে। আমাদের পাদ্রী সাহেবের কাছে শোনা, লাতিন 'রুস্তিকারে' ('গ্রামে বাস করা') শব্দ থেকে 'রাস্টিকেট' কথাটা এসেছে। কিন্তু এসব গুণগর্ভ সুভাষিত শুনে হেডমাস্টার যে আসন ছেড়ে আমি-সত্যকামকে গৌতম ঋষির মতো আলিঙ্গন করবেন এমত আশা তিন লিটার ভাঙ পেটে নামিয়েও করা যায় না। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। এস্থলে ধার্মিকও শুনতে চায় না ধর্মের কাহিনী—নইলে পৃথিবীতে এত গণ্ডায় গণ্ডায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম কেন? ভটচায যান মসজিদে ধর্মকাহিনী শুনতে এবং বিপরীতটা? হুঃ!

সে সব দিনে—না, রাতের আকাশে উত্তমকুমারাদি তারকা আকাশে দীপ্যমান হন নি। আমার পরবর্তী যুগের সখা দেবকী পাহাড়ীও তখন অসংখ্য বিমল উজ্জল রতনরাজির মতো খনির তিমির গর্ভে। নইলে গাগারিন্ বেগে চলে যেতুম মোহময়ী মুম্বই বা টলিউডে—হেসেখেলে পেয়ে যেতুম যম বা শয়তানের মেন্ রোল।

ভাঙের কথা এইমাত্র বলেছি: তখন স্থির করলুম স্কুলের দরওয়ানজী হনুমান পূজন তেওয়ারী—যিনি কিনা পালপরবে ঐ বস্তু সেবন করেন এবং সেই সুবাদে আমাকে তথা ফ্রেণ্ড স্বদেশ চক্রবর্তীকে ঐ বিদ্যায় হাতেখড়ি দেন—তেনাকে ভাঙ খাইয়ে বেহুঁস করে হেডমাস্টারের ঘরে লাগাবো আগুন। গায়ে আগুন লেগে গেঞ্জিটা পুড়ে গেল আর পাঞ্জাবিটা পুড়লো না—এ কখনো হয়! ব্ল্যাক বুক তার মিথ্যা সাক্ষ্য সহ পুড়ে ছাই হবে। সেই ছাই দিয়ে পরবো বিজয়-টিকা! ওয়াহ্, ওয়াহ্!

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—'

কিচ্ছুটি করতে হল না। অতি ভৈরব হরষে ঐ সময়ে এলো অসহযোগ আন্দোলন।

আমারে আর পায় কেডা?

চুম্বন

ঘটনাটা সাঁচ্চা না গুল, হলফ করে বলতে পারবো না, কিন্তু তাতে কণামাত্র যায় আসে না। রসের বিচারে সত্য না অসত্য, ভাল না মন্দ, প্রাকৃত না অপ্রাকৃত, এসব মাপকাঠি, কষ্টিপাথর সম্পূর্ণ অবান্তর। ডানাওলা অশ্ব অর্থাৎ পক্ষিরাজ ঘোড়া কখনো হয়?…রাক্ষসীই হয় না, তার উপর তার প্রাণ নাকি কোন্ এক সাত সাগরের অতল তলে কৌটোর ভিতর রয়েছে—ভোমরা রূপে। সেই ভোমরাকে চেপটে থেঁতলে না মারা পর্যন্ত ঐ রাক্ষসীর উপর যতই খঞ্জর-খাণ্ডার, বন্দুক-কামান চালাও না কেন সে মরবে না। এইসব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে যখন ঠাকুমা রূপকথা বলেন তখন কি সর্বাঙ্গে শিহরণ কম্পন রোমাঞ্চন হয় না? মধ্যরজনী অবধি ঠাকুমাকে জাবড়ে ধরে বিনিদ্রাবস্থায় কাটে না?

হালে জনৈক পাঠক আমায় জানিয়েছেন, আমার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের শহ্‌র্‌-ইয়ার নামক রমণী বঙ্গদেশের মুসলিম সমাজে কখনই থাকতে পারে না। এ চরিত্রটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য অবাস্তব হলেই যে রসের পর্যায়ে পৌঁছয় না, এ হুকুম দিয়েছেন কোন্ রসরাজ?. তাহলে পূর্বোক্ত পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া, রাক্ষসীর কৌটোতে রাখা ভোমরা প্রাণ এসব কোনো প্রকারেরই রসসৃষ্টি করতে পারে না। ঐ অকরুণ পাঠক যদি বলতেন, "শহ্‌র্‌-ইয়ার বাস্তব হোক, অবাস্তব হোক, এটা রসের পর্যায়ে পৌঁছয় নি," তাহলে আমি চাঁদপানা মুখ করে সেটা সয়ে নিতুম। কারণ এটা রুচির কথা, রসবোধের কথা। আমার আরও পাঁচজন পাঠক-পাঠিকা রয়েছেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, "না; শহ্‌র্‌-ইয়ার রসসৃষ্টি করেছে।" অতএব এ লড়াই করবেন আমার পাঠকমণ্ডলী। আমি শুক্তি বা ঝিনুক। আমার পেটে জন্মেছে শহ্‌র্‌-ইয়ার মুক্তো। জহুরীরা এর মূল্য বিচার করবেন। ঐ অকরুণ পাঠকের মতো কেউ বলবেন, "এটার মূল্য একটা কানাকড়িও নয়।" আবার কেউ কেউ হয়তো বলবেন, "না হে না, অত হেনস্তা করো না। মুক্তোটা তো নিতান্ত হাবিজাবি বলে মনে হচ্ছে না।"

এই মতভেদের মাঝখানে দুই পক্ষের কেউই তখন বলবেন না, "ঐ ঝিনুকটাকে ডাকো না কেন? সেই-ই তো এটার জন্ম দিয়েছে। সে-ই বলুক, এটার দাম কত?"

বিচক্ষণ পাঠক, চিন্তা করো, সেই ঝিনুক, যে ইতিমধ্যে মরে তু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে, তাকে কোন্ মূর্খ নিয়ে আসবে নিউ মার্কেটের জউরী বাজারে, কিংবা আমস্টারডামের মণিমুক্তোর মক্কা মদীনায়? সে এসে ফাইনাল ফৈসালা করবে, মুক্তোটির মূল্য কি হবে! তাজ্জব কী বাৎ!!

সহজতর উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয়, নেপোলিয়নকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সে-জননীই কি নেপোলিয়নের সর্বোত্তম জীবনী লেখবার হক ধারণ করেন?

কিন্তু এসব কচকচানি থাক্। যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছিলুম সেইটে নিবেদন করি।

ইয়োরোপের কোনো এক বিখ্যাত নগরে মোকদ্দমা উঠেছে এক চিত্রকরের বিরুদ্ধে। তিনি একটা একজিবিশনে একাধিক ছবির মধ্যে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নগ্না এক যুবতীর চিত্র। পুলিস মোকদ্দমা করেছে, নগ্না রমণীর চিত্র অশ্লীল, ভাল্গার্, অব্সীন, পর্নগ্রাফিক। এ ধরনের ছবি সর্বজনসমক্ষে প্রদর্শন করা বে-আইনী, ক্রিমিনাল অফেন্স।

আদালতের এজলাসে বসেছেন গণ্যমান্য বৃদ্ধ জজসাহেব, এবং জুরি হিসেবে ছ'জন সম্মানিত নাগরিক।

এক কোণে সেই নগ্না নারীর লাইফ সাইজ তৈলচিত্র। তাবৎ আদালত সেটি দেখতে পাচ্ছে। দুই পক্ষের উকিলদের তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে হঠাৎ জজ-সাহেব চিত্রকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলছেন, এ ছবিটা অশ্লীল নয়। আচ্ছা, তাহলে অশ্লীল ছবি কাকে বলে সেটা কি এই আদালত তথা জুরি মহোদয়গণকে বুঝিয়ে বলতে পারেন?"

চিত্রকর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই পারি, হুজুর। তবে অনুগ্রহ করে আমাকে মিনিট দশেক সময় দিলে বাধিত হব।"

জজ-সাহেব বললেন, "তথাস্তু!"

চিত্রকর তাঁর উকিলের কানে কানে ফিসফিস করে কি বললেন সেটা বাদ-বাকী আদালত শুনতে পেল না।

সাত আট মিনিট যেতে না যেতেই উকিলের এক ছোকরা কর্মচারী চিত্রকরের হাতে ছবি আঁকার একটা রঙের বাক্স তুলে দিল। চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নগ্না রমণীর ছবির সামনে গিয়ে রঙতুলি দিয়ে এঁকে দিলেন নগ্নার একটি পায়ে সিল্কের একটি মোজা।

জজের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হুজুর, এ ছবিটা এখন হয়ে গেল অশ্লীল!"

তাবৎ আদালত থ। জজ বললেন, "সেটা কি প্রকারে হল ? আপনি তো বরঞ্চ মোজাটি পরিয়ে দিয়ে নগ্নার দেহ কথঞ্চিৎ আবৃত করলেন ?"

চিত্রকর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এই কথঞ্চিৎ আবৃত করাতেই দেওয়া হল অশ্লীলতার ইঙ্গিত। এতক্ষণ মেয়েটি ছিল তার স্বাভাবিক, নৈসর্গিক, নেচারেল নগ্নতা নিয়ে—যে নগ্নতা দিয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নরনারী পশুপক্ষীকে ইহ-সংসারে প্রেরণ করেন। এবারে একটি মোজা পরে মেয়েটা আবরণ দিয়ে অশ্লীল সাজেশন্ দিল তার আবরণহীনতার প্রতি। এখন যদি কেউ এ ছবিটা দেখে মনে করে, কোনো গণিকা তার গ্রাহকের লম্পট কর্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করার জন্য একটিমাত্র মোজা পরেছে তবে আমি দর্শককে কণামাত্র দোষ দেব না।"

চিত্রকরের বিবৃতিতে সম্মানিত জজ তথা জুরি-মহোদয়গণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি না, সে কথা আমার মনে নেই, তবে আমার উনিশ বৎসর বয়সে—যে-সময় কিশোর মাত্রেরই হৃদয়ানুভূতি নারী-রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল, কবিগুরু যা অপূর্ব ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকাশ করেছেন :

"বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগালো দোল
আধো-জাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার আলোর দ্বন্দ্বে
যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য অসত্যের মাঝে
লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।"

সে বয়সে পূর্বোক্ত চিত্রকর-কাহিনী আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তার সাত বৎসর পর কিস্মৎ আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন প্যারিসে। কারো দোষ নেই, আমি স্বেচ্ছায় গেলুম, এ জীবনের প্রথম 'ক্যাবারে' দেখতে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমার সর্বপ্রথমই মনে হয়েছিল, এ কিশোরী যুবতীরা কি অনবদ্য সুন্দর স্বাস্থ্যই না ধরে! সুডৌল পরিপূর্ণ স্তনদ্বয়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না-মোটা-না-সরু যুগল বাহু, নাতিক্ষীণ কটিচক্র, পুষ্টনধর উরুযুগ এবং দেহের উত্তরার্ধের কুচদ্বয়ের সঙ্গে পরিমাণ রেখে তরঙ্গিত নিতম্বদ্বয়। আমি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে স্বাস্থ্যবতী সাঁওতাল রমণী এবং অন্তত একটি মাস

রাজপুতানী দেখেছি। এদের সঙ্গে আমি প্যারিসের 'ক্যাবারিনী'দের সৌন্দর্যের তুলনা করছি নে। আমি করছি স্বাস্থ্যের। সেখানে প্যারিসিনীরা বিজয়িনী। ...এবং আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। প্যারিসিনীরা যখন নাচছিল তখন তাদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী নাভিকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছিল। নদীতে যে রকম অতি ক্ষুদ্র দ'য়ের চতুর্দিকে স্রোতের চাপে ঘূর্ণায়মান আবর্ত সৃষ্ট হয়। ঠিক এই অদ্ভুত সৌন্দর্যটি আমি ইতিপূর্বে দেখেছিলুম একমাত্র রাজপুতানায়। সেখানকার কুমারীরা মাথার উপর দুটো তিনটে জলে-ভর্তি ঘড়া-কলসী চাপিয়ে বাড়ি ফেরে। ওরা তো তখন হাঁটে না। যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। তাই ওদের নাভিকুণ্ডলীর চতুর্দিকে প্যারিসিয়ান নর্তকীদের মতো সৃষ্ট হয় সেই দ', সেই আবর্ত। অপূর্ব সে দৃশ্য!

নমস্য চিত্রকর নন্দলাল, এই সচল ডাইনামিক চক্রাবর্তন তুলে নিয়েছেন এক অচল স্টাটিক ছবিতে। সেখানে সেই রাজপুতানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে খানিকক্ষণ তাকালেই চোখে ধাঁধা লাগে; মনে হয় নাভির চতুর্দিকে যেন চকিবাজী ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।...এই হল সার্থক শিল্পীর কলাদক্ষতা। সচলকে অচলতা দিয়ে, অচলকে সচলতা দিয়ে মূর্তমান করতে পারেন।

কিন্তু এ-বর্ণনা আর বাড়াবো না। আমার বক্তব্য বোঝাবার জন্য নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই নিবেদন করি।

ক্যাবারিনীদের পরনে ছিল উত্তমার্ধে অতি সূক্ষ্ম, প্রায় স্বচ্ছ, শরীরের মাংসের সঙ্গে রঙ-মিলিয়ে চীনাংশুকের গোলাপী ব্রাসিয়ের। অধমার্ধে ছিল কটিসূত্র —সোজা বাংলায় যাকে বলে ঘুনসি। সেই ঘুনসি থেকে নেবে গিয়েছে চার আঙুল চওড়া, ঠিক আমাদের পালোয়ানদের নেঙট, অবশ্য সাইজে তিনগুণের একগুণ, আকারে ত্রিকোণ, এবং সেটি ঘুরে গিয়ে পিছনের কটিমধ্যে যেখানে ঘুনসির সঙ্গে গিঁঠ খেয়েছে সেখানে সে ঠিক ঘুনসিরই মতো একটি সূক্ষ্ম সূত্ররূপ ধারণ করেছে।

নৃত্যের সর্বশেষ দৃশ্যে ক্যাবারিনীরা তাঁদের ব্রাসিয়ের খুলে খুলে স্টেজের চতুর্দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়াতে আরম্ভ করলেন।

এস্থলে এসে পাঠক আমাকে লম্পট ভাবুন আর যাই ভাবুন, হক্ কথা বলতে গাফিলী করবো না। যা থাকে কুল-কপালে!

এরপর আমি ভেবেছিলুম নর্তকীরা তাদের অধমার্ধের অঙ্গবাসও খুলে ফেলবেন। তা যখন হল না, তখন আমি আমার সঙ্গীকে শুধিয়ে জানতে পারলুম,

আইনানুযায়ী স্টেজে সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া নিষিদ্ধ। অবশ্য বে-আইনীভাবে গোপনে সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্যের ব্যবস্থার অভাবও প্যারিসে নেই।

এরা যখন নাভির নিচের কাপড়টুকু খুললো না তখনই আমার মনে হল—এবারে পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন—এ নৃত্য এবারে হয়ে গেল অশ্লীল। আমার মনে হল, সেই যে চিত্রকরের আঁকা একটি মাত্র মোজা অশ্লীলতম ইঙ্গিত দিচ্ছিল, এখানেও হুবহু তাই, বরং বলবো অশ্লীলতর, অশ্লীলতম। এরা যদি একেবারে নগ্ন হয়ে যেত তবে এরা সেই চিত্রকরের নগ্ন রমণীর মতো (একটি মোজা পরানোর পূর্বে) হয়ে যেত সরল স্বাভাবিক নৈসর্গিক নেচারেল। এদের সেই এক চিলতে দক্ষিণার্ধবাস তখন দিতে লাগলো অশ্লীলতম ইঙ্গিত—চিত্রকরের মোজাটির ইঙ্গিত তার তুলনায় কিছু না।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এক নেটিভ স্টেটের জনৈক মহারাজা ভাস্কর্য-শিল্পের প্রকৃত সমঝদার ছিলেন। তিনি ইয়োরোপ থেকে অনেকগুলো প্রথম শ্রেণীর মূর্তির প্লাস্টার-কাস্ট নিয়ে এসে তাঁর জাদুঘরটি সত্যকার দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান করে তুলেছিলেন। কিছু কিছু মূর্তি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন—পুরুষ রমণী দুই-ই। একদিন মহারানী গিয়েছেন সেই জাদুঘর দেখতে। তিনি তো শকড্। হুকুম দিলেন নগ্ন মূর্তিগুলোর কোমরে গামছা বেঁধে দিতে! পাঠক ভাবুন, রোমান মূর্তির কোমরে (বাঁধিপোতার ?) গামছা! সে কী বেঢপ দেখতে! কিন্তু এহ বাহ্য।… অজ পাড়াগাঁয়ে লোক, সে-শহরে এলে চিড়িয়াখানা এবং এই জাদুঘরটিও দেখতে আসতো। এক ছুটির দিনে আমি জাদুঘরের এটা সেটা দেখছি,—এমন সময় একটি গামছা-পরা মূর্তির সম্মুখে তিনজন গামড়িয়া—চাষাই হবে—আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমি গুড়িগুড়ি তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং নিম্নোক্ত সরেস কথোপকথন শুনতে পেলুম।

প্রথম চাষা : "মূর্তিটার কোমরে গামছা কেন ?" (আমি বুঝলুম, ঐ অঞ্চলের একাধিক মন্দিরে নগ্নমূর্তি দেখেছে বলে এ-প্রশ্নটা তুলেছে)।

দ্বিতীয় চাষা : "শুনেছি, মহারানী নাকি ন্যাংটো মূর্তি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরই হুকুমে গামছা পরানো হয়েছে।"

পূর্ণ এক মিনিটের নীরবতা। তারপর—

তৃতীয় চাষা : (ফিসফিস করে) "মহারানীর পাপ মন।"

আমার এই অভিজ্ঞতা সমর্থন করেন, ঐ জাদুঘরের ধুরন্ধর পণ্ডিত জর্মন উচ্চতম কর্তা! জাদুঘরে গাঁইয়াদের ভিড় লাগলেই তিনি তাঁর একাধিক কর্ম-চারীকে নিযুক্ত করতেন ওদের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ছবিমূর্তি সম্বন্ধে ওদের

টীকাটিপ্পনী শুনে তাঁকে রিপোর্ট দিতে।...এ-দেশ ছাড়ার সময় তিনি আমাকে বলেন, "শহুরেদের তুলনায় এ দেশের জনপদবাসীদের সরল স্পর্শকাতরতা অনেক বেশী। এরা যেমন কালীঘাটের পট দেখে আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় মডার্ন ছবি দেখেও সুখ পায়। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, গগন ঠাকুরের কিউবিস্ট ছবিও এদেরকে হকচকিয়ে দিতে পারে না। তবে এগুলো সম্বন্ধে মতামত দেবার পূর্বে—এবং আকছারই লোহার উপর হাতুড়িটি মারে মোক্ষম—অনেকখানি চিন্তা করে তবে বলে। আরো একটা মোস্ট ইনট্রিসটিঙ এবং ক্যারাকটেরিস্টিক ফ্যাক্ট—এরা থ্রী-ডাইমেনশনাল, রিয়ালিস্টিক, রঙীন ফোটো-গ্রাফের মতো ছবি বাবদে উদাসীন (যেগুলো শহুরেরা পছন্দ করেন)। এই হল আমার কর্মচারীদের রিপোর্ট।" অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কারণ, হা হতোস্মি, এই কর্মচারীরা অন্যান্য শহুরেদের মতো পছন্দ করে রঙিন ফোটো-গ্রাফের মতো ছবি।

আমি শুধালুম, "নিউড?"

হ্যার ডিরেক্টর তাজ্জব মেনে বললেন, "নিউড? এসব গ্রাম্য লোক সুস্থ স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করে। উত্তম বলদের সঙ্গে জাত গাভীর সম্বন্ধ করায়। পথেঘাটে কুকুর-বেড়ালের সম্পর্ক দেখে ছেলেবেলা থেকেই। এদের ভিতরে তো কোনো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এরা তো শহুরেদের মতো সেক্স্-স্টার্ভড্ বা পার্ভার্স নয়। এরা ন্যুড দেখে সরলচিত্তে, রস পায় অনাবিল হৃদয়ে।

কি বলতে গিয়ে কি বলে বলে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে এলুম! কিন্তু বিচক্ষণ গ্রাম্য পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন আমার এসব আশকথা-পাশকথা আমার মূল বক্তব্যের জন্য সখৎ বুনিয়াদ নির্মাণ করছে।

তা হলে ফিরে যাই ফের সেই ক্যাবারেতে; বরঞ্চ বলি, ততক্ষণে আমি সখাসহ নৃত্যশালা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমি প্যুরিটান নই, নটবরও নই। তাই এ-সব অশ্লীল ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে না। ঐ জর্মন পণ্ডিতের ভাষায় বলতে গেলে আমি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ স্বাভাবিক জনপদপ্রাণী। তদুপরি আমি বুদ্ধু। আমি চট্ করে উত্তেজিত হই নে, ঝপ্ করে মাটির সঙ্গে মিলিয়েও যাই নে।

রাস্তায় নামার পর সখা বললে, "তা হলে চলো, পুরোপাক্কা উলঙ্গ নৃত্যে।"

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! সে-জায়গার টিকিটের মূল্য তো বিলেতের পঞ্চম জর্জের মুকুটের কুহ্-ই-নূরের চেয়ে খুব কিছু একটা কম হবে না। আমার পকেটে সে-রেস্ত নেই।"

সখা জানতেন আমি বুদ্ধু। তাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "একদম নগ্ননৃত্যের আসরে টিকিটের দাম ঢের ঢের কম। ওগুলো বিলকুল পপুলার নয়।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলুম, যেটি এ-লেখনে আমার একমাত্র বক্তব্য।

সম্পূর্ণ নগ্ননৃত্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নৈসর্গিক নেচারেল জিনিস। সেটা দেখতে যাবে কে? প্যারিসে বেড়াতে আসে সাধারণতঃ বিদেশীরা। তাদের অনেকেই মরবিড, নপুংসক পার্ভার্স। তারা, এবং অল্লাধিক ফরাসীরা যায় ঐ সব অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ নৃত্যে। তারা তো নেচারেল নগ্ননৃত্য দেখতে চায় না। এইটেই আমার মূল বক্তব্য।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খোস্‌লা অতিষ্ঠ হয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সে-বিবৃতিতে তিনি একটা অশ্লীল ফিল্মের সাতিশয় ভৎর্সনাপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। যুবক নায়ক যুবতী নায়িকা একটা টিলার সানুদেশে একে অন্যের অতিশয় পাশাপাশি লম্বমান হয়ে গড়-গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন এবং একে অন্যের প্রতি কুৎসিততম জঘন্যতম যৌনইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা কেন হল, তার বিশ্লেষণ শ্রীযুত খোস্‌লা করেন নি। বোধহয় প্রয়োজন বোধ করেননি।

পাঠকদের সহৃদয় অনুমতি নিয়ে আমি তার বিশ্লেষণ করি।

যেহেতু এ-দেশের ফিল্মে চুম্বন, আলিঙ্গন, নগ্নতা দেখানো বে-আইনী তাই ফিল্ম-নির্মাতা রগরগে ছবি বানিয়েছেন যৌন-সম্পর্কের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতের আশ্রয় নিয়ে—

হুবহু যে-রকম নগ্নাকে মোজা পরিয়ে, ক্যাবারে নৃত্যের শেষ কটিবস্ত্র উন্মোচন না করে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, চুম্বন নগ্নতার বাধা-নিষেধ যদি আজ তুলে দেওয়া হয় আর্টের খাতিরে (অবশ্যই সেটা কঠিন প্রশ্ন, ফিল্মে আর্ট বলতে আমরা কি বুঝি, এ নিয়ে সুযোগ পেলে পরবর্তীকালে আলোচনা করবো), তবে কি আমাদের ফিল্ম-নির্মাতারা সঙ্গে সঙ্গে উদোম নৃত্য আরম্ভ করে তাঁদের ফিল্ম চুম্বনে নগ্নতায় ভরপুর, টৈটম্বুর করে দেবেন?

হয়তো গোড়ার দিকে কিছুটা বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরা শীগগিরই বুঝে যাবেন যে সাধারণ দর্শক তিন মিনিটব্যাপী চুম্বন, পাঁচ মিনিটব্যাপী নগ্নতা প্রদর্শন দেখবার জন্য অত্যধিক ব্যাকুল নয়। ঠিক যে-রকম পূর্বেই নিবেদন করেছি, প্যারিসের পরিপূর্ণ নগ্ননৃত্য দেখবার জন্য মানুষ হৈ-হুল্লোড় লাগায় না।

আইন দরকার, ব্যান্‌-এরও আয়োজন আছে।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, কোনো কোনো দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পরও সে-সব দেশের খুনের সংখ্যা বেড়ে যায়নি।

হালে ডেনমার্কে সর্বপ্রকার অশ্লীল 'সাহিত্যে'র উপরকার ব্যান্‌ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে কোথায় না অশ্লীল সাহিত্যের বিক্রি হুশ হুশ করে বেড়ে যাবে, রাম—ব্যাপারটা উল্টো বুঝেছেন। অশ্লীল মালের পাবলিশাররা মাথায় হাত দিয়ে ফুটপাতে বসে গেছেন। তাঁদের বিক্রি শতকরা ৭০ ভাগ কমে গেছে। কারণ মানুষের লোভ নিষিদ্ধ ফলের প্রতি। ইংরিজিতে প্রবাদ: **A stolen kiss is sweeter than any other.**

এ বাবদে শেষ আপ্তবাক্য বলেছেন একটি সুরসিকা ফরাসী মহিলা। আমেরিকায় তখন লরেন্স মহাশয়ের লেডি চ্যাটারলি পুস্তক অশ্লীল কি না, সেই নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। লেডি চ্যাটারলি পক্ষের উকিল ("লেডি চ্যাটারলির লাভার' না, "লেডি চ্যাটারলির লয়ার") হুতাশনসদৃশ প্রজ্বলিত ভাষায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করে অনুপ্রেরণিত কণ্ঠে বললেন, "লেখকরাজ লরেন্স এই পুস্তক দ্বারা যৌন সম্পর্ককে অকল্পনীয় স্বর্গীয় স্তরে (স্পিরিচুয়াল লেভেলে) তুলে ধরেছেন।"

এই বিবৃতিটি পড়ে সেই ফরাসী মহিলাটি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "সর্বনাশ! এখন তা হলে যৌন-সম্পর্কের অর্ধেক আনন্দই মাঠে মারা গেল। আমি তো এ্যাদ্দিন জানতুম, এটা পাপাচার!"

মরহুম অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাই
(আল্লার পদপ্রান্তে)

এ লেখাটি আমাকে লিখতে হবে, এবং আজই লিখতে হবে। অথচ অন্তর্যামী জানেন, এটি লিখতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমার অক্ষম লেখনী কতখানি পর্যুদস্ত হচ্ছে। ভাবাবেগে আমি এমনই মতিচ্ছন্ন যে অনেক কিছু একসঙ্গে বলতে চাই, এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারি না।

সরল পাঠক ভাবে, সাহিত্যিকের ভাবনা কি? ভাষা তার আয়ত্তে, বেদনা হোক, আনন্দ হোক সে-সব কিছুই সহজ সরলতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে। কথাটা ভুল নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে মাত্র একটি ব্যত্যয় আছে।

উপস্থিত আমার কথা ভুলে যান। সার্থক সাহিত্যিকদের কথাই বলবো।

তাঁরা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে যুবক-যুবতীর মধ্যে বিরহ ঘটান, বিধবার একমাত্র শিশুপুত্রের মৃত্যু ঘটান এবং এগুলোর চেয়েও নিদারুণতর ট্র্যাজেডি নির্মাণ করেন। তারপর অতিশয় সহানুভূতিপূর্ণ স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিরহ-কাতরা যুবতীকে, পুত্রহীনা বিধবাকে কখনো যুক্তি, কখনো অনুভূতির মারফতে সান্ত্বনা জানান।

এসব কল্পনারাজ্যের কথা।

কিন্তু যখন সার্থক সাহিত্যিকের আপন জীবনে নিদারুণ শোক আসে তখন তিনি কি করেন? তখন তাঁর অবস্থা হয় সত্যই শোচনীয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। আমার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের বড় জনৈক যশস্বী লেখক একদিন ঢুকলেন আমার ঘরে কাঁদতে কাঁদতে। আমি কোনো কিছু বলার পূর্বেই তিনি বললেন, "ভাই আমার ছোট মেয়ে মাধবী কাল বিধবা হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। তুমি ভাই, আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি কি লিখব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি নে।"

সেইদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, ব্যক্তিগত বেদনায় সাহিত্যিক কী নিদারুণ অসহায়। অপরের বেদনা সে দূর থেকে দেখে কিছুদিন ধরে সেটাকে মনের ভিতর থিতোয় এবং বেশ কিছুদিন পর সেটাকে সাহিত্য রূপে প্রকাশ করে। কিন্তু নিজের বেলায়? হায়, সে অসহায়। এবং সাধারণ "অসাহিত্যিক"-জনের চেয়েও সে নিরুপায়। সাধারণ "অসাহিত্যিক"-জন তখন বিধবা কন্যাকে সাদা-মাটা চিঠি লিখে সান্ত্বনা জানায়। মেয়েও সে চিঠি বুকে চেপে কাঁদে, সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু সার্থক সাহিত্যিক? সে তো অনেক বেশী স্পর্শকাতর। এ রকম সাদা-মাটা চিঠি সে তো লিখতে পারে না। তার তো সে অভ্যাস নেই।

সার্থক যশস্বী সাহিত্য-নির্মাতার যদি এই বিপাক হয়, তবে আমার মতো অতিশয় সাধারণ লেখকের কথা চিন্তা করুন।

আমি যে কি মতিচ্ছন্ন সেটি রচনারম্ভেই নিবেদন করেছি।

ভোরবেলা আমার এক চেলা ঘরে ঢুকলো, 'আনন্দবাজার' হাতে নিয়ে প্রায়ই আসে। আপন মনে খবরের কাগজ পড়ে।

আজ শুধলো, 'আপনি তো বাঙাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা অধ্যাপক আব্দুল হাইকে আপনি চিনতেন?'

আমি বললুম, চিনতুম মানে? এখনো চিনি। আমার চেয়ে বছর পনরো ছোট। তাহলে কি হয়! লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার

সাহিত্যরসে কী সুন্দর স্পর্শকাতরতা। তদুপরি, তুমি যা বললে, ভাষা আন্দোলনে জোর লড়নেওলা, আমার বন্ধু—'

চেলা আমাকে আনন্দবাজার এগিয়ে-দিলে। তাতে দেখি আব্দুল হাইয়ের ছবি এবং নিচে লেখা :

"ঢাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে ডক্টর হাই-এর মৃত্যু।"

ভাষা ও ধ্বনিবিদ্ বলতে শেষ পর্যন্ত বিধাতার কৃপায় বেঁচে রইলেন পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৌলানা মহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এঁরা উভয়েই পশ্চিম বাংলার কৃতী সন্তান।

দেশ বিভাগের ফলে একজন রইলেন কলকাতায়, অন্যজন ঢাকায়। যেন গঙ্গার এক ভাগ জল এল ভাগীরথী দিয়ে, অন্য হিস্যার পানি চলে গেল পদ্মা দিয়ে পাকিস্তানে। তার পর এই বাইশ বৎসর ধরে বিস্তর পানি জল[১] দু'ধারা দিয়ে বয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুত চাটুয্যের উপর নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজের চাপ পড়লো। বয়সও হয়েছে। কাজেই তাঁর প্রাণের যে কামনা—ভাষাতত্ত্বের চর্চা—তার জন্য হাতে সময় থাকে অল্পই। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, শব্দতত্ত্বে জ্ঞানার্থীজনকে তিনি সদাসর্বদা পথনির্দেশ করে দেন। ভরতনাট্যেও বলে, একটা বিশেষ বয়সের পর তুমি আর নৃত্যগীত করবে না, তোমার শিষ্যশিষ্যাদের দেহ দিয়ে তোমার নৃত্যকলা দেখাবে।

ওদিকে, ওপারে ঘটলো আরো মর্মন্তুদ ঘটনা। মৌলানা শহীদুল্লাহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বৎসর দুই পূর্বে আচম্বিতে শয্যা নিলেন[২]—বহু কাজ অসম্পূর্ণ রেখে। গত বৎসর যখন তাঁকে ঢাকা হাসপাতালে সেলাম দিতে যাই তখন তিনি আমাকে চিনতে পারলেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে—যদ্যপি

১ জলপানি বললুম না, তার অর্থ ভিন্ন। বস্তুত আমি 'পানি' শব্দের দুশমন নই। অতি অবশ্যই আমি 'জল-পাঁড়ে' নামক কাল্পনিক সমাস ব্যবহার করবো না। পক্ষান্তরে জমজমের জল না বলে জমজমের পানি বলাই ভালো। 'গঙ্গা পানি' কানে খারাপ শোনায়। কিন্তু সেও না হয় সয়ে নিলুম। মুশকিল হবে 'জলপানি' নিয়ে। কেউ 'জলপানি' পেলে সে কি 'পানি-পানি' পায়? যদিও সে খুশীতে পানি পানি হতে পারে, তার জান ত-র্-র্-র্ হতে পারে।

২ তবে ইনি এখনো সম্পূর্ণ অচল নন। এবং তাঁর গুণগ্রাহী তথা শিষ্যজনকে

আমাদের পরিচয় গত অর্ধ শতাব্দী ধরে।

উভয় বাংলাতে আমরা সকলেই আশা করেছিলুম, আব্দুল হাই একদিন শহীদুল্লাহর আসন গ্রহণ করবেন। আমি কোন সরকারী, বেসরকারী উচ্চপদের কথা ভাবছি নে। আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল একদিন তাঁর গবেষণা আরো বিস্তৃত সুপরিচিত হবে, তাঁর পথনির্দেশ গৌড়জনকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

কিস্মৎ, কিস্মৎ—সবই কিস্মৎ! একটি সামান্য উদাহরণ দি:

'হাই' শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রাণবন্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জাগ্রত ভগবান'; আব্দুল হাই শব্দদ্বয়ের অর্থ তাই 'জাগ্রত (জীবন্ত) ভগবানের (অনুগত) দাস।'

যিনি তার নামকরণ করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই আশা পোষণ করেছিলেন এ-শিশু যেন অতি, অতিশয় দীর্ঘজীবী হয়।

সে চলে গেল পঞ্চাশে। যাঁরা তাঁকে চিনতেন না, তাঁরা হয়তো ভাবলেন, পঞ্চাশ তো খুব অল্প বয়স নয়। কিন্তু আমার মতো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ পরিচয়ে চেনবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছিল তাঁরাই শুধু জানেন পঞ্চাশেও এই লোকটি ছিলেন কি অসাধারণ প্রাণবন্ত ('হাই',) বিদ্যাচর্চা রসগ্রহণে সদাজাগ্রত এমন কি মূর্তমান 'চাঞ্চল্য' বললেও অত্যুক্তি হয় না—অবশ্য সদর্থে। এঁরা সকলেই এক বাক্যে বলবেন, আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুর মতো অকালমৃত্যু—এ শোক বিধাতা যেন দয়া করে আমাদের অত্যধিক না দেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে যখন এক নবীন ভুবনে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। আব্দুল হাই যখন জ্ঞানান্বেষণে এক নূতন জগতের সম্মুখীন তখন তাঁর মৃত্যু হল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের গুরু। আজ শুধু আব্দুল হাইয়ের গুরুই তাঁর সম্বন্ধে সার্থক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রশস্তি রচনা করতে পারবেন।

তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়, আমি, আমরা শুধু আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি।

আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য আমি এ-স্থলে নিবেদন করি।

সানন্দে জানাই তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন একটি তরুণ ডাক্তার—চট্টগ্রামের চিরঞ্জীব বড়ুয়া। মানুষ বুঝি পিতাকেও অতখানি সেবা করে না।

তার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই বলে হয়তো আব্দুল হাইয়ের চরিত্রের এ মহান্ দিকটি অধিকাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অতি সংক্ষেপে নিবেদন করি।

এ-বঙ্গে আমার চেয়েও বেশী যদি আজ কেউ প্রিয়বিয়োগ-কাতর হয়ে থাকেন তবে তিনি—যদিও আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবু তাঁর অবস্থার কিছুটা অনুমান করতে পারি—ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ (ট্রিপল) ডি-লিট (ক্যাল), রিপন, হুগলী মহসিন, কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, কিন্তু বহুকাল ধরে এদেশবাসী।

অধুনা তাঁর একখানি অভিধান—'বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ'—ডক্টর আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। পূর্বতন 'পঞ্চতন্ত্র'-এ আমি এ-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমার কথা থাক। এ অভিধান প্রকাশ করার সময় আব্দুল হাই একটি ক্ষুদ্র 'ভূমিকা' লেখেন। তার থেকে আমি কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি।

হাই সাহেব ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখছেন: 'কয়েক বছর পূর্বে ডক্টর সুকুমার সেন সাহিত্য পত্রিকায় (এ পত্রিকাটি অধ্যক্ষ আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমৃত্যু সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন) প্রকাশের জন্য ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পালের "বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন" নামে একটি প্রবন্ধ আমাকে পাঠিয়ে দেন। ডক্টর পালের এ প্রবন্ধটি আমি ১৯৬৮ সালের শীত সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় সানন্দে প্রকাশ করি এবং যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে অভিধান আকারে এ-কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই।

ডক্টর পাল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা পূর্ব পাকিস্তানে। এ কারণে পূব পাকিস্তানে তাঁর কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অদৃষ্টচক্রে তিনি সীমান্তপারে বসবাস করছেন।[৩] তাহলেও তিনি মুসলিম জীবন ও সংস্কৃতিমূলক সাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মধ্যযুগ থেকে এ-কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে এ-বিরাট সংকলন গ্রন্থটি প্রণয়ন করে ডক্টর পাল বাংলা ভাষা-ভাষী সকলকে এবং বিশেষভাবে বাঙালী মুসলমান

৩ আব্দুল হাই মুর্শিদাবাদের লোক। 'অদৃষ্টচক্রে' তাঁকেও 'সীমান্তপারে' বসবাস করতে হল। তাই সমদুঃখীজনব্যথিতবেদন অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা ও স্পর্শকাতরতা ছিল। তাঁর আপন দুঃখ তিনি ডক্টর পালের মারফৎ প্রকাশ করেছেন।

সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমে 'সাহিত্য পত্রিকায়' ও পরে পুস্তকাকারে তাঁর এ মূল্যবান গবেষণামূলক সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাঙালী সুধী সমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আজ সত্যিই আনন্দিত।

মুহম্মদ আব্দুল হাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ

আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে পেরেছিলুম, পণ্ডিত আব্দুল হাই নিজে, তো জ্ঞানচর্চা করেছেনই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী উৎসাহ দিয়েছেন অন্যজনকে—শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, এ বঙ্গেও।

আর, আজ যে সব যুবক জ্ঞানচর্চা গবেষণা করতে গিয়ে নানাবিধ অন্যায় অসত্য, মনুষ্যকৃত স্বার্থপ্রণোদিত নীচ-হীন প্রতিবন্ধকের সম্মুখে পদে পদে বিড়ম্বিত হচ্ছে তারা অন্তত এই ব্যত্যয়টি, উৎসাহদাতা আব্দুল হাইয়ের এই চরিত্রমূল্যটি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করবে। আমেন।

সিংহ-মূষিক কাহিনী

চল্লিশ বৎসর বয়সের ঘাটের থেকে যৌবনতরী বিদায় দেওয়ার পরও কখনো আশা করতে পারিনি, স্বপ্নেও সে আকাশ-কুসুম চয়ন করতে পারিনি যে এ-অধমের জীবদ্দশাতেই স্বরাজ আসবে, স্বাধীন জীবন কাকে বলে তা এই চর্মচোখেই দেখে যেতে পারবো।

কিন্তু প্রভু যখন দেন, তিনি তখন চাল-ছাত চৌচির করে ঐশ্বর্য-বৈভব (নিয়ামৎ গণীমৎ) ঢেলে দেন। হঠাৎ একদিন হুড়মুড়িয়ে স্বরাজ এসে উপস্থিত —বন্যায় প্লাবনের মতো। ফলে আমরা সবাই যে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে ভেসে গেলুম এবং এখনো এমনই যাচ্ছি যে তার দিক্‌চক্রবালও দেখতে পাচ্ছি নে। আমি ইচ্ছে করেই এই অতিশয় প্রাচীন, সাদামাটা তুলনাটি পেশ করলুম, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুলনা তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে দাঁড়ায়, কিন্তু এ-স্থলে তুল্য ও তুলনীয় এমনই টায়-টায় মিলে গেছে—স্বরাজ এবং বন্যা, যে এটি সত্যি চার ঠ্যাঙের উপর দাঁড়িয়েছে। তুলনাটি যে কী রকম মোক্ষম ড্রেন পাইপ পাতলুনের

মতো টাইটফিট তার আরেকটি নিদর্শন দি। এই প্রলয়জলধিতে যে সব কর্তা-ব্যক্তিরা নৌকো ভেলা পেয়ে গেলেন তাঁরা বানে ভেসে-যাওয়া বেওয়ারিশ মাল (সেশের সম্পদ, "কোম্পানি কা মাল", যদি বেওয়ারিশ না হয় তবে বেওয়ারিশ আর কারে কয়!) আঁকশি দিয়ে ধরে ধরে আপন আপন ভল্টে বোঝাই করলেন। এখানে আরো একটা মিল রয়েছে—অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, গুটি কয়েক অ্যাঙ্‌গ্রি ইয়ং টার্ক এর "অবিমৃষ্যকারিতা"র ফলে ব্যাঙ্ক-ভল্ট বাবদে এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া হল যে সেগুলো সেই বানের জলে উৎক্ষিপ্ত-প্রক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। কোন্ কূলে ভিড়বে—আমরা তো অনুমান করতে পারছি নে। তবে মাভৈঃ! এসব ঘড়েল কুমীরগুষ্টি যখন জলের অতল থেকে নির্বিচারে অবলা কুমারী থেকে গোবর-গামার ঠ্যাং কামড়ে ধরে বহ্বারম্ভ ভক্ষণ করতে পারেন, তখন এই সব বেওয়ারিশ প্রাণহীন ভল্ট কামড়ে ধরে সেগুলোকে নদীর অর্ধনিমজ্জিত গহ্বরে নিয়ে যাওয়া তো এঁদের কাছে শনির অপরাহ্ণের পিকনিকের মতো নির্দোষ সহজ সরল, কিংবা বলতে পারেন অত্যাবশ্যকীয় 'রাজকার্যে'র অনুরোধে হাওয়াই দ্বীপে বসন্ত যাপন অথবা শীতে মন্তে কার্লো ভ্রমণ।

সন্দেহপিচেশ পাঠক হয়তো ভাবছো, আমি নিজে সেই হালুয়ার কোনো হিস্সে পাইনি বলে বন্ধ্যা রমণীর ন্যায় শতপুত্রবতীদের অভিসম্পাত দিচ্ছি। মোটেই না। আমার কপালেও ছিটেফোঁটা জুটেছে! ইরানের প্রখ্যাত কবি মৌলানা শেখ সাদী বলেছেন, 'ইহ-সংসারে মহাজন ব্যক্তি মাত্রই (সাদী গুণীজ্ঞানী অর্থে বলেছেন এস্থলে কিন্তু আপনাকে যথ সম্প্রদায়ের বেনেদের কথা ভাবতে হবে) যেন আতরের ব্যবসা করেন। তোমাকে মিন-পয়সায় আতর না দিলেও তাবৎ আতরের বাক্স ডবল তালা মেরে বন্ধ রাখলেও বাড়িময় যে আতরের খুশবাই ম-ম করছে এবং তোমার নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে, সেটা ঠেকাবেন কি প্রকারে?' এস্থলেও তাই। এ মহাজনরা যদ্যপি বাইশ বৎসর ধনদৌলত ভরা গোটা আষ্টেক লোহার সিন্দুকের উপর ডবল ডানলোপিলোতে বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছেন তথাপি এগুলো বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে এঁদের খুলতে হয় তখন পাকা বেল ফেটে গিয়ে যে কাককুল প্রবাদানুযায়ী এ রস থেকে বঞ্চিত তারাও তার হিস্সে পেয়ে যায়।

এই ধরুন কিছুদিন আগেকার কথা। এক টাকার-কুমীরের উচ্চাশা হয়েছে তিনি সমাজেও যেন গণ্যমান্যব্যক্তিরূপে উচ্চাসন লাভ করেন। হঠাৎ একদিন আমার কুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক বিরাট মোটরগাড়ি। তার

দৈর্ঘ্য এমনই যে সেটার ন্যাজামুড়ো করতে হলে হঠাৎ পিছনের লাগেজ কেরিয়ার থেকে সম্মুখের বনেটের নাক অবধি—সেখানে পদাধিকারলব্ধ পতাকা পৎ পৎ করে, এঁর গাড়িতে অবশ্য পতাকা ছিল না—যেতে হলে আরেকটা মোটরগাড়ি ভাড়া করতে হয়! তা সে যাই হোক, যাই থাক, যেই যক্ষ (অবশ্য ইনি কালিদাসের একদারনিষ্ঠ বিরহী যক্ষ নন—এঁর নাকি ভূমিতে আনন্দ ; থাক "শঙ্করে"র চৌরঙ্গী পশ্য) এসে এই অধমকে আলিঙ্গন করে একখানা চেয়ারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

নিম্নলিখিত রসালাপ হল :

যক্ষ॥ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়াতে বড়ই আনন্দিত হলুম। আমি বহুকাল ধরে আপনার একনিষ্ঠ পাঠক। আপনার "অগ্নিবীণা" আপনার "বিদ্রোহী" উপন্যাস আমি পড়েছি, কতবার পড়েছি বলে শেষ করতে পারবো না। ওঃ! কী করুণ, কী মধুর!

হরি হে, তুমিই সত্য।

আমি॥ (মনে মনে) সর্বনাশ! ইনি আমাকে কবিবর নজরুল ইসলামের সঙ্গে গোবলেট করে ফেলেছেন! যে ভুল পাঠশালার ছোকরাও যদি করে তবে সে খাবে ইস্কুলের বাদবাকি পড়ুয়াদের কাছে বেধড়ক প্যাঁদানি। তদুপরি যক্ষবর বলছেন, "বিদ্রোহী" কবিতাটি নাকি উপন্যাস এবং সেটি নাকি বড়ই করুণ আর মধুর! এস্থলে আমি করি কী! যে ব্যক্তি গাধাকে (এস্থলে আমি) দেখে বলে এটা রেসের ঘোড়া (এস্থলে কাজী কবি—কবি-পরিবার যেন অপরাধ না নেন, আমি নিছক রূপকার্থে নিবেদন করছি) সে ব্যক্তি গাধাকে তো চেনেই না, ঘোড়াকেও চেনে না। ইতিমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ॥ (স্মিতহাস্য করে) আপনার বড় ভাই সৈয়দ মুস্তাফা শিরাজ—ঐ যিনি তালতলার খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক—তিনিও আমার ছোট ভাইয়ের কাছে প্রায়ই আসেন। বড় অমায়িক বৃদ্ধ। শুনেছি আমাদের বাড়ির পাশেই তাঁর বিরাট তেতলা বাড়ি।

হরি হে, তুমিই সত্য! তুমিই সত্য!

আমি॥ (মনে মনে) এই আমার জীবনে সর্বপ্রথম আমার পিরামিড-দৃঢ় হরিভক্তিতে চিড় ধরলো। হরি যদি সত্যই হবেন তবে তাঁকে সাক্ষী রেখে এই লোকটা মিথ্যার জাহাজ বোঝাই করে যাচ্ছে আর তিনি টুঁ ফুঁ করছেন না, এটা কি প্রকারে হয়? ওদিকে শিরাজ মিঞা খাঁটি বিদগ্ধ রাঢ়ের ঘটি, আর আমি সিলট্যা খাজা বাঙাল। ওঁর সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই—থাকলে

নিশ্চয়ই শ্লাঘা অনুভব করতুম। অবশ্য আমরা সবাই আদমের সন্তান; সে হিসেবে তিনি আমার আত্মীয়। তদুপরি বেচারী পুস্তক প্রকাশক নয়, ঢাউস বাড়িও তাঁর নেই, যদ্দূর জানি আমারই মতো দিন-আনি-দিন-খাই চাকরিতে পুরো-পাক্কা-পার্মানেণ্ট। এবং বাচ্চা শিরাজ—যে আমার পুত্রের বয়সী—সে নাকি আমার অগ্রজ এবং বৃদ্ধ! বৃদ্ধ! বুঝুন ঠ্যালা। আশা করি এ লেখন বাবাজীর গোচর হলে তিনিও সব্যসাচীর ন্যায় আমাকে মাফ করে দেবেন। ইতিমধ্যে পুনরপি,

যক্ষ ॥ (তাঁর দেওয়া "বিবিধ-ভারতী"র মতো বিবিধ সংবাদ যে আমাকে একদম হতবাক করে দিয়েছে সেইটে উপলব্ধি করে, পরম পরিতোষ সহকারে) আচ্ছা, আপনি কি শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছিলেন?

আমি ॥ (মনে মনে, যাক্ মিথ্যের জাহাজ সত্যের চড়াতে এসে কিছুটা ঠেকেছে) আজ্ঞে হাঁ। তবে বিশেষ ফলোদয় হয়নি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।

—আহা কি যে বলেন! আচ্ছা, আপনার হাতের লেখা নাকি রবিঠাকুরের মতো?

—অনুকরণ করেছিলুম। সে সুন্দর লেখার কাছে আমার লেখা কি কস্মিন-কালেও পৌঁছতে পারে?

—আচ্ছা, কিন্তু আপনি নাকি হুবহু তাঁর নাম সই করতে পারেন? একবার নাকি তাঁর নাম সই করে ভুয়ো নোটিশ মারফৎ আশ্রমকে একদিনের ছুটি দেন। পরে নাকি আপনি নিজেই সেটা ফাঁস করে দেন?

আমি "কীর্তিটি" অস্বীকার করলুম না। কিন্তু যক্ষরাজ কোন্ দিকে নল চালাচ্ছেন সেঁটে বসে, তখনও বুঝিনি! জানলা দরজার দিকে ঘুরে এবারে চেয়ার ছেড়ে তক্তপোশে আমার গা সেঁটে বসে, জানলা দরজার দিকে ঘোর সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ফিসফিস করে আমার কানে কানে বললেন, বাবু, তোমার হাল তো দেখতে পাচ্ছি। তোমার দু'-পয়সা হবে: আমারও ফায়দা হবে। কিন্তু কাককোকিল পোকাপরিন্দায়ও যেন জানতে না পায়।

আমার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের একখানা সার্টিফিকেট। আমি যে তাঁর জীবিতাবস্থায় গোপনে গোপনে দেশসেবা, পলিটিক্যাল কাজ এবং বিশ্বভারতীকে সাহায্য করছিলুম সেই মর্মে একখানা চিঠি। শেষ বয়েসে তাঁর প্রায় সব চিঠিই ইংরিজিতে টাইপ হত, তিনি শুধুমাত্র সই করে দিতেন।

আপনাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমি সেই জরাজীর্ণ টাইপরাইটার মেলা জাঙ্কের সঙ্গে নিলামে কিনেছি, অবশ্যই দালাল মারফৎ। আমার কপাল

ভালো। ঐ সব হাবিজাবির ভিতর তাঁর প্রাচীন দিনের একগুচ্ছা লেটারহেড সমেত হলদে ফ্যাকাশে নোটপেপারও পেয়ে গিয়েছি। টাইপরাইটারটা সযত্নে মেরামত করেছি। এখন এটা ঠিক ১৯৩৮।৩৯।৪১-এর মতোই ছাপা ফোটায়। আমি পাকা লোককে দিয়ে সার্টিফিকেটের মুশাবিদা করাবো, টাইপ করাবো। তারপর কবির দস্তখৎটি হয়ে গেলে দলিলটি রেখে দেব আঁকাড়া চালের বস্তার ভিতর। ব্যস! আর দেখতে হবে না। টাইপের কালি, দস্তখতের কালি সব ম্যাটমেটে মেরে গিয়ে ১৯৪১ সনের চেহারা নিয়ে বেরুবে সেই খানদানী চেহারা নিয়ে।

এই চূড়ান্তে পৌঁছে যক্ষ হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন।

সাংসারিক বুদ্ধি আমার ঘটে আছে, এহেন অপবাদ যে-সব পাওনাদারদের আমি নিত্যি নিত্যি ফাঁকি দিয়ে অদ্যাবধি বেঁচেবর্তে আছি তাঁরাও বলবেন না। তৎসত্ত্বে এ-নাটকের শেষাঙ্কে আমি যেন অকস্মাৎ অর্জুনের দিব্যদৃষ্টি প্রসাদাৎ কৃষ্ণাবতারের বিশ্বরূপ দেখতে পেলুম।

"সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট!" অর্থাৎ পূর্বোক্ত দলিলে আমাকে জাল করতে হবে কবির সিগনেচর, স্বাক্ষর, দস্তখৎ। দস্ত্ কথা শব্দটির অর্থ হাত (যার থেকে দস্তানা এসেছে); আমাকে দস্তখৎ করতে হবে না, করতে হবে দস্তক্ষত—অর্থাৎ জাল করে হাতে ক্ষত আনতে হবে।

আমার মুখে কোনো কথা যোগালো না।

যক্ষ বললেন, আপনার দক্ষিণা কি পরিমাণ হবে?

আমার মাথায় তখন নলরাজদেহনির্গত কলি ঢুকেছে, অর্থাৎ দুষ্টবুদ্ধি চেপেছে। দেখিই না, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

ব্রীড়াময়ী কুমারীর মতো—কিংবা ধোওয়া তুলসী পাতাটির মতোও বলতে পারেন—ক্ষিতিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিবেদন করলুম, আপনি বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে না তাকিয়েই অনুভব করলুম যক্ষের সর্বাঙ্গে শিহরণ রোমাঞ্চন উত্তাল তরঙ্গ তুলেছে। এত সহজে যে নিরীহ একটা লেখক এহেন ফেরেব্বাজীতে রাজী হবে, এ-দুরাশা তিনি আদপেই করেননি। ভেবেছিলেন আমাকে বহুৎ ডলাইমলাই করতে হবে। সোল্লাসে বললেন পাঁচশ।

আমি তুলসীপাতার কোমল রূপটি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করে সুতীক্ষ্ণ তালপাতার আকার ধারণ করে বললুম, আপনি কি ছাগীর দরে হাতি কিনতে চান? তার চাইতে যান না যে-কোনো আদালতের সামনে বটতলায়। পাকা জালিয়াত

পাঁচটি টাকায় ঐ কর্মটি করে দেবে!

আমার চাই পাঁচ হাজার।

আমি বেশ বুঝে গিয়েছিলুম, যক্ষ প্রফেশনাল জালিয়াতের কাছে যেতে চান না। সেটা মোস্ট ডেনজরস্।

ইতিমধ্যে এই প্রথম তাঁর পরিপূর্ণ সপ্রতিভ ভাব কেটে গিয়ে তিনি হয়ে গেছেন স্তম্ভিত হতভম্ব। কিছুক্ষণ পরে রাম ইডিয়টের মতো বিড়বিড় করে বললেন, পাঁচ হাজার?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, বড়বাজারের নাপিতকে দিয়ে আপনার কান সাফ করাতে হবে না। ঠিকই শুনেছেন।

অতঃপর গৃহমধ্যে সূচীভেদ্য নৈস্তব্ধ্য।

খানিকক্ষণ পর আমিই বললুম, আপনি বাড়ি গিয়ে চিন্তা করুন, স্লীপ ওভার ইট। আমিও তাই করবো।

আমি জানতুম, এ সব ঘড়েলদের সবচেয়ে বড় গুণ এদের ধৈর্য। তাই এই ধৈর্য কাজে লাগাবার ফুরসত-মোকা পেলেই এরা সোল্লাসে রাজী হয়। ধৈর্য দ্বারা ঘষতে ঘষতে এরা অন্যপক্ষের প্রস্তরও ক্ষয় করতে পারে।

আর আমারও তো কোনো স্টক নেই। এদের ধৈর্য যদি অফুরন্ত হয়, তবে আমার ধৈর্য অনন্ত। দেখাই যাক না, শ্রাদ্ধ কদ্দুর গড়ায়!

তাই গোড়াতেই বলছিলুম আমাদের মত নগণ্যগণও এ-সব ছিটেফোঁটার সুযোগ পায়, কিন্তু হায়, যার অদৃষ্টে অর্থ নেই তার কপালে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঠাকুরানীও ফোঁটা আঁকতে এলে সে মূর্খ তখন যায় নদীতীরে, কপাল ধুতে! ফিরে এসে দেখে, লক্ষ্মী অন্তর্ধান করেছেন। তাই তাঁর নাম চপলা!

রাবাৎ—ইনসল্ট

প্রখ্যাত লেখক রেমার্ক-এর উপন্যাস "পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ (অল কোআএট্)"-এর এক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে কয়েকজন নিতান্ত সাধারণ সেপাইয়ের মধ্যে। ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে প্রতিবেদন নিবেদন করছি। একজন সেপাই শুধোলে, "লড়াই লাগে কেন?" আরেকজন বললে, "দূর বোকা! এক দেশ আরেক দেশকে অপমান করে। তখন লাগে লড়াই।" প্রথম সেপাই তখন বললে, "কিন্তু আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছি নে। যারা করছে তারা

প্রাণভরে লড়ুক। আমাকে আমার বাড়ি, ক্ষেতখামারে ফিরে যেতে দেয় না কেন ?"

রাবাৎ সম্মেলনে নাকি ভারতবর্ষ ইন্‌সল্টেড হয়েছেন। কই, আমি তো মোটেই অপমানিত বোধ করছি নে। তদুপরি আরেকটা তত্ত্ব এ-স্থলে আমার স্মরণে আসে। আমার বাল্যবয়সে আমার এক গুরুজনের সামনে বাইরের এক ব্যক্তি আমাকে অযথা কড়া কড়া কথা শোনায়। আমি তখন চটে গিয়ে বলি, 'আমাকে অপমান করছেন কেন ?' সে ব্যক্তি কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার সেই মুরুব্বী তখন বললেন, "ঐ তো করলে ব্যাকরণে—প্রোতোকলে—ভুল। তুমি স্বীকার করে নিলে তুমি অপমানিত হয়েছ। তারপর যে অপমান করেছে সে মাফ না চেয়ে চলে গেল। তুমি রয়ে গেলে অপমানিত। সুতরাং কক্‌খনো নিজের মুখে মেনে নিতে নেই, 'আমি অপমানিত হয়েছি।' নিতান্তই যদি তখন তোমাকে কিছু বলতে হয়, তবে বলবে, 'আপনি এরকম অভদ্র আচরণ করছেন কেন ?' দোষটা চাপাবে তার ঘাড়ে। এবং আরো নিতান্তই যদি অপমান বোধ করে থাকো তবে সেটা জোর গলায় স্বীকার না করে, চুপসে সেটা হজম করে নেবে এবং তক্কে তক্কে থাকবে কখন ব্যাটার উপর মোক্ষম দাদ তুলতে পারবে—যদ্যপি আল্লাতালার আদেশ সব্‌র্ (সহিষ্ণুতাসহ ক্ষমা—যার থেকে বাংলার "সবুর" কথাটা এসেছে।) রাবাতের ব্যাপারটা আগাপাস্তলা "মুসলমানী" ছিল বলে মুসলমানী শাস্ত্রের নজির দিলুম।

এর উপর আরেকটা কথা আছে। অপমান করতে পারে কে, কাকে ? আমি গেলুম আপনার বাড়িতে। আপনার চাকর আমাকে খামোখা কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলে—বৈঠকখানায় ঢুকতেই দিলে না। এ-স্থলে সে আমাকে অপমান করেনি, করেছে রূঢ় ব্যবহার—আমাকে অপমান করার মত সামাজিক আসন তার কোথায় ? আবার দেখুন, অন্য আরেকদিন আপনার ঠাকুরদা বসে ছিলেন বারান্দায়। আমাকে দেখেই খাপ্পা হয়ে আমাকে নাহক বকতে শুরু করলেন। সে-স্থলেও আমি অপমানিত নই। কারণ আমি আপনার বন্ধু। আপনার পিতামহের বিলক্ষণ হক্ক আছে আমাকে কড়া কথা বলার।...অপমান হয় সমপর্যায়ে। যেমন মনে করুন, সন্তোষ ঘোষ। তিনি লেখক, আমিও লেখক। তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন, আমিও তাঁকে অপমান করতে পারি। আরেকটি নজির দিই। যদ্যপি আইনে বারণ তথাপি ইতালি প্রভৃতি কোনো কোনো দেশে ডুয়েল লড়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

কিন্তু সেখানেও যদি আপনার ভৃত্য ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ডুয়েলে চ্যালেন্জ্ করে, সে-খবর জানিয়ে তুজন প্রতিভূ চাকরের প্রতিভূদের সঙ্গে তু-মিনিট আলোচনা করেই, একবাক্যে চারজনাই রায় দেবেন, "এ ডুয়েল হতে পারে না। তু'জনার পদমর্যাদা এক নয়। চাকরটা শুধু তার পদমর্যাদা বাড়াবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেন্জ্ করেছে।"

মরক্কো দেশ কোথায়, মশাই? শুনেছি সেখান থেকে মরক্কো লেদার নামক পুরু চামড়া রপ্তানি হয়। পুরু চামড়া নিশ্চয়ই। নইলে সেখানকার লোক এই সুদূর ভারতবর্ষের লোককে নিমন্ত্রণ করে—তাদের অর্বাচীন ইতিহাসে (প্রাচীন ইতিহাস এদের নেই) এই বোধ হয় তারা কাউকে কখনো নিমন্ত্রণ করলো—এ রকম পুরু চামড়ার আচরণ করবে কেন? তদুপরি শুনেছি, মরক্কো দেশকে নাকি এখনো বহু বাবতে ফ্রান্স এবং স্পেনের কথামতো চলতে হয়, এবং সর্বশেষে শুনেছি, স্পেন ও ফ্রান্সের ঝগড়ার সুযোগ নিয়েই এ-দেশের যেটুকু "স্বাধীনতা" আছে সেটুকু বেঁচেবর্তে আছে। আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগে, মুসলিম রাষ্ট্রদের নিমন্ত্রণ করে এরা যেন সেই ইতালীয় ডুয়েলকামীর মতো পদমর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিল। আমার তো মনে হয় না, আক্সা মসজিদের আগুন মরক্কোর বুকে কোনো আগুন জালিয়ে দিয়েছিল।

কোথায় মরক্কো, কোথায় ভারত? পদমর্যাদায় কোথায় ভারত আর কোথায় সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর টা-পেনি হে-পেনি মরক্কো! সে আমাদের ইনসল্ট করবে কী করে!

ফখরুদ্দীন সায়েব, দীনেশবাবু, আমাদের ফরেন আপিস যা করলেন সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার দুঃখ, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে চিঠিপত্র ছাপিয়ে এ-দেশের মুসলমানরা এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন না কেন? বলেন না কেন যে, এঁদেরই হয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার ঐ একটা থার্ড ক্লাস দেশে গিয়েছিল।

যদ্যপি-বা স্বীকার করি—আমি করি না—যে ভারত রাবাতে ইনসল্টেড হয়েছে—তথাপি বলবো, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অপমানিত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই। ক্ষুদ্র স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে জয়ী হলেও উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করার কিছু নেই।

অল-মসজিদ্-উল-আক্সা

আজকের দিনে বিশ্ব মুসলিম প্রধানত তিনটি তীর্থ দর্শনে যান। মক্কায় আল্লার ঘর কা'বাতে, মদীনায় পয়গম্বরের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তৃতীয় জেরুজালেমে—যেখানে ইহুদি, খ্রীষ্ট ও ইসলাম তিন ধর্মের সমন্বয় হয়।

প্রকৃত শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী কিন্তু বিশ্ব মুসলিমকে যে-তিনটি পুণ্যভূমি স্বীকার করতে হয় তার একটি মক্কার কা'বা এবং তারপর যে পুণ্যস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে তার দুইটিই জেরুজালেমে। এর প্রথমটি একাধিক নামে পরিচিত। ইংরিজিতে একে ডোম্ অব দি রক্ (রক=প্রস্তরের উপর নির্মিত ডোম্=গুম্বুজ), ঐতিহাসিক ভ্রান্তিবশতঃ ওমর মস্ক্‌ও বলা হয়; আরবীতে এটিকে কুব্বতুস্—সখরা (কুব্বৎ=ডোম; সখ্‌রা=প্রস্তর বলা হয়)। এটিকে ইহুদি, খ্রীস্টান, মুসলমান সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে। কারণ এই তিন ধর্মেরই সম্মানিত রাজা সুলেমানের প্রসিদ্ধ মন্দির একদা এস্থলেই দণ্ডায়মান ছিল। এই সলমনের টেম্পল্ একাধিক বার বিনষ্ট হয় এবং সর্বশেষে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা। ভগ্নস্তূপের উপর তাবৎ শহরের ময়লা স্তূপীকৃত হতে থাকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' বৎসর ধরে। ৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হজরৎ ওমর খ্রীস্টানদের হাত থেকে জেরুজালেম অধিকার করে জঞ্জাল সরিয়ে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর পঞ্চাশ বৎসর পর আমাদের শাহ্-জাহানের মতো বিত্তশালী ও স্থাপত্যে সুরুচিসম্পন্ন খলিফা আব্দুল মালিক সেখানে যে পৃথিবীর অন্যতম অনবদ্য ইমারৎ নির্মাণ করেন সেইটিই ১২০০ বৎসর ধরে সেখানে অটুট অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিশ্বজনের সৌন্দর্যস্তুতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছে। আমি যতদিন জেরুজালেমে ছিলুম তার প্রায় প্রতিদিন একবার না একবার একা একা ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর বিরাট আরকিটেক্টনিকাল বৈভব থেকে ক্ষুদ্রতম অলংকরণ দেখে মুগ্ধ হতুম।

(১) কা'বা, (২) উপরে উল্লিখিত এই মসজিদ—তারপরই আসে (৩) মস্‌জিদ-উল্-আক্সা, সংক্ষেপে আক্সা মসজিদ। এই আক্সার উল্লেখ কুরান শরীফে আছে (সূরা ১৭ : ১)।

এ স্থলে কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

আরব ও ইহুদি একই সেমিতি বংশ (রেস) জাত, একই রক্ত ধারণ করে। আরবী ও হীব্রু (ইহুদিদের এই ভাষাতেই তাদের বাইবেল রচিত) ভাষা দুই

ভঙ্গী, অর্থাৎ কগ্‌নেট্‌। এবং সব চেয়ে বড় কথা বাইবেলে বর্ণিত ইহুদী প্রফেটগণ যথা, আব্রাহম, দায়ুদ, সুলেমান ইত্যাদি কুরান শরীফেও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। হজরৎ নবী তাই যখন ইসলাম প্রচার করেন তখন তিনি ইহুদি আরবের কেন্দ্রভূমি জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু হজরতের মদীনা শহরের বসতি স্থাপনা করার দুই বৎসর পর আল্লার আদেশে মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন—এবং আজও সেই রীতি প্রচলিত আছে। এরই ফলে জেরুজালেমের সলমন-মন্দিরভূমি মুসলিম জগতে দ্বিতীয় স্থান পেল বটে তবু কোনো কোনো জাত্যভিমানী আরব সেটিকে বহু শতাব্দী ধরে প্রথম স্থানেই রেখেছিলেন—বিশেষত উম্মই (ওমাইয়াড্‌) খলিফারা। অদ্যকার দিনে কিন্তু মুসলিম জহান প্রথম স্থান দেয় মক্কার কা'বা শরীফকে এবং দ্বিতীয় স্থান জেরুজালেমের সলমন মন্দিরকে—যার উপর প্রতিষ্ঠিত আব্দুল মালিক নির্মিত এমারতের বয়ান এইমাত্র দিয়েছি এবং এর পরেই বলেছি, তৃতীয় পুণ্যক্ষেত্র—মসজিদ্‌-উল্‌-আক্‌সা।

কিন্তু তৃতীয় হলে কি হয়, এই আক্‌সার সঙ্গে বিজড়িত আছে বিশ্ব মুসলিমের রোমহর্ষক উত্তেজনাদায়ী ঐতিহ্য, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্মিলিত হবার অবিস্মরণীয় অভিযান এবং তার চরম ফলপ্রাপ্তি—নজাৎ, মোক্ষ, মহা পরিনির্বাণ, যা-খুশী বলতে পারেন।

কুরান শরীফে এ-অভিযানের যে-বয়ান লেখা আছে, হদীসে তার যে টীকা-টিপ্পনী আছে (কুরান হিন্দুদের বেদস্থানীয় শ্রুতি ; হদীসকে স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে সচরাচর তুলনা করা হয়, আশা করি কোনো মুসলমান এ-তুলনার জন্য অপরাধ নেবেন না)। বস্তুত ইয়োরোপীয় কাব্যের ইতিহাসে ইসলামের এই অনুচ্ছেদটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। দান্তের মহাকাব্য "ডিভাইন কমেডি" এর কাছে ঋণী—অপর্যাপ্ত ইয়োরোপীয় আরবী তথা ইতালিয়ান ভাষা-সাহিত্যের গুণীজ্ঞানী আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন।

কুরানে আছে, পয়গম্বর সাহেব মক্কাতে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার কিছু কালের মধ্যেই স্বয়ং আল্লাতালা তাঁকে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পরম সত্যধর্মের নিগূঢ়তম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাঁর প্রধান ফেরেশতা ("দেবদূত" ইংরিজিতে "আর্কেঞ্জেল" জিব্‌রাঈল = গেব্রিয়েলকে) পাঠান মুহম্মদকে (দঃ) তাঁর সমীপে

নিয়ে আসতে।[১] কুরান শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে,

"সেই (ব্যক্তিই) ধন্য যিনি এক রাত্রেই তাঁর অনুচরসহ মসজিদ্-উল্-হারাম্ (অর্থাৎ মক্কার কা'বা) থেকে একই রাত্রে মসজিদ-উল্-আক্সা (জেরুজালেম) পর্যন্ত ভ্রমণ করেন, যার চতুর্দিক আমরা পূত করেছি। এবং যাতে করে আমরা তাঁকে আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি।" (কুরান শরীফ; সুরা ১৭ : ১)

অন্বয় এবং টীকা : "সেই ব্যক্তি" হজরৎ। "একই রাত্রে"—তখনকার দিনে যানবাহন যা ছিল তাতে করে মক্কা থেকে জেরুজালেম পৌঁছতে অন্তত (উটে চড়েও) পনেরো দিন লাগার কথা। এটা আমার অনুমান মাত্র। কম তো হতে পারে না; বেশীই হবে।

"আমাদের চিহ্ন দেখাতে পারি"—অর্থাৎ আল্লাতালা স্বয়ং তাঁকে সত্যধর্মের গভীর তত্ত্বে দীক্ষিত করবেন—পূর্বোক্ত নজাৎ মোক্ষ ইত্যাদি।

এস্থলে প্রশ্ন মসজিদ-উল্-আক্সা কোন্ স্থলে অধিষ্ঠিত? মুসলিম অমুসলিম (অমুসলিম এই কারণে বলছি, প্রচলিতার্থে অহিন্দু মাক্সমুলার যে-রকম বেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, ঠিক সেই জিনিসই করেছেন একাধিক ইয়োরোপীয় অমুসলিম পণ্ডিত কুরান হদীস নিয়ে) সকলেই তার অধিষ্ঠান জেরুজালেমে ছিল বলে স্থির-নিশ্চয়—তাই আমি অনুবাদ এবং টীকাতে একই রাত্রে মক্কা থেকে জেরুজালেম ভ্রমণের কথা বলেছি।

পণ্ডিতদের বক্তব্য, মক্কা শরীফের বাইরে এমন এক জায়গা যেটি আল্লা স্বয়ং পূতপবিত্র করেছেন সে-শুধু জেরুজালেমই হতে পারে। কারণ ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ই হজরৎ নবী ঐ দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছিলেন। অতএব সেই জেরুজালেমের সলমনের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ভূমিতেই আছে মস্জিদ-উল্-আক্সা।

পূর্বেই বলেছি খলিফা ওমর সলমন মন্দিরের সেই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ এবং পরবর্তীকালে আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন ডোম অব দি রক্, এবং তারই অতি কাছে আরেকটি বৃহত্তর বিরাট মসজিদ্-উল্-আক্সা।

ডোম অব্ দি রক্ একটা পাথরের চতুর্দিকে গড়া হয়েছিল বলে স্থপতি সেটাকে হাজার হাজার নমাজার্থী মুসলমানের জন্য বিরাট কলেবর দিতে পারেন

১ কুরান শরীফে জিব্রাঈলের উল্লেখ নেই। একাধিক হদীসে সবিস্তর আছে।

নি। তাই তিনি সেটিকে করেছিলেন সুন্দর, মধুর। অবশ্য মসজিদের চতুর্দিকে দিয়েছিলেন প্রশস্ততম অঙ্গন (এদেশের মন্দিরে সঙ্কীর্ণ গর্ভ-গৃহের চতুর্দিকে যে-রকম বিস্তীর্ণ অঙ্গন রাখা হয়), কিন্তু গ্রীষ্মকালে, জেরুজালেমের দ্বিপ্রহর রৌদ্রে সেখানকার অনাচ্ছাদিত মুক্তাঙ্গনে—যেখানে মস্তকোপরি সূর্যের প্রতাপের চেয়ে পদতলের পাষাণ ঢের বেশী পীড়াদায়ক—সেখানে জুম্মা নামাজ পড়া অহেতুক পীড়াদায়ক হবে বলে তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর প্রাণ যা চায় সেই পরিমাণে বিস্তৃত, মসজিদ-উল্-আক্সা।

কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে বিশ্ব মুসলিমের কাছে মসজিদ্-উল্-আক্সা তাবৎ পুণ্যভূমির মধ্যে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর।

কুরান হদীসের সঙ্গে যে মুসলিমের সামান্যতম পরিচয় আছে, সে-ই আপন মনে কল্পনা করে, সেই সুদূর মক্কা থেকে আল্লা তাঁর প্রিয় নবীকে রাতারাতি নিয়ে এলেন মসজিদ্-উল্ আক্সাতে (শব্দার্থে মক্কা থেকে "সবচেয়ে দূরে পুণ্যক্ষেত্রে"), সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, 'বুর্‌াক্' নামক পক্ষিরাজ অশ্ব এবং তার মুখ মানবীর ন্যায়—সেই অশ্বে সোয়ার হয়ে নবীজী পৌঁছলেন বেহেশ্‌তের দ্বার-প্রান্তে।

এই নিয়ে সে মনে মনে কত না কল্পনার জাল বোনে! স্বয়ং আল্লার সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ!

অবশ্য এ-কথাও সত্য যে বহু মুসলিম দার্শনিক সূফী (রহস্যবাদী ভক্ত= মিস্টিক) এ প্রশ্ন বার বার শুধিয়েছেন, এই যে হজরতের স্বর্গারোহণ এটা কি বাস্তব না স্বপ্ন; তিনি কি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন, না তাঁর আত্মা মাত্রই আল্লার সম্মুখীন হয়েছিলেন? কিন্তু মোলাকাত যে হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

যাই হোক্, যা-ই থাক্,—এই মসজিদ-উল্-আক্সা থেকেই, আল্লাতালা হজরৎকে দিয়ে স্থাপনা করলেন মর্ত্যভূমি ও স্বর্গভূমিতে যোগ-সেতু।

সেই সেতুর পার্থিব প্রান্ত পুড়িয়ে দিয়ে সে-সেতু বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা অজ্ঞ বিজ্ঞ যে-কোনো মুসলমানকেই বিচলিত করার কথা।

ন্যাকামো

প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বর প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠশালার মাস্টার-মশাইদের 'দুরাবস্থা', দেশ থেকে কেন নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে না এই নিয়ে বিরাট বিরাট মীটিং হয়, বিস্তর চেল্লাচেল্লি হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয়। তারপর সারা বৎসর নিশ্চুপ।

এ-যেন কঞ্জুস শ্বশুরের জামাইষষ্ঠী করার মতো। নিতান্ত না করলেই নয় বলে। তারপর পরিপূর্ণ একটি বৎসর কিপ্টে শ্বশুর নিশ্চিন্দি।

উঁহু! তুলনাটা টায়-টায় মিললো না। শ্বশুর যতই হাড়ে টক শাইলক হোক না কেন, এবং জামাই যতই হতভাগ্য দুঃখী হোক না কেন, সে বেচারী অন্তত একবেলার মতো পেট ভরে খেতে পায় এবং শুনেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একখানা কাপড়ও পায়। আমি সঠিক বলতে পারবো না কারণ আমি মুসলমানী বিয়ে করেছি। যদ্যপি সম্পর্কে তার এক বারেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই কলকাতা শহরেই পুরুষ্টু পাঁঠাটার মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঝাঁ-চকচকে একাধিক মোটর দাবড়ে বেড়ায় তবু শালা…আমি অশ্রাব্য অছাপা গালিগালাজ করছি নে[১]—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটা সম্পর্কে আমার বড়কুটুম (শ্যালক)—আমাকে জামাই-ষষ্ঠীর দিনে স্মরণ করে না। কারণ তার পিতা—আমার ঈশ্বর শ্বশুর মহাশয় তাঁর সাধনোচিত ধামে চলে যাওয়ার পর এই শ্যালকটি তার পিতার তাবৎ সব গ্রহণ করেছেন নৃত্য করতে করতে। (সত্যের খাতিরে অনিচ্ছায় বলছি দাতাকর্ণ

১ আমার প্রতি অকারণ সহৃদয় পাঠক, যাঁরা আশকথা-পাশকথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে অবান্তর একটি ঘটনার উল্লেখ। আমার বৃদ্ধ পিতা তখন ছোট একটি মহকুমার অনারারি হাকিম। একদিন আদালত থেকে ফিরে আমায় বললেন, "সিতু, আজ আদালতে কি হয়েছিল, জানিস? এক মূর্খ আরেক গাধার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনেছে, ঐ দোসরাটা নাকি তাকে সদর রাস্তায় 'শালা' বলে গালাগালি দিয়েছে (এতদিন পরে আমার মনে নেই সেটা এবুজিভ ল্যানগুইজ না ডিফেমেশন ছিল—লেখক)।" তারপর বাবা বললেন, "আসামী পক্ষের মোক্তারের বক্তব্য, যাকে সে 'শালা' বলেছে সে সম্পর্কে সত্যিই তার শালা; অতএব কোনো অপরাধ হয়নি। বিপক্ষ কিন্তু বলছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আসামী যখন শালা বলেছে তখন মধুভরা সোহাগ-পোরা সে শালা বলেনি; বলেছে

শ্বশুরমশাই বিশেষ কিছু রেখে যাননি, এবং সামান্য যেটুকু ভদ্রাসন রঙপুরে রেখে গিয়েছিলেন সেটুকুও পার্টিশনের ফলে শ্যালকের হস্তচ্যুত হয়। বেশ হয়েছে খুব হয়েছে !!) কিন্তু পিতৃদেবের দায়দায়িত্ব বেবাক এড়িয়ে গেছে। তাই সে জামাইষষ্ঠীর একমাস আগের থেকে এড়িয়ে চলে। হিন্দু কায়দাকানুন আমি জানি নে, কিন্তু আমি যে অঞ্চলের মুসলমান সেখানে রীতি, শ্বশুর গত হওয়ার পরেই তাঁর পুত্র জামাইয়ের শ্বশুর হয়ে যান। হয়তো হিন্দুদের ভিতর এ-রেওয়াজ নেই। আমি জানবো কি করে ? কিন্তু আমাদের এই হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় ঐক্যবিধান নিয়ে যখন সব্বাই মাথা ঘামাচ্ছেন তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ লেনদেন গিভ্-অ্যাণ্ড-টেক করা উচিত নয় ?

এই দেখুন না, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় আমার দু-তিনটি হিন্দু বোন আমাকে নেমন্তন্ন জানায়—নেমন্তন্ন কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আমাকে তখন তারা ডাক দেয়—হক্ক হিসেবে, অ্যাজ এ ম্যাটার অব্ রাইট। আমি তখন বিশ-পঁচিশ টাকার শাড়ি নিয়ে যাই।

কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রিন্স অব্ ওয়েলস, ফিরোজ মিঞা বড্ডই ঘোর আত্মাভিমানী। সে নিমন্ত্রণ পায় তার তিন-চার হিন্দু বোনদের কাছ থেকে। আমি বিলক্ষণ বুঝি সেই সরলা হিন্দু কুমারীরা মনে মনে ভাবে, সব হিন্দু ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পরব করছে আর এই ছোট ভাইটি একা একা দিন গোঁয়াবে ? তদুপরি একথাও তো সত্য, এই কুমারীদের কোনো কোনো হিন্দু ভাই মুসলমান ফিরোজের চেয়ে কোনো গুণে শ্রেষ্ঠতর নয়। আমার মনে পড়লো, ঐ ফিরোজই তার কোনো এক দিদির জন্মদিনে তার প্রিয় ফুল কেয়া আনতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে গোয়ালপাড়ার কেয়াবনের মধ্যিখানে গোখরো সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে যায়।

অপমান করার জন্য।" ইতিমধ্যে বাবার মগরিবের (সন্ধ্যার নামাজের) অন্য অজুর জল এসে গিয়েছে। আমি তাই তাড়াতাড়ি শুধোলুম, "আপনি কি রায় দিলেন ?" বাবা বললেন, "দুই পক্ষকে আদালত থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, "মস্করা করার জায়গা পাও নি !"···আমার মনে এখন সন্দেহ জাগে, বাবার এই হুকুম ঠিক আইনসম্মত হয়েছিল কি না। তবে এ কথা জানি, দুই পক্ষই কোনো প্রতিবাদ না জানিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। কারণ বাবা ছিলেন রাশভারী, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ। আসামী ফরিয়াদী মোক্তার সবাইকে দেখেছেন উলঙ্গাবস্থায় আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় খেলাধুলো করতে।

অতএব বাবু ফিরোজ আমাকে বললেন, "আব্বু, আমি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যাচ্ছি। কিন্তু তার পূর্বে দিদিদের জন্য কিছু শাড়ি কিনতে হবে। আমি দালাল কোম্পানিতে যাচ্ছি।"

সর্বনাশ! দালাল কোম্পানী অকাতরে সব দেবে। অবশ্য, বাচ্চা ফিরোজ কেন, ওরা কাউকেই ঠকায় না। তবে কেনা আমি ওদেরকে একবার ঠকিয়েছি।

কত টাকার বিল এনেছিল জানেন? ১৮০ টাকা!

পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম? বুঝিয়ে বলি। এ-লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু'-কিস্তি লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামলো ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর মোলায়েম রিমঝিম। তারপর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হলো আপনাদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করি, একটুখানি জমজমাট আড্ডা জমাই।

ইতিমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই সেই রুদ্ররসে।

আমাকে যদি কেউ শুধোয়, আমি কোন্ জিনিসে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করি তবে নির্ভয়ে বলবো, শিক্ষা।

কোন্ শিক্ষা?

প্রাইমারি স্কুল, অর্থাৎ পাঠশালা।

তারপর?

হাইস্কুল। তারপর? কলেজ, বি. এ. এম. এ.। তারপর? পি. এচ. ডি.। আমার মনে সবচেয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়, যখন ডক্টরেট করার জন্য কেউ আমার কাছে এসে সাহায্য চায়।

পাঠক অপরাধ নেবেন না যদি এ-স্থলে আমি কিঞ্চিৎ আত্মজীবন প্রকাশ করি।

বঙ্গসাহিত্যে আমার যেটুকু সামান্য লাস্ট বেঞ্চের আসন জুটেছে (অর্থাৎ আমার প্রথম পুস্তক "দেশে বিদেশে" প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে) আমি একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, মরহুম হুমায়ুন কবীর সাহেবের "চতুরঙ্গে" ১৯৪৮ সালে। প্রবন্ধটির নাম "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম, যে যাই বলুক না কেন, আখেরে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হবে। কিন্তু এহ

বাহু। আমি তখন প্রাইমারি এডুকেশনের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলি :

'আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের কিছু কিছু জমিজমা মাঝে-মধ্যে থাকে, কিন্তু সে অতি সামান্য, নগণ্য। কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন। এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নির্মম কাহিনী বর্ণনা করার মত ভাষা ও শৈলী আমার নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে এবং অনেক স্থলেই উত্তম বিদ্যার্জন করেছেন, যেটা আমরা শহরে বসে সঠিক বুঝি নে—গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হয় অনেক বেশী। মহাজনের রূঢ় বাক্য, জমিদার জোতদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়মনে আঘাত দেয় ঢের ঢের বেশী। এবং উচ্চশিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ট্রাজেডি। "ইত্তেহাদ" "আজাদ" (পশ্চিমবঙ্গের বেলায় বলবো, "আনন্দবাজার" "দেশ"—এটা এখানে জুড়ে দিচ্ছি—লেখক) মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহু ক্ষেত্রে নিরাময় হয়, হয়তো তার সবিস্তর আশাবাদী বর্ণনাও কোনো রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর অন্নাভাবে চিকিৎসাভাবে পুত্র অথবা কন্যা যখন যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কি করেন, কি ভাবেন, আমার জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছা যায়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পাঠশালার গুরু-মশাইয়ের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না, স্বাস্থ্যনিবাস (সেনেটরিয়াম) সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মারোগকে কিস্মতের গর্দিশ ব'লে মেনে নিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে। হতভাগা পণ্ডিত পারে না।'

কিন্তু প্রশ্ন, প্রবন্ধের গোড়াতেই জামাইষষ্ঠীর কথা তুলেছিলুম কেন ?

শুনেছি, সঠিক বলতে পারবো না, গাঁয়ের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে বছরে এক-দিন শহরে এনে ঐ যে বিরাট বিরাট সভা করা হয়, ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলা হয় তখন জামাইষষ্ঠীর দিনের মতো তাদেরকে এক পেট খেতেও দেওয়া হয় না

এবং তৎপর '৬৪ দিনের গোরস্তানের নীরবতা।

এই শেষ নয়। দাঁড়ান না। সুযোগ পেলে আরেকদিন আরেক হাত আমি নেবই নেব!

স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু মেনে, সাক্ষী মেনে।

বিশ্বভারতী প্রাগ্

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য এদেশে বিশ্ববিখ্যাত একাধিক পণ্ডিত আনিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন অধ্যাপক মরিৎস্ ভিন্‌টারনিৎস। এঁকে এদেশের অনেক সংস্কৃতপণ্ডিত চিনতে পারবেন। ১৯০৯ থেকে ১৯২২ জুড়ে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। এরই ইংরাজী অনুবাদ বেরয় এদেশে ১৯২৭ থেকে ১৯৩২। এছাড়া আছে, 'গৃহ্যসূত্র' 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ অনুষ্ঠান' 'ভারতীয় ধর্মে রমণী' ইত্যাদি তাঁর প্রচুর গ্রন্থরাজি।

এ সব ক'টি বই-ই পণ্ডিতদের জন্য।

কিন্তু তিনি আমাদের মতো সাধারণজনদের একখানি পুস্তিকা লিখে গিয়েছেন —কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এ-পুস্তিকা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে, অন্য অবকাশে, আমি দু-একটি কথা বলেছি। এ-স্থলে পুনরায় বলি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত লেখা বেরিয়েছে তার ভিতরে আমি এটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। তার প্রধান কারণ অধ্যাপকের সমস্ত জীবন কাটে বেদ, উপনিষদ, সংস্কৃত কাব্য নিয়ে। এদেরই ভিতর দিয়ে যে ঐতিহ্য ভারতবর্ষে চলে আসছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সংযুক্ত, কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমত কিভাবে গড়ে উঠেছিল এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী বলার অধিকার ছিল অধ্যাপক ভিন্‌টারনিৎসেরই। তিনি বাংলা ভাষা জানতেন।

বইখানি অতিশয় সরল জর্মন ভাষায় রচিত। ইংরাজী বা বাংলায় এর অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। হওয়া উচিত। বইখানির এক খণ্ড শান্তি-নিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনে আছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির জর্মন এবং পরবর্তী যুগে খাস জর্মনির জর্মনগণ দ্বারা নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কৃষ্টি সভ্যতার অনেক-খানি জর্মন সভ্যতার কাছে ঋণী। তাছাড়া অনেক জর্মনও চেকোস্লোভাকিয়ায় বাস করতো।

অধ্যাপক ভিন্‌টারনিৎস চেক নন। তিনি জন্মেছিলেন দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যখন টুকরো টুকরো হয়ে যায় তখন তাঁর জন্মভূমি পড়ে নবনির্মিত রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে, অবশ্য অস্ট্রিয়াই (হিটলারেরও জন্ম এই অঞ্চলে এবং তাঁর ধমনীতে নাকি কিঞ্চিৎ চেক

রক্তও ছিল ; মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, চেকদের যে তিনি সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন তার কারণ, ওই করে তিনি তাঁর চেক রক্ত অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন) কিন্তু, সেইটে আসল কথা নয়। তিনি ভালোবাসতেন প্রাগ শহরকে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সেখানে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮/১৯ খ্রীস্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়া জন্মগ্রহণ করে মাতৃ-উদর থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তিনি ইচ্ছে করলেই ভিয়েনা (এইমাত্র বলেছি, তাঁর মাতৃভূমি পড়েছিল অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা তখন প্রাগ ইত্যাদি শহর থেকে তার আপনজনকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে) বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি যাননি।

অধ্যাপক ভিন্টার্নিৎস ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বরাবর ১৯৩৭—তাঁর পরলোকগমন অবধি প্রাগেই থেকে যান।

তিনি ছিলেন জাতে, ধর্মে ইহুদি।[১] ইহুদিরা কোনো জায়গায় পত্তন জমালে সেখানে যে সব ইহুদি পরিবার আছে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এমনই এক হয়ে যায় যে পরে ভিন্ন জায়গায় উৎকৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা পেলেও এদের ত্যাগ করাটা নিমকহারামী বলে মনে করে। ওই একই কারণে ইজরায়েলের শত ক্রন্দনরোদন সত্ত্বেও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ইহুদি পরিবার-সমাজ-দেশ ছেড়ে ওই দেশে যেতে চায় না।[২]

প্রাগ শহর বড় বিচিত্র শহর। সেখানে চেক আছে, জর্মন আছে, ইহুদি আছে, আরো কত জাত-বেজাতের লোক আছে—এবং বড় মিলেমিশে থাকে।

আর, পূর্বেই বলেছি, শহরটি বাস্তবিকই বড় সুন্দর।

মধ্যিখান দিয়ে মলডাও নদী চলে গিয়েছে। ঠিক যে-রকম ভিয়েনার মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব, প্যারিসের মধ্যিখান দিয়ে শেন, বুডাপেস্ট-এর মাঝখান দিয়ে ড্যানুয়ুব।

---

১ আমি শুনেছি তিনি যখন শান্তিনিকেতনে ভিজিটিং প্রফেসাররূপে ছিলেন তখন কলকাতার ইহুদি সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণে সেখানকার ইহুদি ধর্মমন্দিরে তাঁদের বাৎসরিক পূজায় উপস্থিত থাকেন।

২ অন্য কারণও হয়তো আছে। ১৯৩৫ সালে যখন আমি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের কেন্দ্রভূমি তেল্-আভিভ শহরে যাই তখন এক ইহুদি আমাকে বলেন—মস্করা করে, না কি, বলা কঠিন—'কাকে কাকের মাংস খায় না। সব ইহুদি, সব কাক, এক জায়গায় জড়ো হলে তো উপবাসে মরতে হবে। দুনিয়ার কুল্লে জাত স্বজাতের সঙ্গে থাকতে চায়। আমরা ব্যত্যয়।'

অধ্যাপক ভিনটারনিৎসকে নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবো।

হোটেলওলাকে শুধোলুম, হোথায় কোন্ ট্রামে বা বাস-এ যেতে হয়।

সেদিন কি একটা পরব ছিল। ভিড়ে ভিড়ে হুর্জ্জুম।

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই বন্ধ। কিন্তু একটা স্কেলিটেন স্টাফ থাকবে তো! তারা নিশ্চয়ই অধ্যাপকের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারবে।

ইতিমধ্যে এই হুজ্জুম না কাটা পর্যন্ত ট্রাম-বাস তো চলবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ঘাড়ের বাঁ দিকটা চুলকোচ্ছি, এমন সময়ে এক অপরূপ সুন্দরী এসে আমাকে শুধালে, 'আপনার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন?'

এ শুধু প্রাগেই সম্ভবে!

অন্য দেশের মেয়েরা পুরুষকে মদত দেবার জন্য এরকম এগিয়ে আসে না।

ত্রিমূর্তি

প্রখ্যাত রুশ ঐতিহাসিক মিখাইল গুস্ একটি বড় খাঁটি তত্ত্বকথা বলেছেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীর কথা আজ আমরা স্মরণ করি এজন্য যে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। এরকম একটা শিক্ষা হল যে, আমাদের যুগে বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের যে কোনো রকম দাবি এক সামগ্রিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। হিটলারের পদানুসরণ যারা করতে চায়, তাদের সকলের প্রতি এ হল এক গুরুতর হুঁশিয়ারি।"[১]

কমরেড পণ্ডিত গুসের কথার পিঠ-পিঠ আমি কোনো মন্তব্য করার দম্ভ ধরি নে। আমি অন্য এক মনস্তত্ত্ববিদের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি মাত্র। দ্বিতীয়

১ ভারতে অবস্থিত বিদেশী একাধিক দূতাবাস একাধিক ভাষায় বিস্তর প্রোপাগাণ্ডা লেখন প্রকাশ করেন, আমার মতো স্বল্পজ্ঞাত লোকও খান-দশেক পায়। এগুলো পড়তে হলে অনেকখানি ধৈর্যের প্রয়োজন কারণ এদের অধিকাংশই বড় একঘেয়ে।...এরই মধ্যে হঠাৎ একখানি উত্তম চটি পুস্তিকা আমার হৃদয়মনকে বড়ই আলোড়িত করেছে। "সোভিয়েত সমীক্ষা" ৯. ৯. ৬৯ সংখ্যা, সম্পাদক কোলোকোলো, যুগ্ম-সম্পাদক প্রদ্যোৎ গুহ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কলিকাতাস্থিত দূতস্থানে প্রকাশিত।

বিশ্বযুদ্ধের শেষে ন্যুরনবের্গ শহরে যখন গ্যোরিঙ, হেস্, কাইটেল প্রভৃতি জনা বিশেকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলছিল তখন প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কেলি দিনের পর দিন হাজতে এদের মনঃসমীক্ষণ করার পর দেশে ফিরে গিয়ে বলেন, "হিটলারের মতো ডিক্টেটর এবং নাৎসি পার্টির মতো পার্টি পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে পুনরায় দেখা দিতে পারে।" তাই আমার মনে ভয় লাগে, কমরেড গুসের "গুরুতর হুঁশিয়ারি" সত্ত্বেও এ-গর্দিশ পুনরায় যে-কোনো দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তবু যদি রুশ তভারিশ্ গুস্এর এ-হুঁশিয়ারি (অস্তরজ্নো!) মেনে নেন তবে ক্রমে ক্রমে চীন এমন কি মার্কিনও হয়তো রুশের সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন—এ রকম একটা আশা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপের পক্ষপ্রধান ছিলেন, হিটলার স্তালিন মুসসোলীনি রোজোভেল্ট্ এবং চার্চিল। এদের প্রথম তিনজন ছিলেন কট্টর ডিক্টেটর; বাকি দুজন গণতন্ত্রের প্রতিভূ। প্রথম তিনজন রণাঙ্গনে নামেননি বটে, কিন্তু তাবৎ যুদ্ধের নীতি পদ্ধতি ইত্যাদি (স্ট্রাটেজি; মাঝে-মধ্যে ট্যাকটিক পর্যন্ত)[২] সম্বন্ধে তাঁরা পরিষ্কার, কঠিন নির্দেশ দিতেন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ জঙ্গীলাটদের।

এই সংখ্যায় আছে দুটি সুলিখিত রচনা: (১) মিখাইল গুস কর্তৃক "ইতিহাসের শিক্ষা" এবং (২) সোভিয়েট ইউনিয়নের জনৈক মার্শাল কর্তৃক "সোভিয়েত সৈন্যের উদ্দেশে" (মার্শাল জুকভের গ্রন্থ "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তার" সমালোচনা)। বলা বাহুল্য আমি যে সব সময় এঁদের সঙ্গে একমত হতে পেরেছি তা নয়। সান্ত্বনা নিই এই ভেবে যে দেশে-বিদেশের একাধিক কমরেডও হয়তো কোনো কোনো স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। বাংলা অনুবাদ কে বা কারা করেছেন তাঁদের নাম নেই। অনুবাদ স্থলে স্থলে ঈষৎ আড়ষ্ট হলেও অতিশয় বিদগ্ধ উচ্চাঙ্গের।

২ মাত্র কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (৩ অক্টোবর '৬৯)-এ জেনারেল শ্রীযুক্ত চৌধুরীর "ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি" শিরোনামায় লিখিত একটি অতুলনীয় অনবদ্য রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। অনেকে হয়ত বলবেন, সাধারণজন, (সিভিলিয়ানরা) যতই সংগ্রামশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবে ততই সে মারমুখো হয়ে পদে পদে লড়াই করতে চাইবে—জিঙ্গোইস্ট বনে যাবে। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার বিশ্বাস রাজনীতি কোথায় সমরনীতিতে পরিণত হয়, এ জ্ঞান সাধারণজনের যতই বাড়বে ততই যুদ্ধ সম্বন্ধে তার দায়িত্ব-

রোজোভেল্ট চার্চিল সেরকম করেননি। এঁরা তাঁদের জঙ্গীলাটদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বাদবাকী সব কিছু ওদেরই হাতে ছেড়ে দিতেন। তবে বলা হয়, রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত জঙ্গীলাটদের রুটিন কর্মে নাক গলাতেন (ইনটারফিয়ার করতেন) ডিক্টেটরদের ভিতর হিটলার প্রচুরতম ও গণতন্ত্রের প্রতিভূ চার্চিল অনেকখানি।

এই পঞ্চপ্রধানের যে তিন জঙ্গীলাট খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁরা মার্কিন আইজেনহাওয়ার, ইংরেজ মণ্টগামেরি। ডিক্টেটররা সর্বদাই সর্বকৃতিত্ব সম্পূর্ণ পেতে চান বলে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর কোনো সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করতে চাইতেন না। তৎসত্ত্বেও ডিক্টেটরের অধীনে থেকেও যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন তিনি রুশের জঙ্গীলাট মার্শাল গ্রিগরি জুকফ্।

এই তিন জঙ্গীলাট সম্মুখ সংগ্রামে নেমেছিলেন। এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিয়ৎকাল পরেই মার্কিন আইজেনহাওয়ার ও ইংরেজ মণ্টগামেরি যুদ্ধক্ষেত্রে আপন আপন অভিজ্ঞতা সবিস্তর বর্ণনা করে গ্রন্থ লেখেন। তৃতীয় বীর জুকফ্ এ তাবৎ কিছুই লেখেননি।[৩] (হয়তো স্তালিন চাননি যে জুকফ্ কোনো কিছু লেখেন যাতে করে তাঁর কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। আমার মনে হয় সেখানে তিনি করেছিলেন ভুল। সেকথা পরে হবে।)

এই তিনজনই হিটলারের সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত করেন। এবং একাধিক মার্কিন, ইংরেজ (ফরাসীও) যদ্যপি স্বীকার করতে রাজী হন না, আমার নিজের বিশ্বাস হিটলারকে পরাজিত করার প্রধান কৃতিত্ব রুশ জনগণ, স্তালিন ও মার্শাল জুকফের। সুতরাং গত বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গন-ইতিহাস— জুকফের বিবরণীহীন ইতিহাস—যেন হামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক!

বোধও বাড়বে। ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন, এ দুনিয়ায় কত শত বার সিভিলিয়ান পলিটিশিয়ানরা লড়াই করার জন্য যখন হন্যে হয়ে উঠেছে, তখন সেনাবাহিনীর জঙ্গীলাট জাঁদরেলরা (প্রফেশনাল সোলজাররা) তাদেরকে ঠেকিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দেয়নি এবং পরে দেখা গেল ঐ করে জঙ্গীলাট জাঁদরেল দেশকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন। অথচ সাধারণজন ভাবে, এরা কথায় কথায় লড়াই শুরু করে দিয়ে পদোন্নতি, মেডেলের জন্য মুখিয়ে আছেন।

৩ কয়েকজন জর্মন জেনরেল লিখেছেন বটে, কিন্তু এঁদের কেউই সব রণাঙ্গনের পূর্ণাধিকার কখনো পাননি। আর ইতালিয়ান "জাঁদরেল"দের সম্বন্ধে "নীরবতা হিরণ্ময়"।

স্তালিনের মৃত্যুর পর জুকফ অবশ্যই তাঁর গ্রন্থ লিখতে পারতেন। কিন্তু তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে স্তালিনের চরিত্রের উপর কলঙ্ক-লেপন। রুশের বড় কর্তারা তখন যে-প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ করলেন তার মূল বক্তব্য, "স্তালিন ছিল সংগ্রাম-নীতিতে একটা আস্ত বুদ্ধু। তার ভ্রান্ত নির্দেশের ফলেই লক্ষ লক্ষ রুশ সে যুদ্ধে মারা যায়। নইলে যুদ্ধ অনেক পূর্বেই খতম হয়ে যেত।"

যুদ্ধের পর স্তালিন যদিও জুকফকে নানাপ্রকার নিপীড়ন করেন তবু তিনি এই প্রোপাগাণ্ডাতে সায় দিতে পারেননি। স্তালিনকে তিনি তাঁর ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই সে সময়েও তিনি কোনো কিছু লিখলেন না।

এরপর স্তালিন-স্মৃতিবিরোধীরাও গদিচ্যুত হলেন।

ধীরে ধীরে স্তালিন সম্বন্ধে রাশার জনসাধারণেরও ধারণা বদলাতে লাগলো।

তাই যুদ্ধের চব্বিশ বৎসর পর জুকফ তাঁর "স্মৃতিচারণ ও প্রতিচিন্তা" প্রকাশ করেছেন ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে। (এক নম্বর ফুটনোট দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধশেষের এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর আইজেনহাওয়ার, মণ্টগামেরি ও জুকফ এই ত্রিমূর্তির কল্যাণে এখন যুদ্ধক্ষেত্রে হাতেকলমে এঁরা কোন্ কোন্ রণনীতি রণকৌশল অবলম্বন করে অবশেষে জয়লাভ করলেন তার পূর্ণতর ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হবে—কোনো যুদ্ধেরই পূর্ণতম ইতিহাস এ পর্যন্ত লেখা হয়নি, এ-বেলাও হবে না।

জুকফের মূল গ্রন্থ বা তার পূর্ণ অনুবাদ আমার হাতে কখনো পৌঁছবে না। ইতিমধ্যে রুশ মার্শাল ভাসিলেফস্কি ঐ গ্রন্থের যে পরিচিতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সারাংশ দিয়েছেন একমাত্র তারই উপর নির্ভর করে—কথায় বলে অভাবে পড়লে স্বয়ং শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়—ঘরমুখো বাঙালীকে রণমুখো সেপাইয়ের অভিজ্ঞতা শোনাবার চেষ্টা দেব। একেবারে নিষ্ফল হব না। কারণ "রণমুখো" না হলেও বাঙালী যে ইতিমধ্যে বেশ "মারমুখো" হয়ে উঠেছে সে-তত্ত্ব কি কলকাতা কি মফঃস্বল সর্বত্রই স্বপ্রকাশ। শুনতে পাই এরপর তারা নাকি "রণমুখো" হয়ে লড়াই লড়ে এদেশে "প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র" প্রবর্তন করবে। কিন্তু সেটা আ লা র‍্যুস্ (রুশ পদ্ধতিতে রান্না স্যালাড) না, আ লা শীন (চীন পদ্ধতিতে রান্না ফ্রাইড রাইস) হবে সেটি নিয়ে মতভেদ আছে।

রুশ রাজনীতি তথা চীন রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞানগম্যি নেই।

কিন্তু বিস্তর রসানুভূতি আছে উভয়ের সরেস খাদ্যাদি সম্বন্ধে।

তাই ভালোবাসি রাশান স্যালাড, রাশান কাভিয়ার, রাশান বর্শস্যুপ, রাশান পানীয় (আমি কড়া ভোদকা সইতে পারি নে ; পছন্দ করি—এবং স্তালিনও ঐ খেতেন—উত্তম ওয়াইন, তা সে স্তালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ারই হোক বা ককেশাসেরই হোক)।

সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করি চীনা ফ্রাইড রাইস (চীনা হোটেল-বয় বলে "ফ্রাইড লাইস" অর্থাৎ ভাজা উকুন), স্প্রিং চিকিন, ব্যাঙের ছাতার অমলেট ইত্যাদি।

কলকাতার রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা একটা মারাত্মক ভুল করছেন। ওঁদের উচিত এ-শহরে অন্তত দু গণ্ডা রাশান রেস্তোরাঁ বসানো।

কারণ "Love does not go through heart, but through stomach"—"প্রেম হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় না, সঞ্চারিত হয় উদরে"—আপ্তবাক্যটি বলেছেন একটি ফরাসিনী সুরসিকা নাগরিক॥

রহস্য লহরী

২২ সেপ্টেম্বরের 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের "ক্যালকাটা নোটবুক"-এ দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্বন্ধে ঐ "নোটবুকে"র বিদগ্ধ লেখকের করুণ-মধুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুচ্ছেদটি পড়ে আমি সত্যই ঈষৎ লজ্জায় মাথা নিচু করলুম। "ঈষৎ" বললুম এই কারণে যে, আমিও স্থির করেছিলাম যে আগস্ট-সেপ্টেম্বর (দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম ২৫ আগস্ট ১৮৬৯) তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমিও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার নগণ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো। তারপর বার্ধক্যে যা হয়, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের জন্মদিন যখন সে ভুলে যায় তখন তরুণ অকরুণ পাঠক তার ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির দিকে কটাক্ষ করে তাকে বিড়ম্বিত করবেন না এই তার ক্ষীণতর আশা।

তরুণ পাঠক যদি ২২ সেপ্টেম্বরের ঐ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডটি যোগাড় করতে পারেন তবে তিনি যেন সেই অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর ঠাকুমা-দিদিমাকে শোনান। আমি কথা দিচ্ছি, তাঁদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে, ক্ষণতরে তাঁরা আবার কিশোরী হয়ে যাবেন, দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে পারেন। কারণ পুনরায় বলছি, অনুচ্ছেদটি—এ লেখকের চৌদ্দ আনা লেখাতে যা হয় তাই হয়েছে—বড়ই সুন্দর হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করছি, আমি লেখক হিসেবে ওঁকে দম্ভপূর্ণ সার্টিফিকেট দিচ্ছি নে—সামান্য পাঠক হিসেবে আমার দিলভরা তারীফ জানাচ্ছি। সে হক্ক সকল পাঠকেরই আছে।

আর লেখক হিসেবে বললেই বা কী! কাগে কাগের মাংস খায় না, এ প্রবাদ জানি। কিন্তু কাগে কাগের মাংস প্রশংসা করে না একথা কখনো শুনিনি।

গুরুজনদের মুখে যা শুনেছি (বিশেষত মমাগ্রজের বাচনিক—কারণ তিনি কুষ্টিয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) সে-সব তত্ত্ব ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলেছি। ভুল হয়ে যেতে পারে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম কুষ্টিয়ার কাছেই। সেই জায়গাতেই বা তার অতিশয় কাছে জন্ম নেন বা বিরাজ করেন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, সাহিত্যিক জলধর সেন (যাঁকে শরৎচন্দ্র বড়দা বলে সম্বোধন করে সম্মান দেখাতেন) এবং এ-যুগের প্রথম মুসলমান লেখক মুশর্‌রফ হোসেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "বিষাদসিন্ধু" এখনো মুসলমানদের—এবং অনেক হিন্দুদের কাছে সুপরিচিত।

তদুপরি ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। এঁর শ্যামাসঙ্গীত আমি শুনি বাল্যবয়সে, পদকীর্তন শোনার সময়ে--প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার বহু পূর্বে। হায়, সে গানের কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। তার বক্তব্য ছিল, "কাঙাল (অর্থাৎ হরিনাথ) যদি ছেলের মত ছেলে হত তবে তুমি জানতে। কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, তুমি পারতে না মা ছাড়তে।" গ্রামোফোন কোম্পানির সে রেকর্ড বোধ হয় এখন আর নেই।

এবং এই অঞ্চলেরই মহাত্মা—লালন ফকীর। তাঁর পরিচয় দেবার মতো প্রগল্‌ভতা আমার নেই।

ঐ সময়ে গোপনে গোপনে কেমন যেন একটা দ্বন্দ্ব ছিল নদীয়া জেলায় এবং কলকাতাতে। নদীয়ার লোক তো বলতোই, এখনো বলে, তাদের বাংলা ভাষা সবচেয়ে শুদ্ধ ও মধুর। ওদিকে রাঢ়ের ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিম প্রভৃতি তখন কলকাতাকে কেন্দ্র করে, তাঁরা যে-ভাষা জানেন, বলেন, সেই ভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের বাহনরূপে প্রবর্তিত করেছেন। তাই এখনো নদীয়া তথা পূর্ববঙ্গের বহু গুণী খেদ করেন যে, মীর মুশর্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' যখন প্রকাশিত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে পুস্তকটির পরিপূর্ণ সম্মান দেখাননি।

ঐ সময়ে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষের দিকে, এ শতাব্দীর গোড়াতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সামান্য কয়েকটি পল্লীচিত্র ("নোটবুকে"র ভাষায় he wrote sketches of village life in a reminiscent mood.... Generally he starts with a festival and goes on to describe its impact

on the different sections of the village population. His pleasant vignettes—পল্লীচিত্রের জন্য এই "ভিন্নেৎ" শব্দটি একদম mot juste—born out of acute personal observation, present a microscopic picture of life.) "ভারতী" পত্রিকাকে পাঠান। তখন সম্পাদিকা ছিলেন খুব সম্ভব সরলা দেবী কিংবা তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী। এই ভিন্নেৎগুলো সম্পাদিকা সানন্দে লুফে নেন এবং বহু বহু গুণী এগুলোর সর্বোত্তম প্রশংসা করেন। এ যেন হঠাৎ এক ঝলক গাঁয়ের মিঠে মেঠো হাওয়া নগরে ঢুকে শহরের নিরুদ্ধ-নিশ্বাস বাতাসকে মোলায়েম করে দিল। এই চিত্রগুলো ঐ সময়ে পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এর পরের ইতিহাস আমি সঠিক কালানুক্রমিক বলতে পারবো না। যতদূর মনে আছে তাই নিবেদন করি।

ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকরি নিয়ে বাঙলাদেশে লিখে পাঠান, তাঁকে বাংলা শেখাবার জন্য যেন একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যে দীনেন্দ্রকুমারকেই পাঠানো হয় এর থেকেই আজকের দিনের পাঠক বুঝে যাবেন, সেদিন বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন কতখানি উচ্চ ছিল। এবং হয়তো যাঁরা তাঁকে মনোনীত করেন তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের উচ্চারণটিও যেন খাঁটি ন'দের মিষ্টি উচ্চারণ হয়।[১]

কিন্তু দীনেন্দ্রকুমার বরোদায় খুব বেশীকাল থাকেননি।

১ "বরোদাতে বাঙালী" নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ লেখা যায়। ঔপন্যাসিক, বেদজ্ঞ সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নাতি সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং আরো উত্তম উত্তম বাঙালীকে বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও কর্ম দেন।...এস্থলে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন আমার আছে। আমার প্রতি দরদী পাঠক ভিন্ন অন্যেরা যেন বাকিটুকু না পড়েন। ১৯৩৪-এ আমি যখন কাইরোতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তখন ঐ সয়াজী রাও আমাকে 'পাকড়্কে' বরোদায় নিয়ে এসে একটি অত্যুত্তম কর্ম দেন। মহারাজা একদিন আমাকে রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দের অনেক কাহিনী বলার পর আমি দুঃখ করে বলেছিলুম—"Your Highness! I am your latest and worst choice." মহারাজ তখন গুন গুন করে সেকালের একটি song-hit গান "you are not my first love, but you could be my last love!...এর

কারণ ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজা, শ্রীঅরবিন্দ, অন্যতম বরোদাপ্রধান খাসে রাও যাদব এবং (বোধ হয়) দেশপাণ্ডের মধ্যে কি-সব গুপ্ত মন্ত্রণা হয়, সে-সম্বন্ধে আমি সঠিক জানি নে। ফলে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু এ ভিন্ন কাহিনী।

দীনেন্দ্রকুমার বাঙলায় ফিরে এলেন।

এর পর তাঁর জীবন-কাহিনী আমার কাছে আরো অস্পষ্ট।

তবে আমার মনে সন্দেহ হয়, এ-কালেও যখন বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টা শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে দগ্ধ-উদর-জ্বালা শান্ত করতে পারেনা[২], তা হলে ভদ্রলোক বোধহয় খুবই অর্থকষ্টে ছিলেন। তখন ১৯১৫, এ-রকম সময় দীনেন্দ্রকুমার গত্যন্তর না দেখে ডিটেক্টিভ স্টোরি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। তারই নাম "রহস্য লহরী"। সঠিক অনুবাদ বললে বোধ হয় একটু ভুল হয়। যেখানেই সুযোগ পেতেন, সেখানেই কিঞ্চিৎ বঙ্গোপযোগী বাঙালী ধরনধারণ ঢুকিয়ে দিতেন।

এই "রহস্য লহরী" এ-দেশে তখন যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তার বয়ান আজ দেবে কে? সাধুবাদ সহ বলি, "নোটবুক" তার যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়েছেন।

কিছুদিন পরেই মহারাজ গত হন। এ-বাবদে শেষ কথা, ঐ সর্বগুণে গুণী মহারাজ ভারতের নানা জাতের ভিতর সব চেয়ে ভালোবাসতেন বাঙালীকে।

২ নবীনরা হয়তো জানেন না এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কি কি মনোবেদনা বাংলা এবং সংস্কৃতে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থকষ্টে যখন মাইকেল মারা যান তখন হেমচন্দ্র লেখেন :

> "হায় মা ভারতী,
> চিরদিন তোর কেন এ-কুখ্যাতি ভবে,
> যে-জন সেবিবে ও-রাঙা চরণ সেই সে দরিদ্র হবে।"

এবং বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃতে বলেছেন,

> "অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
> বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে॥"

অধমের তার অক্ষম অনুবাদ :

> "ওরে পোড়া পেট, কত না কিছুই করি আমি তোর তরে।
> [illegible] মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে।"

কিন্তু এই উন্মাদনার প্রধান কারণ কি ?

আমি দৃঢ়প্রত্যয়, সত্যনিশ্চয় যে-ভাষাতে দীনেন্দ্রকুমার তাঁর "রহস্য লহরী" লিখলেন, ও-রকম ঝরঝরে, ছিমছাম সরল স্বচ্ছ শীতের নদীস্রোতের মতো শান্ত প্রবহমাণ বাংলা ভাষা এই দেড়শো বছরের ভিতর অতি অল্প লোকই লিখেছেন।

তা না হলে বলুন তো, বারো বছরের বাঙাল বালক তার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা বিলাতের গল্প পড়ে অর্ধযামিনী অবধি বিনিদ্র অবস্থায় শিহরিত, কম্পিত, রোমাঞ্চিত হয়ে রইল কেন ?

ভাষা, ভাষা, ভাষা ! ভাষা বহু তিলিসমাৎ, বহু মিরাকৃল, বহু অলৌকিক কর্ম করতে পারে।

দ্বন্দ্ব-পুরাণ

মহাপুরুষদের জীবনধারণ প্রণালী, তাঁদের কর্মকীতি এমন কি দৈবেসৈবে তাঁদের খামখেয়ালীর আচরণ দেখে তাঁদের শিষ্য-সহচর তথা সমকালীন সাধারণ জন আপন আপন গতানুগতিক ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কী করে একটা মানুষের পক্ষে এ-রকম কীতিকলাপ আদৌ সম্ভবে। এ-প্রহেলিকার সমাধান না করতে পেরে শেষটায় বলে, "ওঃ ! বুঝেছি। এঁরা অলৌকিক ঐশী শক্তি ধারণ করেন।" তখন আরম্ভ হয় এঁদের সম্বন্ধে কিংবদন্তী বা লেজেণ্ড নির্মাণ। কোন্ পীর ধুলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিবর্তিত করতে পারতেন, কোন্ গুরু চেলাদের আবদার-খাঁইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে রাগের বশে এক কুষ্ঠরোগীকে পদাঘাত করা মাত্রই, তন্মুহূর্তেই, সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়—হরি হে তুমিই সত্য।

ফার্সী ভাষাতে তাই প্রবাদ আছে, "পীরেরা ওড়েন না, তাদের চেলারা ওঁদের ওড়ান" "পীরহা নমীপরন্দ, শাগির্দান উন্‌হারা মী পরানন্দ্"—অর্থাৎ "আমাদের পীর উড়তে পারেন। তবে কিনা সে অলৌকিক দৃশ্য সবাই দেখতে পায় না।"

অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এস্থলে লক্ষণীয় আপনার আমার মতো পাঁচু ভুতোকে নিয়ে কেউ ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র লেজেণ্ডও নির্মাণ করে না। করবার কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

তাই আশ্চর্য হলুম একটা ব্যাপার দেখে। কিছু দিন পূর্বে এই গৌড়ভূমির এক মহাপুরুষকে নিয়ে জনৈক সুপণ্ডিত গভীর গবেষণামূলক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য—থিসিস—ঐ মহাপুরুষকে নিয়ে যে-সব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলো নিছক রূপকথা, সোজা বাংলায় গাঁজা-গুল; আসলে উনি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা সাধারণ জনের একজন।

এ থিসিস ধোপে কতখানি টেকে কি না টেঁকে সেটা আমি বলতে পারব না —আমার পশ্চাদ্দেশে লোহার শিকলি দিয়ে টাইম বম বেঁধে দিলেও প্রাণ বাঁচাবার জন্যও না (যদ্যপি পয়গম্বর সাহেব বলেছেন, "জান্ বাঁচানো ফর্জ।" নামাজ রোজার মতোই ফর্জ—অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য কর্ম, না করলে সখ্‌ৎ গুনাহ বা কঠিন পাপ হয়)!

তাই আমি ঐ লেখককে (তিনি যে সত্যই সুপণ্ডিত সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, কারণ আমি তাঁর একাধিক গভীর গবেষণাময় সুচিন্তিত পুস্তক পড়েছি) মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই। সেই আলোচ্য মহাপুরুষ যদি আসলে অতই সাদামাটা সাধারণ জন হন তবে তাঁর সম্বন্ধে অত লেজেণ্ড, অত অলৌকিক কাহিনী নির্মাণ করবার দায় পড়েছিল কোন্ গণ্ডমূর্খ-মণ্ডলীর উপর! লেজেণ্ডগুলো সত্য না মিথ্যা সে বিচারের গুরুভার বিধাতা এ হীনপ্রাণের স্কন্ধে রাখেননি। আমি শুধু জানি, সাধারণ জনকে দিয়ে মানুষ অলৌকিক কর্ম করায় না; যদি বা অতি, অতিশয় দৈবেসৈবে, দু-একজনকে নিয়ে লেজেণ্ড তৈরি করে, তবে প্রথম পরশুরামের "বিরিঞ্চি" স্মরণে এনে তারপর কাশীরামদাসের শরণ নিতে হয়;

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

তাবৎ লেজেণ্ডই যে নৈসর্গিক নিয়মভঙ্গকারী অলৌকিক কর্ম, মিরাকূল হবে, এমন কোনো খুদার কসম বা কালীর কিরে নেই। সাদামাটা, হার্মলেস লেজেণ্ড আজকের দিনেও নির্মিত হয়। পাঠক হয়তো প্রত্যয় যাবেন না, কিন্তু হয়, হয় এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ সপ্তম দশকে—অন্তত নব লেজেণ্ডের ফাউণ্ডেশন স্টোন পোঁতা হয়।

ঐ তো সেদিন পত্রান্তরে পড়লুম, জনৈক লেখক লিখেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চা পান করতেন না।" আমি তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আমি তাঁকে বহু বহুবার চা খেতে দেখেছি, এ-দেশী চা, যাকে সচরাচর ব্ল্যাক টী বলা হয়, উত্তম গোত্রবর্ণের অর্থাৎ, উজ্জ্বল সোনালি রঙের চা হলে তারিফ করতে শুনেছি।

একবার চীন দেশ থেকে গ্রীন টী (যদিও গরম জলে ঢালার পর রঙ এর হয়ে যায় ফিকে লেমন ইয়োলো) আসে গুরুদেবের কাছে। সে-চায়ের শেষ পাতাটুকু পর্যন্ত তাঁকে সদ্ব্যবহার করতে দেখেছি।

তা হলে এ-লেজেণ্ডের মূল উৎস কোথায়? এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চা-বাগানের কুলীদের উপর বর্বর ইংরেজ ম্যানেজার (আই. সি. এস.-দের তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক ভাষায় বক্স-ওয়ালা—কারণ তারা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে) কী পৈশাচিক অত্যাচার করত সে-সংবাদ বাঙালী জনসাধারণের কানে এসে পৌঁছয়। তখন চায়ের নামকরণ হয় "কুলীর রক্ত" এবং অনেকেই এই "কুলীর রক্ত" চায়ের পাতা বাড়ি থেকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠান, কাউকে চা পান করতে দেখলে ঘৃণামিশ্রিত উচ্চকণ্ঠে সর্বজনসমক্ষে বলতেন, "লজ্জা করে না মশাই, কুলীর রক্ত পান করতে!" রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের খবর রাখতেন; বিশেষ করে যখন স্মরণে আনি, যে-স্বর্গত শশীন্দ্র সিংহ তাঁর সাপ্তাহিক ইংরেজী খবরের কাগজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অকুতোভয়ে চা-বাগানের "টমকাকার কুটির" লিখে লিখে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত ছিলেন। অতএব আজ যিনি এক লেজেণ্ডের প্রথম চিড়িয়া ওড়ালেন যে রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, তিনি হয়তো ধরে নিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তখন আর পাঁচ জন সহানুভূতিশীল বাঙালীর মতো চা বয়কট করেছিলেন এবং জীবনে আর কখনো চা খাননি। বয়কট হয়তো তিনি করেছিলেন—কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা কিয়ৎকাল (এবং স্মরণে রাখা উচিত সে-যুগে চায়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না—বোধ হয় মোটামুটি গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ স্টীমার প্যাসেনজারদের মুফতে চা পান করান হত), কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত আমি তাঁকে বহুবার চা পান করতে দেখেছি।[১] তবে চায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আসক্তি ছিল না।

১ ১৯২১-২২ রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন দেহলী বাড়ির উপরের তলায়, নিচের তলায় সস্ত্রীক দিনেন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে একেবারে লাগোয়া নূতন বাড়ি হসটেল ঘর। সেখানে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনোদবিহারী ইত্যাদিরা বাস করতেন। শেষ কামরায় স্বর্গত অনাথনাথ বসু এবং আপনাদের স্নেহধন্য এ-অধম। সর্বশেষ কামরা রবীন্দ্রনাথের পেন্‌ট্রি রূপে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, কমলাদি (দিনুবাবুর স্ত্রী) রবীন্দ্রনাথের যে দৈনন্দিন আহার্য পানীয় পাঠাতেন সেগুলো প্রথম এ পেন্‌ট্রিতে জড়ো করে (চাকরের নাম ছিল সাধু;

প্রায়ই চা ছেড়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য অন্য কোনো পানীয়তে চলে যেতেন। গরমের দিন বিকালে চা বড় খেতেন না—বদলে খেতেন বেলের, তরমুজের শরবত (নিম পাতার "শরবতের" কথা সকলেই জানেন)। সকাল বিকেল ছাড়া অবেলায় টিপিকাল বাঙালীর মতো তাঁকে আমি কখনো বেমক্কা চা খেতে দেখিনি। এবং

বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।[২]

স্মরণে আনুন। অবশ্য চায়ের নেমন্তন্নে চা খেতেই হবে এমন আইন হিটলারও করেননি—যদ্যপি তিনি দিনে রাতে এণ্ডলেস (অসংখ্য, অন্তহীন) কাপ্‌স্ অব টী পান করতেন—অতিশয় হাল্কা, মিন-দুধ।

বস্তুত কী চা, কী মাছ-মাংস কোনো জিনিসেই রবীন্দ্রনাথের আসক্তি ছিল না—যা-সামান্য ছিল সেটা মিষ্ট মিষ্টান্নের প্রতি। টোস্টের উপর প্রায় কোয়ার্টার ইঞ্চি মধুর পলস্তরা পেতে জীবনের প্রায় শেষ বৎসর অবধি তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকাবে ঐ বস্তু খেয়েছেন।[৩] মিষ্টান্ন তো বটেই—বিশেষ করে নলেন

বনমালী পরে আসে) রবীন্দ্রনাথকে সার্ভ করা হত। ঐ ঘর পেরুবার সময় সব সময়ই চোখে পড়ত আহারাদি কি কি। আমার জানার কথা।

২ এই কবিতাটি নিয়ে আমার মনে ধন্দ আছে। এ দু-লাইন থেকে বোঝা যায় কবি ব্যস্ত, চায়ের নেমন্তন্নের জন্য এখনো সাজ করা হয়নি ; অথচ তার ঠিক ষোল লাইন পরেই বলেছেন, বিশেষ কারণে তিনি যে বৃদ্ধ নন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। (তখন তাঁর বয়েস ৬২) এবং বলেছেন,

"এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কি তার হুঁশ আছে ?"

এখন প্রশ্ন, কবি এই বললেন তিনি চায়ের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন এবং তার পরই নাকি ভোলা খাবার নিয়ে এসেছে ! তবে কি লখনৌওলাদের মতো বাড়ি থেকে উত্তম রূপে খেয়ে নিয়ে দাওয়াতে যেতেন যাতে করে সেখানে খানদানী কায়দায় কম-সে-কম খাবেন। কিংবা ফরেসডাঙার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মতো—যেখানে নিমন্ত্রিত মাত্র ভোজ্যবস্তুর প্রতি নজর বুলিয়ে জলস্পর্শ না করে বাড়ি ফিরে যান। বিশ্বাস না হয়, অবধূত রচিত "নীলকণ্ঠ হিমালয়ে" মল্লিখিত মুখবন্ধে এ-বাবদে সবিস্তর বর্ণনা পড়ুন।

৩ সিলেট ও খাসিয়া সীমান্তে এক রকম অতুলনীয় মধু পাওয়া যায়।

গুড়ের সন্দেশ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো ভোজনবিলাসী আমি কমই দেখেছি। এবং প্রকৃত ভোজনবিলাসীর মতো পদের আধিক্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও পরিমাণে খেতেন কম—তাঁর সেই পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও তার সঙ্গে মানানসই দোহারা দেহ দিয়ে—প্রয়োজনের চেয়ে ঢের কম। ফরাসিতে বলতে গেলে তিনি ছিলেন গুর্মে (ভোজনবিলাসী, খুশখানেওলা); গুরমাঁ (পেটুক) বদনাম তাঁকে পওহারী বাবা (এই সাধুজী নাকি শুধুমাত্র পও=বাতাস খেয়ে প্রাণধারণ করতেন) পর্যন্ত দেবেন না।

লেজেণ্ড সম্বন্ধে এইবারে শেষ কথাটি বলে মূল বক্তব্যে যাব।

লেজেণ্ডের একটা বিশেষ সুস্পষ্ট লক্ষণ এই; দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গুণীজ্ঞানীরা যতই কট্টর কট্টর অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করুন না কেন যে বিশেষ কোনো একটা লেজেণ্ড সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তবুও তারা সে লেজেণ্ড আঁকড়ে ধরে থাকে। এখনো বিস্তর লোক বিশ্বাস করে পৃথিবীটা চেপ্টা; শ্মশানে ভূতপ্রেত, গোরস্তানে মামদো আছে; ইংরেজ বিশ্বাস করে সে পৃথিবীর—সরি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট নেশন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-স্থলে আরো বলে নিই; মহাপুরুষদের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তারাও তাদের সম্বন্ধে বিপরীত লেজেণ্ড তৈরি করে। যেমন খ্রীস্টবৈরী ইহুদিরা বলেছে প্রভু খ্রীস্ট ছিলেন মাতাল, তিনি শুঁড়িদের (পাব্লিকান্স) ইতরজনের সাহচর্যে উল্লাস বোধ করতেন, এবং নর্তকী বেশ্যাদের সেবা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না (মেরি ম্যাগডলীন)।

বাঙলাদেশে একটা দল আছে। সেটা কভু বা বর্ষার প্লাবনে দুর্বার গতিতে বন্যা জাগিয়ে জনপদভূমির সর্বনাশ করে যায় আর কভু বা, বৎসরের পর বৎসর ফল্গুধারা পারা অন্তঃসলিলা থাকে। এ-দল পর পর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করে উপস্থিত ফল্গু-পন্থানুযায়ী অন্তঃসলিলা। মোকা পেলে বুজ্‌বুজ্ করে বেরুতে চায়। এদের জন্ম নেবার

এ-মধু মৌমাছিরা শুদ্ধমাত্র কমলালেবুর ফুল থেকে সংগ্রহ করে (সিলেটি কমলালেবুও পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট এবং সবচেয়ে সুগন্ধী, যদিও জাফার নেবুর চেয়ে সাইজে ছোট)। ছুটিতে দেশে যাবার সময় গুরুদেব আমাকে বললেন, "পারিস যদি আমার জন্য কিছু কমলামধু নিয়ে আসিস।" আমি খুশি হয়ে বললুম, "নিশ্চয়ই আনব কিন্তু কাশ্মীরের পদ্মমধু কি এর চেয়ে আরো ভালো নয়?" গুরুদেব স্মিত হাস্য করলেন। ভাবখানা "কিসে আর কিসে।"

কারণ সম্বন্ধে এ-স্থলে আলোচনা করব না।

রবীন্দ্রনাথ চা খেতেন না, এটা নিরীহ, হার্মলেস লেজেণ্ড। কিন্তু এই দল প্রচার করে যে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক অক্ষরও জানতেন না, তিনি ছিলেন সুরকানা, মামুলী রাগরাগিণী তিনি ঘুলিয়ে ফেলতেন এবং বিলিতি গাওনা-বাজনার প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ ভক্তি। তাই গোড়ার দিকে তাঁর গানের কথাতে সুর দিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে তাবৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর দিয়েছেন দিনেন্দ্রনাথ !!! এস্থলে পুনরায় বলতে হয়, হরি হে তুমিই সত্য।

দ্বিতীয় লেজেণ্ড : আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন রবিঠাকুর রচনা করেন রাজা পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে। এদের "যুক্তি" এই প্রকার :—

(১) জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা একজন রাজা (কারণ রাজাই তো জনগণের ভাগ্যনির্ণয় করেন)।

(২) পঞ্চম জর্জ রাজা।

অতএব জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা স্বয়ং পঞ্চম জর্জ।

কুয়োট এরাট ডেমনস্ট্রাণ্ডুম (Q. E. D.)। আমেন আমেন। সুশীল পাঠক, অবধারিত হোন, যে দল এ-লেজেণ্ডের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তারা সেটা সত্য জানা সত্ত্বেও সজ্ঞানেই করেছিল। এরা জ্ঞানপাপী। এবং এরা বিলক্ষণ অবগত ছিল, সমসাময়িক বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধেয় গুণীজ্ঞানীরা এই কিম্ভূত-কিমাকার থিয়োরীকে দলিলদস্তাবেজ, প্রমাণপত্র, সাক্ষীসাবুদ, যুক্তিতর্ক দ্বারা নস্যাৎ ধুলিসাৎ তো করবেনই, তদুপরি করলারি বা ফাউ হিসেবে আরো প্রমাণ করে দেবেন, এই বিষবৃক্ষ-রোপণকারীরা হস্তীমূর্খ রামপণ্টক (কণ্টক থেকে কাঁটা, পণ্টক থেকে পাঁঠা—জ্ঞানবৃদ্ধ রসসিদ্ধ সুনীতি উবাচ)। কিন্তু এ-দলের চর্ম কাজিরাঙার গণ্ডারবিনিন্দিত বর্মসম স্থূল। তাই আমার যখন একদা চর্মরোগ হয় তখন আমার সখা ও শিষ্য চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ—লি আমাকে সলা দেন, "আপনি পরনিন্দা আরম্ভ করুন। চামড়াটি গণ্ডারের মতো হয়ে যাবে। গণ্ডারের চর্মরোগ হয় না।"

তাই যখন অধুনা খবরের কাগজে দেখতে পাই শ্রীযুক্তা ইন্দিরাকে "জনগণমন অধিনায়িকা" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে তখন আমি রীতিমতো শঙ্কিত হই। আজ ইন্দিরা, কাল জ্যোতিবাবু, পরশু আপনার মতো নিরীহ পাঠককে হয়তো "জনগণমন-অধিনায়ক" বলে বসবে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের পর্যায়ে তুলে দেবে। কিন্তু এ পয়েন্টটি থাক।

কিন্তু প্রশ্ন এই জাতীয় সঙ্গীতটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে পঞ্চম জর্জকে

শোনালে কি হিজ ম্যাজেস্টি আপ্যায়িত হতেন ? মোটেই না।

আইস পাঠক ! গানটি বিশ্লেষণ করহ।

"ভারতভাগ্যবিধাতা" যে তিনি, সে-কথা শুনে রাজা নিশ্চয়ই মনে মনে শুকনো হাসি হাসতেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন, তিনি তাঁর মাতৃভূমি ইংলণ্ডেরও ভাগ্যবিধাতা নন। তাঁর আপন ভাগ্যই নির্ণয় করেন তাঁর (হাঁ "তাঁরই"— মস্করা আর কারে কয় ?) প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টের চূড়োয় বসে। তিনি অবশ্য তখন জানতেন না যে তাঁর যুবরাজ রাজা হবার পর যখন এক এড়িকে (লগ্নচ্ছিন্ন = ডিভোর্সড্ = তালাকপ্রাপ্তা) বিয়ে করতে চাইবেন তখন তাঁর (!) প্রধান-মন্ত্রী তাঁকে কানটি ধরে দেশ থেকে বের করে দেবেন। এবং তাঁর নাতনী যখন রানী হবেন তখন তাঁর স্বামী রানা ("রাজা"র স্ত্রীলিঙ্গ "রানী" কিন্তু রানীর স্বামী যদি রাজা না হন তবে "রানী" শব্দ থেকে পুংলিঙ্গ নির্মাণ করে "রানা" শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই রানী এলিজাবেথের স্বামী রাজা নন, তিনি রানা) ডূক অব্ এড্‌নবরা ভিখিরির টোল-খাওয়া মাখমের টিন হাতে করে পার্লামেণ্ট বাড়ির সামনে এসে হাঁকবেন "দুটো চাল পাই মা", আর গেরস্ত গিন্নী প্রধানমন্ত্রী বাড়ির দরজা এক বুড়ো আঙুল ফাঁক করে (অবশ্য অষ্টরম্ভা দেখিয়ে) বিরক্ত কণ্ঠে বলবেন "ঘরে চাল বাড়ন্ত"। প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হলে বলবেন, "ফিরি মাঙো"—অর্থাৎ "অন্য বাড়ি যাও"।

এর পর যখন অনুবাদক চারণ বলবে, "হুজুরকে 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' বলা হয়েছে" তখন তিনি বহুযুগসঞ্চিত রাজগৌরব প্রসাদাৎ তাঁর ঠা ঠা করে অট্টহাস্য করার অদমনীয় উচ্ছৃঙ্খলাচরণ দমন করে মনে মনে মৃদু হাস্য করে বলবেন, "বটে ! আমাদের নীতি আমাদের ধর্ম 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রূল' 'দ্বিধা করে সিধা রাখো'। আর এ প্রাইজ ইডিয়ট বলে কি ? আমি নাকি 'ঐক্যবিধায়ক'। হোলি জীজস !"

এর পর চারণ কাঁচুমাচু হয়ে বলবে, "হুজুর মধ্যিখানের প্যারা খুঁজে পাচ্ছি নে। দুসরা কপি এখ্‌খুনি এল বলে। ইতিমধ্যে শেষ প্যারাটি অনুবাদ করি।" রাজা আন্‌মনে শুনতে শুনতে হঠাৎ খাড়া হয়ে বসবেন। "কি বললে ? 'পূর্ব গিরিতে রবি উদিল' ? রবি তো রবীনডর হ্যাট ট্যাগোর—দ্যাট নেটিভ ?"

চারণ সভয়ে বলবে, "এজ্ঞে হ্যাঁ।" কারণ একথা তো বিলকুল খাঁটি যে রবি কবি পূর্বদেশে, প্রাচ্যে জন্মেছেন, "পূর্ব উদয়গিরিভালে" তিনি রাজটীকা।

রাজা জর্জ তো রেগে টঙ। "কী, কী-আস্পদ্দা। কাউকে যদি পূর্বদেশে, ভারতে উদয় হতেই হয় তবে সে হব আমি।" তারপর গরগর করে বলবেন,

ভাইসরয়টাকে বলো গে, পুবের মণিপুর পাহাড়ের উপর সিংহাসন যেন পাতা হয়। আমি যেখানে উদিত হব। আশ্চর্য, এত বড় একটা ফন্‌কৃশন ডংকিগুলো বেবাক ভুলে গেছে। চীফ অব্ প্রটোকল মাস্টার অব্ সেরিমনিজকে এক্ষুনি ডিসমিস করো।"

ইতিমধ্যে মিসিং দুই প্যারা এসে গেছে। অনুবাদক তো ভয়ে কাঁপছে। অনুবাদ করে কি প্রকারে ? শেষটায় "ভয়ে না নির্ভয়ে" ইত্যাদি ফরমূলা কেতাদুরস্ত করে বললে, "হুজুর, কবি বলছে, আপনি 'চিরসারথি', আপনি শাঁখ বাজাচ্ছেন (হে চিরসারথি তব···শঙ্খধ্বনি বাজে)।"

রাজা তো রেগে টঙ। ক্রোধে জিঘাংসায় বেপথুমান হয়ে হুঙ্কারিলেন, "কি এত বড় বেআদবী, বেইজ্জতী বেত্তমিজী! এ তো 'লায়েসা মাজেস্টাস' (laesa majestas)। হিজ ম্যাজেস্টিকে অপমান। অবশ্য নেটিভটা লাতিন লায়েসা মাজেস্টাস জানে না। কিন্তু এটাও কি জানে না, এর চেয়ে শতাংশের একাংশ অপরাধ করেও, কোনো কোনো স্থলে না করেও ব্রিটিশ রাজে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁসি গেছে।

অসহ্য অসহ্য। আমাকে বলছে সারথি। মোটর ড্রাইভার। আমার বাবা এডওয়ার্ড যখন ইহজগতের স্বপ্নাতীত অকল্পনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপ্রথম ডেমলার গাড়ি নিয়ে তাঁর কাজিন কাইজারকে বার্লিনে দেখতে যান তখন কাইজার বিস্ময়ে অভিভূত ছোট বাচ্চাটার মতো নাগাড়ে সাড়ে তেরো ঘণ্টা গাড়িটার পালিশের উপর হাত বুলিয়েছিলেন। বাবা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা গাড়ির জন্য বারোটা ড্রাইভার। আর আজ আমাকে—রাজাকে—বলছে আমি মোটর ড্রাইভার, শোফার। আমার আস্তাবলে ক'শ ড্রাইভার আছে তার খবর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি পর্যন্ত জানে না। আর আমি নাকি—ওঃ!"

তারপর বিড়বিড় করে যেন আপন মনে বললেন, "আর বলছে কি, আমি নাকি 'চিরসারথি'। আমি চিরকাল ড্রাইভার থাকব। পার্মেনেন্ট পোস্ট। আমার প্রমোশন তক হবে না। আমি এমনই নিষ্কম্মা চোতা রদ্দী ড্রাইভার! হোলি মৈরি—হ্যাঁ নেটিভরা মাইরি বলে বটে—আমি যদি এ লোকটাকে আমার রোলসের চাকায় বেঁধে—না, আগে তো বলডুইনের এজাজৎ চাই। ড্যাম বলডুইন! আর আমি শাঁখ বাজাই। পল্টনের বিউগলে ফুঁ দি। ছি ছি।"

চারণ আবার "সভয় নির্ভয়" করে নিয়ে বললে, "হুজুরকে বলেছে স্নেহময়ী মাতা।"

এবারে রাজা লম্ফ দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

সিংহাসনে কোচের মতো স্প্রিং থাকে না। থাকে পাতলা একখানি কুশন। কংগ্রেসের সম্মানিত সিডিশাস মেম্বার ভারতীয় ছারপোকার পাল সেখানে বাসা বেঁধে হুজুরের কোমলাঙ্গে তখন ব্যাংকুয়েট পরবের মাঝখানে।

কম্পিত কণ্ঠে রাজা বললেন, "আমি এখ্‌খুনি ফিরে যাচ্ছি দেশে। সব সইতে পারি। কিন্তু আমি মা, আমি স্ত্রীলোক! বুঝেছি লোকটার ইনসলেন্স। বলতে চায়, কূটনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য—raison d' etat—আমি মাগী হওয়া সত্ত্বেও মেকডনাল্ড বলডুইন আমাকে মদ্দার বেশে সাজিয়েছে। আমি আসলে মেনি, ওরা আমাকে পরিয়েছে হুলোর ছদ্মবেশ।"

কাঁপতে কাঁপতে রাজা কার্পেটে বসে পড়লেন। প্রায় কান্নার সুরে বললেন, "সেদিন শিকারের সময় এক নেটিভ শিকারী বলেছিল, এক আসামী নাকি দারোগাকে বলেছিল, 'হুজুর, আমার মা বাপ।' দারোগা নাকি বলেছিল, 'বাপ হতে পারি, কিন্তু আমাকে মা বলছিস কেন? আমি কি স্যারি (শাড়ি) পরি।' শিকারী আমাকে বলেছিল, 'হুজুর, আসামী যদি শুধু বাপ বলত তবে দারোগা ছেড়ে দিত। মা বলেছিল বলে সেশনে সোপর্দ করলে। ফাঁসি হল।'… দারোগাকে মেনি বলাতে সামান্য দারোগা ফাঁসিকাঠে চড়ালে। আর আমি ইংলণ্ডেশ্বর, অ্যাণ্ড অব্ দি ডমিনিয়নস বিওণ্ড দী সীজ, ডিফেণ্ডার অব ফেথ, এম্পারার অব ইণ্ডিয়া। আর এই শেষেরটা কী কাষ্ঠরসিকতা! আমি কি বকিংহম পেলেসে নিভৃতে পেটিকোট পরি, ঠোঁটে নখে আলতা মাখি। ওঃ! অসহ্য অসহ্য!"

তারপর রাজা কোর্ট-গেজেট প্রকাশ করলেন, ঐ নেটিভ টেগোরের গান আমার উদ্দেশে লেখা নয়।

তথাপি এ-লেজেণ্ড মরে না।

কিন্তু এ-কাহিনী এখানে বন্ধ করি। হালে বঙ্কিমচন্দ্রের রামায়ণ-সম্বন্ধে একটি রচনা হিন্দীতে অনুবাদিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লীর আদালতে ডবল ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হয়েছে। বঙ্কিমবাবু নাকি বিস্তর ছুটোছুটি করেও একটা বটতলার চার-আনী মোক্তারও পাচ্ছেন না—অথচ একদা তিনি স্বয়ং দুঁদে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাবৎ ছাতুখোর খোট্টা চুরনবেচনে-ওলাকে বংশধর লালাজী ব্যারিস্টার দারুণ চটিতং।…পাঠক, তিষ্ঠ ক্ষণকাল—টেলিফোন বাজছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম তাই। এক হিন্দীপ্রেমী সোল্লাসে জানালেন, আজ সকালে বঙ্কিমবাবুর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

আমার এ-লেখন হিন্দীতে অনুদিত হলে আমার নির্ঘাত ছ' মাসের ফাঁসি।

মে মাসের ২৯ তারিখ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গাঁধী শান্তিনিকেতন আশ্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বলা বাহুল্য এই তাঁদের প্রথম পরিচয় নয়। গাঁধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতে আসেন তখন তিনি প্রায় চার মাস শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ঐ সময়ে ৬ই মার্চ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।[৩] এর পর ১৯২১-এর পূর্বে উভয়ের আর কোনো মোলাকাত হয়েছিল কি না জানি নে তবে ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ গাঁধীজী জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। গাঁধীজীর উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছিলেন সেটা বন্ধ করা এবং কবি যেন সত্যাগ্রহকে অন্তত তাঁর আশীর্বাদটুকু জানান।[৪] বলা বাহুল্য, গাঁধীজী অকৃতকার্য হন। এই আলোচনা হয়েছিল রুদ্ধদ্বারে। কবি ও গাঁধীজী ছাড়া এ-আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র আর একজন—দীনবন্ধু এনড্রুজ। বস্তুত তিনিই এ-দুজনকে একত্র করেছিলেন; তাঁর আশা ছিল,

---

৩ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫) লিখেছেন: "দুই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎকার হইল (৬ই মার্চ ১৯১৮)।" পৃঃ ৩৭৭। এটা বোধহয় ছাপার ভুল। হবে ১৯১৫।

৪ রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ (একুশ বছরের বড) কিন্তু গোড়ার থেকেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থন করে গাঁধীকে পত্র লেখেন। গান্ধীজীর ভক্তেরা, আশা করি অপরাধ নেবেন না, যদি বলি, হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থরাজির সঙ্গে গান্ধীজীর খুব নিবিড় পরিচয় ছিল না। ওদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বশাস্ত্র তথা সর্বদর্শন বিশারদ। তাই গান্ধীজী খুব একটা বল পেয়েছিলেন যে তাঁর আন্দোলন শাস্ত্রসম্মত এবং হিন্দু-ঐতিহ্যপন্থী। দ্বিজেন্দ্রনাথকে গাঁধী ডাকতেন "বড়দাদা" বলে। ১৬ই জুলাই (অর্থাৎ গাঁধী ভেটের প্রায় মাস দেড়েক পূর্বে ১৯২১-এ) রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোমেরিকা ভ্রমণের পর আশ্রমে ঢুকেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যান। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা দেন—কারণ তিনি জানতেন, রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের বিরোধী কিন্তু অতিশয় নম্রতার সঙ্গে এবং দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্রনাথ সে আলোচনার গোড়াপত্তন করতে দিলেন না। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

সামনাসামনি আলাপচারি হলে হয়তো দুজনের মতের মিল হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য তিনি এই দুই প্রখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।[৫]

এ মোলাকাৎ সম্বন্ধে একটি হাফ-লেজেণ্ড আছে। তবে সেটা অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে। তিনি বললেন, "এত বড় জব্বর একটা পেল্লাই ব্যাপার এলাহি কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে আর আমরা দেখতে পাব না, শুনতে পাব না? আচ্ছা দেখি।" অর্থাৎ শব্দার্থেই তিনি দেখে নিলেন কীহোল দিয়ে, কি ভাবে দুই জাঁদরেল ও তাঁদের মধ্যিখানের সেতুবন্ধ এনড্রুজ আসন গ্রহণ করেছেন। বিচিত্রা বাড়িতে বিলিতি কেতায় কীহোল আছে কি না জানি নে; তবে হয়তো তিনজনের আসন নেওয়ার পর বাইরের থেকে দরজায় খিল দেওয়ার পূর্বে তিনি এক ঝলক দেখে নিয়েছিলেন। আপন বাড়িতে ফিরেই তিনি এঁকে ফেললেন একখানা বেশ বড় সাইজের গ্রুপ ছবি। মুখোমুখি হয়ে বসেছেন দু'জনা দু-প্রান্তে। তাঁদের বসার ধরন টিপিকাল—ঠিক এই ধরনেই তাঁরা আকছারই বসতেন। আর গাঁধীর পিছনে একপাশে বসেছেন এনড্রুজ। এর তিন মাস পরে বাৎসরিক কলাপ্রদর্শনীতে অবনবাবু ছবিখানি এক্সিবিট করলেন। দাম দেখে তো বিশ্বজনের চক্ষুস্থির। সেই আমলে—আবার বলছি সেই আমলে—পনেরো হাজার টাকা! কে একজন বললে, "দামটা বড্ড বেশী হয়ে গেল না?" অবনবাবু শেয়ানা বেনের মতো হেসে বললেন, "বা রে! আমি তো সস্তায় ছাড়ছি। এদের প্রত্যেকের দাম পাঁচ পাঁচ হাজারের চেয়ে ঢের ঢের বেশী নয় কি?" এ-ছবি যখন কেউ কিনলো না, তখন অবনবাবু বললেন, "এটা কাকে দেওয়া যায়? রবিকাকা হেথায়, গাঁধী হোথায়। তবে কিনা এনড্রুজের নিবাস বলতে যদি কিছু থাকে তবে সেটা তো রবিকাকার ছায়াতেই। দু'জন যখন শান্তিনিকেতনে তখন এটা যাক ওখানকার কলাভবনে।" এ-ছবি অনেকেই নিশ্চয়ই কলাভবনে দেখেছেন—তবে দীর্ঘ ৪৮ বৎসর পর রঙ বড্ড ফিকে হয়ে গিয়েছে।

---

৫ এ-আলোচনার বিবরণী কখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে এনড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরে ঘরোয়া বৈঠকে আমাদের একটা প্রতিবেদন দেন কিন্তু আমাদের নোট নিতে মানা করেন। আমি ঘরে ফিরে যতখানি মনে ছিল গরমাগরম লিখে ফেলি। সে পাণ্ডুলিপি কাবুলে বিদ্রোহের সময় হারিয়ে যায়। তাতে করে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এ-আলোচনার সারাংশ না হোক বিষয়বস্তু পাঠক প্রাগুক্ত পুস্তকের ৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় পাবেন।

১৯২৫-এর ২৯ মে গাঁধীজী আবার রবীন্দ্রনাথকে স্বপক্ষে টানবার জন্য শান্তিনিকেতন আসেন এবং দু'দিন সেখানে থাকেন। ইতিমধ্যে "শান্তিনিকেতনেই ৯০ খানা চরকা ও তকলি চলিতেছে—বিধুশেখর, নন্দলাল প্রভৃতি সকলেই চরকা কাটিতেছেন।" আবহাওয়া তাহলে অনুকূল। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন : "তিনি (গাঁধী) শান্তিনিকেতনে আসিতেন, রবীন্দ্র-নাথের সহিত চরকা সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান উদ্দেশ্য। গাঁধীজী জানিতেন কবি তাঁহার সহিত চরকা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবুও বোধহয় বিশ্বাস ছিল যে নিজের ঐকান্তিকতার বলে তিনি কবিকে তাঁহার পথে আনিতে পারিবেন। দুই দিন তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনা চলে, বলা বাহুল্য কেহ কাহাকেও নিজ মতে আনিতে পারেন নাই। তৎসত্ত্বেও এখানে বলিয়া রাখি, উভয়ের প্রীতি পূর্ববৎই অক্ষুণ্ন রহিল।"*

২৯-এ মে গ্রীষ্মাবকাশের মাঝখানে পড়ে। আমি তখন দেশে, সিলেটে।

ফিরে এসে কি আলোচনা হয়েছিল সে-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কীর্তন শুনলুম। কিন্তু সে-সব রসকষহীন আলোচনা নিয়ে লেজেণ্ডের গোড়াপত্তন হয় না। আমি বলতে চাই অন্য জিনিস।

ফিরে এসেই গেলুম আমার মুরুব্বী গাঙ্গুলীমশাইকে আদাব-তসলিমাৎ জানাতে। শুনেছি, ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বৌদির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর) আত্মীয় ছিলেন। গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউসের ম্যানেজার। সে আমলে শান্তিনিকেতন মন্দিরের কাছে যে পাকা দোতলা বাড়ি (এইটেই আশ্রমে মহর্ষি-নির্মিত প্রথম বাড়ি এবং বর্তমান বোধহয় বিশ্বভারতীর দর্শন বিভাগের আস্তানা) সেইটেই ছিল গেস্ট হাউস। তারই নিচের তলায় একটি ছোট্ট কামরায় মিলিটারী বুট তথা হাফ মিলিটারী য়ুনিফর্ম পরিহিত, হীত-লাল প্রভৃতি "দাসবংশ" কর্তৃক সমাদৃত হয়ে সাতিশয় ফিটফাট রূপে বিরাজ করতেন মহাপ্রতাপান্বিত মহারাজ প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় বা "গাঙ্গুলীমশাই"। বিরাজ করতেন বললে বড্ডই অল্পোক্তি করা হয়—রামায়ণী ভাষায় বলতে গেলে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় গাঙ্গুলীমশাই ম্যানেজার পদে "প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে" অতিথিশালায় পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ তথা অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্র থেকে রবিমন্ত্রিত "দেশ দেশ নন্দিত করি" ভেরীর আহ্বানে সমাগত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী অতিথি

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড : পৃঃ ১৬৪

সজ্জনকে যেন "প্রজাপালন করিতেন"। তাঁর দাপট তাঁর রওয়াবের সামনে দাঁড়াতে পারেন এমন লোক আশ্রমে সে-আমলে ছিলেন কমই। লোকে বলে, তিনি যখন গেস্ট হাউসে বসে "হীতলাল!" বলে হুঙ্কার ছাড়তেন তখন এক ফার্লঙ দূরের রতন কুটিতে প্রফেসর মার্ক কলিন্সের ছোকরা চাকর পঞ্চা আঁৎকে উঠত—তার পিলে চমকে উঠে এপেনডিক্সের সঙ্গে স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হয়ে যেত।

গাঙ্গুলীমশাই ম্যাট্রিক অবধি উঠতে পেরেছিলেন কি না সেকথা বলতে পারি না। তাই পাঠক পেত্যয় যাবেন না যে এঁর আবাল্য অতিশয় অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র ব্যঙ্গসুনিপুণ অভূতপূর্ব সাহিত্য-সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সম্পাদক-মণ্ডলীর মুকুটমণি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক ইনটেলেকচুয়েল বা বুদ্ধিজীবী।

গাঙ্গুলীমশাইয়ের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর, নিটোল পারফেক্ট "রাকোঁতর" স্টোরি-টেলার মজলিসতোড কেচ্ছাবলনেওলা এ-পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। রাকোঁতর হিসাবে ওসকার ওয়াইল্ড ছিলেন এ-কলার সম্রাট। সে-বাবদে যা-কিছু লেখা হয়েছে বিশেষ করে গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদক, ১৯৪৮-এ নোবেল প্রাইজ বিভূষিত আঁদ্রে জিদ (এই হালে, ২২শে নভেম্বর ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী মহাড়ম্বরে ইয়োরোপে উদ্‌যাপিত হল, কিন্তু হায়, মৌলিক রচনার যে প্রখ্যাত লেখক আপন সৃজনকর্ম স্থগিত রেখে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন—তিনি অন্য কোনো মহান লেখকের রচনা অনুবাদ করে তাঁকে এভাবে সম্মানিত করেছেন বলে শুনিনি—যে আঁদ্রে জিদ ইয়োরোপে অজ্ঞাত বাঙালী নামক জাতের শ্রেষ্ঠ ধন ইয়োরোপের বিদগ্ধতম জাতের প্যারিস সমাজে প্রচার করলেন, তাঁকে এই উপলক্ষে কোনো বাঙালী স্মরণ করেছে বলে কানে আসেনি) তাঁর অন্তরঙ্গ সখা ওয়াইল্ড সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে-সব পড়ার পর রাকোঁতর হিসেবে গাঙ্গুলীমশাইয়ের প্রতি আমার ভক্তি বেড়েছে বই কমেনি। বস্তুত আ লা রীডারস্ ডাইজেস্ট্ বলতে হলে ইনিই আমার মোস্ট্ অনফরগেটবল্ ক্যারেকটার। এঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার চালু ইডিয়ম, প্রবাদ এবং কলকাতার ককনি শব্দ শিখেছি। আমার মতো তাঁর অন্য এক সমঝদার—সাপুড়ে সম্মোহিত সর্পের মতো মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা—ছিলেন 'আনন্দবাজার' গ্রুপের শ্রীযুত কানাইলাল সরকার। আমার কথা পেত্যয় না গেলে ওঁয়াকে শুধোবেন।

বলা বাহুল্য, বিলকুল বেফায়দা বেকার, আমি গ্রাঙ্গুলীমশাইয়ের সে-বয়ানের বন্যা, টৈটম্বুর রসের ছিঁটেফোঁটাও এই হিম-শীতল, রসকষহীন সিসের ছাপা হরফে

প্রকাশ করতে পারব না। একমাত্র লোক যিনি পারতেন তিনি আমার রসের দুনিয়া-আখেরের পীরমুর্শীদ "পরশুরাম" রাজশেখর বসু।

আমি তাঁকে মায়ের দেওয়া এক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট সিলেটি আনারসের মোরব্বা দিলে পর তিনি আমার ললাটে চুম্বন দিলেন, মস্তকাঘ্রাণ করলেন। বেলা তখন একটা। তিনি আহারাদি সমাপন করে খাটে শুয়ে আলবোলায় ফুরুৎ ফুরুৎ মন্দমধুর টান দিচ্ছিলেন। আমাকে আদর করার পর ফের লম্বা হয়ে শুয়ে নলটি তুলে নিলেন। চোখ দুটি বন্ধ করে, কবির ভাষায় "আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু" বললেন, "গেরো হে গেরো। এমন গেরো আমার পঞ্চাশ বচ্ছরের আয়ুতে কখনো আসেনি। পুলিসের সঙ্গে মারপিট করে অসহ্য মশার কামড়ের মধ্যিখানে তেরাত্তির হাজতে কাটিয়েছি, চন্নগর মাহেশের ফেস্তাতে যাবার পথে মাঝগঙ্গায় নৌকোডুবিতে হাবুডুবু খেয়েছি - জলে পড়লে আমি আবার নিরেট পাথরবাটি— থিয়েডারের এক হাফ-গেরস্ত মাগী আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল" ইত্যাকার বহুবিধ যাবতীয় ফাঁড়া-মুশকিল গেরো-গর্দীশ বয়ান করার পর বললেন, "ওসব লস্যি হে লস্যি। ওঃ! এ-গেরো যা গেল।"

আমি বললুম, "এ-আশ্রম তো শান্তির নিকেতন। এখানে আবার গেরো?"

গাঙ্গুলীমশাই নল ফেলে দিয়ে যুক্তকরে, মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, "তিনি পিরিলী[৬] বংশের প্রদীপ, আর সেই পিরিলী বংশের এ-অধম পিলসুজ-দেলকোর ছায়া। পাপ মুখে কি করে বলি, এখানেও মাঝে মাঝে অশান্তির উপদ্রব দেখা দেয়। কিন্তু বাবা, আমা হেন সামান্য প্রাণীকে বলির পাঁঠার মতো বেছে নেওয়া কেন?"

আমি হুঁকোর নলটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, "হুঁকোটা ল্যান, খুলে কন।"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "গাঁধী হে, গাঁধী! তোমরা যাকে মহাৎমা ঠহাৎমা বলো।" তারপর ফের যুক্তকরে বললেন, "তারা ব্রহ্মময়ী মা, বজ্রযোগিনী মা,

৬ পিরিলী খেতাবটি নাকি মুসলমান বাদশা ঠাকুর গোষ্ঠী এবং তাঁদের আত্মীয়দের দেন। কথাটা "পীর" এবং "আলী" শব্দের অশুদ্ধ সন্ধি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলুম তখন গুরুদেবের এক পিরিলী আত্মীয় ছোকরা আমাকে বলে, "ভাই তোর নাম মুজতবা আলী, আর আমার বংশের নাম পীর আলী। দুজনারই পদবী আলী। আর ঐ সিলেটী রাকেশ বলছিল তুই নাকি পীর বংশের ছেলেও বটিস। তবেই ছাখ, তুই আমার কাছের কুটুম।"

রক্ষে দাও মা এসব মহাৎমাদের লেক নজর থাকে।"

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, "গান্ধীজী তো অতিশয় নিরীহ, নিরুপদ্রবী, ভালো মানুষ। তিনি আপনার গেরো হতে যাবেন কেন?"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে। তোমাকে তা হলে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

জানো তো বাপু, দেশ-বিদেশের হোমরা-চোমরা এখানে এলে আকছারই ওঠেন উত্তরায়ণে; বাস করেন হয় গুর্দেবের (প্রাচীন-পন্থীরা "গুরুদেব" না বলে বলতেন "গুর্দেব") পাশে, নয় রথীবাবুর ওখানে। আমি তো নিশ্চিন্দি মনে দিব্য গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর উত্তরায়ণের নায়েব গোমস্তা চাকরবাকরদের দেখলেই মনে মনে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ভাবি, সব ব্যাটা বলির পাঁঠা। গাঁধী মাছ মাংস খান না বটে, কিন্তু মা কালীকেই কি তাঁর উদ্দেশে বলি দেওয়া পাঁঠা কেউ কখনো খেতে দেখেছ? গাঁধী খাবেন না, সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে চাকর নফরের বলি নির্ঘাত। তখন কেমন জানি, কিংবা জানি নে, একটা অহেতুক অজানা শঙ্কা আমার ব্রেন-বক্সের ব্রহ্মতালুতে ঢুকে সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে পায়ের চেটো দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমারই মুখে শোনা,

পাঁঠার বলি দেখে পাঁঠী নাচে।

(পাঁঠা বলে) 'ও পাঁঠী তোমার লাগি বীবীর শীর্‌নী আছে॥'

আমি তখন পাঁঠীর মতো আপন মনে ফিক্‌ফিক্ হাসছি, বিলকুল খেয়াল নেই যে পীর বীবীর দর্গাতে পাঁঠা বলি হয় না, বলি হয় পাঁঠী, শীর্‌নী চড়াবার জন্যে। সাদামাটা রাঢ়ীতে বলে, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে।'[৭] উত্তমরূপে প্রবাদটি হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই ত্যাখ-তো-না-ত্যাখ সঙ্গে সঙ্গে এত্তেলাফরমান উপস্থিত। আমি কি তখন আর জানতুম যে এই ফরমান-পুষ্পগুচ্ছের ভিতর লুকিয়ে আছে গোখরোর বাচ্চা। আমি তো নাপাতে নাপাতে উত্তরায়ণ পৌঁছলুম। পকেট থেকে ডাস্টার বের করে বুটজোড়া পরিষ্কার করে খোলা দরজায় হাফ মিলিটারি মোলায়েম টোকা দিয়ে গুর্দেবের ঘরে ঢুকলুম।

গুর্দেব লেখা বন্ধ করে আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'বসো

৭ শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার দে'র অত্যুত্তম "বাংলা প্রবাদ" গ্রন্থে আছে (নং ৪১১১) "পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাচে, পাঁঠা বলে মগধেশ্বরী আছে।" সুশীলবাবু এর টীকা লিখতে গিয়ে জে. ডি. এনডারসেন-এর উপর বরাত দিয়ে বলছেন, মগধেশ্বরীর পুজোতে চট্টগ্রামে পাঁঠী বলি দেওয়া হয়।

গাঙ্গুলী।' আমি সিভিলিয়ান কায়দায় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মিলিটারি কেতায় দাঁড়িয়েই রইলুম।

গুর্দেব অত্যন্ত প্রসন্ন বদনে আমাকে বললেন, 'যবে থেকে তুমি এখানে এসেছ, বুঝলে গাঙ্গুলী, আমার ঘাড় থেকে অন্তত একটা বোঝা নেমে গেছে, ভিজটারদের আরাম-আয়েসের জন্যে আমাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। তুমি একাই একশ; সব সামলাতে পারো। আমি তো মনস্থির করে বসেছিলুম গান্ধীজীকে এই উত্তরায়ণেই গেস্ট-রুমে তুলব। কিন্তু আজ এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলুম, তিনি দুটি দিন এখানে নির্জনে শান্তিতে বাস করতে চান। তুমি তো জানো, আমার এখানে উদয়াস্ত ভিজটারের ভিড় লেগেই আছে। তাদের আনাগোনা, বারান্দায় চলাফেরা, আঙ্গিনায় হাঁকডাক গাঁধীর শান্তিভঙ্গ করবে। তাই স্থির করেছি, তোমার গেস্ট হাউসের দোতলাই তাঁর জন্য সবচেয়ে ভালো আবাস হবে; আর তুমি যা-তা ভিজটারকে ঠেকাতে যে কতখানি ওস্তাদ সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হাতে গাঁধীকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।' "

গাঙ্গুলীমশাই সেই ফাঁসির হুকুমের স্মরণে একটুখানি কেঁপে উঠে কাঁপা গলায় বললেন, "বাব্বা! আমি আমার ঐ গেস্ট হাউস আস্তাবলে গাঁধীকে রাখব কি করে? একটা শোবার ঘরে আছে দু'খানা স্প্রিঙের খাট। সে এমনই স্প্রিং যে তার উপর রামমূর্তি সার্কাসের ফেদার-ওয়েট বামনাবতার শুলেও সে-স্প্রিং ক্যাঁচর-ম্যাঁচর করে মেঝের সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের পাড়াতে এক পাদ্রী সাহেব লেকচার দিতে গিয়ে বলেন, "প্রফেট নোআর আমলে সর্ববিশ্বব্যাপী এক বিরাট বন্যা হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট তাবৎ প্রাণী, বৃক্ষ, তৈজস-পত্রাদি যাতে সেই বন্যায় লোপ না পায় তাই তিনি নোআকে আদেশ দেন, তিনি যেন একটা বিরাট নৌকা গড়ে তার উপর প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বীজ, এমন কি প্রত্যেক আসবাবপত্র জোড়ায় জোড়ায় হেপাজতীর সঙ্গে তুলে রাখেন।" গুরুগম্ভীর হয়ে এতখানি শাস্ত্রালোচনা করার পর গাঙ্গুলীমশাই ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জিরিয়ে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমার মনে রত্তিভর সন্দ নেই যে আমার গেস্ট হাউসের উপরের তলায় যে দুটি খাট আছে সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বময় ঘোরাঘুরি করে শেষটায় আশ্রয় পেল দেবেন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে। আফটার অল্ তিনি তো প্রফেট —নোআরই মতোন গত শতাব্দীর প্রফেট।"

এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন, গাঙ্গুলীমশাই ছেলেবেলা থেকেই সে-যুগের বিলিতি—এদেশে একদম বেখাপ্পা—ডবল খাট, ড্রেসিং টেবিল, এস্‌ক্রিতোয়ার,

বিদে, চায়না ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তাঁর ধনী ঠাকুদ্দা তাঁর ভিলাটি সাজিয়েছিলেন ন'সিকে বিলিতি কায়দায়—একমাত্র ডাব্‌ল সী টা ছিল ব্যত্যয়, নেটীভ স্টাইলে গোড়ালির উপর বসে কর্মটি সমাধান করতে হত। তা সে যাই হোক, গাঁধীজীর অভ্যর্থনার জন্য যেটুকু মিনিমামেস্ট দরকার সে তিনি পাবেন কোথায়, গাঙ্গুলীমশায়ের ভাষায় "আফটার অল লোকটা তো বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করেছে।"

গাঙ্গুলীমশাই বলে যেতে লাগলেন, "গুর্দেব বোধ হয় আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভরসা দেবার জন্য বললেন, 'তোমার যা যা দরকার আমার এখান থেকে, রথী আর বউমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেয়ো।' আঃ! কথাটি শুনে পেরানটি জুড়িয়ে গেল। ওঁয়ার আছেটা কি? এ-রকম কম আসবাবপত্র নিয়ে তাঁর ক্রিচারস কম্ফর্ট পোষায় কি করে জানেন ব্রহ্মময়ী।[৮] অবশ্য রথীবাবুর বাড়িতে এটা-সেটা আছে, কিন্তু একটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো আর লাজারসের গুদোম ঘর নয় যে প্রত্যেক আইটেম্ দু'তিন দফে করে থাকবে। ও বাড়ি থেকে আমার যা দরকার—খাট সোফা কোচ, নূতন পর্দা, লেখা-পড়ার জন্য উত্তম টেবিল-চেয়ার, একটা পেনট্রির আসবাবপত্র যেখানে খাবার জড়ো করা হবে, ডাইনিং রুমের জন্য একটা সাইডবর্ড যেখানে পেনট্রি থেকে আসা খাবারের ডিশ ডিনার টেবিলে সার্ভ করার পূর্বে রাখা হয়, হল-মার্কওলা উত্তম রুপোর ছুরি-কাঁটা—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "অবাক করলেন, গাঙ্গুলীমশাই! আপনি আমাকে সেই বুদ্দু স্নব ইংরেজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ফরাসী ভাষা জানে না; প্যারিসের রেস্তোরাঁয় তাই আঙুল দিয়ে মেনুতে দেখিয়ে দিলে প্রথম পদ। এল স্নপ। এবার স্নব আঙুল দিলে মেনুর মধ্যিখানে। ভাবলে, মাছ-মাংস ঐ

৮ কথাটা খুবই সত্য। প্রাগুক্ত দেহলী বাড়িতে যখন কবি থাকতেন তখন দেখেছি তাঁর ছিল (১) দু'খানা তক্তপোশ জুড়ে একটি ফরাস—তার গদি কোয়ার্টার ইঞ্চি পুরু হয় কি না হয় (২) মেসে পড়াশোনার জন্য যে-রকম মিনিয়েচার টেবিল দেয় তারই এক প্রস্থ ও একখানা চেয়ার (৩) সামনের ন্যাড়া ছাতের উপর দু'-একখানা বেতের কুশনহীন চেয়ার এবং (৪) বোধ হয় উপাসনা করার জন্য একখানা হেলানো-হাতাহীন জলচৌকির মতো কাষ্ঠাসন। গোসল-খানায় কি কি মহামূল্যবান জিনিস ছিল দেখিনি, তবে এমনই একটা সঙ্কীর্ণ করিডরের মতো ফালি জায়গায় সেটা ছিল যে সেখানে নূরজাহানের হাম্মাম থাকার কথা নয়।

ধরনের কিছু একটা সলিড্ সাব্স্টেনশাল আসবে—ফরাসীতে যাকে বলে "পিয়েস দ্য রেজিস্তাঁস" অর্থাৎ যে বস্তু (পীস) আপনার ক্ষুধাকে মোক্ষম রেজিসটেন্স দেবে। ও হরি! ফের এল স্যুপ। খানাপীনা বাবদে হটেনটট গোত্রের ইংরেজ জানবে কি করে বিদগ্ধ ফরাসী জাত মেন্যুতে নিদেন ত্রিশ রকমের স্যুপ রাখে (হটেনটট গোরা বলে, উয়ি ঈট টু লিভ, আর বিদগ্ধ ফরাসী বলে, উয়ি লিভ টু ঈট)। এদিকে ইংরেজের রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে। পুডিং মুডিং-এর আশায় দেখালে সর্বশেষ আইটেম। এল টুথ পেক—খড়কে। বুঝুন ঠ্যালা। তরলতম দু-কিস্তি স্যুপ খেয়ে, 'পান করে' বললে সঠিকতর হয়, খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁটা! আপনি যে ইংরেজটাকেও হার মানাতে চললেন। করমচান্দের সুযোগ্য সন্তান মোহনদাস গাঁধী তো শুনি খান—বা পান করেন—প্যাঁজের শুরুয়া বা স্যুপ, সেও অতি হাল্কা আর বকরীর দুধ। ঐ দুই তরল দ্রব্য মুখে পৌঁছে দেবার জন্য আপনি ওঁকে হাতে তুলে দেবেন হামিলটন কোম্পানির হল-মার্কওলা রুপোর ছুরি আর কাঁটা! ভাগ্যিস আপনি চীনের ইম্পিরিয়াল পেলেস থেকে হীরে পান্না বসানো চপ স্টিক রেকুইজেশন করেননি।"

গাঙ্গুলীমশাই ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "তোমার যেমন আক্কেল। যে-ভিখিরি কুকুরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে ডাস্ট-বিন থেকে খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে অখাদ্য খায়, তাকে খেতে ডাকলে কি রাস্তা থেকে বাড়িতে একটা ডাস্ট-বিন তুলে এনে সেই ময়লার ভিতর সেই অখাদ্যই রাখো নাকি যেটা সে নিত্যি নিত্যি খায়? আর দু-তিনটে ঘেয়ো কুকুর লড়াই করার জন্য?

আরে বাপু, যার যা বেস্ট, মেহমানকে সেইটে দিতে হয়। আমি তাই দিন তিনেক উদয়াস্ত খেটে উপরের তলার তিনখানা ঘর সাজালুম। খুব যে মন্দ হল তা বলব না। অবশ্য দুর্গা নাম জপ এক সেকেণ্ডের তরেও কামাই দিইনি।

মহারাজ আসবার আগের দিন বেলা প্রায় দশটার সময়—গর্মি তখন নিদেন ১১২ ডিগ্রী—দেখি, কে যেন মিন ছাতায় রোদ্দুর ভেঙে ভেঙে আসছে। কে? চোখ কচলে দেখি—সর্বনাশ—জাব্বাজোব্বা পরা গুর্দেব। প্রথমটায় ভেবেছিলুম মহর্ষিদেবের ছায়া-শরীর। জানো বোধহয়, অনেকেই জ্যোৎস্না রাতে দেখেছে, সাদা আলখাল্লা পরা তাঁর ছায়াকায়া মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁর মর্তের বাসভবন এই গেস্ট হাউসের দিকে আসছেন। এবারে বুঝি ঠা ঠা রোদ্দুরে। তবে ভরসা এই কাছে গেলেই উপে যাবেন।"

আমি বললুম, "যত সব গাঁজা। মহর্ষিদেব এ-মন্দির কখনো দেখেননি।

শুনেছি, মহর্ষির আদেশে হাভেল সাহেব না কে যেন আর অবন ঠাকুরে মিলে এটার প্ল্যান করেন। এটার প্রতি পরলোকে গিয়েও তাঁর মোহ থাকবে কেন ?"

গাঙ্গুলীমশাই বললেন, "আমি তো পড়িমরি হয়ে ছুটলুম গুর্দেবের দিকে, রঙ-চটা বাঁশের ছাতাখানা নিয়ে। তিনি ছাতাখানা উপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখি গাঙ্গুলী, অতিথি সৎকারের কি ব্যবস্থা করেছ'।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্বাঙ্গে সভয় কম্পনের শিহরণ খেলে গেল—গুরুদেবের ঐ অত্যন্ত হার্মলেস ইচ্ছা প্রকাশের স্মরণে। বললেন, "সবাই আমাকে ভরসা দিয়েছিল, গাঁধী কিছুতেই গুর্দেবকে এ-বাড়িতে তকলীফ বরদাস্ত করে আসতে দেবেন না। তিনি যাবেন স্বয়ং—যতবার প্রয়োজন হয়—উত্তরায়ণে, যাত্রী যে-রকম ভক্তিভরে তীর্থস্থলে যায়। কাজেই গুর্দেব আমার জোড়াতালির ঘর-সাজানো দেখতে পাবেন না। এখন উপায় ?—এক ঝটকায় মা কালীর ঘুষ ডবল করে দিলুম—দুটোর বদলে চারটে মোষ।

হায়, হায়, হায়। গেরো, গেরো, গেরো। গুর্দেব ঘরে ঢুকেই বললেন, 'এসব করেছ কি হে! সব যে বিলিতি মাল। ব্রাস রডওলা স্প্রিং খাট! সর্বনাশ। বের কর, বের কর টেনে। এখখুনি। আর লোক পাঠাও, দেরি করো না—অমুকের বাড়িতে। বিয়ের সময়ে সে পেয়েছিল চীনে মিস্ত্রীর হাতে খোদাই করা করা একখানা জবরদস্ত কাঠের পালঙ্ক। আনাও সেটা। আর এসব যে একেবারে বিলিতি বেড্‌শীট, বালিশের ওয়াড়। তুমিই যাও, গাঙ্গুলী, হ্যাঁ তুমিই যাও, বৌমার কাছে। তাঁর গুদোমঘরে আমার একটা মস্ত বড় সিন্দুক আছে। তার ভিতর খদ্দরের সব জিনিস পাবে। আমি যখন গেলবার আহমদাবাদ গিয়েছিলুম তখন সবাই আমাকে চেপে ধরল খদ্দর পরার জন্য। আমি বললুম অত মোটা কাপড় আমার সয় না। তারা যেন চ্যালেন্‌জ্‌টা তুলে নিলে। ধুতি, পাঞ্জাবির অতি মিহিন কাপড় থেকে আরম্ভ করে বিছানার চাদর, ওয়াড়—এমন কি খদ্দরের মশারি। না হে না, তুমি ভাবছ ওর ভিতর মানুষ দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। মোটেই না। এমনই মিহিন যেন মসলিন। ভিতরে যে শুয়ে আছে তার দিকে বাইরের থেকে তাকালে মনে হয় মাঝখানে কোনো মশারি নেই।'

হঠাৎ কার্পেটের দিকে নজর যেতে ফের হুকুম, 'ফেলে দাও এটাও।' তারপর কি যেন ভাবতে গিয়ে উপরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল বিজলি বাতির বাল্‌ব। চিন্তিতভাবে যেন আপন মনে বললেন, 'এটাকে নিয়ে কি করা যায় ?' আমাকে বললেন, 'হ্যাঁ, বউমার ওখানে যাবার সময় নন্দলাল আর

ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।' আমি সর্ব আদেশ তামিল করার সময় ভাবলুম, হনুমানজীকে কে বলে সরল? তিনি তাঁর মুনিবটিকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। এখন বলছেন, 'লে আও বিশল্যকরণী'। আনা মাত্রই হয়তো ফের হুকুম—'ঐ য্-যা। বিবজ্রতারিণীর কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। যাও তো বৎস পবননন্দন হনুমান পবনগতিতে। নিয়ে এসো ঐ বস্তুটি।' তখন ঘণ্টাতে ঘণ্টাতে যাও ফের ঐ মোকামে। ক'বার যেতে আসতে হবে সে কি স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রই জানেন? অতএব নিয়ে চল সমূচা গন্ধমাদনটাকে। আর এ-স্থলে স্মরণ কর, আমাদের গুরুদেবের বাবামশাই কি করতেন? ঘড়ি ঘড়ি মত বদলাতেন বলে তাঁর খাস সহচর দু'দিন অন্তর অন্তর বিদেশ থেকে টেলি পাঠাতেন, 'বাবু চেন্‌জেস্ হিজ মাইণ্ড।' পুত্রে যে সেটা অর্সায়নি কি করে জানব? আমি নিয়ে চললুম গন্ধমাদন প্রমাণ সেই বিরাট সিন্দুকটাকে। আমার অবশ্য সুবিধে, আমাকে তো ওটা বইতে হবে না। বইবে ব্যাটা হীতলাল, কালো, ভোলা, বঙ্কা গয়রহ।

গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেখি, চীনা পালঙ্ক তখনো আসেনি। খবর পেলুম সক্কলের পয়লা এসে পৌঁচেছেন ঠানদি (৺ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী)। সেটা অতিশয় স্বাভাবিক। তাঁর নাম কিরণ। তাঁর টাট্টু ঘোড়ার মতো চলন দেখে ক্ষিতিবাবুই একদিন বলেছিলেন, 'সার্থক নাম কিরণ! কী-run দেখেছ?'

উপরে গিয়ে দেখি তুলকালাম কাণ্ড। ঠানদি এবং জনা তিন-চার এক্সপার্ট মহিলা লেগে গেছেন ঠিক সেনট্রাল বাতিটার নিচে দুনিয়ার সব কঠিন কারুকার্য ভরা বিরাট গোল একটা আল্পনা আঁকতে। গুরুদেব এক কোণে চুপ করে বসে বসে সব দেখছেন। এমন সময় নন্দলাল এলেন। গুরুদেব তাঁকে বললেন, 'এক কাজ কর তো নন্দলাল। ঐ বাল্‌বটাকে আড়াল করতে হবে। তুমি এটার নিচে একটা পেতলের চেপ্টা ফ্লাওয়ার ভাজ্ ছাত থেকে সরু সরু চেন দিয়ে ঝুলিয়ে দাও তো। ঠিক মানানসই সাইজ ও শেপের ও-রকম একটা ভাজ্ বৌমার আছে। আর ভাজ্ ভর্তি করে দাও পদ্মফুল দিয়ে, কুঁড়িগুলো যেন গোল হয়ে বাইরের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দেয়। বিজলির আলো আসবে পদ্ম পাপড়ির ফাঁকে ফাঁকে। কি বললে? পদ্ম নাও পাওয়া যেতে পারে! নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। একটু দূরে লোক পাঠালেই হবে। নইলে মানানসই অন্য ফুল।' নন্দ-লাল মাথা নেড়ে জানালেন হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে সেই মানওয়ারি জাহাজ সাইজের পালঙ্ক এল।

আমি এ-কাপড়, ও-শীট দেখাই। তিনি নামঞ্জুর করেন। শেষটায় না

পেয়ে বললুম, 'সিন্দুকটা নিচে রয়েছে। উপরে নিয়ে আসব কি?' এক ঝলক হেসে বললেন, 'না, আমি নিচে যাচ্ছি।' সেখানে চেয়ারে বসে শেষ রুমাল অবধি নেড়ে-চেড়ে পরখ করলেন, বাছাই করলেন। তারপর ফের উপরে এসে চেয়ারে বসে বিছানা তৈরী করা বাবদে পই পই করে বাৎলালেন, কোন শীটটা উপরে যাবে, কোন্‌টা নিচে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো মেলা মেলা বায়নাক্কা ঝামেলা। জলের কুঁজোটা কোথায় থাকবে, নাইট-টেবিলের পাশে ছোট্ট শেলফে কি কি বই থাকবে—সে সব কথা বলতে গেলে বাকি দিনটা, চাই কি রাতটাও কাবার হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে সারি। হঠাৎ বললেন, 'চল গাঙ্গুলী, স্নানের ঘর দেখে আসি।' ঢুকেই বললেন, 'এ কী কাণ্ড! সরাও এখখুনি ঐ জিনক্ টাব্‌টা। নিয়ে এস আমার স্নানের ঘর থেকে পেতলের বড় গামলাটা। আর ওখানেই একটা বোয়ামে আছে বেসন। নিয়ে এসো একটা রুপোর কৌটোতে করে। সাবানটা সরাও।' আমি বললুম, 'ওটা গডরেজের ভেজিটেবল সোপ।' 'তা হোক। ফেলে দাও ওটা। আর ঐ টার্কিশ টাওয়েলটাও সরাও। সিন্দুক থেকে নিয়ে এস খদ্দরের তোয়ালে, আর একখানা সব চেয়ে সরেস গামছা। নিমের দাঁতন কই?' আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'ওঁর তো দাঁত নেই, আর্টিফিসিয়াল আছে কি না জানি নে।' 'তা হোক, নিয়ে এস দাঁতন। আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে বলো, আজই যেন সুপুরি পুড়িয়ে—বাকি সব তিনি জানেন—টুথ পাউডার বানিয়ে পাঠিয়ে দিতে।' বুঝলুম, কোনো নবীন দশনসংস্কারচূর্ণ—ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী বদ্যি-গিন্নী তো।

করে করে সব কটা ঘর তৈরি হল। সেই ১১৪ গরমে আর ক্লান্তিতে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। বৃদ্ধ প্রভু কিন্তু খুট খুট করে দিব্য এ-ঘর ও-ঘর করছেন।'

দম নিয়ে গাঙ্গুলীমশাই বিরাট এক তাওয়া সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তোমার প্রাণ যা চায় সেই দিব্যি, কসম, কিরে আমাকে কাটতে বললে আমি এখখুনি সেইটে কেটে বলব আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস কোনো বধূ তার বরের জন্য, কোনো প্রেমিক তার প্রিয়ার জন্য কস্মিনকালেও এ-রকম বাসরঘর মিলনশয্যা তৈরি করেনি। আর গুরুদেবও এ-কর্ম পূর্বে কখনো করেননি সে-বিষয়ে আমি আদালতে তিন সত্যির দোহাই দিয়ে কসম খেতে রাজি আছি।

আরেকটা কথা শোন, সৈয়দ। গুরুদেবের মতো স্পর্শকাতর, সুন্দরের পূজারী যখন সব হৃদয় ঢেলে দিয়ে কোনো কিছু সুন্দর করে গড়ে তুলতে চান—এই যেমন এ-বাড়িটাকে তার চরম সুন্দর রূপ দেওয়া—তখন তাঁর হাজার মাইল কাছেও

আসতে পারে কোন্ প্রফেশনাল ডেকোরেটরের গোসাঁই!

আর সমস্ত জিনিসটা ছিল অত্যন্ত সিম্‌পল অথচ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে উথলে উঠছিল সৌন্দর্য।"

আমি শুধালুম, "তারপর?"

গাঙ্গুলীমশাই শান্তকণ্ঠে বললেন, "এখানেই কাহিনীটি শেষ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তুমি যখন আদ্যন্ত শুনতে চাও তবে কি আর করি? বলি।

গাঁধীজীকে উপরের তলায় নিয়ে গেলেন স্বয়ং গুর্দেব। আমি তাঁর ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে,—যদি বা কোনো কিছুর দরকার হয়। তাই সব দেখেছিলুম, সব শুনেছিলুম। দুই হিমালয়ের সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে গভীরতম প্রীতি—এমন কি সংঘাত। সেই মোকা ছাড়ব আমি! হেঁঃ!

বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, গাঁধী যেন দু'চারটে জিনিস দেখলেন, কিন্তু কোনো কিছুই লক্ষ্য করলেন না। আল্পনা, মাথার উপরে ফুলের ডালি, তাজমহলের মতো খাটবিছানা, বেডকাভারের ঠিক মাঝখানে বাতিকে কাজ করা নিটোল গোল মেডালিয়নের ভিতর সেই অজন্তার ছবি, যেখানে একটি তরুণী দু'ভাঁজ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রভু বুদ্ধের পদতলে পদ্মফুলের অঞ্জলি দিচ্ছে।

কোনো-কিছুই যেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

তারপর তিনি আস্তে আস্তে উত্তরের খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি যেন মন্দির পেরিয়ে টাটা বিলডিং ছাড়িয়ে কোন্ সুদূরে চলে গেছে। হঠাৎ গুর্দেবের দিকে ফিরে বললেন, 'এরই কাছে ছাতে যাবার সিঁড়ি আছে না? চলুন।' ছাতে গিয়ে দু'জনাতে অল্প একটু পাইচারি করার পর গাঁধী একগাল হেসে বললেন, 'আমি এই ছাতেই বাসা বাঁধব। ভারী চমৎকার!"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "তার মানে?"

"মানে আর কি? পড়ে রইল সব নিচে। আমি তাঁকে ককখনো ঐ বেড-রুমের একটিমাত্র জিনিসও ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য এ কথা ঠিক, যে দুটি দিন এখানে ছিলেন তার অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন উত্তরায়ণে, গুর্দেবের সঙ্গে আর বড়বাবুর (দ্বিজেন্দ্রনাথের) সান্নিধ্যে। বড়বাবুর কাছ থেকে বুড়ো ফির-ছিলেন হাসিখুশি ভরা ডগমগ মুখে, আর গুর্দেবের কাছ থেকে চিন্তাকুল বদনে। রাত্রি কাটাতেন ছাতে।" গাঙ্গুলীমশাই থামলেন।

অনেকক্ষণ গভীর চিন্তা করার পর বললেন, "আমি পলিটিক্স এক বর্ণও

বুঝি নে। গাঁধীর লেখা এক ছত্রও পড়িনি আর গুর্দেবের সামান্য যে-টুকু পড়েছি সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমার মতামতের কোনো মূল্য নেই। তবু বলি, এবারও গাঁধী-গুর্দেবে মনের মিল হল না। কিন্তু আমার মনে হয় এবারেই ছিল বেস্ট চান্স্। আমার মনে হয়, গাঁধী যদি ঐ আল্পনা, পদ্মফুলের আলো এবং গুর্দেবের আরো পাঁচটা সযত্নে সাজানো নেড়ে-চেড়ে দেখতেন, একটুখানি কদর দেখাতেন তাহলে গুর্দেবের দিলটা একটু মোলায়েম হত। লোকে বলে গাঁধী সত্যের পূজারী আর গুর্দেব নাকি সুন্দরের পূজারী! কিন্তু গুর্দেব যে সত্যেরও পূজারী সেও তো জানা কথা। গাঁধীও নিশ্চয়ই সুন্দর জিনিস ভালোবাসেন—কে বাসে না, কও! কিন্তু তার কোনো লক্ষণ আমার পাপ চোখে পড়েনি। তাই আমার মনে হয় গাঁধী যদি তাঁর জন্য সাজানো ঘরটাকে একটু পুজো করতেন—মানে একটু আদর করতেন—তা হলে গুর্দেব ভাবতেন, 'এ-লোকটা ভিতরে ভিতরে সুন্দরেরও পূজা করে। আমার বংশের না হোক আমার গোত্রেরই লোক।' তাই হয় তো একটা সমঝাওতা হয়ে যেত।

আবার দেখ, গাঁধীজী তাঁর সত্য-উপলব্ধির প্রতীক চরকা সবাইকে বিলোচ্ছেন। আমরা হাত পেতে নিচ্ছি কিন্তু আমরা কোনো প্রতিদান দিচ্ছি নে —কারণ আমাদের মতো সাধারণ লোকের কীই বা আছে যে তাঁকে দেব? কিন্তু গুর্দেবের বেলা তো সে-কথা নয়। তিনি সুন্দরের পূজা করে অনেক-কিছু পেয়েছেন। কই, গাঁধী তো তাঁর কাছ থেকে নিলেন না! এমন কি এই যে সামান্য সাজানো কামরা কটি—তার ফুল, কিছু আল্পনা কোনো-কিছুই লক্ষ্য করলেন না—গ্রহণ করলেন না।

তাই বলি, সৈয়দ, সংসারটা চলে গিভ অ্যান্ড্ টেকের উপর।"

উপসংহারে নিবেদন, বলা বাহুল্য, গুরুদেবকে দিয়ে যে আমি উত্তম পুরুষে কথা বলিয়েছি তার অধিকাংশই আমার কল্পনাপ্রসূত। কারণ যদিও গাঙ্গুলীমশাই গুরুদেবের কথাবার্তার চোদ্দ আনা আমাকে সে-সময়ে ঠিক ঠিকই বলেছিলেন তবু ভুললে চলবে না, পূর্বেই নিবেদন করেছি, গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন পয়লা নম্বরী কীর্তনিয়া—বাকোঁতর। নিশ্চয়ই তাঁর বর্ণনায় বেশ খানিকটে রঙচঙ চড়িয়ে ছিলেন—ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

তদুপরি তিনি আমাকে কাহিনীটি বলেন, ১৯২৫-এ। আর আমি এ-কাহিনী লিখছি ১৯৬৯-এ!! কিন্তু মূল ঘটনাগুলো যে সত্য তার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি (কারণ এ-ঘটনা পরে আরেকবার ঘটে—তবে সেখানে পাত্র গাঁধী ও মুসসোলিনির

প্রতিভূ এক জাহাজ-কাপ্তান)।

অবশ্য আমি দুই লাইনেই এ-কাহিনী শেষ করতে পারতুম। যথা :

"গুরুদেব অতিশয় সযত্নে ঘর সাজালেন। তার সৌন্দর্য গাঁধীজীর চোখে পড়ল না।" কিন্তু তাহলে তো লেজেণ্ডের গোড়াপত্তন হয় না—"রবিপুরাণ" দ্বন্দ্বকাহিনী নির্মিত হয় না।

আরেকটি কথা বলার খুব যে একটা প্রয়োজন আছে তা নয়। তবু বলি। সুচতুর পাঠক অতি অবশ্যই বুঝে গিয়েছেন, গুরুদেবের মুখে আমি যে ভাষা বসিয়েছি, অতি অবশ্যই গুরুদেব ও-রকম কাঁচা বাংলা বলতেন না। এবং সহৃদয় পাঠক বুঝে গিয়েছেন বলেই আমাকে মাফও করে দিয়েছেন। প্রবাদ আছে—"টু আন্‌ডারস্টেণ্ড ইজ টু ফরগিভ্‌"।

এবং গাঙ্গুলীমশাইয়ের ভাষারও জেল্লাই জৌলুস জ্যান্ত জিন্দা করতে পারিনি আমি—দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর।

সর্বশেষে বক্তব্য এটা লেজেণ্ড, রূপকথা, পুরাণ। ইতিহাস নয়।

"দ্বন্দ্বপুরাণ" উপরেই শেষ হল। কিন্তু গাঁধী-পুরাণের অন্য এক কাহিনীর ইঙ্গিত আমি এই মাত্র দিয়েছি। সেটি বলিনি। সেও মজাদার।

দ্বন্দ্বপুরাণের ছ'বছর পরের ঘটনা। ১৯৩১, রাউণ্ড-টেবিল সেরে গাঁধীজী দেশে ফেরার জন্য বেছে নিলেন একখানা ইতালীয় জাহাজ। ইল্ দুচে বেনিতো মুসসোলিনি তো ড্যাম্ গ্ল্যাড্। (ওদিকে জর্মন জাত বড় নিরাশ হয়েছিল। গাঁধী বলেছিলেন, রাউণ্ড-টেবিলে তিনি যদি সফলতা লাভ করেন তবে ইয়োরোপে যে একটি মাত্র জায়গা দেখার তাঁর ঐকান্তিক কামনা আছে সেটিকে তিনি তীর্থযাত্রীরূপে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশে ফিরবেন—ভাইমার, কবি গ্যোটের লীলাভূমি ও সমাধিস্থল। কিন্তু গোলটেবিলে নিষ্ফল হলেন বলে সোজা দেশে ফেরেন।) মুসসোলিনি খবর পাওয়া মাত্র বললেন, "যে জাহাজে গাঁধী যাবেন সেটা অত্যুত্তম, কিন্তু তার সেরার সেরা 'কাবিনা লুস্‌সোরীয়োজা' (সাধু সাবধান !—ইতালীয় ভাষার সঙ্গে আমার অতি সামান্য নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পরিচয়—ভুল হতে পারে। অর্থ হচ্ছে কাবিন দ্য ল্যুক্স্, লাকশারি কেবিন, সব চেয়ে আক্রা ভাড়ার বিলাস কেবিন) নিশ্চয়ই রাজা মহারাজা ফিল্মস্টারের পক্ষে যথেষ্টরও বেশী, কিন্তু গাঁধী ?" এখানে এসে তিনি যে অলঙ্কার ব্যবহার করলেন তার ইংরেজি আছে—"গাঁধী ? হি ইজ নট এভরিবডিজ কাপ অব্ টী"—বাংলাতে মেরেকেটে বলা যেতে পারে, "ভিন্ন গোয়ালের একক গোমাতা, মা-

ভগবতী” কিংবা আমরা যে-রকম বলি “কানু ছাড়া গীত নেই”, তার সঙ্গে মিলিয়ে “গাঁধী ছাড়া নর নেই।” আরবরা বলে, “গাঁধী মহারাজের কাহিনী সব কাহিনীর মহারাজা।” তার পর হুকুম দিলেন, “গাঁধীকে সবসে বঢ়িয়া কেবিন দাও—একটা না, সুইট অব কেবিন্‌স্‌। বেডরুম, ড্রইংরুম, এন্টিরুম (ভিজিটারদের জন্য প্রতীক্ষা-গৃহ), আপন খাস ডাইনিং রুম ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষপতিদের বুকিং কেনসেল করে। আর তোমাদের দ্য ল্যুক্‌স্‌ কেবিনের সোফা কোচ বিছানা বাথরুম লক্ষপতিদের জন্য গুড ইনাফ, মলটো বুয়োনো (ভেরি গুড্‌) কিন্তু গাঁধীর জন্য নয়। পালাদসো ভেনেদসিয়া (ভেনিস পেলেস—ইটালীর প্রায় সর্বোত্তম প্রাসাদ) থেকে তাবৎ ফার্নিচার পাঠাও।” সর্বশেষে বললেন, “ঔর অচ্ছী অচ্ছী তাগড়ী বকরী, দুধকে লীয়ে।” এই ফার্নিচার পাঠানোর পিছনে হয়তো বা কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। এখানে আবার গুরুদেব প্রধান পাত্র।

যাঁরা কবিগুরুর মৃত্যুর পর তাঁর বধূমাতা স্বর্গীয় প্রতিমা দেবীর “নির্বাণ” পুস্তিকা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, অসুস্থাবস্থায় তিনি কিছুদিন কাটান তাঁর এক প্রিয়া শিষ্যার বাড়িতে, দক্ষিণ আমেরিকার আরজেনটিনায়। এঁর নাম ভিকতরিয়া (অর্থাৎ “বিজয়া” এবং কবি দেশে ফিরে এঁকেই তাঁর পরের গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। কবির সঙ্গে তোলা এঁর ছবি পাঠক পাবেন “পূরবী” কাব্যে, বিশ্বভারতী সংস্করণ “রবীন্দ্ররচনাবলী” চতুর্দশ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠার মুখোমুখি। এঁকে উদ্দেশ করে কবি একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন। “পূরবী”তে “বিদেশী ফুল” “অতিথি” ও অন্যান্য কবিতা দ্রষ্টব্য) ও-কাম্পো। কবি দেশে ফেরেন ইটালিয়ান “জুলিয়ো চেজারে” (জুলিয়াস সীজারের ইতালীয় উচ্চারণ) জাহাজে করে। জাহাজে বিদায় দিতে এসে ভিকতরিয়া দেখেন (পূরবীর “বদল” ও গীতবিতানের “তার হাতে ছিল” গান দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য) যে, যদিও কবিকে সর্বোত্তম দ্য ল্যুক্‌স্‌ কেবিন দেওয়া হয়েছে তবু সদ্য রোগমুক্ত জনের জন্য হেলান দিয়ে বসার আরাম-কেদারা সেখানে নেই। তিনি তদ্দণ্ডেই লোক পাঠালেন বাড়িতে; সে আরাম কেদারায় অসুস্থ কবি বসতে ভালোবাসতেন সেইটে নিয়ে আসতে। বিরাট সে কেদারা, তাই কেবিনের ছোট দরজা দিয়ে ঢোকে না। ভিকতরিয়া ডেকে পাঠালেন জাহাজের কাপ্তানকে। বিরাট জাহাজের কাপতেন হেজিপেজি লোক নয়—তাকে “ডেকে পাঠানো” যে সে লোকের কর্ম নয়। তাই এস্থলে বলে রাখা ভালো, তাঁর অর্থসম্পত্তি ছিল প্রচুরতম এবং তাবৎ আর্জেনটাইনের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর তাঁর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারিত। তিনি সুসাহিত্যিকা, প্রভাবশালী মাসিকের সম্পাদিকা এবং পরবর্তীকালে তিনি ইউনাইটেড নেশনসের

একাধিক বিভাগে তাঁর দেশের প্রতিভূ হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। "টাইম" সাপ্তাহিকে আমি সে-বিবরণী পড়েছি ও তাঁর ছবি সেখানে দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আরজেনটাইন-ডাকবিভাগ কবির ছবিসহ বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ করে ভিকতরিয়ারই জোরদার প্রস্তাবে। এবং তিনি নির্দেশ দেন, ডাকবিভাগ যেন কবির কোন্ ছবি ছাপা হবে তাই নিয়ে মাথা না ঘামায়। ভারত যে-ছবি ছাপাবে সেটা তিনি কবিপুত্রের কাছ থেকে আনিয়ে ডাকবিভাগকে দেবেন। ডাকবিভাগ মাতার সুপুত্রের মতো তাবৎ নির্দেশ মেনে নেয়। ঐ স্ট্যাম্প খামে সেঁটে ভিকতরিয়া কবিপুত্রকে একখানা চিঠি লেখেন; আমি সেটি দেখেছি। যা বলছিলুম: কাপতানকে ভিকতরিয়া হুকুম দিলে কেবিনের দরজা কেটে কেদাবা ঢোকাও।* বলে কি? হ্য ল্যুক্‌স কেবিনের দেয়াল বরাত দিয়ে কেটে তার অঙ্গহানি করা! কাপতান গাঁইগুঁই করছে দেখে জাতে দজ্জাল সেই স্পেনিশ রমণী আরম্ভ করলেন ভৎর্সনা, অভিসম্পাত, কাপতানের আসন্ন পতনের ভবিষ্যদ্বাণী—মুষলধারার বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করতে। এ-ঘটনা স্বয়ং কবি কনফার্ম করেছেন। তিনি পুরো ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে এস্থলে বলেন, "আমি স্পেনিশ ভাষা জানি নে। কিন্তু ভিকতরিয়ার সেই জ্বালাময়ী ভাষার কটুবাক্যের রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধা হয়নি।"

কাপতান পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বংশরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দেয়।

হয়তো এ-ঘটনা মুসসোলিনির কানে পৌঁছয়। হয়তো তাই এ-ঘটনার ছ' বছর পর গাঁধীজী যখন তাঁর জাহাজে চড়লেন তখন তিনি পালাদসো ভেনেদসিয়া থেকে সেরা সেরা আসবাবপত্র পাঠান।

যে-জাহাজ করে গাঁধী দেশে ফেরেন তার এক ইতালীয় স্টুয়ার্ড আমাকে এ-কাহিনীটি বলে। আমি তার সবিস্তর বর্ণনা আমার "বড়বাবু" গ্রন্থে "গান্ধীজীর দেশে ফেরা" নাম দিয়ে লিখেছি। এস্থলে সংক্ষেপে সারি।

গাঁধীজী জাহাজে উঠলেন। ভয়ে আধমরা (কারণ নির্মম ডিক্টেটর

* এ-কেদারার শেষ ইতিহাস পাঠক পাবেন, কবির সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ "শেষলেখা"তে। এ ঘটনার দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে, কবি তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পূর্বে রোগশয্যায় সেই কেদারখানা খুঁজে নিয়ে (ছাপাতে আছে "খুঁজে দেব"—হবে "খুঁজে নেব") তার উদ্দেশে একটি মধুর কবিতা লেখেন। "শেষলেখা" কাব্যের ৫নং কবিতা পশ্য।

মুসোলিনির কানে যদি খবর পৌঁছয়—গুজোব হোক আর না-ই হোক, লেজেণ্ড হোক আর সত্য ইতিহাসই হোক—যে গাঁধীর পরিচর্যায় ত্রুটি-জখম ছিল তা হলে বারোটা রাইফেলের গুলি খেয়ে তাঁকে যে ওপারে যেতে হবে সে-বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয়) তথাপি সগর্বে সদম্ভে গাঁধীজীকে দেখালেন তাঁর জন্য স্পেশালি রিজার্ভড্ প্রাসাদসজ্জায় গৌরবদীপ্ত আরাম-আয়েসের ইন্দ্রপুরী সদৃশ কেবিনগুলো। গাঁধীজীর অনুরোধে তারপর তিনি তাঁকে দেখালেন বাদবাকী তাবৎ জাহাজ।

সর্বশেষে গাঁধী শুধোলেন, সব চেয়ে উপরের খোলা ডেক-এ (ছাতে) যাওয়া যায় কি না ?

কাপ্তান সানন্দে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেলেন। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বিরাট বিস্তীর্ণ ডেক।

গাঁধী বললেন, "আমি এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করব।"

কাপ্তান বদ্ধ পাগলের মতো হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গোঙরাতে গোঙরাতে বলল, "অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ভূমধ্যসাগরে রাত্রে তাপমাত্রা নামবে শূন্যে। সুয়েজ খাল আর লোহিত সাগরে দুপুরের গরমী উঠবে ১১৪ তক্। এমন কর্ম থেকে আপনাকে ঈশ্বর রক্ষতু।"

গাঁধী ঝাড়া তেরোটি দিনরাত্রি কাটিয়েছিলেন উপরে। প্রতি সকালে মাত্র একবার নেমে আসতেন নিচে। প্রার্থনা করতে। সর্বশ্রেণীর প্যাসেনজার নিমন্ত্রিত হতেন। শুনেছি খালাসীরাও বাদ যায়নি।

কিন্তু গাঁধীজীর এই দুই প্রত্যাখ্যানের ভিতর অতলস্পর্শী পাতাল এবং গগনচুম্বী আকাশের পার্থক্য রয়েছে।

মুসোলিনির ভেট ছিল আরাম-আয়েস [illegible]-ঐশ্বর্য। গাঁধী যে সেগুলো সবিনয় প্রত্যাখ্যান করবেন সেটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রবি কবি গাঁধীর সামনে ধরেছিলেন সরল, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য। কবিরই ভাষায় বলি,

"দুয়ারে এঁকেছি
রক্তরেখায়
পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?"

হায়, বলেনি।

মাভৈঃ!

বাঙালী সব দিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এ রকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেণ্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই জোটে না।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকেও সেখানে ডাকা হয়েছিল; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লীতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি-ঘেঁষা পোশাক পরেন, ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজি আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজি এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে যে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাঙ্ক্যু না বলতে পারে এবং সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালী উমেদার ইংরিজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজি বলে সেটা কিছু 'আ-মরি' 'আ-মরি' করবার মতো নয়,—বিশেষত পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজিজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও 'পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক কিন্তু ঐসব বুঝে না-বুঝেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত 'থ্যাঙ্ক্যু', 'পার্ডন', 'আই এম এফ্রেড' তারা তাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০-৪২ পর্যন্ত বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফার্সী (এবং কিঞ্চিৎ আরবীর) চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারি চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী), কানুনগো (লিগেল রিমেমব্রেন্সার), বখ্শী (একাউন্টেন্ট জেনারেল—পে মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনিস্ট্রেটিভ তাবৎ ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়স্থরা। ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন। বস্তুত ফার্সী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁদের কপালে কিছুই জোটেনি।

তা সে যাই হোক, আমরা বাঙালী প্রথমেই তাড়াতাড়ি ইংরিজি শিখে-ছিলুম বলে বেহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এর পর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলাদেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলাদেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী।[১] দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজি ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলাদেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়

১ 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। (ক) দোয়াবের ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারেনি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করেনি, (খ) বৌদ্ধ-জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করেনি, (গ) মুসলমান আমলে বাঙলাদেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

আল্লায় বলিছে "মুই যে-দেশে যে-ভাষ,
সে-দেশে সে-ভাষে করলুম রসুল প্রকাশ।"
"যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥")

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহের কাণ্ডারী ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে বড় ইংরিজ (ফরাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার সুপণ্ডিত মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইস্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লিতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চারাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এসময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজি বইয়ের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে রকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবার সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালী ইংরিজি ভাষা, আচার-ব্যবহার, কায়দা-কেতা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কল্কে, সরি, সেভিয়েট—পায় না।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে? তাই সংক্ষেপে বলি।

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কারবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ফার্সী এদেশে ছ'শ বছর ধরে রাষ্ট্রভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করিনি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠীওলারাও একদিন ইংরেজি বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজ-কারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরিজি জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মাভৈঃ!

হিটলারের শেষ প্রেম

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে রাত দশটার সময় হামবুর্গ বেতার কেন্দ্র তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রোগ্রাম হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করলো—

"আমাদের ফ্যুরার আডলফ হিটলার বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

যে-সময়ে এ নিদারুণ ঘোষণাটি করা হয়, তখন প্রোগ্রামমাফিক কথা ছিল, "ইঁদুর ধ্বংস করার উপায়।" এই নিয়ে হিটলার-বৈরীরা এখনো ঠাট্টা-মস্করা করেন।

যে সব জর্মন বেতার-ঘোষণাটি শুনেছিল, তাদের অনেকেই যে বিরাট শক্ পেয়েছিল, সে-নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এদের অনেকেই সরলচিত্তে বিশ্বাস করতো, আশা রাখতো—যে-হিটলার ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর বহু উৎকৃষ্ট সংকটে যেন ভাগ্যবিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে, অবলীলাক্রমে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করে সে-সব সংকট উত্তীর্ণ হয়েছেন এবারেও তিনি আবার শেষ মোক্ষম ভেল্কিবাজি দেখিয়ে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। তার অর্থ; যে-সব রুশ সৈন্য বার্লিন অবরোধ করেছে তারা স্বয়ং হিটলারচালিত আক্রমণে খাবে প্রচণ্ডতম মার, ছুটবে মুক্তকচ্ছ হয়ে মস্কো বাগে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ইংরেজ সৈন্যও পড়ি-মরি হয়ে ফিরে যাবে আপন আপন দেশে। রাহুমুক্ত ফ্যুরার —পথপ্রদর্শক সর্বোচ্চ নেতা পুনরায় ইয়োরোপময় দাবড়ে বেড়াবেন।

এরা যে মোক্ষম শক্ পেয়েছিল সে তো বোঝা গেল। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষমতর শক্ পেল কয়েকদিন পর যখন বেতার ঘোষণা করলো, হিটলার আত্মহত্যা করার পনেরো ঘণ্টা পূর্বে এফা ব্রাউন নামক একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। কারণ, জর্মনির দশ লক্ষের ভিতর মাত্র একজন হয়তো জানতো যে, হিটলারের একটি প্রণয়িনী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীরূপে বছর বারো-তেরো ধরে জীবনযাপন করছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ যে কয়েকজন এই "গুপ্তি প্রেমে"র খবর জানতেন, তাঁরা এ-বাবদে ঠোঁট সেলাই করে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে পুরো পাক্কা নিশ্চুপ থাকতেন। কারণ হিটলারের কড়া আদেশ ছিল, তাঁর এই গুপ্তিপ্রেম সম্বন্ধে যে-কেউ খবর দেবে বা গুজব রটাবে, তিনি তার সর্বনাশ করবেন। তার কারণও সরল। তাঁর প্রপাগাণ্ডা মিনিস্টার গ্যোবেল্‌স্ দিনে দিনে বেতারে খবরের কাগজের মারফতে হিটলারের যে মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন (আজকের দিনের ইংরেজিতে "তাঁর যে 'ইমেজ' নির্মাণ করেছিলেন") সেটি

সংক্ষেপে এই : হিটলার আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর ধ্যানধারণাসাধনা সর্বশক্তি তিনি নিয়োগ করেন একমাত্র জর্মনির মঙ্গলসাধনে। হিটলার স্বয়ং অন্তরঙ্গ জনকে একাধিকবার বলেছেন, "জর্মনিই আমার বঁধু" (বাগদত্তা দয়িতা)। এমন কি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরও তত্ত্বতাবাশ করেন না। এটা সত্য, এ নিয়ে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বিধবা একমাত্র সৎদিদিকে মিউনিকের নিকটবর্তী তাঁর বের্খটেশগার্ডেনের বাড়ি বের্গহফে গৃহকর্ত্রী রূপে রাখেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সে-বাড়িতে এসে পৌঁছলেন এফা ব্রাউন। যা আকছারই হয়—ননদিনী ঠাকুরঝির সঙ্গে লাগল কোঁদল। হিটলারের অন্যতম বন্ধু বলেন এ স্থলে আরো আকছারই যা হয় তাই হল। পুরুষমানুষ, তায় হিটলারের মতো কর্মব্যস্ত পুরুষ, এ-সব মেয়েলী কোঁদলে কিছুতেই প্রবেশ করে একটা ফৈসালা করে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি চুপ করে বসে "যাত্রাগান দেখলেন"—অবশ্য অতিশয় বিরক্তিভরে। শেষটায় দিদিই হার মানলেন। হিটলার-ভবন ত্যাগ করে মিউনিকে আপন একটি ছোট্ট বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। হিটলার এর পর তাঁকে আর কখনো তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেননি। তার কিছুদিন পর সৎদিদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। হিটলার এটাতে ভয়ঙ্কর চটে যান। কেন, তা জানা যায়নি। বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত তো হলেনই না, সামান্য একটি প্রেজেন্টও পাঠালেন না। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র চিরতরে সম্পূর্ণ ছিন্ন হল।

হিটলারের আপন মায়ের পেটের একটি সুন্দরী বোনও ছিল। তাঁকেও তিনি একবার তাঁর বাড়ি বের্গহফে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ বাড়ির আরাম-আয়েসে এতই সুখ পেলেন যে, কাটালেন মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘকাল। হিটলার বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোনের বিদায় নেওয়ার পর তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি। এ-ননদীর সঙ্গে এফা ব্রাউনের কলহ হয়েছিল কি না সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নীরব। ভাইবোন বলতে ইনিই হিটলারের একমাত্র মায়ের পেটের বোন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতা আডলফ হিটলারের মৃত্যুর পরও অবহেলিত এই বোন কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন।

এই আপন বোন ও পূর্বে বর্ণিত সেই সৎদিদি ছাড়া হিটলারের ছিলেন একটি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঐ সৎদিদির বড় ভাই। নানা দেশে বহু কর্মকীর্তি করার পর ইনি এলেন বার্লিনে—তাঁর সৎভাই জর্মনির কর্ণধার হয়েছেন খবর শুনে। নাৎসি পার্টির দু-একজনকে চিনতেন বলে তাঁদের কৃপায় পারমিট যোগাড় করে খুললেন বার্লিনের উপকণ্ঠে একটা মদের দোকান—বার্। পার্টি-মেম্বাররা

সেখানে যেতেন তো বটেই, তদুপরি বিশেষ করে সেখানে হুল্লোড় লাগাতেন দুনিয়ার যত খবরের কাগজের রিপোর্টার। ওনাদের মতলব, হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তস্য অগ্রজ ভ্রাতার কাছ থেকে গোপন তথ্য, রসালো চুটকিলা সংগ্রহ করে আপন আপন কাগজে টকঝাল পরিবেশন করা।

কিন্তু ব্রাদার আলওয়া হিটলার ছিলেন ঝাণ্ড শুঁড়ি। পাছে তাঁর কোনো বেফাঁস কথা কনিষ্ঠ ফ্যুরার আডলফের কানে পৌঁছে যায় এবং তিনি চটেমটে তাঁর মদের দোকানের পারমিটটি নাকচ করে দেন সেই ভয়ে তিনি ফ্যুরার সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলতে রাজি হতেন না। অনুজ যে কারণে-অকারণে ফায়ার হয়ে যান সেটা বড় বেরাদার বিলক্ষণ জানতেন।...হিটলারও তাঁর সম্বন্ধে কখনো কোনো কৌতূহল দেখাননি।

পূর্বেই বলেছি, হিটলারের দাদা দিদি বোনের সঙ্গে তাঁর যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক ছিল না, সেটা দিদি বোনের পাড়াপ্রতিবেশী সখাসখী সবাই জানতেন। তাঁরাও সেটা আর পাঁচজনকে বলতেন। "আহা! ফ্যুরার জর্মনির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই আকণ্ঠ নিমগ্ন যে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও অচেতন।" ক্রমে ক্রমে, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে "মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে", এ-স্থলে জর্মনিরও নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদটি রটে গেল, আবাল্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় প্রভু হিটলার তাঁর সর্ব আত্মজনকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র জর্মনির জন্য আত্ম-বিসর্জন দিচ্ছেন।

প্রপাগণ্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্‌স্ ঠিক এইটেই চাইছিলেন। তিনি সেই গুজবের দাবাগ্নিতে দিলেন ঘন ঘন কুলোর বাতাস। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এ 'সত্য তত্ত্ব'। বিশ্বজন আগের থেকেই জানতো, হিটলারের জীবনধারণ পদ্ধতি ছিল চার্চিল এবং স্তালিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার্চিলের মুখে জাগ্রতাবস্থায় সর্বক্ষণ অ্যাম্মোটা সিগার এবং বেলা-অবেলায় এক পেট খাঁটি স্কচ হুইস্কি। স্তালিনের ঠোঁটেও তদ্বৎ—তবে সিগারের বদলে খাঁটি রাশান পাপিরসি (সিগারেট) এবং স্কচের বদলে তিনি অষ্টপ্রহর পান করতেন, হুইস্কির চেয়েও কড়া মাল ভোদকা শরাব। দুজনাই সর্ববিধ গোস্ত গব গব করে গিলতেন। পক্ষান্তরে হিটলার ধূম্র এবং মদ্যপান করতেন না এবং তিনি ছিলেন ভেজিটারিয়ান। কাজেই তাঁকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীরূপে বিশ্বজনের সম্মুখে তুলে ধরতে ডঃ গ্যোবেল্‌সের কল্পনার আশ্রয় অত্যধিক নিতে হয়নি।

হিটলারের মৃত্যুসংবাদ জর্মন জনগণকে যে শক্ দিয়েছিল, তারপর তারা যে মোক্ষমতর শক পেল তার সঙ্গে এটার কোনো তুলনাই হয় না।

যুদ্ধ-শেষে কয়েক দিন পর (মে ১৯৪৫) যে-রুশ সেনাপতি জুকফ বার্লিন অধিকার করেন তিনি প্রচার করলেন, আত্মহত্যা করবার পূর্বে হিটলার তাঁর এক রক্ষিতাকে বিয়ে করেন।

সর্বনাশ! বলে কি! সেই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী যিনি

"দারাপুত্র পরিবার
কে তোমার তুমি কার?"

কিংবা "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ধ্যানমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর জর্মনির জন্য বিনিদ্র ত্রিযামা যামিনী যাপন করলেন তিনি কি না শেষ মুহূর্তে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যবশতঃ "ধর্মচ্যুত" হয়ে বিবাহ করলেন একটা "রক্ষিতাকে"! এ যে মস্তকে সর্পদংশন।

আজ যদি শুনতে পাই (এবং এটা অসম্ভব তথা আমি মাপ চেয়ে নিয়ে বলছি) যে-ডিউক অব উইনজার তাঁর দয়িতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনার্থে অবহেলে ইংলণ্ডের সিংহাসন ত্যাগ করেন, তিনি তাঁর সেই বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে প্যারিসের কোনো গণিকালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তবে কি সেটা পয়লা ধাক্কাতেই বিশ্বাস করবো?

জর্মনির জনসাধারণ প্রথমটায় এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছে এই: যতক্ষণ ম্যাজিশিয়ান তার ভানুমতী খেল দেখায় ততক্ষণ দর্শক বেবাক নির্বাক হয়ে তাই দেখে, কিন্তু যে-মুহূর্তে বাজিকর "গুড নাইট" বলে অন্তর্ধান করে তন্মুহূর্তেই আরম্ভ হয় বিপুল কলরব। কী করে এটা সম্ভব হল, কী করে ওটা সম্ভব হল?—তাই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা! এবং দু'একটি লোক যারা ম্যাজিকের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত তারা অল্পবিস্তর পাকা সমাধানও তখন দেয়।

এস্থলেও তাই হল। হিটলার ম্যাজিশিয়ান যখন তাঁর শেষ খেল দেখিয়ে ইহলোক থেকে অন্তর্ধান করলেন তখন আরম্ভ হল তুমুলতর অট্টরোল। এবং এস্থলেও যাঁরা হিটলারের অন্তরঙ্গজন—হিটলারী ম্যাজিকের অর্থাৎ এফা ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানতেন—তাঁরা এ-বাবদে ঈষৎ ছিটেফোঁটা ছাড়তে আরম্ভ করলেন। এঁদের কাহিনী অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না।

ইতিমধ্যে হিটলারের খাস চিকিৎসক ডাক্তার মরেল ধরা পড়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেন সেটা আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এফা ব্রাউন্ আর হিটলার একসঙ্গে বাস করতেন বই কি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এবং কিছু-একটা হত হয়তো—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।"

এ সময়ে হিটলারের উইল দলিলটি আবিষ্কৃত হয়। এটি তিনি তাঁর বিবাহের পরমুহূর্তেই ডিকটেট করে টাইপ করান এবং আপন স্বাক্ষর দেন। তাতে অন্যান্য বক্তব্যের ভিতর আছে :

"যদ্যপি আমার সংগ্রামের সময় বিবাহ এবং তজ্জনিত দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো আস্থা আমার ছিল না, তথাপি এখন, আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি মনস্থির করে একটি রমণীকে বিবাহ করছি। আমাদের ভিতর ছিল বহু বৎসরের বন্ধুত্ব (ফ্রেণ্ডশিপ = জর্মনে ফ্রয়েন্টশফট) এবং বার্লিন যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার অদৃষ্টের অংশীদার হবার জন্য এখানে এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রীরূপে আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জনসেবায় নিয়োজিত ছিলুম বলে যে ক্ষতি হয়েছিল (অর্থাৎ একে অন্যের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম — অনুবাদক) তার ক্ষতিপূরণ এর দ্বারা হবে।"[১]

এই এফা ব্রাউন রমণীটি কে?

আমি ইতিপূর্বে 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' তথা 'হিটলারের প্রেম' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার সময় উল্লেখ করি যে আমার জানামতে হিটলার তাঁর জীবনে সবসুদ্ধ $\frac{১}{২}+১+\frac{১}{২}$ = দুইবার ভালোবেসেছিলেন। প্রথম হাফ প্রেমকে ইংরাজিতে 'কাফ্ লভ্' বলে। বাছুরের মতো ড্যাবডেবে চোখে দয়িতার দিকে তাকানো আর 'উদভ্রান্ত প্রেমে'র মতো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—বাঙাল দেশে যাকে বলে ঝুরে মরা। কারণ হিটলার তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে কখনো সাহসভরে আলাপচারী তো করেনইনি, এমন কি চিঠিপত্রও লেখেননি। হিটলার তখন, ইংরিজিতে যাকে বলে 'টীন এজার'। এ-প্রেমটাকে সত্যকার রোমান্টিক প্রাতনিক প্রেম বলা যেতে পারে।

এর প্রায় বাইশ বৎসর পরে, যৌবনে, হিটলার পুরো-পাক্কা ভালোবেসেছিলেন গেলী রাউবাল নামক এক কিশোরীকে। এটিকে আমি পুরো এক নম্বর দিয়ে পূর্বোল্লিখিত "হিটলারের প্রেম" প্রবন্ধ রচনা করি। এটি স্থান পেয়েছে মল্লিখিত 'রাজা উজির' পুস্তকে। এ-অধম পারতপক্ষে কাউকে কখনো আমার

১ বৈদিক যুগে আমাদের ভিতর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তার সমাধান এখনো হয়নি। এস্থলে লক্ষণীয়, হিটলার নিজেকে আর্য বলে শ্লাঘা অনুভব করতেন। তাই হয়ত প্রথমে কিছুটা আপত্তি জানানোর পর এই সতীদাহে সম্মত হন। পাঠক এ-নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

নিজের লেখা পড়ার সলা-উপদেশ দেয় না, তবে যাঁরা রগরগে রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প ছাড়া অন্য রচনা পড়তে পারেন না, তাঁরা এটি পড়ে দেখতে পারেন।

এই কিশোরী আত্মহত্যা করেন। হিটলারও হয়ত সেই শোকে আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাঁর ফোটোগ্রাফার বন্ধু, হফ্‌মান প্রধানত—যদি তাঁকে শব্দার্থে তিন দিন তিন রাত্রি চোখে চোখে রাখতেন।

এই দুটি—½+১ প্রেম হয়ে যাওয়ার পর হিটলার আরেক ½ প্রেমে পড়েন—জীবনের শেষ বারের মতো। এফা ব্রাউনের সঙ্গে। এটাকে আমি হাফ প্রেম বলছি এই কারণে যে, আজ পর্যন্ত উভয়ের কোনো অন্তরঙ্গজনই এঁদের ভিতর সঠিক কি সম্পর্ক ছিল সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। এফা ছিলেন অতিশয় নীতিনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কুমারী। হিটলার ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি তিনি কদাচ আকৃষ্ট হননি। যে-রমণী তার দয়িতের সঙ্গে সহমরণ বরণ করার জন্য স্বেচ্ছায় শত্রুবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে, তাকে "রক্ষিতা" আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়।

পক্ষান্তরে এ-তত্ত্বটিও নিষ্ঠুর সত্য যে হিটলার সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এফাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। তিনি অবশ্য তার জন্য একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। সেগুলো বিশ্বাস করা-না-করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচির উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয় তার সব কটা ভুয়ো নয়। এবং হিটলার সর্বদাই এ-জাতীয় আলোচনার সর্বশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে বলতেন, "জর্মনি ইজ মাই ব্রাইড" =জর্মনি আমার (জীবনমরণের) বধূ। এরই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাঁর শেষ উইল-এ।

অতএব এফা না ছিলেন হিটলারের রক্ষিতা, না ছিলেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। সর্ব ঐতিহাসিক তাই বলেছেন, 'এ মোস্ট আনডিফাইণ্ড স্টেট'—অর্থাৎ এঁদের ভিতর ছিল এমন এক সম্বন্ধ যেটা কোনো সংজ্ঞার চৌহদ্দীতে পড়ে না।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঘা ঐতিহাসিক (যদ্যপি আমার বিচারে তিনি ট্রেভার রোপার, বুলক, নামিরের ইত্যাদির কাছেই আসতে পারেন না) শয়রার—যাঁর নাৎসিদের সম্বন্ধে বিরাট ইতিহাসের উপর নির্ভর করে নির্মিত একটা অতিশয় রসকষহীন ফিল্ম ১৯৬৯-এর গোড়ার দিকে কলকাতা তক পৌঁচেছিল—ইনি বলছেন, যে গেলী রাউবালের সঙ্গে হিটলারের প্রণয় হয় তাঁর আত্মহত্যার এক বা দুই বৎসর পর হিটলারের সঙ্গে এফা ব্রাউনের পরিচয় হয়। এ তথ্যটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয়। কারণ একাধিক ঐতিহাসিক বলেন আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে গেলী তার মামা (সম্পর্কে) হিটলারের

স্যুট সাফস্যুৎরো করার সময় পকেটে হিটলারকে লিখিত এফা ব্রাউনের একখানা 'প্রেমপত্র' পেয়ে যায়। গেলী আত্মহত্যা করার পর তার মা বলেন, এই চিঠিই গেলীকে আত্মহত্যার দিকে শেষ ঠেলা দেয়,—অবশ্য এ-কথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না গেলীর মা এফাকে এমনই উৎকট ঘৃণা করতেন যে পারলে তার চোখ দুটো ছোবল মেরে তুলে নিয়ে, রোস্ট করে তাঁর প্যারা কুকুরকে খেতে দিতেন।

গেলী হয়ত চিঠিখানা পেয়েছিল কিন্তু সে-চিঠি যে তার হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে-বিশ্বাস আমার হয় না। কারণ গেলীকে যিনি সবচেয়ে বেশী চিনতেন সেই হফ্‌মান বলেছেন, গেলী ভালবাসত ভিয়েনাবাসী এক কলেজের ছোকরাকে, সে প্রকৃতপক্ষে কখনো তার মামার প্রেম নিবেদনের প্রতিদান দেয়নি। তদুপরি আরেকটি কথা আছে, হিটলার তখন গেলীর প্রেমে অর্ধোন্মাদ। এফার সঙ্গে এমনি গতানুগতিক আলাপ হয়েছে। সে মজে গিয়ে হিটলারকে প্রেমপত্র লিখেছে—তরুণীরা আকছারই এ-রকম করে থাকে—এবং হিটলার এ-ধরনের চিঠি পেতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এবং নিশ্চয়ই এফার এ-চিঠি সিরিয়াসলি নেননি।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হল হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে। মধ্যবিত্ত সমাজের কুমারী কন্যা যতখানি লেখাপড়া করে সেইটে সেরে তিনি হফ্‌ম্যানের স্টুডিয়োতে অ্যাসিসটেন্টের কর্ম নেন। তাঁর কাজ ছিল, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং ডার্করুমে কিছুটা সাহায্য করা। সেই সূত্রে হফ্‌মান নিতান্ত প্রফেশনালি হিটলারের সঙ্গে এফার আলাপ করিয়ে দেন।

হিটলারের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে ভিয়েনা নগরে। সে-নগরের নাগরিকরা ডানসিং, ফ্লার্টিং, প্রণয়-মিলন, পরকীয়া শিভালরিতে অনায়াসে প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দেয়। হিটলারও রমণীসঙ্গ খুবই পছন্দ করতেন। জর্মনির সর্বময় কর্তা হওয়ার পর তিনি তাঁর অন্তরঙ্গজনকে একাধিকবার গল্পচ্ছলে বলেছেন, "এসব বড় বড় হোটেলের গাড়োলরা যে পুরুষ ওয়েটার রাখে, তার মত ইডিয়টিক আর কী হতে পারে! এটা তো জলের মত স্বচ্ছ যে সুন্দরী যুবতী ওয়েট্রেস রাখলে ঢের ঢের বেশী খদ্দের জুটবে। আমার জীবনে ট্র্যাজেডি যে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে যখন আমি কোন স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েটে বসি, আমাকে বাধ্য হয়ে ডাইনে এবং বাঁয়ে বসাতে হয় এই বুড়ী-হাবড়ীকে। কারণ তাঁদের স্বামীরা দুই বুড়ো-হাবড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভিন্ন রাষ্টের রাষ্ট্রপতি।...ওঃ, সে কি গব্বযন্ত্রণা।

খুশ-এখতেয়ার থাকলে তার বদলে আমি যে-কোন অবস্থায় ছোট্ট একটি নাম-না-জানা রেস্তোরাঁয় একটি ডবকী ওয়েট্রেসের সঙ্গে (মেয়েদের বেতন কম বলে কন্টিনেন্টে ছোট রেস্তোরাঁই শুধু ওয়েট্রেস রাখে) দু'দণ্ড রসালাপ করতে করতে না হয় সামান্য ডাল-ভাতই (ওদেশের ভাষায় দুই পদী খানা) খাবো—জাহান্নামে যাক স্টেট ব্যাঙ্কুয়েটের বাহান্ন পদী কোর্মা-কালিয়া, বিরয়ানি-তন্দুরী (ওদের ভাষায় শ্যাম্পেন কাভিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি)।"

তাই হিটলারের অ্যারোপ্লেনে রাখা হত খাবসুরৎ হুরী, স্টুয়ার্ডেস। কিন্তু এ-কথা সবাই বলেছেন, হিটলার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন না।

এস্থলে নাগর পাঠককে সবিনয় নিবেদন করি, এফা ব্রাউন ছিলেন সত্য সত্যই চিত্তহারিণী অসাধারণ সুন্দরী। কিশোরী-যুবতীর সেই মধুর সঙ্গমস্থলে। কিন্তু এ-বেরসিক লেখক নারী-সৌন্দর্য বর্ণনে এযাবৎ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বলে নাগর রসিক পাঠককে এস্থলে সে-রস থেকে সে বঞ্চিত করতে বাধ্য হল।

এফা সুন্দরী তো ছিলেনই তদুপরি স্টুডিয়াতে যে-সব খানদানী বিত্তশালিনী তরুণী যুবতী ছবি তোলাতে আসতেন, এফা তাদের আচার-আচরণ থেকে অনেক-কিছু শিখে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বেশভূষা এবং অলঙ্কারাদি।... পরবর্তীকালে যখন তাঁর অর্থের কোনই অভাব ছিল না তখনো তাঁর বেশভূষাতে রুচিহীন আড়ম্বরাতিশয্য প্রকাশ পায়নি। তাঁর অর্থবৈভব শুধু একটি অলঙ্কারে প্রকাশ পেত। তাঁর বাঁ হাতে বাঁধা থাকত মহার্ঘ্য বিরল হীরেতে বসানো একটি ছোট্ট রিস্টওয়াচ। জর্মনির মত দেশের ফ্যুরার যদি প্রিয়াকে তাঁকে জন্মদিনে একটি হাতঘড়ি উপহার দেন, তবে সেটি কি প্রকারের হবে, সেটা কল্পনা করার ভার আমি বিত্তশালী পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

গোড়ার দিকে হিটলার এফাকে খুব বেশী একটা লক্ষ্য করেননি।

এদিকে গেলীর মৃত্যুর পর হিটলারের জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

সখা হফ্‌মান তখন তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য সুযোগ পেলে হিটলারের প্রিয় অবসর যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। হিটলারকে নিয়ে যেতেন মিউনিকের আশপাশের হ্রদবনানীতে পিকনিকে। সঙ্গে থাকতেন হফ্‌মানের স্ত্রী, ফোটো স্টুডিয়োর দু-একজন কর্মচারী এবং এফা ব্রাউন।

ক্রমে ক্রমে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এর পর দেখা গেল, হফ্‌মান যদি পক্ষাধিককাল কোন পিকনিকের ব্যবস্থা না করতেন তবে স্বয়ং হিটলার তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে বলতেন, "হেঁ হেঁ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই আপনার এখানে ঢুঁ মারলুম।" তারপর কিঞ্চিৎ ইতিউতি

করে বলতেন, "যা ভাবছিলুম···একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করলে হয়, আপনারা তো আছেনই, আর হেঁ হেঁ ঐ ফ্রলাইন ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও মন্দ হয় না,—কি বলেন ?"

তখনো হিটলার এফার প্রেমে নিমজ্জিত হননি—এবং কখনও হয়েছিলেন কি না, সে-বাবদে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। পরবর্তী কাহিনী পড়ে সুচতুর —অন্তত আমার চেয়ে চতুর—পাঠক-পাঠিকা প্রেম বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা-প্রসূত কূটবুদ্ধি দ্বারা আপন আপন সুচিন্তিত এবং/কিংবা সহৃদয় অভিমত নির্মাণ করে নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে কিন্তু শ্রীমতী এফা হিটলার প্রেমের অতলান্ত সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতরে বিলীন হচ্ছেন। আর হবেনই না কেন ? যদ্যপি হিটলার তখনো রাষ্ট্রনেতা হননি, তথাপি তাবৎ জর্মনির সবাই তখন জানত, রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ যে-কোনো দিন তাঁকে ডেকে বলবেন প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। তদুপরি, পূর্বেই বলেছি, হিটলার ছিলেন রমণীচিত্তহরণের যাবতীয় কলাকৌশলে রপ্ত।···এবং সর্বোপরি তিনি প্রায়ই অবরেসবরে এফাকে দিতেন ছোটখাটো প্রেজেণ্ট। বিত্তশালীজন তার দয়িতাকে যে-রকম দামী দামী ফার কোট, মোটর গাড়ি দেয়, সে রকম আদৌ ছিল না—তিনি দিতেন চকলেট, ফুল বা ভ্যানিটি কেস (আমাগো রাষ্ট্রভাষায় যারে কয় "ফুটানি কী ডিবিয়া")।

সব ঐতিহাসিক বলেছেন, এফা ছিলেন "রাদার এম্‌টি-হেডেড" অর্থাৎ সরলা বুদ্ধিহীনা। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? অস্মদ্দেশীয় এক বৃদ্ধ চাটুয্যে "মহারাজ"কে জনৈক অর্বাচীন শুধিয়েছিল প্রেমের খবর তিনি রাখেন কি, তিনি বৃদ্ধ, তাঁর ক'টা দাঁত আর এখনো বাকি আছে ? গোস্‌সাভরে তিনি যা বলেন তার মোদ্দা—"ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস ? প্রেম হয় হৃদয়ে।" বিলকুল হক কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে পারতেন, প্রেম নামক আদিরসটি মস্তিষ্ক থেকে সঞ্চারিত হয় না।

তাই এফা ঐ সব চকলেটাদি সওগাৎ বান্ধবী, সহকর্মীদের ফলাও করে দেখাত, পিকনিকের বর্ণনা ফলাওতর করে সবিস্তর বাখানিত এবং ভাবখানা এমন করত যে, হিটলার তার প্রেমে রীতিমত ডগোমগোজরোজরোমরোমরো।

এস্থলে ইয়োরোপীয় সরলা কুমারীরা যা সর্বত্রই করে থাকে (এবং অধুনা কলকাতা-ঢাকাতে তাই হচ্ছে) এফা তাই করলেন। নির্জনে একে অন্যে যখন হুহুঁ হুঁহুঁ, কুঁহুঁ কুঁহুঁ তখন আশ-কথা পাশ-কথার মাঝখান দিয়ে—যেন টেবিলের

ফুলদানির দেখা-না-দেখার ফুলের মাঝখান দিয়ে জর্মনে একে বলে 'থ্‌ দ্য ফ্লাওয়ারস' —বিবাহ নামক সেই প্রাচীন সনাতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা দিলেন। নিশ্চয়ই একাধিকবার।

পূর্বেই বলেছি, হিটলার কিন্তু পৈতে ছুঁয়ে কসম খেয়ে বসে আছেন, বিবাহ-বন্ধন নামক উদ্বন্ধনে তিনি—কাট্যাফালাইয়েও—দোদুল্যমান হতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এবং ঝাণ্ডু ডিপ্লোমেট এই অস্বস্তিকর বাক্যালাপ কি করে এড়াতে হয়, সেটা খুব ভাল করেই জানতেন।

এটা বুঝতে সরলা, নীতিশীল পরিবারে পালিতা এফার একটু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে তাঁর রক্ষণশীল পিতামাতা এফার সঙ্গে হিটলারের 'ঢলাঢলি'র খবর পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন হয় হিটলার তোমাকে বিয়ে করুক, নয় তুমি তার সঙ্গ ত্যাগ কর।

পিতামাতার প্রতি বিনম্রা এই কুমারী তখন কি করে?

হঠাৎ ঐ সময়ে একদিন হফ্‌মান সখা হিটলারকে টেলিফোন করলেন, "যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি চলে আসুন।"

হিটলার: "কেন, কি হয়েছে?"

হফ্‌মান: "আসুন না; সব কথা এখানে হবে।" হফ্‌মান এবং হিটলার দুজনেই জানতেন তাঁদের টেলিফোনের কথাবার্তা পুলিস ট্যাপ্‌ করে।

হিটলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হফ্‌মানের ফ্লাটে পৌঁছলেন। শুধোলেন, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?"

হফ্‌মান: "বড় সিরিয়াস। এফা পিস্তল দিয়ে বুকে গুলি মেরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা নেয়। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় হিটলার বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু জানাজানি হয়নি তো—তাহলেই তো সর্বনাশ!"

এস্থলে লক্ষণীয় যে হিটলার দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। তাঁর পার্টি এবং বিশেষ করে গ্যোবেল্‌স্‌ সাধারণ্যে তাঁর যে "ইমেজ" গড়ে তুলছিলেন, সেটা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর। এখন যদি তাঁর দুশমন কম্যুনিস্টরা জেনে যায় যে, তিনি গোপনে একটা মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করতেন এবং সেই সরলা কুমারী যখন যুক্তিসঙ্গত নীতিসম্মত পদ্ধতিতে হিটলারকে সেই ভাব-ভালোবাসার অন্তে যে প্রতিষ্ঠান থাকে, অর্থাৎ বিবাহ, সেটা প্রস্তাব করে তখন তিনি ধড়িবাজ, কাপুরুষ, বেইমানের মতো মেয়েটাকে ধাপ্পা মারেন, এবং ফলে ভগ্নহৃদয়া কুমারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তবেই তো চিত্তির! যে নাৎসি

পার্টির নেতা এ-রকম একটা পিশেচ সে পার্টির কী মূল্য ? এই বেইমান পার্টিতে আস্থা রাখবে কোন্ ভদ্র ইমানদার জর্মন ? এবং ভুললে চলবে না, মাত্র বছর দুই পূর্বে গেলী রাউবালও আত্মহত্যা করে—যদিও সে সময় কম্যুনিস্টরা সেই সুবর্ণ-সুযোগের সিকি পরিমাণ ফায়দাও ওঠাতে পারেনি, অর্থাৎ একসপ্লয়েট করতে পারেনি।

কিন্তু মাভৈঃ! কন্দর্প নির্মিত এ-সব সংকটে প্রায়শ তিনি বিধাতার ন্যায়-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রেমিক-প্রেমিকার তাবৎ মুশকিল আসান করে দেন।

হফ্‌মান সঙ্গে সঙ্গে হিটলার তথা নাৎসি পার্টির জীবনমরণ সমস্যা সমাধান করে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন। জানাজানি হয়নি। কারণ এফাকে অচৈতন্য অবস্থায় যে সার্জনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি আমার নিকট-আত্মীয়। তাকে এমনভাবে কড়া পাহারায় রেখেছেন যে, পুলিস পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তিনি স্বয়ং আমাকে খবরটা জানিয়েছেন।"

তখন, এই প্রথম হিটলার প্রেয়সীর অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। না—ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তবে এফা রক্তক্ষরণহেতু বড্ডই দুর্বল।

শুধু এফার ফাঁড়া কেটে গেল তাই নয়, স্বয়ং হিটলার এবং নাৎসি পার্টিরও ফাঁড়া কেটে গেল। অবশ্য কিছুটা কানাঘুষো হয়েছিল, কিন্তু জানাজানি হয়নি।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে হিটলার যে খুব একটা নেমকহারাম ছিলেন তা নয়। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে হিটলার বুঝে গেলেন এফার প্রেম কতখানি গভীর—বল্লভার ব্রেন-বাক্সে কিছু থাক আর নাই থাক, তার গলা থেকে নাভিকুণ্ডলী অবধি জুড়ে বসে আছে একটা বিরাট হৃদয়—সেখানে না আছে ফুসফুস না আছে লিভার স্প্লীন কিডনি না আছে অন্য কোনো যন্ত্রপাতি।

এ-হেন হৃদয়কে তো অবহেলা করা যায় না।

এতদিন হিটলার যে-প্রেম করতেন এফার সঙ্গে সেটার পদ্ধতি ছিল মোটামুটি জর্মন কলেজ-স্টুডেন্টরা তাদের বান্ধবীর (ফ্রয়েণ্ডিন = গার্ল ফ্রেণ্ডের) সঙ্গে যে ভাবে করে থাকে। অর্থাৎ সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর এফা তাঁর নাইট গাউন ইত্যাদি রাত্রের পোশাক একটি অতি ছোট্ট স্যুটকেসে পুরে চুপিসাড়ে ঢুকতেন হিটলারের ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাড়ির পাঁচজন জেগে ওঠার পূর্বেই, ভোরবেলা, ফের চুপিসাড়ে চলে যেতেন আপন ফ্ল্যাটে।

এবারে হিটলার করলেন ভিন্ন ব্যবস্থা। ততদিনে তিনি রীতিমত বিত্তশালী হয়ে গিয়েছেন। হিটলারের আপন কর্মস্থল ম্যুনিক শহরে তিনি এফার জন্য

ছোট্ট একটি ভিলা, মোটর কিনে দিলেন এবং মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অর্থাৎ তিনি হিটলারের একমাত্র রক্ষিতা হিসাবে হিটলারমণ্ডলীতে আসন পেলেন। এস্থলে "রক্ষিতা" বলাটা হয়ত ঠিক হল না। কারণ ইয়োরোপের প্রায়ই অনেকে কয়েক বৎসর পরে এই রক্ষিতাকে বিয়ে করে তাকে সমাজে তুলে নেন। এবং সমাজপতিরাও বধূর অতীত সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই: এদেশে যদি বিয়ের তিন চার মাস পর কোনো রমণী বাচ্চা প্রসব করে, তবে হইচই পড়ে যায়। ইয়োরোপে আদৌ না। আমার যতদূর জানা গির্জা পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন না তুলে বাচ্চাটাকে ব্যাপ্টিস্ট করে তাকে ধর্মতঃ সমাজে তুলে নেয়।

অবশ্য হিটলার সমস্ত ব্যবস্থাটা করলেন অতিশয় গোপনে। পূর্বেই বলেছি, তাঁর এবং এফার চাকর মেড্ তথা অতিশয় অন্তরঙ্গজন হাড়ে-মাসে জানতেন যে তাঁরা যদি এই প্রণয়লীলা নিয়ে সামান্যতম আলোচনা করেন—বাইরের লোককে খবরটা জানাবার তো কথাই ওঠে না—তাহলে তিনি পার্টির জব্বর পাণ্ডাই হন আর জমাদারণীই হোক, তাঁরা যে তদ্দণ্ডেই পদচ্যুত বহিষ্কৃত হবেন তাই নয়, কপালে গুম-খুনও অনিবার্য। কারণ হিটলার বহু বিষয়ে নির্মম। দেশের কর্ণধার হওয়ার পূর্বে এবং পরেও হিটলার হিমলার বিস্তর গুম-খুন করিয়েছেন।

ওদিকে এফার যে ধার্মিক চরিত্রশীল জনক-জননী হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কুমারী কন্যার অন্তরঙ্গতার কঠোর কঠিনতম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এ-ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন। এটাকে প্রতিরোধ করলে একগুঁয়ে মেয়ে যদি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এবং যদি সফল হয়ে যায়!

আমার দুঃখ শুদ্ধ-পাঠটি আমার মনে নেই: মোটামুটি যে মেয়ে—

"মরণেরে করিয়াছে জীবনের প্রিয়।
কারো কোনো উপদেশ কান দিবে কি ও?"

এফার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন ছাড়া আর সবাই বিশ্বাস করতো, এফা ফোটোগ্রাফ দোকানে কাজ করেন। তিনি হফ্মানের স্টুডিয়োতে প্রতিদিন হাজিরা দিতেন।

এর কিছুদিন পরে ১৯৩৩-এর ৩০-এ জানুয়ারি হিটলার হয়ে গেলেন জর্মনির কর্ণধার—প্রধানমন্ত্রী চ্যানসেলার। তাঁকে তখন স্থায়ীভাবে বাস করতে হল বার্লিনে—ম্যুনিক পরিত্যাগ করে। এখন তিনি এফাকে নিয়ে পড়লেন বিপদে।

এতদিন শুধু কম্যুনিস্টরাই তাদের আধা-পাকা গোয়েন্দাগিরি করেছে হিটলারের। এবারে জুটলো তাবৎ মার্কিন খবরের কাগজের ঘুঁদে ঘুঁদে রিপোর্টার—পূর্বোক্ত "ঐতিহাসিক" শায়রারও তাদেরই একজন। এদের চোখ দু-নলা বন্দুকের মতো গভীর অন্ধকারেও এক্স-রে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে জানে শিকারের দিকে। এবং কারো যে কোনো ব্যক্তিগত জীবনের প্রাইভেসি থাকতে পারে সেটা তাদের শাস্ত্রে —আদৌ যদি তাদের কোনো শাস্ত্র থাকে—লেখে না। পাঠক শুধু স্মরণে আনুন ইংলণ্ডের রাজা যখন মিসেস সিমসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন তখন সে "কেচ্ছা"কে তারা কী কেলেঙ্কারির রূপ দিয়ে দিনে দিনে রসিয়ে রসিয়ে মার্কিন কাগজে প্রকাশ করেছে! তার তুলনায় হিটলার কোন্ ছার। ব্যাটা আপস্টার্ট যুদ্ধের সময় ছিল নগণ্য করপরেল—তার আবার প্রাইভেট লাইফ! সেটাকেও আবার রেহাই দিতে হবে! ছোঃ!

কাজেই এফাকে বার্লিনে আনা অসম্ভব।

ফলস্বরূপ ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এ হিটলারের আত্মহত্যা করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর—কবির ভাষায় নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর—এফা পেলেন আগের তুলনায় অল্পই, এবং ক্রমশঃ হ্রাসমান। তাই সহমরণের বহু আগের থেকেই এফা একাধিক বন্ধুবান্ধবীকে বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন, "১৯৩৩-এর জানুয়ারি (অর্থাৎ হিটলার যেদিন চ্যানসেলর হন) আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা নির্মম দিবস (ট্র্যাজিক ডে, 'ট্রাগিশা টাখ')।"

যেদিন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে অবতরণ করে কালক্রমে জর্মনি জয় করে সেটাকে বলা হয় ডী-ডে (D-Day)। সেটা ৬ই জুন ১৯৪৪। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারিতেই কিন্তু আরম্ভ হয় অভাগিনী এফার ডী-ডে। কিন্তু এসব কথা পরে হবে।

বার্লিনে কর্মব্যস্ত হিটলার ম্যুনিকে আসার সুযোগ পেতেন কমই। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যুনিকে ট্রাঙ্ককল করে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করে নিতেন। এবং টেলিফোন লাইনটি এমনভাবে নির্মিত ছিল যে, এফা হিটলার কনেকশন হয়ে যাওয়া মাত্রই দুই প্রান্তের টেলিফোন অপরাটেররা কিছুই শুনতে পেত না।...এবং যে স্থলে ট্রাঙ্ককলের অষ্টপ্রহর ব্যাপী এহেন সুবিধা সেখানে চিঠিচাপাটির বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না—ওদিকে আবার চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে হিটলার ছিলেন হাড় আলসে। (জর্মনে "স্টিগুঙ্কেতের শ্রাইবফাউল"দু—গন্ধময় লেখন-আলসে)। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন আক্ষরিক অর্থে হিটলারের দম ফেলার ফুরসৎ নেই, ক্রমাগত একটার পর আরেকটা মিলিটারি কনফারেন্স হচ্ছে—

তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতম ভ্যালে লিঙেকে বলতেন, "হে লিঙে, তুমি ঝপ করে এফাকে দুটি লাইন লিখে দাও না।" তখন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিটলারের কোনো-না-কোনো কর্মচারী প্লেনে করে ম্যুনিক যাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর চিঠি এফার হস্তগত হত।

ভ্যালে বলতে ভৃত্যও বোঝায়। কাজেই পাঠক নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়ে শুধাবেন, "কী! চাকরকে দিয়ে প্রিয়ার উদ্দেশে চিঠি লেখানো! সখৎ বেআদবী তো বটেই—তার চেয়ে বটতলার 'সচিত্র প্রেমপত্র' থেকে দু-পাতা কেটে নিয়ে খামে পাঠিয়ে দেওয়া ঢের ঢের বেশী শৃঙ্গাররসসম্মত!" কিন্তু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই—হিটলার, এফা ও ভ্যালে লিঙে তিনজনই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এমন কি লিঙের সামাজিক (রাজনীতির কথা হচ্ছে না) প্রতিষ্ঠা ছিল হিটলারের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের। তদুপরি, হিটলারের হাজার হাজার খাস সেনানীর (এস-এ) মাঝখান থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিঙেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন প্রায় কর্নেলের কাছাকাছি। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, হিটলার ম্যুনিকে এলেও তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো রাষ্ট্রকার্যে। সে-সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এফাতে লিঙেতে সময় কাটাতেন গালগল্প করে। এফা জানতেন, পুরুষদের ভিতর লিঙেই দশ-বারো বছর ধরে হিটলারের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং হিটলারও তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। এফা মেয়েদের ভিতর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তিনী। অতএব দুজনার ভিতর একটা অন্তরঙ্গতা জমে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এফা এই লিঙেকে তাঁর হৃদয়বেদনা যতখানি খুলে বলেছেন, অন্য আর কাউকে অতখানি বলেননি।[২]

অন্যত্র সবিস্তর লিখেছি, হিটলারের মৃত্যুর পর লিঙে রুশহস্তে বন্দী হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর রুশ-কারাগারের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করার পর জর্মনিতে ফিরে এসে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। এফা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই

২ এফার সঙ্গে লিঙের আরেকটা মিল আছে। বার্লিন যখন প্রায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত, শেষ পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু পালাবার পথ তখনো ছিল, সে-সময় হিটলার লিঙেকে ডেকে বলেন, "তুমি আপন বাড়ি চলে যাও।" লিঙে অসম্মতি জানান এবং সংক্ষেপে যা বলেন তার মোদ্দা : যাঁকে আমি এত বৎসর ধরে সেবা করেছি তাঁকে তাঁর শেষ মুহূর্তে আমি ত্যাগ করতে পারবো না। এবং সবাই জানেন, এফাও হিটলারের কড়া আদেশ সত্ত্বেও তাঁকে ত্যাগ করেননি।

পুস্তিকায়ই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে বিশ্বাস্য খবর পাবেন। হিটলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে, কিন্তু এফা সম্বন্ধে লিখেছেন বড়ই দরদ-ভরা ভাষায়। তিনি ইচ্ছে করলেই হিটলার এফার সম্পর্ক সম্বন্ধে রগরগে মার্কিনী ভাষায় "কেলেঙ্কারি কেচ্ছা" লিখতে পারতেন—কোনো সন্দেহ নেই তিনি রুশ দেশ থেকে পশ্চিম জর্মনিতে ফেরা মাত্রই মার্কিন রিপোর্টাররা তাঁকে চেপে ধরে, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হিটলার এফার নব "বিদ্যাসুন্দরে"র জন্য আপ্রাণ পাম্প করেছিল কিন্তু সে-সময় বিশেষ কিছু তো বলেনই নি, পরেও পুস্তিকা রচনাকালে লিখেছেন যেটুকু নিতান্তই না লিখলে সত্য গোপন করে এফার প্রতি অবিচার করা হয়। এই অন্তর্নিহিত শালীনতাবোধ ছিল বলেই হিটলার ও এফা উভয়েই তাঁকে বন্ধুর চোখে দেখতেন। এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া আজগুবী ব্যাপার নয়। এ দেশের পাঠান দাসবংশের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই এর সত্যতার নজীর সে-ইতিহাসে পাবেন। এবং লিঙে তো কিছু ক্রীতদাস নন !!

তাই এফাতে লিঙেতে এমনিতেই চিঠিপত্র চলতো। হিটলার সেটা জানতেন। তাই তিনি যে কাজকর্মে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তিনি যে ফোন করার জন্য মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করে পাঁচ মিনিটের তরেও আপন খাস কামরায় যেতে পারছেন না, এটা তাঁর গাফিলতি নয়, বস্তুত তাঁর এই অপারগতা সম্বন্ধে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন—এসব কথা লিঙেকে গুছিয়ে লিখতে বলতেন।

হিটলার যে এফাকে কখনো বার্লিনে আসতে দিতেন না তা নয়। অবশ্য অতিশয় কালেকস্মিনে। জব্বর পার্টি-পরবের স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট না থাকলে অন্তরঙ্গজন তথা এফার সঙ্গে তিনি ডিনার-লাঞ্চে বসতেন। এফাকে তাঁর বাঁ-দিকের চেয়ারে বসাতেন। এফা ঠিকমতো খাচ্ছেন কি না, তাঁর পছন্দসই খানা তৈরি হয়েছে কি না তাই নিয়ে পুতু-পুতু করতেন এবং সবাই বুঝতে পারতো তিনি এফাকে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন স্টেট ব্যাঙ্কুয়েট বা বাইরের লোক খানা খেতে আসতো, সেদিন এফাকে উপরের তলায় হিটলারের চারজন মহিলা সেক্রেটারি ও তাঁর খাদ্যরন্ধনের অধিকর্ত্রীর[৩] সঙ্গে খানা খেতে হত। অবশ্য এ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল, যখন হিটলারের দফতরের এক উচ্চ

৩ ইংরেজের স্নবারির "বামনাই"য়ের দুটি চূড়ান্ত বেশরম, বেহায়া উদাহরণ পাঠক এ-স্থলে পাবেন। হিটলার নিরামিষাশী ছিলেন ও তদুপরি তাঁকে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে হত; অর্থাৎ তিনি ডায়েট খেতেন। সে-সব বিষয়ে রান্না বড়

অফিসার, ফেগেলাইন বিয়ে করলেন এফার এক বোনকে। তখন হিটলার-সমাজের একটুখানি বৃহত্তর চক্রে এফাকে পরিচয় দেওয়া হত, সম্মানিত অফিসার ফেগেলাইনের শ্যালিকারূপে! মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ীর মেয়ের বর!

বিরাট বিরাট লক্ষজন পরিপূর্ণ সভাতে, যেখানে হিটলার ওজস্বিনী বজ্রভাষিণী থাণ্ডারী লেকচার ঝাড়বেন, সেখানেও তাঁকে বিশেষ আসন দেওয়া হত না। তাঁর এবং হিটলারের আর পাঁচজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে দয়িতের জনগণমনচিত্তহারিণী বক্তৃতা শুনতেন।

হায়! একে কি বলবো—"বড় দুঃখে সুখ" বা "বড় সুখে দুঃখ"? আমি এ-বাবদে মূর্খ—আবার বিদগ্ধ, সম্মানিত সখা "শিব্রাম" এ রকম একটা মোকা পেলে ঝপ্ করে একটা অকল্পনীয় পান করে খপ্ করে একটা আরো অচিন্তনীয় সুমধুর সুভাষিত ম্যাক্সিম বানিয়ে ফেলতেন পুরো দেড় গণ্ডা শব্দ ব্যবহার না করেই। এই একটা ব্যাপারে লোকটা মকৃথী-চোস্ কঞ্জুস। অভিধানের শব্দ-ভাণ্ডার যেন ব্যাঙ্কের ভল্টে লুকানো চিত্র-তারকাদের—সক্কলের না কারো-

---

বড় হোটেলের "শেফ"-রাও রাঁধতে জানে না। তাই ডাক্তারদের আদেশে তাঁকে নিযুক্ত করতে হয় একটি অতিশয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে। ইনি সর্বোচ্চ সম্মানসহ এম. ডি. পাস করার পর বিশেষভাবে স্পেশালাইজ করেন কিভাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়ে রুগীকে সারানো যায়। (আমাদের কবিরাজ ঠাকুমা-দিদিমারা যা করে থাকেন) এবং যারা শীতের দেশে নিরামিষাশী তাদের খাদ্য কিভাবে তৈরি করতে হয়—যাতে করে মাছ-মাংসের অভাব পরিপূরণ করা যায়। ইংরেজ এই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বার বার "কুক", "পাচিকা", "রাঁধুনী বামনী", "বাবুর্চী" বলে তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। তিনি প্রায়ই এঁর সঙ্গে ডিনার খেতেন। ভাবটা এই, ছোট জাতের হিটলার—আর "রাঁধুনী", "বাবুর্চী" ছাড়া কার সঙ্গে হৃদ্যতা করবে! এবং সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইংরেজের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং মহিলার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বেবাক ভুলে যায়। এবং ভুলে যায় বলতে, মহিলাতে হিটলারেতে খেতে খেতে "মোচার ঘণ্টে কতখানি গুড় দিতে হয়" সে নিয়ে আলোচনা হত না। আলোচনা হত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিয়ে। ...এবং পূর্বেই বলেছি, লিঙের শিক্ষাদীক্ষা পদমর্যাদা "ভুলে গিয়ে" ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে "ভ্যালে চাকর" নামে তাকে হীন করার চেষ্টা করেছে।...হিটলারের আদেশ সত্ত্বেও তিনি লিঙেরই মতো হিটলারকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি। আমার যতদূর জানা, তিনি বার্লিনে নিহত হন। প্রভুভক্তির ফলস্বরূপ।

কারোর—ইনক্যাম-ট্যাক্স অফিসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শক সম্পদ।

আমি কিন্তু দেখছি, এর ট্র্যাজিক দিকটা। পিতামহ ভীষ্মের পরই যে-বীরকে এ-ভারত সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি একচক্রা ভদ্রোত্তম কমাণ্ডর-ইন-চীফ, ফীল্ড-মার্শাল কর্ণ। তিনি যখন কুরুপ্রাঙ্গণে শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছেন, তখন মাতা কুন্তী তাঁর প্রতি-সাফল্যে কি তাঁর মাতৃগর্ব, মাতৃশ্লাঘা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন? শাস্ত্রোদ্ধৃতি দিতে পারবো না, তবে বাল্যবয়সের আমার সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম গুরু আমাকে সঙ্গোপনে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, মাতা কুন্তীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়সন্তান ছিলেন কর্ণ।

এফা ব্রাউনের ঐ একই ট্রাজেডি। সবজনসমক্ষে তিনিও গাইতে পারেন না—"বঁধু তুহাঁরি গরবে গরবিনী হম, রূপসী তুহাঁরি রূপে।"

অভিমানিনী পাঠিকা, তুমি হয়তো শুধোবে, এ-হেন ভণ্ডামীর অপমানজনক পরিস্থিতি এফা মেনে নিলেন কেন? এর উত্তরে আমার নিজের কোনো মন্তব্য না দিয়ে শুধু নিবেদন:

> "চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গিয়ে
> সারা নিশি কাটাইয়ে
> প্রভাতে এসেছ, শ্যাম,
> দিতে মনোবেদনা॥"

হিটলার

উৎসর্গ

প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন মধুমাস,
পূরবী গেয়ে ভোলালি তোরা,
চাইনে তো বিভাস!

বাণীর একনিষ্ঠা সাধিকা
অখণ্ডসৌভাগ্যবতী বধূ
কল্যাণীয়া
শ্রীমতী অর্চ্চনা
তথা
পুত্রপ্রতিম অপিচ দিলের দোস্ত
নূর-ই-চশ্‌ম
শ্রীমান দ্বারিক মিত্রের
চতুর্ভদ্র করকমলে

রথযাত্রা, ১৩৪৭
কলকাতা।

আনকস্
সৈয়দ মুজতবা আলী

হিটলারের শেষ দশ দিবস

ঠিক কুড়ি বৎসর আগে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটের অল্প পূর্বে হিটলার তাঁর অ্যার-রেড্ শেল্টার (বুঙ্কার—মাটির গভীরে কন্ক্রিটের পঞ্চাশ ফুট ছাতের নিচের আশ্রয়স্থল—কামানের বা প্লেন থেকে ফেলা গোলা বুঙ্কারের গর্ত পর্যন্ত কিছুতেই পৌঁছতে পারে না) থেকে বেরিয়ে করিডরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নব-পরিণীতা বধূ এফা, প্রায় পনেরো বৎসরের 'বন্ধুত্বে'র (হিটলারের শেষ উইলে তিনি এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন—বস্তুত নিতান্ত অন্তরঙ্গ কয়েক-জন অনুচর ভিন্ন দেশের-দশের লোক জানত না যে হিটলার ও এফার মধ্যে সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর) পর তিনি প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে এঁকে বিয়ে করেছেন। করিডরে গ্যোবেল্স্, বরমান প্রভৃতি প্রায় পনেরোজন তাঁর নিকটতম মন্ত্রী, সেক্রেটারি, সেনাপতি, স্টেনো, খাস অনুচর-চাকর সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হিটলার ও এফা নীরবে একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর নিতান্ত যে ক'জনের প্রয়োজন তাঁরা করিডরে রইলেন—বাদ-বাকিদের বিদায় দেওয়া হল। হিটলার ও এফা খাস কামরায় ঢুকলেন। অনুচররা বাইরে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটিমাত্র পিস্তল ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল। অনুচররা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন—তাঁরা ভেবেছিলেন দুটো শব্দ হবে। সেটা যখন শোনা গেল না তখন তাঁরা কামরার ভিতরে ঢুকলেন। সেখানে দেখতে পেলেন, তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন, কিংবা পড়ে আছেনও বলা যেতে পারে। তাঁর খুলি, মুখ এবং যে সোফাটিতে তিনি বসেছিলেন সব রক্তাক্ত। কেউ কেউ বলেন, তিনি মুখের ভিতর পিস্তল পুরে আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ বলেন, কপালের ভিতর দিয়ে গুলি চালিয়ে। তার কাঁধে এফার মাথা হেলে পড়েছে। এফার কাছেও মাটিতে একটি ছোট পিস্তল। কিন্তু তিনি সেটা ব্যবহার করেননি। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

তারপর কুড়িটি বৎসর কেটে গেলে পর ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই সেদিনের স্মরণে ও তার সপ্তাহ খানেক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার উপলক্ষে বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

আমার কাছে আসে প্রধানত জর্মনি, অস্ট্রিয়া ও সুইটজারল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত জর্মন ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক। এগুলোর আসতে প্রায় দু' মাস সময় লাগে। অ্যার-মেল হওয়ার ফলে বুকপোস্ট, ছাপা-মাল যে কী জঘন্য শম্বুক

গতিতে আসে সে-কথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তর্ধান করেন। কেউ কেউ ধরা পড়েন রাশানদের হাতে। তার মধ্যে হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙেও ছিলেন। কেউ কেউ লুকিয়ে থাকেন মার্কিন-ইংরেজ-ফরাসী অধিকৃত এলাকায়। এঁরাও ধরা পড়েন, প্রধানত মার্কিনদের দ্বারা। আর কারো কারো কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। যেমন বরমান ইত্যাদি কয়েকজন। এঁদের কে কে পালাবার সময় হত হন বা পালাতে সক্ষম হন জানা যায়নি।

গোড়ায়, অর্থাৎ হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পর রুশ জঙ্গীলাট জুকফ প্রচার করেন যে, হিটলার এফা ব্রাউনকে বিয়ে করার পর আত্মহত্যা করেন। ওদিকে মস্কোতে বসে স্তালিন বলেন, হিটলার মরেননি, তিনি ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর আশ্রয়ে স্পেনে আছেন (স্তালিনের মতলব ছিল এই অছিলায় ইয়োরোপের শেষ ফ্যাশী ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোকে খতম করা)। এমন কি কোনো কোনো উচ্চস্থলে একথাও বলা হল যে, ইংরেজ (!) তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। ইংরেজকে তখন বাধ্য হয়ে পাকাপাকি তদন্ত করতে হয় যে হিটলার সত্যই বুঙ্কার থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি না, কিংবা তিনি মারা গিয়েছেন কি না। এ কাজের ভার দেওয়া হয় ইতিহাসের অধ্যাপক, যুদ্ধকালীন গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ট্রেভার রোপারকে।

তিনি তাঁদেরই সন্ধানে বেরুলেন যাঁরা হিটলারের সঙ্গে বুঙ্কারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। এঁদের কয়েকজন হিটলারের মৃত্যু, দাহ, অস্থি-সমাধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু বুঙ্কার ও তৎসংলগ্ন ভূমি তখন রাশানদের অধিকারে (পূর্ব বার্লিনে); তারা সেখানে অধ্যাপককে কোনো অনুসন্ধান করতে দিল না। হিটলারের যে সব সাঙ্গোপাঙ্গ রাশানদের হাতে ধরা পড়েন তাঁরা যে সব জবানবন্দি দেন সেগুলোও অধ্যাপককে জানানো হল না।

হিটলারের মৃত্যুর সাত মাস পরে ট্রেভার রোপার তাঁর রিপোর্ট সরকারের হাতে দেন ও সেটি প্রকাশিত হয়। এর পর আরো তথ্য উদ্ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু অধ্যাপক তাঁর ময়না-তদন্তে যে বর্ণনাটি দেন তার বিশেষ কোনো রদ্-বদল করার প্রয়োজন হয়নি। এসব মিলিয়ে ট্রেভার রোপার সর্বসাধারণের জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা করে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত করেন। তার নাম 'লাস্ট্ ডেজ্ অব হিটলার।'

এ পুস্তিকা ইয়োরোপের প্রায় সর্ব ভাষাতেই অনূদিত হয়, এবং তার যুক্তিতর্ক এমনই অকাট্য যে জনসাধারণ হিটলারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। ওদিকে

সরকারী রাশান মত—হিটলার মারা যাননি।—তাই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে বইখানি নিষিদ্ধ বলে আইনজারী করা হল।

কিন্তু শেষটায় রাশানদেরও স্বীকার করতে হল যে হিটলার জীবিত নেই। কাশীরাম দাস পূর্বেই বলে গেছেন :—

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে স্তালনকে প্রায় সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সৃষ্টিকর্তার আসনে তুলে 'দি ফল্ অব বার্লিন' ফিল্‌ম্ রাশাতে তৈরী হল। এ ছবি এদেশেও এসেছিল। এতে হিটলারের মৃত্যু যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেটা মোটামুটি ট্রেভার রোপারের বর্ণনাই। মাত্র একটি বিষয়ে তফাত। ছবিতে দেখানো হয়েছে হিটলার বিষ খেয়ে মরলেন—অথচ হিটলার যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের কারণ কি তাই নিয়ে অধ্যাপক তাঁর পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে সবিস্তর আলোচনা করেছেন—এ স্থলে সেটা নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ পণ্ডিতের বিশ্বাস, to make assurance doubly sure হিটলার বিষের পিলে কামড় ও পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন একই সঙ্গে।

রুশদেশে দশ বছর জেল খাটার পর ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে হিটলারের কয়েকজন পার্শ্বচর মুক্তি পান। তার ভিতর একজন হিটলারের ভ্যালে লিঙে। ইনি বেরিয়ে এসেই দীর্ঘ একটি বিবৃতি দেন। এদেশের অমৃতবাজার পত্রিকায়ও সেটি ধারাবাহিক বেরয়। অন্যজন হিটলারের এ্যাড্‌জুটান্ট গুন্‌শে। ইনি ও লিঙে যে সব বিবৃতি দিলেন, সেগুলোর সঙ্গে অধ্যাপকের বইয়ে গরমিল অতি কম, এবং তাও খুঁটিনাটি নিয়ে।

অধ্যাপকের 'লাস্ট্ ডেজ্ অব হিটলার' বেরনোর পর ঐ বিষয় নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, কিন্তু মোটামুটি সকলেই অধ্যাপকের উপর নির্ভর করেছেন।

* * *

আমি প্রথম জর্মনি যাই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে। হিটলার তখনো গোটা জর্মনিতে সুপরিচিত হননি। তাঁর কর্মস্থল ও খ্যাতি প্রধানত ছিল মুনিক অঞ্চলে। তারপর আমার চোখের সামনেই তিনি রাইষ্‌টাগে (জর্মন পার্লিমেণ্টে) তাঁর দলের ক্ষমতা অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ালেন। ১৯৩২-এ আমি দেশে ফিরে এলুম। ৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যান্সেলর—প্রধানমন্ত্রী, প্রধান কর্মকর্তা হলেন। ১৯৩৪-এ আমি আবার প্রায় এক বছর জর্মনিতে ছিলুম। তখন হিটলার কিভাবে রাজ্যশাসন করেন সেটি পুরোপুরি দেখলুম। ১৯৩৮-এ আমি আবার জর্মনিতে চার

মাস কাটালুম। চেম্বারলেন তখন হিটলারের কাছে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগলো। বিশ্বযুদ্ধের পর আমি হিটলার ও তাঁর রাজ্যশাসন (থার্ড রাইখ একেই বলা হয়, এবং হিটলার সদম্ভে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, তৃতীয় রাইখ এক হাজার বছর স্থায়ী হবে—কিন্তু তার আয়ুষ্কাল হল মাত্র বারো বছর তিন মাস!) সম্বন্ধে শত শত বই কিনি। জর্মন, মার্কিন, ফরাসী, ইংরেজ ইত্যাদির লেখা। এদের সকলেই হয় হিটলারের পক্ষে না হয় বিপক্ষে ছিলেন। আমাকে নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। যুদ্ধের পরও আমি দু'বার জর্মনি ঘুরে আসি।

এস্থলে হিটলারের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার দম্ভ আমার নেই। উপরের কয়েক ছত্র থেকে পাঠক শুধু যেন বুঝতে পারেন আমার মিত্রেরা কেন আমাকে হিটলার সম্বন্ধে প্রামাণিক পুস্তক লিখতে বলেন। আমারও সেই বাসনা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি সেটা আর হয়ে উঠবে না। তাই যেটুকু পারি সেইটুকু এইবেলা লিখে নিই।

অনেক সময় পাঠকের ধৈর্য কম থাকে বলে তিনি উপন্যাসের শেষ অধ্যায়টি পড়ে নেন। আমি শেষ অধ্যায়ই সর্বপ্রথম লিখব। পটভূমি—অর্থাৎ প্রথম বাইশ বা বত্রিশ অধ্যায়—নির্মাণ করবো কয়েকটি ছত্রে।

১৯৩৩-এ হিটলার চ্যান্সেলর হলেন। ১৯৩৪-এ জর্মনির প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ মারা গেলে তিনি সে আসনটিও দখল করে দেশের 'ফ্যুরার' বা একচ্ছত্রাধিপতি 'নেতা' হন। পার্লিমেন্টের আর কোনো স্বাধীনতা রইল না। ১৯৩৮-এ হিটলার স্বাধীন অস্ট্রিয়া রাজ্য (তাঁর আপন জন্মভূমি ঐ দেশেই) দখল করে 'বৃহত্তর রাইষে'র অংশ করে নিলেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার জর্মন-ভাষাভাষী অঞ্চল গ্রাস করতে চাইলে, শান্তিভঙ্গের ভয়ে ভীত ইংলণ্ডের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ে সে অঞ্চলটুকু তাঁকে লিখিত-পঠিত ভাবে দান করলেন। কয়েক মাস পর হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার যে অঞ্চল তিনি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সেইটুকুও কাউকে কিছু না বলে-কয়ে গ্রাস করলেন। তখন চেম্বারলেনের কানে জল গেল—সেও পূর্ণমাত্রায় নয়। ১৯৩৯-এ হিটলার পোলাণ্ডের ভিতর দিয়ে জর্মন পূর্ব প্রাশা সংযুক্ত করার মানসে পোলাণ্ড রাজ্যের কাছে করিডর এবং অন্যান্য এটা-সেটা

দাবী করলেন। ইংলণ্ড আবার মধ্যস্থ হতে চাইল, কিন্তু হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। ইতিপূর্বেই জর্মন তথা বিশ্ববাসীকে সচকিত শঙ্কিত করে তিনি তাঁর জাতশত্রু স্তালিনের সঙ্গে চুক্তি করে পোলাণ্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন উত্তেজিত জনমতের চাপে পড়ে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো কিন্তু পোলাণ্ডকে কোনো সাহায্য পাঠাতে পারার পূর্বেই পোলাণ্ড হেরে গেল।

তার এক বৎসর পর ১৯৪০-এর গ্রীষ্মকালে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করে অত্যল্প সময়েই তাকে পরাজিত করলেন। ফ্রান্সে আগত ইংরেজ বাহিনী প্রাণ নিয়ে কোনো গতিকে স্বদেশে ফিরে গেল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জাম সব-কিছু ডানকার্ক বন্দরে ফেলে যেতে হল।

হিটলার ইংরেজকে বললেন, 'আর কেন ? সন্ধি করো!' ইংরেজ বললে, 'না, তোমাকে খতম করবো।'

হিটলার তখন বিরাট নৌবহর নিয়ে ইংলণ্ড আক্রমণের তোড়জোড় করলেন, কিন্তু শেষটায় দেখা গেল অভিযান নিষ্ফল হলেও হতে পারে। হিটলার সে চিন্তা বর্জন করলেন।

তাঁর চিরকালের বাসনা ছিল রুশ জয় করে বিজিত অংশে জর্মন চাষী মজুর বসিয়ে কলনি নির্মাণ করা।[১] ১৯৪১-এর গ্রীষ্মে তিনি রাশা আক্রমণ করলেন ও রুশ সৈন্য পরাজয়ের পর পরাজয় স্বীকার করে পিছু হটতে লাগলো। হিটলার-বাহিনী মস্কোর দোরের গোড়ায় পৌঁছল। কিন্তু হিটলারের কপাল মন্দ। অসময়ে নেমে এল প্রচণ্ড শীত, বরফ আর বৃষ্টি। পরের বৎসর হিটলার-সৈন্য অভিযান করলো ককেশাসের তেল দখল করতে। সেখানে স্তালিনগ্রাদে জর্মনরা খেল তাদের প্রথম মোক্ষম মার। ওদিকে হিটলারের মিত্র জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার ফলে আমেরিকাও যুদ্ধে নামল। মার্কিনদের এক দল গেল জাপানকে হারাতে ; অন্য দল ইংরেজ সহ উত্তর আফ্রিকায়। সেখানে রমেল প্রায় মিশর আক্রমণ করে সুয়েজ দখল করতে যাচ্ছিলেন। মার্কিন-ইংরেজ সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা দখল করে নামলো জর্মনমিত্র মুসসোলীনির মুলুক ইতালিতে।

---

১ জর্মন রাষ্ট্রের নেতা (ফ্যুরার) হওয়ার বহু পূর্বে তাঁর একমাত্র বই হিটলার লেখেন 'মাইন কাম্‌প্‌ফ্‌' নাম দিয়ে। এ পুস্তকের অন্যতম মূল বক্তব্য : সমুদ্রপারে কলনি নির্মাণের যুগ গেছে (এটা সত্য, এতদিনে সপ্রমাণ হয়েছে) ; জর্মনিকে রুশদেশ জয় করে সেখানে কলনি স্থাপনা করতে হবে।

ওদিকে ১৯৪৪-এ রুশ বিপুল বিক্রমে জর্মনদের আক্রমণ করে বিজিত রাশা থেকে তাদের খেদিয়ে দিয়ে পৌঁছে গেল পোলাণ্ডে—তারপর জর্মন সীমান্তে। এদিকে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার জাহাজ নিয়ে মার্কিন-ইংরেজ নামল পশ্চিম ফ্রান্সের নরমাণ্ডি উপকূলে (হিটলার যে নৌ-অভিযান করতে সাহস পান নি এরা সেটাই উল্টোদিক থেকে করলে)। হিটলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর রক্ষণ ব্যবস্থা করেছিলেন—সেনাপতিদের মধ্যে রমেলও ছিলেন—কিন্তু দুশমনকে ঠেকাতে পারলেন না। তারা ফ্রান্স জয় করে ১৯৪৫-এর শীতকালে জর্মনি ঢুকে, রাইন নদ অতিক্রম করে বার্লিনের কিছু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ স্তালিনের সঙ্গে মার্কিন-ইংরেজের চুক্তি ছিল, রুশরা প্রথম বার্লিন প্রবেশ করবে। রুশরা বার্লিনের পূর্ব সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এবারে তারা বার্লিন আক্রমণ করবে। এটা এপ্রিলের মাঝামাঝি—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। আর কয়েক দিন পরেই হিটলারের জন্মদিন—২০ এপ্রিল।

২০ এপ্রিল। আজ ফ্যুরারের জন্মদিন। তিনি কি জানতেন, দশ দিন পর তাঁকে নিজের হাতে নিজের জীবন নিতে হবে? না; কারণ ২৯ এপ্রিল রাত্রেও তিনি জেনারেল ভেংকের খবর নিচ্ছেন; তিনি কবে পর্যন্ত চতুর্দিকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন। আবার ২০ এপ্রিলে ফিরে যাই।

হিটলারের আমীর-ওমরাহ, সেনাপতি-জাঁদরেল, সাঙ্গোপাঙ্গ সেদিন সবাই জন্মদিন উপলক্ষে বুঙ্কারে উপস্থিত হয়েছেন। এদের প্রায় সকলেই মনে মনে জানতেন, ফ্যুরারের সঙ্গে এই তাঁদের শেষ দেখা, কারণ রাশানরা তখন বার্লিনের প্রায় চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছে। যে প্রভুকে তাঁরা কেউ ১২ বছর, কেউ ২০ বছর ধরে সেবা করেছেন এবং হিটলার চ্যানসেলর হওয়ার পর ধনজন-খ্যাতি-খেতাব সব-কিছুই তাঁর অকৃপণ হস্ত থেকে পেয়েছেন—তাঁকে তখন ত্যাগ করতে তাঁদের আর তর সইছে না। কারণ রাশান-ব্যূহ পরিপূর্ণ চক্রাকার ধারণ করার পর তাঁরা আর বেরুতে পারবেন না। তদুপরি বার্লিনের আরো দক্ষিণে রুশ-সেনাবাহিনীর আরেক বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রের প্রায় মাঝখানে এসেছে; মার্কিন-ইংরেজ পশ্চিম থেকে পূর্ব পানে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুই সৈন্যদল হাত মেলালে পর রাইখ দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। ২০ এপ্রিলে তারা তখনো হাত মেলায়নি—দক্ষিণ জর্মনি পৌঁছবার জন্য তখনো একটি করিডর খোলা। বেশীর ভাগই দক্ষিণ জর্মনি যেতে চান। সেখানেই নাৎসি আন্দোলনের জন্মভূমি ম্যুনিক শহর; তার কাছেই হিটলারের আবাসভূমি বের্গহফ—বের্খ্‌টেশ-

গার্ডেন্ অঞ্চলে, আল্‌পসের উপরে। সকলেরই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত হিটলার ঐ পর্বতসঙ্কুল গিরি-উপত্যকার গোলকধাঁধাতে এসে তারই সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দুশমনের সঙ্গে লড়ে যাবেন—

কারণ হিটলার একাদিক্রমে বার বার তাঁর সহচরদের বলেছেন : 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এই যে রুশ, মার্কিন, ইংরেজ মৈত্রী এটা কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এদের আদর্শ স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। দুই সৈন্যদল মুখোমুখি হতেই এই কোয়ালিশন (মৈত্রী) ভেঙে পড়বে। ফ্রেডরিক দ্য গ্রেটের বিরুদ্ধে ঠিক এই রকমই কোয়ালিশন হয়েছিল। তিনিও নিরুপায় হয়ে যখন আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, ঠিক সেই সময় কোয়ালিশনের অন্যতম প্রধান নেত্রী রাশার মহারাণী মারা গেলেন। রাশানরা বাড়ি ফিরে গেল ; সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিশন খানখান হয়ে গেল। জর্মনি লুপ্তগৌরব ফিরে পেল এবং উচ্চতর শিখরে আরোহণ করল।'

বুঙ্কারের খাস কামরায় নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস, জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ইয়োডলের কাছ থেকে হিটলার একজন একজন করে জন্মদিনের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। বাদবাকিরা—গ্যোরিঙ, রিবেনট্রপ্, হিমলার (হিটলার এঁরই মারফৎ আইষ্‌মানকে ইহুদি-হননে নিযুক্ত করেন), গ্যোবেল্‌স্, বরমান ইত্যাদির সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। তিনি দৃঢ়নিশ্চয়, বার্লিন মহানগরের সামনে রাশানরা পাবে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়। ভাগ্যবিধাতাই শুধু জানেন, এই সব অপদার্থ চাটুকারদের ক'জন হিটলারের এই অন্ধবিশ্বাসে অংশীদার ছিলেন। কারণ এঁরা সবাই জানতেন, প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে রাশার জারিনার (মহারাণীর) মত প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট মারা গিয়েছেন, কিন্তু মার্কিন সৈন্যদল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেনি।

হিটলার আগের থেকেই জর্মনিকে উত্তর দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিলেন। এখন আদেশ দিলেন, বার্লিনে যাঁদের নিতান্তই কোনো প্রয়োজন নেই তারা হয় উত্তর নয় দক্ষিণ পানে চলে যাবেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমীর-ওমরাহ দক্ষিণ বাগে চললেন—বিরাট বিরাট লরীতে করে দফতরের কাগজপত্র বোঝাই করে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—আপন আপন ধন-দৌলত বোঝাই করে। পড়ে রইল বার্লিনের অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারী। আর রইলেন খাঁটি প্রভুভক্ত গ্যোবেল্‌স্, ক্ষমতালোভী সেক্রেটারী বরমান—হিটলারের 'গরবে তিনি গরবিনী' ; দূরে চলে গেলে সে শক্তি পাবেন কোথা থেকে? বাদবাকিদের অধিকাংশের সঙ্গে হিটলারের আর দেখা হয়নি। তাঁর দুই প্রধান সেনাপতি

কাইটেল আর ইয়োডল গেলেন বার্লিনের উপকণ্ঠে, সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে; নৌসেনাপতি চলে গেলেন উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র-পারে, তাঁর হেড কোয়ার্টার্সে।

সবাই করজোড়ে হিটলারকে নিবেদন করলেন, আর কয়েকদিনের মধ্যেই রুশ সৈন্য বার্লিনের চতুর্দিকে ব্যূহ স্থাপন করে ফেলবে। ফ্যুরার তাহলে আর দক্ষিণে যেতে পারবেন না। যুদ্ধচালনার হুকুম-নির্দেশ তাহলে দেবে কে? হিটলার কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। অবশ্য এ-কথা সবাই জানতেন, একবার মনস্থির করার পর হিটলার অচল অটল হয়ে রইতেন।

তারপর হিটলার হুকুম দিলেন, বার্লিনে ও বার্লিনের চতুর্দিকে যে সব সৈন্য রয়েছে তারা যেন সবাই একত্র হয়ে এক জোটে সব ট্যাঙ্ক সব জঙ্গীবিমান নিয়ে বার্লিনের দক্ষিণভাগে রুশসৈন্যদের আক্রমণ করে। হিটলার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'কোন সেনাধ্যক্ষ যদি তার সৈন্যকে সম্মুখযুদ্ধে না পাঠায় তবে পাঁচ ঘণ্টার বেশী সে বাঁচবে না।' জঙ্গীবিমানের সেনাপতি কলারকে বললেন, 'তোমার মাথার দিব্যি, কোন সৈন্য যদি রণাঙ্গনে না যায়…।' এস্থলে 'মাথার দিব্যি' অর্থ হিটলার তার মুণ্ডুটির ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালাবার হুকুম দেবেন।

কিন্তু হায়, বাস্তব জগতের সঙ্গে হিটলারের হুকুমের কোনো সাদৃশ্য তখন আর ছিল না। মাসের পর মাস ধরে তাঁর আমীর-ওমরাহ তাঁর কাছে সত্য গোপন করে চলেছেন। যাঁরা সত্য গোপন করেননি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অশেষ ভাগ্যবান, তাঁরা সুদ্ধু অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে বরখাস্ত হয়েছেন, অন্যরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কারাগারে ফাঁসি যাচ্ছেন বা হিটলারের খাসসেনানীর চাবুকে চাবুকে জর্জরিত হচ্ছেন। সত্য গোপন করে হিটলারকে বলা হয়নি, ব্যাটালিয়ানের পর ব্যাটালিয়ান যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে—যেখানে হিটলার ভেবেছেন পুরো ডিভিশন রয়েছে, সেখানে তার এক-দশমাংশ আছে কি না সন্দেহ, তিনজন সেপাইয়ে মিলে রয়েছে একটা বন্দুক, টোটার সংখ্যা এতই সীমাবদ্ধ যে শত্রু দশবার গুলি ছুঁড়লে এরা একবার;—হিটলার জানতেন যে জঙ্গীবিমানের পেট্রল কমে আসছে, কিন্তু তারই অভাবে যে শত শত অ্যারোপ্লেন মাটিতেই শত্রুর বোমারু দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে তার পুরো খবর তাঁকে দেওয়া হয়নি।

বুঙ্কারের কনফারেন্স্ রুমের টেবিলের উপর বিরাট জঙ্গী ম্যাপ খুলে হিটলার তাঁর কাল্পনিক সৈন্যবাহিনী, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি লাল নীল রঙীন বোতামের প্রতীক দিয়ে সাজাচ্ছেন আর কোন্ জায়গা থেকে কোন্ সৈন্যদল কোথায় কার

সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কোন্ জায়গায় আক্রমণ করবে তার হুকুম দিচ্ছেন। এসব সেনাপতিদের, এমন কি কোনো কোনো স্থলে কর্নেলদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার কথা—এ সমস্ত তিনি তুলে নিয়েছেন আপন স্কন্ধে। হুকুম দিচ্ছেন মাটির নিচের বুঙ্কারে বসে। যুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন-ইংরেজ বোমারু, জঙ্গীবিমান জর্মনির আকাশে একচ্ছত্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দিন নেই, রাত্রি নেই বেধড়ক বোমা ফেলে ফেলে বার্লিন শহরটাকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হিটলার একদিনের তরে, একঘণ্টার তরেও সরজমিনে অবস্থা তদন্ত করতে বেরননি। পাছে 'বাস্তবতা' তাঁর 'অনুপ্রেরণাকে ব্যাহত করে'। পক্ষান্তরে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জর্মন বোমারু যখন লণ্ডন লণ্ডভণ্ড করছিল তখন প্রায়ই দেখা যেত, বিরাট সিগার মুখে চার্চিল সে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জনসাধারণকে দুঃখের দিনে উৎসাহ দিচ্ছেন—আর তারাও বলছে, 'আসুক না তারা। আমরাও আছি—গুড ওল্ড উইনি'।[২]

বুঙ্কারে হিটলারের জীবনের শেষ ক'দিন সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সময় ও তারিখে ভুল করেছেন। কারণটি অতিশয় সরল। দিনের পর দিন এঁরা বিজলি বাতিতে কাজ করেছেন—মাটির পঞ্চাশ ফুট নিচে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিছুই দেখতে পাননি। তারিখ ঠিক থাকবে কি করে? মাঝে মাঝে তাঁরা প্রায় ভিরমি যেতেন। বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস কলের সাহায্যে বুঙ্কারে ঠেলে দেওয়া হত। কিন্তু বোমাবর্ষণের ফলে বাইরের আকাশে মাঝে মাঝে এত ধুলোবালি জমে যেত যে কল সেগুলোও বুঙ্কারের ভিতর পাঠাতো। তখন বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য কল বন্ধ করে দিতে হত। ফলে অক্সিজেনের অভাবে সবাই নিরুদ্ধনিশ্বাস। বুঙ্কারের ভিতরকার অনৈসর্গিক দূষিত বাতাবরণের—দৈহিক ও মানসিক উভয়ই—সর্বোত্তম বর্ণনা দিয়েছেন হ্যার বল্ট্, একখানা চটি বইয়ে। ট্রেভার তাঁর উপর অনেকখানি নির্ভর করেছেন। অমূল্য চটি বইখানার অনুবাদ নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু সেটি আমার চোখে পড়েনি—আমি উপকৃত হয়েছি বলে পাঠককে পড়তে বলছি। শুনেছি, বইখানা নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় আইষমানের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়, এবং ক্রোধোন্মত্ত আইষমান নাকি মার্জিনে লিখেছেন—'ব্যাটাকে যদি একবার পেতুম'![৩]

পূর্বোল্লিখিত আক্রমণের যে আদেশ হিটলার তাঁর জন্মদিনের পরের দিন, ২১

২ উইনি, উইনস্টন চার্চিল।

৩ বল্ট্—ডি লেৎস্তেন টাগে ড্যার রাইষস্কান্ৎসেলাই।

এপ্রিল দিলেন তার সেনাপতি নিযুক্ত হলেন স্টাইনার।

পরের দিন সকালবেলা (হিটলার শুতে যেতেন ভোরের দিকে আর উঠতেন দুপুরের দিকে—শেষের দিকে দুর্ভাবনা আর ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন শুতে যেতেন আরো দেরিতে, উঠতেনও তাড়াতাড়ি, তিন ঘণ্টারও বেশী ঘুম হত না) থেকে হিটলার স্বয়ং এবং তাঁর হুকুমে অন্যান্যরা চতুর্দিকে ফোন করতে লাগলেন, স্টাইনারের আক্রমণ কতদূর এগিয়েছে ? কেউই কোনো পাকা খবর দিতে পারে না। যেটুকু আসছে তাও পরস্পরবিরোধী ; একবার স্বয়ং হিমলার বললেন—তিনি অবশ্য অকুস্থল থেকে দূরে—আক্রমণ চলছে ; তার পরমুহূর্তেই অন্য সূত্র থেকে খবর এল আক্রমণ আদপেই আরম্ভ হয়নি। এমন কি স্টাইনার স্বয়ং যে কোথায় তাও কেউ সঠিক বলতে পারে না। যে জেনারেল কলারের মুণ্ডুর ভিতর দিয়ে গরম বুলেট চালিয়ে দেবার ভয় দেখানো হয়েছিল তিনি তাঁর রোজনামচায় সেই ধুন্ধুমারের বর্ণনা লিখেছেন—এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিকেল তিনটে পর্যন্ত কোন খবর নেই। তারপর নিত্যিকার প্রথামত মন্ত্রণা-সভা বসল। উপস্থিত ছিলেন ফ্যুরার, দুই জেনারেল কাইটেল (হিটলারের পরেই তিনি) ও তার পরের জন ইয়োডল ; এবং আরো দুই সেনাপতি বুর্গডফ (পাঁড়মাতাল) ও ক্রেব্‌স্—শেষের দুজন সদাসর্বদা হিটলারের পাশের বুঙ্কারে বাস করতেন ও বলতে গেলে হিটলারের লিয়েজোঁ আপিসার ছিলেন এবং হিটলারের সেক্রেটারি বরমান।[৪]

সেই ঐতিহাসিক মন্ত্রণাসভায় হিটলার-রাইষের শেষ হাঁড়ি ফাটলো।

স্টাইনার আক্রমণ আদৌ ঘটেনি। একখানি বোমারু বা জঙ্গীবিমানও আকাশে ওঠেনি। হিটলারের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্ল্যান, মুণ্ডু দিয়ে বুলেট চালানোর বিভীষিকা প্রদর্শন—সব ভণ্ডুল, সব নস্যাৎ!

তাঁর জীবনে এই প্রথমবারের মত হিটলার পরাজয় স্বীকার করলেন।

৩ বল্‌ট্—পূর্বোক্ত।

৪ ডাঙর ডাঙর নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষ ন্যুরনবের্গে 'মকদ্দমা' করেন। কাইটেল, ইয়োডলের ফাঁসি হয়। বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌সের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি ; তবে প্রায় সবাই নিঃসন্দেহ, রাশানরা যখন ২ মে তারিখে বুঙ্কার আক্রমণ করে তখন এঁরা আত্মহত্যা করেন। তার পূর্বে ক্রেব্‌স্ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে (১ মে) রাশান প্রধান সেনাপতির কাছে যান, কিন্তু রাশানরা শর্ত মানলো না বলে প্রস্তাব ভেস্তে যায়। বরমান নিখোঁজ।

হিটলারের মেজাজটি ছিল আগুনে গড়া। দুঃসংবাদ পেলেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন কর্কশ কণ্ঠে, চিৎকারে চিৎকারে তাঁর গলা ফেটে যেত, পাইচারি না —ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সবেগে ছুটোছুটি আরম্ভ করতেন, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে আরম্ভ করত, এবং চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইত। প্রধান প্রধান সেনাপতিদের মুখের সামনে ঘুষি বাগিয়ে 'কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক' পর্যন্ত বলতে কসুর করতেন না। বেদরদীরা বলে, তিনি শেষ পর্যন্ত মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে দিতে কার্পেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাই তারা তাঁর নামকরণ করে 'কার্পেটভুক'। তবে সত্যের খাতিরে বলা ভাল, হিটলারের শত্রু-মিত্র কোনো ঐতিহাসিকই এটা বিশ্বাস করেননি।

এবারে শুধু যে তাই হল তা নয়, এবারে চিৎকার, হুঙ্কার, বেপথুর পর তিনি নির্জীবের মত চেয়ারে বসে স্বীকার করলেন, এই শেষ। রুশের তুলনায় জর্মন জাতি হীনবল, নির্বীয, অপদার্থ বলে সপ্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মত লোককে তাদের ফ্যুরাররূপে পাবার গৌরব ও সামর্থ্য তারা ধরে না। তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধা নেই, তিনি দক্ষিণ জর্মনি গিয়ে আলপ্‌সের গিরি-উপত্যকা গুহা-গহ্বরে যুদ্ধ চালাবেন না—তৃতীয় রাষ্ট্র বন্ধ্যা সপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তিনি বার্লিনেই থাকবেন। সম্মুখযুদ্ধ করার মত শারীরিক শক্তি তাঁর আর নেই বলে রুশরা বার্লিন প্রবেশ করলে তিনি বার্লিনের রাস্তায় বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারবেন না। তিনি তখন আত্মহত্যা করবেন।

একথা সত্য, হিটলারের শরীরে তখন আর কিছু নেই।

হিটলারের অন্যতম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হাসেলবাথ বলেন, '১৯৪০ পর্যন্ত হিটলারকে তাঁর বয়সের তুলনায় (তখন তিনি ৫০) অনেক কম দেখাত। ঐ সময় থেকে তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বুড়োতে লাগলেন। ১৯৪০ থেকে '৪৩ পর্যন্ত তাঁর যা সত্যকার বয়স তাই দেখাতো। ১৯৪৩-এর (স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের) পর তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন।' শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য যে একেবারে ভেঙে পড়ে তার জন্য অংশত তাঁর হাতুড়ে ডাক্তার মরেলই দায়ী—হিটলারকে যে সব গণ্যমান্য চিকিৎসক পরীক্ষা করেছেন, কিংবা সাময়িকভাবে চিকিৎসা করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে এ সত্যটি বলে গেছেন। হিটলার কার্যক্ষম থাকবার জন্যে —সামান্যতম সর্দিকাশিতে পর্যন্ত তিনি ভয় পেতেন, এবং আসার লক্ষণ দেখতে পেলেই অবিচারে ইনজেকশন নিতেন—মরেলের কাছ থেকে উত্তেজনাদায়ক ওষুধ চাইতেন। মরেলও অবিচারে এমন সব ওষুধ আর ইনজেকশন দিতেন যেগুলো দিত সাময়িক উত্তেজনা কিন্তু আখেরে করত স্বাস্থ্যের অশেষ ক্ষতি। বৃদ্ধ

সাময়িকভাবে থাকাকালীন অন্য এক ডাক্তার দৈবযোগে হিটলারের চাকর লিঙের ড্রয়ারে এসব ওষুধ প্রচুর পরিমাণে পান ও বিশ্লেষণ করে দেখেন যে ওগুলোতে মারাত্মক বিষ রয়েছে, যেগুলো অতি অল্প ডোজে কঠিন ব্যামোতে দেওয়া হয়। অথচ মরেল ওগুলো লিঙেকে দিয়ে রেখেছিলেন, হুজুর যাতে যখন খুশী, যত খুশী ঐসব ট্যাবলেট খেতে পারেন।[৫]

আর ইনজেকশনের তো কথাই নেই: লেকচার দিতে হলে পূর্বে ইনজেকশন, পরে ইনজেকশন। প্রকৃতি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ হতে সাহায্য করে; মরেল বা হিটলার সে সাহায্য নিতে চাইতেন না। ফলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও শেষ বয়সে নির্মমভাবে তার প্রাপ্য নেয়।

ডাক্তাররা যখন হিটলারকে এ তথ্যটি বললেন, তখন তিনি রেগে টং। মরেলের উপর না, ডাক্তারদের উপর।

হিটলার তাদের অকথ্য অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য, মরেলের কড়ে আঙুলে যত এলেম, এঁদের গুষ্টির সব ক'টার মগজেও তা নেই।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ সালে বল্ট্ মিলিটারি রিপোর্ট দিতে গিয়ে তাঁকে জীবনের প্রথমবারের মত কাছের থেকে দেখেন। 'হিটলার অনেকখানি কুঁজো হয়ে, বাঁ পা হেঁচড়ে টেনে আনতে আনতে আমার দিকে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মর্দনের সময় নির্জীব হাত কোনো চাপ দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন—তাঁর চোখে এক অবর্ণনীয় কাঁপা-কাঁপা জ্যোতি[৬] সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক এবং ভীতিজনক। তাঁর বাঁ হাত নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। তাঁর মাথাও অল্প অল্প দুলছে। তাঁর মুখ ও বিশেষ করে চোখের চতুর্দিকে দেখলে মনে হয় যেন এগুলোর সব শেষ হয়ে গেছে। সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে হয়, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ।'[৭]...অন্যরা বলেছেন, নানা রকমের বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে খেয়ে তাঁর চামড়ার রঙ বিবর্ণ পাঁশুটে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাঁ-হাত এত বেশী কাঁপতো যে চেয়ারের হাতা বা টেবিল তিনি সে হাত দিয়ে

---

৫ চিকিৎসকদের কৌতূহল হতে পারে ওষুধটা কি? এর নাম Dr. ›ester's Antigaspills. এর প্রেসক্রিপশন: Extr. Nux. Vom; tr. Bellad. a. a. 0. 5; extr. Gent 1. 0. বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে মি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি যদ্দৃষ্টং নকল দিলুম।

৬ অনেকে সন্দেহ করেছেন, এই জ্যোতি উত্তেজক ওষুধবশতঃ।

বল্ট্, ট্রেভার রোপার, আসমান দ্রষ্টব্য।

চেপে ধরতেন ; দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত পিছনে নিয়ে গিয়ে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে রাখতেন।...বল্‌ট্ হিটলারের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে আবার তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি আরো কুঁজো হয়ে গিয়েছেন, আরো পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে এগোন। সমস্ত চেহারাটা মৃত। সবসুদ্ধ শীর্ণ-জীর্ণ বিকৃত-মস্তিষ্ক অতি বৃদ্ধের মূর্তি। চোখেও সেই অস্বাভাবিক জ্যোতি আর নেই।

হিটলার যখন দৃঢ়কণ্ঠে বার্লিনেই মৃত্যুবরণের শপথ গ্রহণ করলেন তখন সকলেই একবাক্যে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'নিরাশ হবার মত কিছুই নেই। দক্ষিণ জর্মনি ও উত্তর ইতালিতে, বোহেমিয়া অঞ্চলে ও অন্যত্র এখনো অনেক অক্ষত সৈন্যবাহিনী রয়েছে। হিটলার যদি দক্ষিণ জর্মনির গিরি-উপত্যকায় তাদের জড়ো করেন তবে আরো অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করা যাবে।'

হিটলার অচল অটল। তাঁর হুকুমে পরের দিন বার্লিন বেতার প্রচার করলো, হিটলার ও গ্যোবেল্‌স্ ও পার্টির কর্মকর্তাগণ বার্লিন ত্যাগ করবেন না, ফ্যুরার স্বয়ং বার্লিন রক্ষা করবেন। তার পরের কথাগুলো বোধহয় গ্যোবেল্‌সের জোড়া প্রপাগাণ্ডা-বাণী 'বার্লিন ও প্রাগ চিরকাল জর্মন শহর হয়ে রইবে।' কাইটেল, ইয়োডল বরমানকে ডেকে বললেন, 'আমি বার্লিন ত্যাগ করবো না।' জেনারেলদ্বয় প্রতিবাদ করে বললেন, 'তাহলে দক্ষিণ জর্মনির জমায়েত সৈন্যচালনা করবে কে?' হিটলার বললেন, 'সৈন্যচালনার কীই বা আছে, লড়াইয়ের কীই বা বাকি? এখন সন্ধিসুলেহ করো গে। সে কাজ গ্যোরিঙই আমার চেয়ে ঢের ভালো পারবে।'

গ্যোরিঙের এই উল্লেখ পরবর্তী অনেক ঘটনার জন্য দায়ী।

২৩ এপ্রিল দুপুরবেলা দক্ষিণ জর্মনিতে গ্যোরিঙের কাছে এই কথোপকথনের খবর পৌঁছল। তিনি যে খুশী হলেন সেটা কারো বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু সাবধানের মার নেই বলে হিটলারের আইন-উপদেষ্টাকে ডেকে পাঠিয়ে ১৯৪১ সালের হিটলার-দত্ত সেই পুরনো প্রত্যাদেশের দলিল বের করলেন—যেটাতে হিটলার তাঁকে তাঁর ডেপুটি রূপে নিয়োগ করেছিলেন। এখন যদি রিপোর্ট সত্য হয় যে হিটলার আর কোনো হুকুম দিচ্ছেন না, এবং সন্ধিসুলেহ করার জন্য তাঁকেই স্মরণ করে থাকেন তবে তাঁকে কিছু একটা করতে হয়। পারিষদদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করার পর তিনি হিটলারকে তার পাঠালেন, আপনি যখন বার্লিনে শেষ পর্যন্ত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—তবে কি আপনি ১৯৪১ এর প্রত্যাদেশ মোতাবেক রাজী আছেন যে আমি তাবৎ রাইষের নেতৃত্ব গ্রহণ

করি ? আজ রাত্রে দশটার ভিতর কোনো উত্তর না পেলে বুঝবো, আপন কর্ম স্বাধীনতা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়েছেন এবং তদনুযায়ী দেশের দশের মঙ্গলের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করবো। আপনি জানেন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বময় এই মুহূর্তে আপনার জন্য আমার হৃদয়ে কী অনুভূতি হচ্ছে! ভগবান আপনাকে—' ইত্যাদি ইত্যাদি (তারপর আশীর্বচন, মঙ্গল কামনা, অন্যান্য দরদী বাৎ)।

অত্যন্ত আইনসঙ্গত সহৃদয় চিঠি। কিন্তু গ্যোরিঙের জাতশত্রু জানেন দুশমন সেক্রেটারি বরমান বছরের পর বছর ধরে এই মহাশুভ লগনের জন্য প্রহর গুনছিলেন। দিনভর হিটলার শুধু 'নেমকহারাম, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক সব—দলকে দল' এই সব বুলি আওড়েছেন ; যখন তিনি উত্তেজনার চরমে হাঁপাচ্ছেন তখন বরমান গুড়িগুড়ি টেলিগ্রামখানা এগিয়ে দেবার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে এটাও যে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা, হিটলার উৎকট সঙ্কটে অসহায় জেনে এ শুধু গ্যোরিঙের নিছক শক্তি কেড়ে নেওয়ার নীচ হীন ষড়যন্ত্র এবং এটা তারই নির্লজ্জ আলটিমেটাম (ভীতিপ্রদর্শনের সঙ্গে ম্যাদ)—এ কথাটিও বললেন।

হিটলার তখন চতুর্দিকে দেখছেন বিশ্বাসঘাতকতা ; এটা তারই আরেক নেমকহারাম নিদর্শন—এই অর্থেই সেটা গ্রহণ করলেন। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে গ্যোরিঙকে দিলেন অশ্রাব্য গালাগাল। বেবাক ভুলে গেলেন, তাঁরই মুখে বেরিয়েছিল গ্যোরিঙ সম্বন্ধে প্রস্তাব, কিন্তু বরমান যখন গ্যোরিঙের প্রাণদণ্ডাদেশ চাইলেন তখন তিনি পার্টি এবং ফ্যুরারের প্রতি গ্যোরিঙের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সেবা ভুলতে না পেরে আদেশ দিলেন, তাঁকে তাঁর সর্ব পদ সর্ব ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করা হল, এবং আদেশ দেওয়া হল হিটলারের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন না। এবং তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখার হুকুম দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে হিটলার গ্যোবেল্‌স্ দম্পতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তাঁরা যেন তাঁদের বাসস্থান ত্যাগ করে তাঁদের ছ'টি বাচ্চাসহ তাঁর পাশের বুঙ্কারে বাসা বাঁধেন। সুবুদ্ধিমান হাতুড়ে ডাক্তার মরেল ইতিপূর্বেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে (কেউ কেউ বলেন চোখের জল ফেলে অনুনয় করে, অন্যেরা বলেন কুমীরের ভণ্ডাশ্রু) হিটলারের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করে দূর দক্ষিণে কেটে পড়েছেন (হিটলার যেন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'যে পথে যাচ্ছি সেখানে যাবার জন্যে আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নেই')। তাঁর কামরা ছিল বুঙ্কারে হিটলারের মুখোমুখি—গ্যোবেল্‌স্ সে ঘরটাও পেলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। গ্যোবেল্‌স্ বললেন তিনিও

আত্মহত্যা করবেন, এবং হিটলারের আপত্তি সত্ত্বেও ফ্রাউ গ্যোবেল্স্ বললেন, তিনিও সেই পথ ধরবেন এবং বাচ্চা ছ'টিকে বিষ খাইয়ে মারবেন।

এটা এমনি বীভৎস কাণ্ড যে কোনো ঐতিহাসিকই এ নিয়ে মন্তব্য করেননি। এর পর হিটলার তাঁর কাগজপত্র থেকে নিজে বাছাই করে কতকগুলো পোড়াবার আদেশ দিলেন।

সমস্ত দিন ধরে দক্ষিণ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ, উত্তর থেকে নৌসেনাপতি ড্যোনিৎস ও হিমলার এবং আরো একাধিক আমীর হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, কিন্তু হিটলার অটল অচল। ২৩ তারিখে তিনি জেনারেল কাইটেলকে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন জেনারেল ভেংকের কাছে—তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিন উদ্ধার করবেন। ইতিমধ্যে রাশানরা বার্লিন মাঝখানে রেখে সাঁড়াশী ব্যূহ নির্মাণের জন্য বার্লিন ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গিয়েছে। ভেংককে এদের সঙ্গে লড়াই করে করে তবে বার্লিন পৌঁছতে হবে। হিটলার ঘড়ি ঘড়ি শুধোচ্ছেন, ভেংকের খবর কি, তিনি কতদূর এগিয়েছেন! সমস্ত বুঙ্কারবাসীর ঐ এক শেষ ভরসা। কিন্তু তাঁর কোনো খবর নেই।

২৫ তারিখে রুশসৈন্য সমস্ত বার্লিন চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলল। এর পর আর দশ-বিশজন লোক যে একসঙ্গে বার্লিন থেকে বেরুবে তার উপায় আর রইল না। তবে একজন দুজন গলিঘুঁচি দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাতের অন্ধকারে হয়তো বেরুতে পারে। এ অবস্থায় হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার জন্য আর অনুরোধ করা যায় না।

কিন্তু বুঙ্কারে দিনে দু'বার কখনো বা তিনবার হিটলার তাঁর মন্ত্রণাসভায় নেতৃত্ব করে যেতে লাগলেন। সেখানে শুধু ঐ খবরই পাওয়া যেত, রুশরা বার্লিনের কোন্ দিকে কতখানি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বৃদ্ধ আর বারো থেকে ষোল বছরের ছেলেরা যতখানি পারে লড়াই দিচ্ছে। যে কোনো সেনানীর পক্ষেই কোনো শহরের অন্তর্ভাগ দখল করা সহজ নয়। রুশরা এগুচ্ছে ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে। ইতিমধ্যে পূর্ব থেকে এসে রুশসৈন্য ও পশ্চিম থেকে এসে মার্কিন সৈন্য মধ্য-জর্মনিতে হাত মিলিয়েছে—জর্মনি এখন দুখণ্ডে বিভক্ত। উত্তর থেকে—বার্লিন থেকে এখন আর আলপ্সের গিরি-উপত্যকায় গিয়ে যুদ্ধ প্রলম্বিত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই সেনাবাহিনীর এই হাত মেলানোর খবর হিটলার পেলেন মন্ত্রণাসভায় বসে। সংবাদদাতা বললেন, 'দুদলে কথা-কাটাকাটি হয়েছে।' ফ্যুরারের

পাংশু মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চোখের জ্যোতি যেন হঠাৎ ফিরে এল। সোল্লাসে বললেন, 'আমি কি তখনই বলিনি? এইবারে শুরু হবে।' কিন্তু হায়, পরের দিনই খবর এল, দু'দল শান্তভাবে আপন আপন থানা গেড়ে নির্বিরোধে খবর পরামর্শ লেন-দেন করছে।

বার্লিনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অষ্টপ্রহর উপর থেকে বোমাবর্ষণ এবং তার সঙ্গে এসে জুটেছে শহরের উপকণ্ঠে বিরাট বিরাট কামান। বোমা ফেলছে বুঙ্কারের উপর। স্তালিনগ্রাদে যে সব জর্মন ধরা পড়েছিল তাদের অনেকে মিলে হিটলার-বিরোধী এক 'স্বাধীন-জর্মনি' দল গড়ে। এরাই আজ রুশদের বার্লিনের রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর চিনিয়ে দিচ্ছে। তাই তাগেও ভুল হচ্ছে না। বুঙ্কারে ফাটল ধরেছে। শহরের কোনো জায়গায় যদি অগ্নিপ্রজ্বালক বোমায় আগুন ধরলো তবে সে আগুন জলের অভাবে নেভানো যায় না বলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ না পূর্বের থেকে পুড়ে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছয় ততক্ষণ সে ব্লকের পর ব্লক, রাস্তার পর রাস্তা পুড়িয়ে চলে। ভূগর্ভস্থ সেলারে সেলারে লক্ষ লক্ষ আহত সৈনিক গোঙরাচ্ছে, শিশুরা কাঁদছে। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোমা পড়ে কোনো কোনো জায়গায় জলের পাইপ ফেটে পূর্বে যে জল জমেছিল মেয়েরা সেই ঘোলাটে জল বালতিতে করে নিয়ে যাচ্ছে।

খবর এল রাস্তায় রাস্তয়ে লড়ে লড়ে রুশসৈন্যরা তো এগুচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভূগর্ভস্থ রেলপথের (আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে) টানেল দিয়ে এগিয়ে আসছে। হিটলার হুকুম দিলেন স্প্রে নদীর (কানাল বা বড় খালও বলা হয়) জল বন্ধ করার গেট খুলে দিতে। সে জল রুশদের ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মরবে হাজার হাজার আহত জর্মন সৈনিক—যারা মাটির নিচের স্টেশন-প্লাটফর্মে শুয়ে শুয়ে অচিকিৎসায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এদের জীবন-মরণে হিটলারের ভ্রূক্ষেপ নেই। বল্ট্ বলেছেন, সমস্ত যুদ্ধে এ রকম হৃদয়হীন আদেশ তিনি শোনেননি। (এ আদেশ পালিত হয়েছিল কি না আমি জানি নে)।

এর চেয়েও নিষ্ঠুর আদেশ হিটলার বরমানকে পূর্বেই দিয়ে বসে আছেন। যে শহরের সামনে শত্রুসৈন্য দেখা দেবে তার তাবৎ কারখানা, ওয়াটার-ওয়ার্কস, বিজলি, নদীর উপর সেতু সব যেন উড়িয়ে দেওয়া হয়। সরবরাহ মন্ত্রী স্পের আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'যুদ্ধের পরে জর্মনরা তবে গড়বে কি, বাঁচবে কি দিয়ে?' হিটলার বললেন, 'এ যুদ্ধে সপ্রমাণ হয়েছে জর্মন জাত রুশের তুলনায় অপদার্থ; এদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।' স্পের কিন্তু গোপনে এ-আদেশ বানচাল করে দেন।

নিষ্ঠুরতম আদেশ দেন হিটলার বরমানকে জর্মন জাতকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার।

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে আবালবৃদ্ধ নরনারীকে খেদিয়ে, সঙ্গীনের ঘায়ে, গুলি চালিয়ে জড়ো করা হোক মধ্য-জর্মনির এক মধ্য-অঞ্চলে। পথে বা সেখানে আহারাদির কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। সেখানে ও পথে আসতে আসতে তারা সবাই মরবে। এ-আদেশ পালিত হয়নি। সেনাবাহিনীতে হুকুম দেবার মত যথেষ্ট অফিসার ছিলেন না বলে, না অন্য কারণে কেউ স্পষ্টাস্পষ্টি উল্লেখ করেননি। তবে একাধিক ঐতিহাসিক বলেছেন, বাইবেল-বর্ণিত স্যামসন ('স্যামসন ও ড্যালাইলা' ছবি এদেশেও আসে) যে রকম মৃত্যুবরণ করার সময় তাঁর শত্রুদের মন্দির টেনে ভেঙে ফেলে তাদেরও মৃত্যু ঘটান, হিটলারও তেমনি ওপারে যাবার সময় কুল্লে জাতটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বার্লিনবাসীরা প্যারিজিয়ানদের মত কখনো নিজেদের মধ্যে সিভিল ওয়ার লড়েনি বলে কখনো রাস্তায় রাস্তায় পিপে, পাথর, আসবাবপত্র, ভাঙা গাড়ি, মোটর দিয়ে ঘাঁটি বা ব্যারিকেড বানাতে শেখেনি। যেগুলো বানিয়েছিল সেগুলো এতই আনাড়ি হাতে তৈরি কাঁচা যে তার বর্ণনা দিয়েছেন সুইডেন রাজ-পরিবারের কাউন্ট ফলকে বেরনাডট্টে। ইনি ব্যারিকেড বানাবার সময় বার্লিনে আসেন সুইডিশ রেড্ ক্রসের প্রতিভূ হিসাবে, তাঁর দেশবাসী বন্দীদের জন্য মুক্তির আবেদন করতে।[৮] ঐ ব্যারিকেডগুলো নিয়ে খাস বার্লিন কক্নিরা (ঢাকার কুট্টিদের মত) একে অন্যের সঙ্গে মন্তব্য বিনিময় করছিল। একজন বললে, 'এগুলো ভাঙতে রুশদের এক ঘণ্টা দু' মিনিট লাগবে।' 'কি রকম?' 'পাকা একঘণ্টা তাদের লাগবে হাসি থামাতে। আর দু' মিনিট লাগবে সেগুলো ভাঙতে।'

ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারে প্রায় ছ-সাতশ' হিটলার-দেহরক্ষী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বেঞ্চিতে মাটিতে ঘুমিয়ে অথবা সংখ্যাতীত টিনে রক্ষিত হ্যাম, বেকন, সসেজ ('রুটির উপর এত পুরু মাখন যে বলদ ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাবে') মুর্গী-

---

৮ ঐ সময়েই হিমলার প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে তাঁরই মাধ্যমে মিত্র-পক্ষের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। এসব আলোচনা ও জর্মন রাষ্ট্রের শেষ ক' মাস সম্বন্ধে তিনি যুদ্ধের পর একখানি মনোরম বই লেখেন—ইংরিজি অনুবাদের নাম The curtain falls. পরম পরিতাপের বিষয় এই সহৃদয়, বিশ্বনাগরিক কয়েক বৎসর পর প্যালেস্টাইনে ইহুদী আরবের সমঝাওতা করতে গেলে সেখানে ইহুদী আততায়ীর গুলিতে মারা যান।

রোস্ট আর বোতল বোতল ফ্রান্স থেকে লুট-করে-আনা, জর্মনির আপন উৎকৃষ্ট ওয়াইন, শ্যাম্পেন খাচ্ছে। এরা জর্মনির ঐতিহ্যগত সেনাবাহিনীর লোক নয়—তারা লড়ছে আপ্রাণ—এরা হিটলার হিমলারের আপন হাতে তৈরী এস এস, যুদ্ধে নামবার বিশেষ আগ্রহ এদের নেই। এদের দেখে বল্‌ট্‌ মনে মনে ভাবছেন, 'এরা এখানে কেন? ফ্যুরার তথা জর্মনির শত্রু বুঙ্কারের ভিতরে না বাইরে, যেখানে লড়াই হচ্ছে?' কিন্তু রান্নাঘরের খাস বালিনের ককৃনি (কুট্টি) মেয়েরা স্পষ্টভাষী। হঠাৎ কয়েকজন চিৎকার করে এদের বললে, 'হেই, হতভাগা নিষ্কর্মার দল! তোরা যদি এখখুনি বাইরে গিয়ে যুদ্ধে না নামিস তবে তোদের পরিয়ে দেব আমাদের গা থেকে মেয়েছেলেদের রান্নার সময়কার পোশাক। আর আমরা যাবো লড়তে। বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেরা প্রাণ দিচ্ছে লড়তে লড়তে, রাস্তায়—আর হামদো হামদো তাগড়ারা বসে আছে এখানে!'

হিটলার তাকিয়ে আছেন ভেংকের আশায়।

বুঙ্কারের এই পাগলদের দুরাশার ভিতর একটি লোকের মাথা পরিষ্কার ছিল—ইনি হিমলারের প্রতিনিধি --ফেগেলাইন। কিন্তু তিনি জানতেন না, যেখানে সবাই পাগল সেখানে সুস্থ-মস্তিষ্ক হওয়া পাগলামি। ইনি মোকা বুঝে এফার (যাকে দু'দিন পরে হিটলার বিয়ে করেন) বোনকে বিয়ে করে যেন হিটলার-পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন—আসলে সবাই একমত, লোকটা অপদার্থ। গোড়াতে ছিল রেস্-কোর্সের জকি। আঙুল ফুলে কলাগাছ, দম্ভভরে যাকে-তাকে অপমান করতো—ওদিকে বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্‌স্ তার এক গেলাসের ইয়ার। হিটলার-পরিবারের সম্মানিত সদস্য হয়েও পারিবারিক আত্মহত্যা করে পারিবারিক চিতানলে হিটলার-এফার সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে বৃহত্তর গৌরব সে কামনা করেনি।' সোনা-জওহর নিয়ে পালাবার সময় সে ধরা পড়লো—এই সঙ্কটের সময়ও যে হিটলার সব দিকে নজর রাখতেন সেটা সপ্রমাণ হল যখন তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন, ফেগেলাইন নেই। ধরার পর হিটলারের আদেশে তার য়ুনিফর্ম, মেডেলাদি কেড়ে নিয়ে, পদচ্যুত করে তাকে বন্দী করে রাখা হল।

২৭ এপ্রিল দিনের শেষে রাত্রে রাশানরা যেন দৈবক্ষমতায় দিব্যদৃষ্টি পেয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে হিটলারের বুঙ্কারের আশেপাশে, উপরে বোমার পর বোমা ফেলতে লাগল। বুঙ্কার-বাসীরা জড়সড় হয়ে শুনতে পাচ্ছে যেন প্রত্যেকটি কামানের বিরাট গোলা তাদেরই মাথার উপর ফাটছে। কারো মনে আর সন্দেহ রইল না, এবার যে কোনো মুহূর্তে রুশেরা সরাসরি বুঙ্কার আক্রমণ করবে।

সে রাত্রে হিটলার তাঁর অন্তরঙ্গজনকে নিয়ে মজলিসে বসলেন। স্থির হল,

প্রথম রুশসৈন্য দেখা দিতেই পাইকারি হারে সবাই আত্মহত্যা করবেন। তারপর সবাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেন, কি প্রকারে মৃতদেহগুলোও সনাক্তের বাইরে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা যায়। তারপর একে একে প্রত্যেকে ছোট্ট ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে হিটলার ও জর্মনির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন বলে শপথ নিলেন।

ব্লাফ্! ব্লাফ্! ব্লাফ্! সবসুদ্ধ দুই কিংবা তিনজন প্রতিজ্ঞা পালন করেন। আর সবচেয়ে হাস্যকর -- হিটলারের মৃত্যুর ঘণ্টা তিনেক পরেই আমিরদের পয়লা নম্বরী বরমান চার নম্বরী ক্রেব্স্কে পাঠালেন রুশদের কাছে সন্ধি-স্থাপনার্থে। সেটা বানচাল হয়ে গেলে দু'জন ছাড়া সবাই চেষ্টা করলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে, বরমান একটা ট্যাঙ্কে চড়ে—এটার ব্যবস্থা তিনি শপথ নেবার পূর্বেই করেছিলেন নিশ্চয় -- রুশ-ব্যূহ এড়িয়ে, তখনো অপরাজিত উত্তর জর্মনিতে ড্যোনিৎসের (হিটলার মৃত্যুর পূর্বে এ কেই রাষ্ট্রের প্রধান রূপে নির্বাচিত করে যান) সঙ্গে যোগ দিতে। যাঁরা অক্ষম হয়ে মার্কিনদের হাতে বন্দী হলেন তাঁরা তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করলেন মার্কিনদের সুমুখে, কে হিটলারকে কত বেশী ঘৃণা করতেন সেইটে সাড়ম্বরে বোঝাতে।

হিটলার তখনো আশা ছাড়েননি। কখনো সামনে ম্যাপ খুলে কম্পিত হস্তে রুশসৈন্য, ভেংকের সৈন্য, নবম বাহিনীর সৈন্য রঙিন বোতাম দিয়ে প্রতীক করে যুদ্ধের ব্যূহ নির্মাণ করছেন আক্রমণের পথ স্থির করছেন; কখনো বা চিৎকার করে মিলিটারী হুকুম দিচ্ছেন—যেন তিনি নিজে রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছেন। কখনো ঘর্মাক্ত হস্তে ম্যাপ নিয়ে দ্রুতপদে পাইচারি করছেন —ভেজা হাতের স্পর্শে ম্যাপখানা দ্রুত পচে যাচ্ছে— আর যাকে পান তাকেই সেই ম্যাপ দেখান , কি ভাবে, কোন্ পথে, সমরনীতির কোন কূটচালে শত্রুপক্ষকে নির্মম ঘায়েল করে, যেন এক অলৌকিক বিস্ময়ে ভেংক এসে সবাইকে এই সংকট থেকে মুক্ত স্বাধীন করবেন।

এঁদের অনেকেই ততদিনে জেনে গিয়েছেন, ভেংকের সেনাবাহিনী বলে আর কিছু নেই। যে ক'জন তখনো বেঁচে ছিল তাঁদের তিনি অনুমতি দিয়েছেন, পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়ে মার্কিনদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে—রুশদের চেয়ে মার্কিনরাই ভালো, এই তখন আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ভেংকের সত্য বিবরণ হিটলারকে বলে কে ? বলে লাভ ? কাইটেল, ইয়োডল সব জেনে শুনে হিটলারের আর্তনাদী টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রামের কোনো উত্তর দিচ্ছেন না —(নামে মাত্র) আর্মি হেড-কোয়ার্টার্স থেকে। কী উত্তর দেবেন এঁরা ?

লিঙে এ সময়ে হিটলারের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুতগতিতে পাইচারি করছেন, কখনো বা ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বদ্ধমুষ্টি দিয়ে দেয়ালে করাঘাত করছেন।' কেন? তাঁর কাছে ঘরের চারখানা দেয়াল কি কারাগারের চারখানা প্রাচীরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে?

আর পাইচারি? এটা তাঁর প্রাচীন দিনের অভ্যাস। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন? দিনের পর দিন। হিটলারের একমাত্র বন্ধু ফোটোগ্রফার হফ্‌মান লিখেছেন, 'হিটলারের প্রথমা প্রেয়সী (সকলেরই মতে এইটেই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ-গ্রেট্ লাভ—এফার প্রতি তাঁর প্রেম ছিল অন্য ধরনের) যখন আত্মহত্যা করে মারা যান, তখন তিনি নিচের তলা থেকে হিটলারের পদধ্বনি শুনতে পান তিন দিন তিন রাত ধরে—মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে। এই তিন দিন তিন রাত তিনি জলস্পর্শ করেননি। প্রণয়িনীর গোর হয়ে গিয়েছে খবর পেয়ে হিটলার পাইচারি বন্ধ করে সোজা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গিয়ে পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।'[১]

আর কখনো কখনো টেবিলের উপর কনুই রেখে অনেকক্ষণ ধরে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সমুখপানে।

ভেংকের জন্য প্রতীক্ষা, তাঁর উত্তেজনা ও জালবদ্ধ পশুর মত ছটফটানি তার চরমে পৌঁছল ২৮ এপ্রিল। রাশানরা তখন বার্লিন নগরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে লড়াই করে করে হিটলারের বাসভবনের দিকে এগিয়ে আসছে। বার্লিনের কমাণ্ডাণ্ট হিটলারকে বলে গেছেন, দু দিন, জোর তিন দিনের ভিতর রুশরা বুঙ্কারে এসে পৌঁছবে। কিন্তু ভেংক কোথায়? কি ঘটে থাকতে পারে?

নিশ্চয়ই আবার বিশ্বাসঘাতকতা! বার্লিন জয় করার মত শক্তির শতাংশের একাংশও যে ভেংকের নেই সে-কথা কে বিশ্বাস করে? ২৮শে সন্ধ্যায় বরমান সেই সুদূর দক্ষিণ জর্মনির ম্যুনিকে তাঁর মিত্র এডমিরাল পুট্‌কামারকে টেলিগ্রাম করলেন, 'সৈন্যদের আদেশ ও অনুরোধ করে যে সব কর্তৃপক্ষ তাদের এখানে আমাদের উদ্ধার করার জন্য পাঠাতে পারতেন, তাঁরা সেটা না করে নীরব। বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বস্ততার স্থান অধিকার করেছে। আমরা এখানেই থাকবো। ফ্যুরার-ভবন খণ্ড-বিখণ্ড।'

এক ঘণ্টা পর, বহু প্রতীক্ষার পর বাইরের জগৎ থেকে পাকা খবর এল। হিটলারকে কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে হাইনরিষ হিমলার—গ্যোরিঙের পদচ্যুতির

১ হাইনরিষ হফ্‌মান, হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড

পর এখন যিনি জর্মনির দ্বিতীয় ব্যক্তি—মিত্রশক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছেন, পূর্বোল্লিখিত রেড্‌ক্রশের নেতা সুইড্ কাউন্ট বের্নাডট্টের মাধ্যমে। প্রস্তাবটি গোপনেই করা হয়েছিল কিন্তু কি করে কে জানে সেটা গুপ্তপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন এক বেতার-কেন্দ্র সেটা প্রচার করেছে। হিটলারের বার্তা সরবরাহ বিভাগের কর্মচারী বেতারে সেটা শুনে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে স্বয়ং এসেছেন হিটলারকে মুখোমুখি খবরটা দিতে।

কামানের গোলা, বোমারুর বোমা তখন ডাল-ভাত। কাজেই ঘরের ভিতর বোমা ফাটলেও হিটলার অতখানি বিচলিত হতেন না। 'সেই বিশ্বাসী হাইনরিষ, যে কি না তার খাস সৈন্যদলের বেল্টে খোদাবার আদেশ দিয়েছিল—TREUE—বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি, নেমকহালালী!—সে কুকুর এখন ঠাকুরের আসনে বসতে চায়, তাঁর প্রতি নেমকহারামী করে?' এই একমাত্র নাৎসি নেতা যাঁর প্রভুত্বে অবিচল ভক্তি সম্বন্ধে কারো মনে কখনো সন্দেহ হয়নি। আর এ-কথা সকলেই জানতেন, যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনই হিটলার মার্শাল ল প্রচার করেছিলেন, 'তাঁর কোনো কর্মচারী—তা তিনি যত উচ্চপদেরই হোন না কেন—যদি কোনো সন্ধির আলোচনা করেন তবে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে—এ বাবদে কোনো করুণা দেখানো হবে না।'

হিটলারের মুখ থেকে নাকি সর্বশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছিল।

স্টাইনারের আক্রমণ কেন হয়ে ওঠেনি, ভেংক কেন আসছে না—এসব সমস্যা হিটলারের কাছে সরল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই পিছনে রয়েছে হিমলারের বিশ্বাস-ঘাতকতা। অবশ্য ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন এ সন্দেহ সত্য নয়। হিমলার শেষ মুহূর্তে সন্ধির প্রস্তাব এনে শুধু আপন প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন—অন্য বহু বহু নাৎসি নেতার মত। তাঁরা গোপনে সুইস ও দক্ষিণ আমেরিকার জর্মন-বহুল নাৎসিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাধিক রাষ্ট্রে বিস্তর অর্থ জমা রেখেছিলেন ও জাল নামে পাশপোর্টও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। হিমলারকে জনসাধারণ ভালো করেই চিনতো; তাঁর পক্ষে এ পন্থা সম্ভবপর ছিল না।[১০]

১০ আখেরে তিনি সেই চেষ্টাই করেছিলেন। ছদ্মবেশে মিত্রশক্তির ঘাঁটি পেরবার সময় তিনি বন্দী হন। দেহতল্লাসির সময় মুখে কিছু আছে কি না দেখবার জন্য তাঁকে মুখ খুলতে বললে তখন তিনি বুঝলেন এই তাঁর শেষ সুযোগ। ডাক্তার মুখে হাত ঢোকাবার পূর্বেই তিনি দাঁত ও মাড়ির মধ্যে লুকানো ক্যাপস্যুলে কামড় দিলেন। আবরণ ভেঙে বিষ বেরিয়ে এল; কয়েক মিনিটের

হিমলারের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র পর হিটলারের সর্বশেষ কর্ম সম্বন্ধে মনস্থির করতে আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না। প্রথমেই হিমলারের বিশ্বাসী নায়েব, প্রতিভু, লিয়েজোঁ অফিসার ফেগেলাইনকে বন্দিশালা থেকে বের করে নিয়ে এসে সওয়াল করা হল। এই সব বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে তিনি কতখানি ওকীব-হাল ছিলেন? ফেগেলাইন কি উত্তর দিয়েছিলেন তা আর জানবার উপায় নেই। প্রশ্নকর্তারা মৃত নয় নিরুদ্দেশ। হিটলারের যুক্তি, ফেগেলাইন যদি না জানবে তবে পালাবার চেষ্টা করলো কেন? বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কি? হুকুম দিলেন, বুঙ্কারের বাইরের বাগানে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে। বল্‌ট্‌ তাঁর বইয়ে বলেছেন, 'এফা তাঁর ভগ্নিপতিকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করেছিলেন কি না আমরা তার কোনো খবর পেলুম না, হয়তো স্বামীর উপর তাঁর কোনো প্রভাবই ছিল না, কিংবা হয়তো তিনি তাঁর স্বামীর মতই ধর্মান্ধের মত বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড—তা সে যে-ই হোন।' আমাদের মনে হয় দুটোই। ঐ সময় শ্রীমতী হানা রাইট্‌শ বুঙ্কারে ছিলেন। ইনি বিশ্বের অন্যতম নামজাদা পাইলট (পরবর্তীকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে এঁর হৃদ্যতা হয় এবং তাঁর অতিথি হয়ে কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন)। ইনি বলছেন, এফা নাকি ঐ সময় বেদনাভরে এক হাত দিয়ে আরেক হতে মোচড়াতে মোচড়াতে যাকে পেতেন তাকেই বলতেন, 'হায় বেচারা, বেচারা আডল্‌ফ্‌! সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে, সবাই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দশ হাজার লোক মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু জর্মনি যেন আডল্‌ফ্‌কে না হারায়!'

রুশরা বুঙ্কার থেকে আর মাত্র হাজার গজ দূরে।

২৮।২৯ এপ্রিলের রাত। ফেগেলাইনের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হিটলার অন্যান্য কর্তব্যের দিকে মন দিলেন। যে রমণী তাঁকে ১৪।১৫ বৎসর ধরে ভালোবেসেছেন, ভালোবাসার প্রথম দিকে একবার নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করা চেষ্টাতে গুরুতর-রূপে জখম হন, হিটলার যাঁকে বিশ্বাস করতেন সব চেয়ে বেশী (হিটলারও বলতেন, তিনি দুজনকে অবিচারে বিশ্বাস করেন। এফা ও তাঁর আলসেশিয়ান ব্লণ্ডীকে), সঙ্কট ঘনিয়ে এলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হিটলার বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে রাজী হননি, এবং যিনি দৃঢ়কণ্ঠে একাধিক-

ভিতরই ভবলীলা সম্বরণ করলেন। গ্যোরিঙও এই পদ্ধতিতেই জেলের ভিতর আত্মহত্যা করেন। তাঁর দেহ ও মুখ বহুবার সার্চ করা হয়, কিন্তু তিনি যে কোথায় ক্যাপস্যুলটি দিনের পর দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা আজও রহস্য।

জনকে একাধিকবার বলেছেন, 'আডল্‌ফ্‌ আর আমার জীবনমরণ একসূত্রে গাঁথা', সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে যাঁকে হিটলার অল্প লোকের সামনেই বেরুতে দিতেন, কোথাও যেতে হলে ভিন্ন ভিন্ন মোটরে যেতেন, সভাস্থলে এফা দর্শকদের সঙ্গে বসে হিটলারের বক্তৃতা শুনতেন—সেই এফা এত বৎসর পর তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার এবং আসন পেলেন। সে রাত্রে হিটলার তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা ডিকটেটরদের প্রিয়া, রক্ষিতা, উপপত্নী, পত্নীরা যে রকম রোমান্টিকভাবে তাঁদের বল্লভদের জীবন প্রভাবান্বিত করেন, পর্দার সামনে কিংবা আড়ালে বহুলোকের জীবনমরণ নিয়ে খেলা করেন—চক্রান্ত, বিষপ্রয়োগ অনেক কিছু করে থাকেন,—এফার সেদিকে কোনোই আকর্ষণ ছিল না। কর্মব্যস্ত হিটলার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন কমই। বিশেষ করে যুদ্ধের পাঁচ বৎসর তিনি ভিন্ন ভিন্ন আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের সন্নিধানে থাকতে বাধ্য হতেন বলে প্রোষিতভর্তৃকা এফা দূর আল্‌প্‌সের উপর হিটলারের নির্জন নিরানন্দ বের্গহফ ভবনে একা একা দিনের পর দিন তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতেন। চাকর-বাকররা বলত এ যেন 'সোনার খাঁচার বন্ধ পাখী'। তারপর হঠাৎ একদিন বল্লভ এসে উপস্থিত হতেন অতিশয় অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বাড়ি গমগম করে উঠতো। ডিনার, তারপর ফিল্ম, তারপর সঙ্গীত, রাত দুটোয় শেষ পার্টি—হিটলার টিটোটেলার, খেতেন হাল্কা চা, কাপের পর কাপ, অন্য সবাই শ্যাম্পেন। হিটলার ঘুম থেকে উঠতেন দেরিতে। খেয়ে জিরিয়ে এফা, ব্লণ্ডী, অনুচরদের নিয়ে নির্জন পথে বেড়াতে বেরুতেন। পথের শেষপ্রান্তে একটি বিশ্রামাগার। সেখানে চা, কেক্‌, ক্রীম-বান খাওয়া হত। হিটলার প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতো। প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে সবাই বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে তাঁর স্থান ছিল না। হিটলারের মৃত্যুর পূর্বে ১০ লক্ষের ভিতর একজনও জানতো না, হিটলারের কোনো বান্ধবী আছেন।[১১]

---

১১ এফা ব্রাউন (হিটলার) সম্বন্ধে কৌতূহলীজন সর্বোত্তম খবর পাবেন পূর্বোল্লিখিত হফ্‌মানের বইয়ে। এঁর ফোটো-ল্যাবরেটরিতেই এফা কাজ করার সময় হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হফ্‌মান তাঁর সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেন। হিটলারের ভ্যালে লিঙে উভয়েরই কামরা-বিছানা সাফসুৎরো করতেন, এবং একদিন দৈবাৎ তিনি দুজনাকে এমন অবস্থায় পান যে, লিঙের চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। লিঙেই এঁদের অন্তরঙ্গতার বিস্তরতম খবর দিয়েছেন। এফাও লিঙেকে খুব বিশ্বাস করতেন ও তাঁর মনের কথা খুলে বলতেন। আসন্ন

এই দুর্দিনে বিয়ের রেজেষ্ট্রি অফিসার যোগাড় করা সহজ হয়নি। শেষটায় একজন এলেন যাঁকে বুঙ্কারের কেউই চেনে না। গ্যোবেল্‌স্ এঁকে যোগাড় করে এনেছেন; লিঙের মতে ইনিই নাকি একদা গ্যোবেল্‌সের বিয়ে সম্পন্ন করেন। এমার্জেন্সি বা বিন্‌নোটিসের বিয়ে বলে বহ্বাড়ম্বর আর বাহ্যাড়ম্বর বাদ দেওয়া হল। দুই পক্ষ মৌখিক—সাধারণতঃ হিটলার-জর্মনিতে সার্টিফিকেট দরকার হত—শপথ দিলেন, উভয়েই অবিমিশ্র 'আর্যরক্ত' ধরেন, ও তাঁদের বংশগত কোনো ব্যাধি নেই। তারপর উভয়ে রেজিস্ট্রিতে সই করলেন। কনে নাম সই করার সময় 'এফা' লিখে 'ব্রাউন' লেখবার জন্যে 'বি' হরফ লিখে ফেলেছিলেন; তাঁকে ঠেকানো হলো, তিনি 'বি' কেটে 'হিটলার' ও 'ব্রাউন নামে জন্ম' (nee) লিখলেন। গ্যোবেলস্ ও বরমান সাক্ষী হলেন।[১২] রাত তখন একটা বেজে গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে।

বিয়ের পর হিটলারের ঘরে পার্টি বসলো। শ্যাম্পেন এল। বহু বৎসর পূর্বে গ্যোবেল্‌স্ যখন বিয়ে করেন তখন হিটলার সে বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি ও হিটলার সেই অবিমিশ্র আনন্দের দিনের সঙ্গে অদ্যকার আনন্দের উপর করাল ছায়ার তুলনা করে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন। জর্মন ভাষায় একটি সংহিটে আছে, 'চোখের জল নিয়ে আমি নাচছি'—এ যেন তাই। হিটলার আবার তাঁর আত্মহত্যার কথা তুললেন। বললেন, তাঁর জীবনাদর্শ (ভেল্টআনশাউউঙ) নাৎসিবাদ খতম হয়ে গেল; এর পুনর্জন্ম আর কখনো হবে না। তাঁর সর্বোত্তম বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই তিনি এসব থেকে নিষ্কৃতির আরাম পাবেন।

পার্টি চালু রেখে তিনি পাশের ঘরে তাঁর স্টেনো-সেক্রেটারি ফ্রাউ য়ুঙেকে নিয়ে তাঁর দুখানা উইল মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন। প্রথম উইলখানা রাজনৈতিক, দ্বিতীয়খানা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। পাঠক মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি লিঙের কাছে যে সব করুণ কথা বলেন সেগুলোও পড়ার যোগ্য।…হিটলারের চিকিৎসক মরেলও এফা সম্বন্ধে তাঁর জবানবন্দিতে কিছু কিছু বলেছেন।

১২ কয়েক মাস পূর্বে, অর্থাৎ এ-বিয়ের কুড়ি বৎসর পর রুশদের প্রধান সেনাপতি—যিনি বার্লিন জয় করেন—ঘোষণা করেন যে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে আছে এই দলিলখানা। রুশরাই সর্বপ্রথম বুঙ্কার দখল করেছিল বলে বিয়ের রেজিস্টারখানা তারাই হস্তগত করে।

হিটলার সম্বন্ধে যে কোনো বইয়ে এ দুখানার কপি পাবেন। আমি সংক্ষেপে সারি। সর্বপ্রথমেই তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, 'একথা মিথ্যা যে আমি বা জর্মনির আর কেউ এ যুদ্ধ চেয়েছিল। এটা ইহুদি এবং যারা তাদের জন্য কাজ করে তাদের কীর্তি...এখন আমার সৈন্যবল আর নেই বলে রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করবো। আমি শত্রুর হাতে ধরা দেব না —ইহুদিরা যাতে করে আমাকে নিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত জনতার জন্য একটা নয়া তামাশা সৃষ্টি না করতে পারে।...তারপর তিনি গ্যোরিঙ ও হিমলারকে নাৎসি পার্টি থেকে ও সর্ব আসন থেকে বিচ্যুত করে বললেন, 'এঁরা যে শক্তিলোভে শত্রুর সঙ্গে গোপন সন্ধি-প্রস্তাব করে শুধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাই নয়, জর্মনি ও তার নাগরিকদের মুখে অমোচনীয় কলঙ্ককালিমা মাখিয়েছেন।' হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল 'যুদ্ধের সাধন কিংবা জীবনপাতন'— সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করাই বেইজ্জতির চূড়ান্ত। সর্বশেষে তিনি জর্মনদের কঠোরতম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের রক্তে যেন সংমিশ্রণ না হয় তার জন্যে, এবং বিশ্বে বিষসঞ্চারণকারী আন্তর্জাতিক ইহুদিদের নির্দয়ভাবে প্রতিরোধ করার জন্য দিব্য দিলেন।...এই উইলেই তিনি এডমিরাল ড্যোনিৎসকে দেশের নেতৃত্ব দিলেন, এবং তাঁর জন্যে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করে গেলেন।[১৩]

তাঁর ব্যক্তিগত হ্রস্ব উইলে তিনি এফাকে বিবাহ করার পটভূমি ও কারণ দর্শালেন। তারপর বললেন, 'তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছেন।' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নাৎসি পার্টিকে দান করলেন, পার্টির অস্তিত্ব লোপ পেলে জর্মন রাষ্ট্রকে, এবং সেও যদি লোপ পায় তাহলে সে বিষয়ে তাঁর আর কোনো নির্দেশ নেই। তাঁর বিরাট চিত্রসঞ্চয় তিনি তাঁর জন্মভূমির লিন্ৎস্ শহরের যাদুঘর নির্মাণের জন্য দিলেন। দরকার হলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আত্মজন, তাঁর সহকর্মী সেক্রেটারি ইত্যাদি যেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত জীবনযাত্রা করতে পারেন, তার আর্থিক ব্যবস্থাও তিনি উইলে রাখলেন।...উইল লেখা শেষ হলে ভোর চারটায় তিনি শুতে গেলেন। হায় রে বাসরশয্যা!

গ্যোবেল্‌স্‌ও তাঁর উইল লিখলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য: ফ্যুরার আমাকে আদেশ দিয়েছেন, নূতন মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে, কিন্তু জীবনে এই প্রথমবার (এবং ইচ্ছে করলে তিনি 'শেষবারের' মতোও লিখতে পারতেন; কেন করলেন না, বোঝা ভার) আমি ফ্যুরারের আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করছি।

---

১৩ ড্যোনিৎস এঁদের অধিকাংশকেই গ্রহণ করেননি

আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণসহ ফ্যুরারের পার্শ্বেই জীবন শেষ করবো। এরপর আছে 'সর্বব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতা' ইত্যাদি ইত্যাদির কথা।

সেই দিন ২৯শে এপ্রিল। দুপুরের দিকে চারজন বিশ্বস্ত লোক মারফৎ তিনখানা উইল তিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। যে করেই হোক তারা যেন রুশব্যূহ ভেদ করে, কিংবা ব্যূহে কোনো ছিদ্র থাকলে তাই দিলে ড্যোনিৎসের কাছে পৌছয়, নইলে ব্রিটিশ বা মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলে।

দুপুরবেলা মন্ত্রণাসভা বসলো। সেখানে প্রধান খবর, রাশানরা এগিয়ে এসেছে এবং ভেংকের কোনোই খবর নেই। তিনজন অফিসার—এঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের পূর্বোল্লিখিত বল্‌ট্—বললেন, তাঁরা ভেংকের সন্ধানে ও তাঁকে বার্লিন পানে ধাওয়া করবার জন্য ফ্যুরারের আদেশ পৌছে দিতে প্রস্তুত আছেন। হিটলার অনুমতি দিলেন। রাত্রের মন্ত্রণাসভার পর আরেকজন চলে যাবার অনুমতি পেলেন।

রাত্রের মন্ত্রণাসভায় বার্লিনের কমাণ্ডাণ্ট জানালেন, রাশানরা চতুর্দিক থেকেই শহরের ভিতরে এগিয়ে এসেছে। ১লা মে তারা বুঙ্কার (এবং রাষ্ট্রভবনে) পৌছে যাবে। বার্লিনের ভিতর যে সব জর্মন সৈন্যদল আটকা পড়েছে তারা এই বেলা যদি রুশব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে না যায়, তবে আর কখনো পারবে না। হিটলার বললেন, দু'একজনের পক্ষে কোনোগতিকে বেরোনো সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু এই সব রণক্লান্ত ভাঙাচোরা হাতিয়ারে সজ্জিত—তারও আবার গুলি-বারুদের অভাব—সৈন্যরা দল বেঁধে, তা সে যতই ছোট দল হোক না কেন, কখনই বেরুতে পারবে না। ব্যস্, হয়ে গেল; হিটলারের অভিমতই সর্বশেষ অভিমত। সৈন্যদের কপালে নিরর্থক মৃত্যুর লাঞ্ছন অঙ্কিত হয়ে গেল।

এই সময়ে হিটলার তাঁর সর্বশেষ টেলিগ্রাম পাঠান—জেনারেল ইয়োডল্‌কে। আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেভার রোপারের মত অতুলনীয় ঐতিহাসিক এই শেষ টেলিগ্রামের উল্লেখ করেননি। বল্‌ট্ তো তার আগেই বুঙ্কার ত্যাগ করেছেন—তাঁর কথা ওঠে না। হিটলারের কোনো প্রামাণিক জীবনীতেও আমি এর উল্লেখ পাইনি। শুধু আস্মান্ ও অন্য এক নৌ-সেনাপতি এর উল্লেখ করেছেন; আস্মান্ তাঁর ইতিহাসে টেলিগ্রামখানার ফটোও দিয়েছেন। তাতে হিটলারের সেই আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন, 'ভেংক কোথায়, নবম বাহিনীর পুরোভাগ কোন্ কোন স্থলে পৌচেছে, ইত্যাদি; আমি এই মুহূর্তেই উত্তর চাই।'

সেইদিনই খবর পৌছল, হিটলার-সখা ডিক্টেটর মুসোলিনীকে মিলানের বিদ্রোহী দল তাঁকে তাঁর উপপত্নীর সঙ্গে ইতালী ছেড়ে সুইটজারল্যাণ্ডে পলায়নের

সময় ধরে দুজনকে খতম করে শহরের মাঝখানের বাজারে পায়ে পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে—যাতে করে উত্তেজিত প্রতিহিংসোন্মত্ত জনগণ দুজনাকে পেটাতে ও পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে। এ সংবাদ হিটলারের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল জানা যায়নি। তবে বহু ডিকটেটরদের শেষ পরিণতি হিটলারের কাছে কোনো নতুন খবর নয়। তাই উইল লেখার সময় ও তার পূর্বেও হিটলার আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর ও একার দেহ যেন পুড়িয়ে এমনভাবে ভস্ম করে দেওয়া হয় যে ইহুদিরা পাগলা জনতাকে তামাশা দেখাবার জন্য কোনো কিছু না পায়। বুঙ্কারের একাধিক বাসিন্দা হুবহু একই ভাষায় এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২৯ তারিখ অপরাহ্নে হিটলারের আদেশে তাঁর প্যারা অ্যালসেশিয়ান কুকুর ব্লণ্ডীকে গুলি করে মারা হল। সেইদিনই তিনি তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে চরম সঙ্কটে ব্যবহারের জন্য বিষের ক্যাপসুল দিতে দিতে দুঃখ করে বললেন যে, শেষ বিদায়কালে তিনি এর চাইতে ভালো কোনো উপহার দিতে পারলেন না।

সেই রাত্রে হিটলার ভিন্ন ভিন্ন বুঙ্কারবাসীদের খবর পাঠালেন, তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চান,—তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন। রাত আড়াইটার সময় (৩০ এপ্রিল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে) প্রায় কুড়ি জন অফিসার ও মহিলা সারি বেঁধে করিডরে দাঁড়ালেন। বরমান সহ হিটলার বেরিয়ে এসে তাঁদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। হিটলারের চোখের উপর যেন ক্ষীণ বাষ্পের হালকা পরশ লেগে আছে। এ বিষয় এবং তাঁর মৃত্যু, শবদাহ ইত্যাদি অনেকেই সবিস্তর লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকার 'আমি হিটলারকে পুড়িয়েছিলুম' এবং লিঙের কাহিনী। হিটলারের অন্যতম মহিলা সেক্রেটারি ছদ্মনামে 'হিটলার প্রিভাট' অর্থাৎ হিটলারের প্রাইভেট জীবন নিয়ে বই লেখেন। সর্বশেষে হিটলারের নরদানব অ্যাডজুটান্ট গ্যুন্‌শের বিবৃতি—রুশ কারাগারে দশ বছর কাটানোর পর জর্মনি ফিরে এসে তিনি বিবৃতি দেন। কিন্তু ট্রেভার রোপার সকলের জবানবন্দি ও বিবৃতি যাচাই করে লিখেছেন বলে তাঁকে অনুসরণ করাই প্রশস্ত। এস্থলে বলে রাখা ভালো হিটলার সপ্তাহখানেক পূর্বে তাঁর চারজন মহিলা সেক্রেটারিকেই বুঙ্কার ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাবার প্রস্তাব করেন। দুজন চলে যান, দুজন থাকেন। নিরামিষাশী হিটলারের জন্য রান্না করতেন ফ্রলাইন মানৎস্লিয়ালী। তিনিও থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। লিঙেকেও যাওয়া না-যাওয়া তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে

দিয়েছিলেন—তিনি যাননি। ফলে রাশাতে দশ বৎসর কারাভোগ করতে হয়েছিল।

অবধারিত আশু বিপদের সামনে মানুষ সব সময় ভেঙে পড়ে না। জাপানী যখন সিঙ্গাপুর দখল করে তখন সব-কিছু জেনেশুনেই সিঙ্গাপুর-বাসিন্দারা বিশেষ করে ইংরেজগুষ্টি নৃত্য-মদে মত্ত ছিলেন। এস্থলেও তাই হল। হিটলারের বিদায় নেওয়ার পরই সবাই বুঝে গেল, এই শেষ, আর আশানিরাশার কিছু নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুঙ্কারে (হিটলারেরটা প্রথম) তখন আরম্ভ হল জালা জালা অত্যুৎকৃষ্ট মদ্যপান ও গ্রামোফোন যোগে নৃত্য। 'হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়'—এস্থলে 'দু'দিন' শব্দার্থে। ঠিক দু'দিন বাদেই রুশরা বুঙ্কার দখল করে।

৩০ এপ্রিল—শেষ দিন

সকালবেলা জেনারেলরা বার্লিনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের খবর নিয়ে মন্ত্রণাসভায় এলেন। অবস্থা আগের চেয়ে সামান্য একটু ভালো, কিন্তু হরেদরে সেই পুরনো কাহিনী—জর্মনরা যদি অসীম বিক্রমে কোনো এক অংশে একটুখানি এগোয় তবে রুশরা আর পাঁচটা দুর্বল জায়গায় তারও বেশী এগিয়ে আসে।

হিটলার আগের রাত্রে যে শেষ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তার উত্তর আসেনি, আর বরমান হিটলারের অনুমতিতে বিনানুমতিতে গণ্ডায় গণ্ডায় যে-সব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তারও কোনো উত্তর নেই।

দুপুরবেলার মন্ত্রণাসভা হিটলারের জীবনের শেষ সভা। এবং সে-সভায় যে খবর সব এলো সে-রকম দুঃসংবাদ তিনি জীবনে আর কখনো শোনেননি (এবং শুনতেও হবে না)। রাষ্ট্রভবন থেকে উত্তরে বেরবার পথে শ্প্রে খাল। তার ভাইডেনডামার ব্রিজের কাছে রুশরা এসে গেছে (এই পোলের উপর দিয়েই বরমান এবং কয়েকজন পরের দিন বার্লিন থেকে বেরুনোর চেষ্টা করেছিলেন) —অর্থাৎ উত্তরের পথও বন্ধ হল। এবং রাষ্ট্রভবনের এক কোণ যে ফস্ স্ট্রীটে এসে ঠেকেছে তার অন্য প্রান্তের টানেলের কিছুটা রুশরা দখল করে ফেলেছে। নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তে হিটলার সঞ্জয়-বার্তা শুনে গেলেন।

দুটোর সময় হিটলার লাঞ্চ খেতে বসলেন। এফা আসেননি।

তিনি যে মানসিক চঞ্চলতা ও উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন সে-কথা লিখে বলেছেন। ট্রেভার রোপার ঐতিহাসিক। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে তাঁর কারবার কম—বিশেষ করে এফা যখন ইতিহাসে কোনো অংশ নেননি, তখন তিনি যে তাঁকে কিঞ্চিৎ অবহেলা করবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু লিখে

ভ্যালে। তিনি তাঁর বিবৃতিতে যে এফার জন্য একটু বেশী স্থান দিয়েছেন সেটা কিছু বিস্ময়জনক নয়। লিঙে বলেছেন, ঐ শেষের দিনেও তিনি লিঙেকে অনুরোধ করেন, হিটলারকে বুঙ্কার ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা দিতে। এস্থলে অন্য আরেকটি ব্যাপারে ট্রেভার রোপারের সঙ্গে লিঙের কাহিনী মেলে না। ট্রেভার রোপারের মতে গ্যোবেল্‌স্ আগাগোড়া হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ না করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লিঙের বিবরণী থেকে জানা যায়, গোড়ার দিকে না হোক অন্তত শেষের দিকে তিনি পর্যন্ত লিঙেকে এফারই মত অনুরোধ জানান, লিঙে যেন হিটলারকে বার্লিন ত্যাগ করার কথা বোঝান। লিঙে নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তিনি ফ্যুরারের মন্ত্রী ও নিত্যালাপী হয়েও যে কর্ম সমাধান করতে পারেননি, সামান্য লিঙে সেটা করবেন কি প্রকারে?

লাঞ্চের পর হিটলার যখন বিশ্রাম করছেন তখন ফ্রাউ (মিসেস) গ্যোবেল্‌স্ লিঙের হাতে একখানা চিরকুট দেন হিটলারের জন্য। শেষবারের মত একবার দেখা করে যেতে। হিটলার প্রথমটায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করে পরে সেদিক পানে চললেন। সিঁড়িতে গ্যোবেল্‌সের সঙ্গে দেখা। তিনি হিটলারকে মত পরিবর্তন করতে বললেন। হিটলার অনিচ্ছা জানিয়ে আপন বুঙ্কারে ফিরে এলেন।

এ ঘটনার উল্লেখ আর কেউ করেননি, কারণ লিঙে ভিন্ন আর সবাই ওপারে। ইতিমধ্যে হিটলারের অন্তরতম অন্তরঙ্গ জনা পনেরো বুঙ্কারের করিডরে দাঁড়িয়ে আছেন। হিটলার ও ফ্রাউ হিটলার (এফা) তাঁদের সঙ্গে নীরবে একে একে করমর্দন করলেন। এই শেষ বিদায়। ফ্রাউ গ্যোবেল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন না। সন্তান ক'টির আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন।

বুঙ্কারে সৈন্যসামন্ত এবং তজ্জনিত রূঢ় কঠোর বাতাবরণের ভিতর এসব সুন্দর মধুর বাচ্চাদের দেখাতো যেন অন্য কোনো জগতের; কোন বেহেশ্‌তের ফিরিশতা দেবদূতের মত। তারা এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করতো। এক বুঙ্কার থেকে অন্য বুঙ্কার যেতে হলে যেখানে দেশের প্রধান সেনাপতি কাইটেলকেও পাস দেখাতে হত সেখানেও তাদের অবাধ গতি। যে কদিন পাইলট নারী হানা রাইট্‌শ্ বুঙ্কারে ছিলেন তারা তাঁর কাছ থেকে কোরাস্ গান শিখেছে। তাদের কি ভয়? ঐ তো কাকা আডল্‌ফ্ রয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের মত (ঈশ্বর জাতীয় 'কুসংস্কার' গ্যোবেল্‌স্ দম্পতি হয়ত বাচ্চাদের জন্য ব্যান করে দিয়েছিলেন! সর্বশক্তিমান; এই তো তারা জন্মের প্রথম দিন থেকে জানে। কাকা হিটলারের অনুকরণে তাদের প্রত্যেকের নাম 'এচ' অক্ষর দিয়ে আরম্ভ।

শেষ বিদায় নেবার পর একমাত্র তাঁরাই করিডরে রইলেন যাঁরা হিটলারের

শেষ-কৃত্য সমাধান করবেন, অন্যদের বিদায় দেওয়া হল।

হিটলার ও এফা তারপর তাঁদের খাস কামরাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই,—লিঙে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন—তিনি হঠাৎ কি এক অজানা ভয়ে করিডর দিয়ে ছুটে পালালেন। অল্পক্ষণের ভিতরই কিন্তু তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হল। তিনি ধীর পদক্ষেপে ফিরে এলেন।

এর পরের ঘটনা দিয়ে, আমরা এ-প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি। মাত্র একটি গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল, এবং লিঙে বলছেন পোড়া বারুদের কটু গন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে ভেসে এল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে লিঙে, গ্যুন্‌শে, বরমান, গ্যোবেল্‌স্ ইত্যাদি ঘরে ঢুকলেন এবং যা দেখতে পেলেন তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

মৃতদেহ দুটি পোড়াবার জন্য দশ লিটার পেট্রল আনতে সেদিন সকালেই হিটলার তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট গ্যুন্‌শেকে আদেশ দিয়েছিলেন। গ্যুন্‌শে হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকাকে সে আদেশ জানালে তিনি বলেন, অতখানি পেট্রল যোগাড় করা সম্ভব হবে না (রুমানিয়া রাশান হাতে চলে যাওয়ার পর বার্লিন আর কোন পেট্রল পায়নি)। অবশেষে পেতে হবেই হবে আদেশ এলে কেম্পকা অতি কষ্টে ১৮০ লিটার পেট্রল টিনে করে বুঙ্কারের বাইরের বাগানে পাঠিয়েছিলেন। শেষ রেস্ত খতম না হওয়া পর্যন্ত হিটলার যে জুয়োখেলা বন্ধ করেননি, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল থেকেই অন্যান্য বুঙ্কার থেকে হিটলার-বুঙ্কারে আসার সব ক'টা পথ তালা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—যাতে করে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রয়োজনীয় জন ভিন্ন অন্য কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পায়।

হিটলারের আপন সৈন্যবাহিনী এস. এস. সৈন্য ও লিঙে হিটলারের দেহ কম্বলে জড়িয়ে নিলেন—রক্তমাখা মাথা মুখ ঢাকবার জন্য। পরিচিত কালো পাতলুন পরা পা দুখানা দেখে করিডরে আর সবাই অনায়াসে ইনি যে হিটলার সেকথা বুঝতে পারলেন। চার দফে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এরা পঞ্চাশ ফুট উপরে খোলা বাগানে বেরুলেন। ইতিমধ্যে বরমান এফার দেহ তুলে নিলেন। তিনি বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে তাঁর দেহে কোনো রক্তের দাগ ছিল না, এবং দেহটিকে ঢাকবার প্রয়োজন হয়নি। বাগানে এনে তাঁর দেহ হিটলারের দেহের পাশে শোয়ানো হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটি 'দুর্ঘটনা' ঘটে গেল। মাটির উপরে বুঙ্কারের যে প্রহরা মিনার ছিল সেখান থেকে প্রহরারত মান্‌সফেল্ট নিচে সন্দেহজনক দ্রুত চলাফেরা;

দরজা খোলা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। প্রহরীর কর্তব্য অনুযায়ী অনুসন্ধান করতে নীচে এসে বুঙ্কারের সামনে সে খেল ধাক্কা শবযাত্রার সঙ্গে। এফাকে সে পরিষ্কার চিনতে পারলো এবং কম্বলে ঢাকা শরীর থেকে কালো পাতলুন পরা দুখানা পা ঝুলছে দেখতে পেল। সঙ্গে বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ (পূর্বের সেই পাঁড়-মাতাল), দানব সাইজের অ্যাডজুটান্ট গুন্‌শে, ভ্যালে লিঙে। গুন্‌শে হুঙ্কার দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্টকে সরে যেতে বললো। আদর্শনীয় চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা হয়ে গেল মান্‌স্‌ফেল্টের।

বরমান সম্প্রদায় সব আটখাট বেঁধে ভেবেছিলেন 'সাবধানের মার নেই'।

সপ্রমাণ হল 'মারেরও সাবধান নেই'!

অনুষ্ঠান আবার চললো।

বুঙ্কারের দরজার উপর পর্চ ছিল। দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে দুটি লাশ মাটিতে শুইয়ে তার উপর পেট্রল ঢালা হল। এমন সময় রাশান কামানের বোমা এসে পড়তে লাগল বলে শবযাত্রীরা পর্চের তলায় আশ্রয় নিলেন। ট্রেভার রোপারের মত গুন্‌শে একখানা ন্যাকড়াতে পেট্রল ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সেটা লাশদের উপর ছুঁড়ে ফেললেন। লিঙে বললেন, তিনি খবরের কাগজে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠে লাশ দুটো ঢেকে ফেললো। পর্চে দাঁড়িয়ে শবযাত্রীদল হিটলারকে শেষ মিলিটারি সেল্যুট দিলেন। তারপর তাঁরা বুঙ্কারের ভিতরে ফিরে গেলেন।

কারনাও নামক আরেকজন সাধারণ প্রহরীরও এসব গোপন অনুষ্ঠান দেখবার কথা নয়। বুঙ্কারের ভিতরকার দরজা তালাবন্ধ দেখে সেও বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আসবার চেষ্টা করে মোড় নিতেই আশ্চর্য হল। হঠাৎ সামনে দেখে দুটি মৃতদেহ পাশাপাশি শুয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ধপ করে জ্বলে উঠলো—বুঙ্কার মিনারের পর্চা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে সে দেখতে পায়নি. ওখান থেকেই জ্বলন্ত ন্যাকড়া, কাগজ ছুঁড়ে লাশে আগুন ধরানো হয়েছে। খানিক পর আগুন একটু কমে যেতে সে পরিষ্কার চিনতে পারলো ভগ্ন-মুণ্ড হিটলারের দেহ। প্রহরী কারনাও কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। পরে সে বলে, 'বীভৎসতম দৃশ্য'। গুন্‌শের মত বিরাট-দেহ দানব তাবৎ জর্মনিতেই কম ছিল। অল্পেতে বিচলিত হবার পাত্র নয়। সে পর্যন্ত বলে, 'হিটলারের দেহ-দাহ-দর্শন আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা'।

প্রহরা পুলিসের এক তৃতীয় ব্যক্তি এই ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখবার জন্য বুঙ্কারের পর্চে গিয়ে দাঁড়ান কিন্তু মনুষ্যদেহ-বসা পোড়ার দারুণ উৎকট দুর্গন্ধ তাঁকে

সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করে।

মিনারের ঘুলঘুলি দিয়ে মান্‌স্‌ফেল্ট ও কার্নাও দেখতে পান, কিছুক্ষণ পরে পরে এস. এস-এর লোক বুঙ্কার থেকে বেরিয়ে 'চিতা'তে আরো পেট্রল ঢেলে দিচ্ছে। তারপর দুজনাতে নিচে নেমে এসে দেখেন, লাশগুলোর পায়ের দিকটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং হিটলারের হাঁটুর হাড় দেখা যাচ্ছে। এক ঘণ্টা পর তাঁরা ফের এসে দেখেন আগুন তখনো জ্বলছে, কিন্তু তেজ কম।

হিটলার আত্মহত্যা করেন অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়—লিঙের হিসেবে তিনটে পঞ্চাশে। খুব সম্ভব বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা অবধি পেট্রল ঢালা হয়। কিন্তু শেষ পযন্ত পেট্রল ফুরিয়ে যাবার পরও দেখা যায়, দেহ দুটো পুড়ে ছাই হওয়া দূরে থাক্‌, মাসচাম পুড়ে গিয়ে কালো হয়ে যা'য়া সত্ত্বেও হিটলারকে যাঁরা কাছের থেকে দেখেছেন তাঁরা তখনো তাঁকে চিনতে পারবেন।

শবদাহকারীগণ পড়লেন বিপদে। হিটলার এ পরিস্থিতির সম্ভাবনা মনশ্চক্ষে দেখেননি এবং সে অনুযায়ী কোনো নির্দেশও দিয়ে যাননি। লিঙে তাঁর বিবৃতিতে হক্‌ কথা বলেছেন: পেট্রল দিয়ে মানব-দেহ পোড়ানো তো সহজ কর্ম নয়, হিটলার কেরোসিনের ব্যবস্থা করে গেলেন না কেন? লাশ পোড়ানোর অভিজ্ঞতা ভারতের বাইরে কম লোকেরই আছে। এটা যে কত কঠিন কর্ম সেটা যে সব নাৎসি গ্যাস-চেম্বারের লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে পরে বিরাট বিরাট চুল্লিতে এদের লাশ পোড়ান, তাঁরা, ন্যুরনবের্গের মোকদ্দমায় জবানবন্দির সময় এ-কথার উল্লেখ করেছেন। এঁদের কর্তা বলেন, 'হাজারখানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমাদের বারো মিনিটেরও বেশী সময় লাগতো না, কিন্তু সেগুলো পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা ছিল অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আমাদের চুল্লীগুলো দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও এদের নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। বিস্তর হাড় চুল্লির তলায় পড়ে থাকতো।' অন্য এক সাক্ষী বলেন, 'সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিল চুল্লীর ধুঁয়ো। মানুষের পুড়ে-যাওয়া ছাই চিমনি দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের নাকে-কানে পোশাকে-আশাকে সর্বত্র ঢুকে পড়তো। পাশের এবং দূরের গাঁয়ের লোকগুলো পর্যন্ত বুঝে যায় যে আমরা কোন্‌ ব্যবসাতে লিপ্ত আছি।'

হিটলারের অনুচরবর্গ ভাবলেন, তাঁর প্রধান বাসনা ছিল তাঁর দেহ যেন শত্রুহস্তে বর্বর তামাশার বস্তু না হয়; অতএব তাঁকে যদি খুব গোপনে গোর দেওয়া হয়, তবে 'ইহুদি' ও রুশরা তাঁর স্বল্পদগ্ধ দেহ খুঁজে পাবে না। সন্ধ্যা মিলিয়ে যাওয়ার পর পুলিসকর্তা রাটেনহুবার গার্ডদের বুঙ্কারে ঢুকে সেখানকার

সার্জেণ্টকে বললে, হিটলার দম্পতির লাশ গোর দেবার জন্য তিনজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন। তাঁদের নিয়ে যেন তিনি আসেন। এঁদের শপথ করানো হল, তাঁরা সব-কিছু গোপন রাখবেন। নইলে তাঁদের গুলি করে মারা হবে।

এঁদের একজনের নাম মেঙেরস্হাউজ্ন্ ও অন্যজন গ্লান্ৎসার। দ্বিতীয়জন বার্লিনের রাস্তার যুদ্ধে মারা যান, এবং প্রথমজন রুশহস্তে বন্দী হয়ে রুশদেশে দশ বছর কাটিয়ে পশ্চিম জর্মনিতে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, হিটলারের শরীর সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া দূরে থাক, তাঁকে তখনো চেনা যাচ্ছিল।

বাগানে চিতার কাছে বোমা পড়ে একটা গর্ত হয়েছিল। মেঙেরস্হাউজ্ন্ ও গ্লান্ৎসার সেটাকে একটা ডবল গোরের সাইজে তিন ফুট গভীর করে খুঁড়লেন। তলায় তক্তা পেতে তার উপর লাশ দুটি রেখে উপরে মাটি চাপা দেওয়া হল।

লিঙে ও রাটেরহুবার রুশদেশে দশ বৎসর বন্দীদশায় কাটিয়ে ফিরে এসে বলেন, তাঁরা ঠিক গোরের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন না বটে তবে বাগানের একটা বোমাতে বানানো গর্তে যে উভয়ের কবর দেওয়া হয় সেটা সত্য। রাটেনহুবার তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন, শেষ মিলিটারি সম্মান দেবার জন্য তাঁর কাছে একখানা স্বস্তিক (হা.কেনক্রয়েৎস—হুকৃট ক্রস) পতাকা চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি যোগাড় করতে পারেননি।

মধ্যরাত্রে প্রহরী মান্স্‌ফেল্ট আবার প্রহরায় ফিরে এসে আবার মিনারে চড়ল। রাশান বোমা তখনো চতুর্দিকে পড়ছিল ও বিমানবাহিনী আকাশে হাউই ফাটাচ্ছিল। তারই আলোকে সে নিচের দিকে তা···য় দেখতে পেল, লাশ দুটো নেই, এবং বোমাতে খোঁড়া এবড়ো-খেবড়ো গর্তটা পরিপাটি লম্বমান চতুষ্কোণ গোরের আকারে নির্মিত হয়েছে। তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এটা মানুষের হাতের দক্ষ কাজ; আকাশ বা কামান থেকে বোমা পড়ার ফলে এ রকম সুবিন্যস্ত নমুনা তৈরী হতে পারে না।

ওদিকে তার সহকর্মী কার্নাও রাষ্ট্রভবনের কাছে সঙ্গীদের নিয়ে প্রহরার রোঁদে বেরিয়েছিল। এদের একজন তাকে বললে, 'ভাবতে দুঃখ হয়, .অফিসার-দের একজনও ফ্যুরারের দেহ কোথায় রইল না-রইল সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তাঁর দেহ কোথায় আছে জানি বলে গর্ব অনুভব করি।' (লোকটি হয় মেঙেরস্হাউজ্ন্, নয় গ্লান্ৎসার)।

কিন্তু যে-ই হোক লোকটির প্রথম বাক্যটি ন'সিকে খাঁটি। হিটলারের মৃত্যুর পর থেকে বাকি সব ব্যবস্থা অত্যন্ত অবহেলা ও দরদহীনভাবে করা হয়। এমনিতে জর্মনরা অত্যন্ত পাকা কাজ করতে অভ্যস্ত। তাহলে এমনটা হল কেন? খুব

সম্ভবত লোকে যে বলে হিটলার তার সাঙ্গোপাঙ্গকে (এমন কি বহু বিদেশীকেও) মন্ত্রমুগ্ধ, প্রায় মেসমেরাইজ করে রাখতেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সেই ভানুমতীর ভোজবাজির সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যাজিসিয়ান হিটলার-ভানুমতীও অন্তর্ধান করলেন তখন তারা হঠাৎ সচেতন হল, তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে। অন্ধ হোক সত্য বিশ্বাস হোক এতদিন 'গুরুর উপর তারা তাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ? 'ঈচ্ ফর হিমসেলফ্ এ্যাণ্ড ডেভিল টেক দি হাইণ্ডমোস্ট'—'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা, আর শয়তান নিক যেটা সক্কলের পিছনে, যেটা অগা কাঁচা'। বরমান অবশ্য তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু বুঙ্কারের অন্যতম অধিবাসী—সে বেচারী লাটবেলাট কিছুই না, এমন কি সামান্য 'আগডোম বাঘডোমের' ডোম সেপাইও নয়, সে নগণ্য দরজী, য়ুনিফর্ম বানায়, 'রিপুকর্ম' করে—সে বলে, 'নেতৃত্ব কথখনো এক কানাকড়িরও ছিল না, লোকগুলো হেথাহোথা ছুটোছুটি করছিল মুণ্ডুকাটা মুর্গীর মত।' কিন্তু সেটা তার পরের অধ্যায়ের কাহিনী—সেটা আমি লিখতে যাচ্ছি নে।

আমি শুধু হিটলারের গোর দেওয়ার পরের একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। আনাড়ি হাতে হিটলার-এফার শবদেহ পোড়ানোর অপটু প্রচেষ্টা যথেষ্ট বীভৎস, এটা বীভৎস ও নিষ্ঠুর।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই রাত্রেই বুঙ্কারবাসীর পক্ষ থেকে রুশদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিষ্ফল হয়। শেষ নিষ্ফলতার খবর আসে পরদিন, ১ মে, দুপুরের দিকে।

এবং পূর্বেই বলেছি, গ্যোবেলস্ স্থির করেন যে তিনি সপরিবার আত্মহত্যা করবেন। এখন সে সময় এসেছে। তিনি সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে সপরিবার আপন বুঙ্কারে চলে গেলেন। কোনো কোনো বন্ধু সেখানে তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে নিলেন।

লিঙে বলেন—ট্রেভার রোপার এ-বাবদে স্বল্পভাষী—গ্যোবেলস্ হিটলারের সার্জন ডাক্তার স্টুম্প্ফেগারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ভিতরে ঢুকতেই গ্যোবেলস্ দম্পতি বেরিয়ে এলেন। ভিতরে কি হল কেউ সঠিক জানে না।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে এসে ফ্রাউ গ্যোবেলসের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন—অর্থ, 'হয়ে গেছে'। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাউ গ্যোবেলস্ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ভিতরে কি হয়েছিল, কেউ জানে না, জানবেও না। কারণ ডাক্তার ও গ্যোবেলস্ পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। জনশ্রুতি, ডাক্তার যখন ঘরে

ঢুকলেন তখন বাচ্চারা কফি খাচ্ছে। তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল; তিনি বললেন, 'কফি খাওয়া শেষ হলেই তোমাদের সবাইকে নানা রঙের লজেঞ্চুস দেব। নূতন ধরনের লজেঞ্চুস।' বাচ্চারা সাত-তাড়াতাড়ি তাদের কফি, কোকো, দুধ শেষ করলো। তিনি বিষে-ভরা লজেঞ্চুস দিলেন। নিজে অন্য ধরনের একটা নিলেন। সব্বাইকে একসঙ্গে মুখে পুরতে হবে। ব্যাস হয়ে গেল।...অন্যেরা বলেন, ইনজেকশন দেন, এবং সবচেয়ে বড় মেয়েটি নাকি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নেবে না বলে ধস্তাধস্তি করেছিল। এসব জনশ্রুতির মূলে কি ছিল? যে পাষণ্ড এরকম হীন কাজ করতে পারে সে হয়তো বুঙ্কারে তার পরিচিতদের ভিন্ন জনকে ভিন্ন কথা বলেছিল। যে এসব করতে পারে তার পক্ষে বলাটা আর এমন কি কঠিন কর্ম? কিংবা হয়তো তাঁর এসিসটেণ্ট ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল এবং জন-শ্রুতিগুলোর মধ্যে একটা হয়তো তার।

এবং আরেকটা কথা বুঙ্কারের প্রায় সবাই জানতেন। একাধিক রমণী গ্যোবেল্‌স্‌দের সব ক'টি সন্তান একসঙ্গে বা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে, ছদ্মনামে বা আপন নামে পালাতে প্রস্তুত ছিলেন। বল্‌ট্‌ বলেছেন, 'গ্যোবেল্‌স্‌ শেষটায় তাঁর আপন প্রোপাগাণ্ডার ফাঁদে বন্দী। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, বার্লিন অজেয়। তারপর শেষ মুহূর্তে যখন বার্লিনে হাজার হাজার অসহায় শিশু রোগে ক্ষুধায় মরছে, তখন তিনি—প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী—আপন সন্তানদের নিরাপদ স্থলে পাঠান কি করে?' আমি বলি, পাঠালে কি হত? দু-চারটা লোক ঠাণ্ডা ব্যঙ্গ করতো। কিন্তু ছ-ছটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বড়, না দুটো হৃদয়হীনের তিনটে মস্করা!

পূর্বেই বলেছি, শিশুগুলোর সব কটারই নাম ছিল হিটলারের আদ্যক্ষর 'এচ' দিয়ে। তারা তাঁর সঙ্গেই গেল।

বেঁচে গেল শুধু একজন। গ্যোবেল্‌সের স্ত্রী তাঁর প্রথম স্বামীর সঙ্গে লগ্নচ্ছেদ (ডিভোর্স) করে গ্যোবেল্‌স্‌কে বিয়ে করেন। সে-পক্ষের একটি সন্তান ছিল। নাম কোয়াণ্ট্‌। গ্যোবেল্‌স্‌ তাকে খুব স্নেহ করতেন। সে তখন বার্লিন থেকে দূরে। গ্যোবেল্‌স্‌ তার জন্য একখানি সুন্দর চিঠি রেখে যান।

অতঃপর গ্যোবেল্‌স্‌ তাঁর অ্যাডজুটাণ্ট শ্বাগেরমানকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা; সব কটা জেনারেল ফ্যুরারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের সব-কিছু লোপ হয়ে গেল। আমি সপরিবার আত্মহত্যা করবো। তুমি আমার দেহ পোড়াবার ভার নিতে পারো?' শ্বাগেরমান স্বীকৃত হলেন ও পেট্রলের জন্য লোক পাঠালেন কিন্তু অল্প

পরিমাণেই পাওয়া গেল। প্রায় সাড়ে আটটার সময় গ্যোবেল্‌স্ তাঁর স্ত্রীসহ বুঙ্কারের করিডর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চললেন। পথে শ্যাগেরমান ও ড্রাইভারকে পেট্রলসহ দেখতে পেলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না। বাগানে বেরিয়ে তিনি তাঁর অর্ডারলিকে আদেশ দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনা তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। অর্ডারলি দুজনার ঘাড়ের উপর দুটি গুলি মারলো। শ্যাগেরমান শব্দ শোনার পর উপরে বাগানে গিয়ে মাটির উপর দুই মৃতদেহ পেলেন। পূর্বাদেশ অনুযায়ী তাঁরে চার টিন পেট্রল—আঠেরো গ্যালন—তাদের উপর ঢেলে চলে গেলেন। ঐটুকু পেট্রলে তাঁদের শরীরের চামড়া আর পোশাক পুড়েছিল মাত্র। মৃতদেহগুলো বিনষ্ট করার বা গোর দেবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। রাশানরা পরের দিন সেগুলো বুঙ্কার আক্রমণ করার সময় পায় ও তাঁদের সনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। গ্যোবেল্‌সের ঝলসে যাওয়া শরীরের ফোটোগ্রাফ কাগজে বেরয়। ভাঙা গাল চওড়া কপাল—চিনতে আমার পর্যন্ত কোনো অসুবিধা হয়নি।

উত্তর হিটলার

হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি, আবার অন্য অর্থে হয়েও ছিল।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই সর্ব পবিত্র শপথ ভঙ্গ করে একাধিক ব্যক্তি বন্দীদশায় রাশানদের কাছে হিটলারের শবদাহ ও কবরের গুপ্তভূমির খবর দিয়ে দেন। তারা হিটলার ও এফার মৃতদেহ খুঁড়ে বের করে ও মেঙেরস্‌হাউজ্‌ন্ প্রভৃতিকে দিয়ে সন্দেহাতীতরূপে সনাক্ত করায়।[১৪]

কিন্তু রাশানরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। ইতিহাস তাদের ভালো করেই পড়া। আছে। তারা জানে, এ-যুগে যাকে অপমান করে আগুনে পুড়িয়ে বা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হয়, পরের যুগের লোক তাকেই শহীদরূপে পুজো করে—তার নির্যাতন-ভূমি তীর্থভূমিতে পরিণত হয়।

একজন বিচক্ষণ রুশ জনৈক বন্দী হিটলার-পার্শ্বচরকে বলেন, 'হিটলারের দেহ আমাদের কাছে গোপনে লুকোনো আছে, ভালেই আছে; তোমরা জর্মনরা শহীদ পূজারী।'

তাই রুশরা হিটলারের দেহ জনগণের তামাশার জন্য বাজারে লটকায়নি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিটলারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে!!

১৪ সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী এবং তার সঙ্গে যায় বুঙ্কার থেকে বরমান, লিঙে ইত্যাদির পলায়নের চেষ্টা। কিন্তু সেটা বর্তমান কাহিনীর অংশ নয়।

গ্রন্থপরিচয়

১

'বড়বাবু' মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে ফাল্গুন ১৩৪২-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। বইয়ের আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত পাইকা টাইপে ছাপা, পৃষ্ঠা ২০৭। বইটির প্রচ্ছদপট আঁকেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচিত মহলে 'বড়বাবু' নামেই সমধিক অভিহিত হতেন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্র সম্বন্ধে এরকম উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সম্ভবত আর কেউ লেখেন নি। প্রবন্ধটির নাম 'বড়বাবু'। প্রথম প্রবন্ধের নামেই গ্রন্থের নামকরণ। এই গ্রন্থে চরিত্র-প্রসঙ্গ জাতীয় আরও গুটি কয়েক প্রবন্ধ আছে, যেমন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নেতাজী, সরলাবালা, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়। ব্যক্তিচরিত্র-প্রসঙ্গ এবং সরস ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়া 'সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার' নামের একটি রোমহর্ষক কাহিনী গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। কাহিনীটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ হলেও লেখকের সাবলীল রচনার গুণে কোথাও অনুবাদ বলে মনে হয় না। দুর্নিবার কৌতূহল পাঠককে গল্পের শেষ পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে টেনে নিয়ে যায়। এই বইয়ের সব রচনাই দেশ, কথাসাহিত্য ও উল্টোরথ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২

'কত না অশ্রুজল' বইটির প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪২। প্রকাশক—বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। বইয়ের আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত, পাইকা টাইপে ছাপা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২। "কত না না অশ্রুজল" প্রবন্ধটি বইয়ের প্রথম রচনা। গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ ব্যাপী এই রচনার নামেই বইটির নামকরণ। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত নিহত আহত সৈনিকদের পত্রাবলী এই প্রবন্ধের বিষয়। বইয়ের অন্যান্য রচনার অধিকাংশই হিটলার ও নাৎসী-জার্মানী সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিষয়ক। উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়া গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত 'দ্বন্দ্ব-পুরাণ' অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই বইয়ের অধিকাংশ লেখাই দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'হিটলার' বইটিতে সৈয়দ মুজতবা আলীর হিটলার ও নাৎসী জার্মানী সম্পর্কিত সব লেখা একত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা করা হয় বলার কারণ—এমন আরও পূর্ব-প্রকাশিত কিছু লেখা রয়ে গেছে যা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই বইটি আষাঢ় ১৩৭৭-এ বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। আকার ডবল মিডিয়ম ষোড়শাংশিত, পাইকা টাইপ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪। হিটলারের শেষ দশ দিবস ছাড়া অন্য রচনাগুলি (হিটলারের প্রেম, মস্কোযুদ্ধ ও হিটলারের পরাজয়, লক্ষ মার্কের বরমান, কনরাট্ আডেনাওয়ার, রাজহংসের মরণগীতি, আবার আবার সেই কামানগর্জন, হিটলার) 'টুনিমেম' 'রাজাউজীর' ও 'বড়বাবু'তে পূবেই মুদ্রিত হয়েছে ও রচনাবলীর পূর্ববর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই কারণে 'হিটলার' অংশে ঐ রচনাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

নকুল চট্টোপাধ্যায়

— চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত —